বেদান্ত-দর্শন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সন ১৩৩৮

মূল্য ৪৲ টাকা।

মাদারীপুর, জ্ঞানসাধন মঠ হইতে
শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত

প্রবাসী প্রেস
১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

জন্মাদ্যস্য যতস্তস্মৈ নারায়ণায় বেধসে।
অর্পণমস্ত গ্রন্থস্য গাঙ্গৈঃ গঙ্গার্চ্চনং যথা॥

নিবেদন

"কলৌ বেদান্তিনঃ সর্ব্বে ফাল্গুনে বালকা ইব"—ফাল্গুন মাসে হোলির সময় বালকেরা যেমন অর্থ না বুঝিয়া বিবিধ অশ্লীল গান করে, সেইরূপ কলিকালে সকলেই বেদান্তের কথা বলিয়া থাকেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। ইদানীং অনেকের মুখেই বেদান্তের নাম শুনা যায়। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সোৎসাহ প্রচারের ফলে শিক্ষিতসমাজে বেদান্তের নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রেই বেদান্ত ধর্ম্মপ্রবণতা বা চিন্তাশীলতার নামান্তর বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য অনেকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিতই বেদান্তের উল্লেখ করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বেদান্ত যে কি পদার্থ, তাহা জানেন না। অনেকে এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিবার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না। তবে এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই এ বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে উৎসুক। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ, হয় সংস্কৃত ভাষার সহিত একেবারেই অপরিচিত, না হয় তাঁহাদের সংস্কৃতজ্ঞান খুবই সামান্য; অথচ বেদান্ত সম্বন্ধে যত মৌলিকগ্রন্থ, সমস্তই সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন না। বঙ্গভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশই অসংস্কৃতজ্ঞের অবোধ্য, এবং যাঁহারা সামান্য সংস্কৃত জানেন, তাঁহাদেরও দুর্ব্বোধ্য। ইংরেজীতে প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধেও প্রায় এই একই কথা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের

জাতীয় অবদান হইতে ক্রমশঃ আমাদিগকে বহির্মুখীন করিয়া তুলিতেছে। ফলে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। এমন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও দেখিয়াছি, যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে একরূপ অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহারও পাশ্চাত্যের মোহ ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভারতীয় দর্শনকে তাঁহারা নির্ব্বোধের প্রলাপমাত্র মনে করিয়াই অভিমানে স্ফীত থাকেন। শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই আমরা পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হইতে শিখি, ফলে ভারতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের একান্তই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাতে বিষয়টী আরও জটিল হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই এই বাধা অতিক্রম করেন। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, বা স্বল্প জানেন, তাঁহাদের পক্ষে পারিভাষিক শব্দের দুরূহতা ও দার্শনিক ভাষার জটিলতা অতিক্রম করিয়া তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর অনেকে বেদান্ত সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে সত্যই আগ্রহান্বিত বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু বঙ্গভাষায় এমন কোন পুস্তক আছে বলিয়া জানি না, যাহার সাহায্যে জিজ্ঞাসুর কৌতূহল সহজে চরিতার্থ হইতে পারে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, কিংবা সামান্য জানেন, তাঁহারা যাহাতে বেদান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইল। যাঁহারা সংস্কৃতের সহিত সুপরিচিত তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমি আশা করি

না। সংস্কৃত ভাষায় এমনই একটা অলৌকিক মাধুর্য্য ও শক্তি বিদ্যমান যে, একমাত্র এই ভাষার সাহায্যেই ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বগুলি অতি অল্প কথায় এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া যথাযথ প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা একবার সংস্কৃতের রসবোধ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতেরই নিজস্ব সম্পত্তি বেদান্তাদি দর্শন পাঠ করিয়া কোনই সুখ পাইবেন না। একেত বিষয়টীই দুরধিগম্য, তাহাতে আবার যে শ্রেণীর পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিবেন বলিয়া আশা করি, তাঁহারা দার্শনিক ভাষার সহিত খুব অল্পই পরিচিত। বিশেষতঃ অন্যান্য বিষয়ে যতই বিজ্ঞ হউন, সাধনভজনবিহীন হইলে কেহ যে বেদান্তের মাধুর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন, আমার এমন বিশ্বাস নাই। তবে যাঁহারা বেদান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে আগ্রহান্বিত, অথচ সংস্কৃতের সহিত বিশেষ পরিচয়ের অভাবে সফলকাম হইতেছেন না, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। এই উদ্দেশ্যে ভাষার সরলতা, পারিভাষিক শব্দের বর্জ্জন এবং জটিল দার্শনিক বিচারের পরিহার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; স্থলবিশেষে দুটি একটী অশুদ্ধ পদ ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। এই পুস্তক প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠক মাতৃভাষার সাহায্যে হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করি না।

এই পুস্তকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের একটা সরল ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস করিয়াছি। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, ইহা

শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ নয়, ভাবার্থ মাত্র। আমার ভ্রমপ্রমাদ হওয়া খুবই সম্ভব। বিজ্ঞ পাঠক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বেদান্তের তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক করিয়া হয় না। যিনি নিজ জীবনে ঐ তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন একমাত্র তাদৃশ সদ্‌গুরুর মুখে উহা শ্রবণ করিলেই এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। এই বিশ্বাসে গুরুশিষ্য সংবাদচ্ছলে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি।

যাঁহারা সূত্রগুলির অক্ষরার্থ জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত নন, তাঁহারা সূত্র এবং তৎসঙ্গে [ ] ঈদৃশ বন্ধনীর অভ্যন্তরস্থ সংস্কৃত শব্দ কয়টী বাদ দিয়া পাঠ করিবেন।

সাধারণ পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, এই পুস্তকে আলোচিত কোন বিষয় প্রথমতঃ খুব পরিষ্কার ভাবে না বুঝিলেও যেন তাঁহারা হতাশ না হন, একটু ধৈর্য্য সহকারে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিলে সকল বিষয়ই পরিষ্কার হইবে, আমার এরূপ বিশ্বাস। একই বিষয় কোন স্থলে সামান্যভাবে, কোনস্থলে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষসূচী এরূপ স্থলে সহায় হইতে পারে।

যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের গুণমুগ্ধ, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যদি বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষকেই দর্শন আলোচনার চরম ফল মনে না করেন এবং প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধিৎসু হন, তবে শ্রদ্ধার সহিত বেদান্ত দর্শন আলোচনা করিবেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক যেস্থলে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বেদান্ত সেই স্থলে উচ্চৈঃস্বরে আশার বাণী ঘোষণা করেন। পাশ্চাত্য দর্শনের যেখানে শেষ, বেদান্তের সেইখানে আরম্ভ—এরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বেদান্ত আলোচনা কালে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে,

ইহা বাস্তব জীবনের পথপ্রদর্শক, কল্পনার খেয়াল নহে। যুক্তি যেস্থলে পরাহত, বেদান্ত সেইস্থলে আশার প্রদীপ।

অবশেষে বক্তব্য, আমার সহকর্ম্মী সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এবং সংশোধনাদি কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

১৮৫৩ শকাব্দ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ ;
বি. এন্. কলেজ, বাঁকীপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অবতরণিকা

। হিন্দুদের বিশ্বাস—বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন পুরুষকর্তৃক রচিত নয়, ইহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনাদিকালের অক্ষয়-জ্ঞান-রত্ন-রাজিই **বেদ** বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম শ্রুতি। অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত তত্ত্বোপদেশ শ্রুত হইয়া আসিতেছে, তাহারই নাম **শ্রুতি**। ব্যাস এই সমস্ত উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা বিভাগ করেন, এবং এই সমস্ত বিভাগের নাম হয় **ঋক্‌, যজুঃ, সাম** এবং **অথর্ব্ব**। এই উপদেশগুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত—এক কর্ম্মপ্রধান, অপর জ্ঞানপ্রধান। কর্ম্মপ্রধান উপদেশগুলি স্তব, স্তুতি, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদির বিষয় শিক্ষা দেয়; এবং তাহাদের সমষ্টিকে বলা হয় **সংহিতা** ও **ব্রাহ্মণ**। পক্ষান্তরে জ্ঞানপ্রধান উপদেশগুলি আত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টি, ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করে, এবং ইহাদের নাম **উপনিষৎ**। উপনিষৎ বহু, এবং ইহাদিগকে আবার **বেদান্ত** শব্দেও অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ বেদান্ত বলিতে প্রধানভাবে এই উপনিষৎ-সমূহকেই বুঝায়। 'বেদান্ত' অর্থ 'বেদের অন্ত', অর্থাৎ বেদের শেষভাগ। বেদের প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড পরে জ্ঞানকাণ্ড—এই জন্য জ্ঞানকাণ্ডের নাম বেদ-অন্ত। অথবা যে জ্ঞান লাভ করিলে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্ত অর্থাৎ অবসান হইয়া যায়, তাহারই নাম বেদান্ত। অথবা বেদের অন্তরের তত্ত্ব যাহা, তাহাই বেদান্ত—এই অর্থে উপনিষৎ-সমূহকে **রহস্য**ও বলা হয়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ইহাদের

সাধারণ নাম বেদ বা শ্রুতি। সুতরাং দেখা গেল, বেদান্ত বলিতে প্রথমতঃ উপনিষৎকেই বুঝায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষৎ বহু। এই সমস্ত উপনিষদে যে উপদেশ আছে, তাহা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত, এবং অনেক স্থলে উপদেশগুলির মধ্যে পরস্পর আপাতঃ-বিরোধ আছে বলিয়াও মনে হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যাস এই সমস্ত উপদেশের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া **বেদান্ত-মীমাংসা** বা **ব্রহ্মসূত্র** প্রণয়ন করেন। আচার্য্য জৈমিনিও এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের একটী মীমাংসা প্রণয়ন করেন এবং তাহার নাম হয় "কর্ম্মমীমাংসা" বা "পূর্ব্বমীমাংসা"। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম "উত্তরমীমাংসা", "শারীরকমীমাংসা"*। কিন্তু এই সূত্রগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে, কেবল উহা পাঠ করিয়া কোন অর্থবোধ করা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরও একরূপ অসাধ্য।

সুখের বিষয় ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নের কাল হইতেই উহার কয়েকটী সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। পরবর্ত্তীকালে শঙ্কর, রামানুজ, ভাস্কর, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব, হরদত্ত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ব্রহ্মসূত্রের বহুবিধ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন; এবং তাহাতে এক বেদান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বলেন, বেদান্ত শাস্ত্রের তিনটী বিভাগ বা প্রস্থান—উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতিপ্রস্থান, এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান। বস্তুতঃ উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত

---

* 'উত্তর' অর্থাৎ বেদের 'জ্ঞান কাণ্ড'; 'শারীরক' অর্থাৎ শরীরোপহিত আত্মা।

শাস্ত্র নামে সুপরিচিত এবং প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক আচার্য্যই এই প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাপিত করিতে যত্নপর হইয়াছেন। তবে বেদান্তদর্শন বলিতে প্রধানভাবে ব্রহ্মসূত্রই বুঝায়।

এস্থলে ব্রহ্মসূত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ। প্রত্যেক পাদে কতকগুলি করিয়া অধিকরণ, অর্থাৎ এক একটী বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা। প্রত্যেক অধিকরণে আবার কয়েকটী করিয়া সূত্র। শঙ্করমতে সমগ্রসূত্রের সংখ্যা ৫৫৫। অবশ্য কোন কোন ভাষ্যকার দুই তিনটী সূত্র একত্র করিয়া কিম্বা একটী সূত্রের বিভাগ করিয়া সূত্রের সংখ্যা কম বেশী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্যগণ প্রথম অধ্যায়কে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়কে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়কে সাধন, এবং চতুর্থ অধ্যায়কে ফল নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য স্পষ্টভাবে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করেন, তাহাদের আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম বোধক অস্পষ্ট বাক্য সকল এবং উপাস্য ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য-সমূহের বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থপাদে সন্দিগ্ধবাক্যসমূহের বিচার আছে। এইরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মকারণতা সম্বন্ধে সাংখ্যাদি স্মৃতির ও যুক্তির বিরোধ পরিহার, সাংখ্যাদিমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন, পঞ্চমহাভূত, জীব ও লিঙ্গশরীর সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের পরলোক গমন প্রণালী, জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ, বিবিধ উপাসনা প্রণালী এবং সাধনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাধন প্রণালী, দেহত্যাগ প্রণালী, দেবযান পথ ও মুক্তিস্বরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। অবশ্য এই কয়টি বিষয় ছাড়া আরও বহুবিষয় ব্রহ্মসূত্রে

আলোচিত হইয়াছে, তবে এই কয়টি প্রধান। বিশেষ স্থচীপত্রে দ্রষ্টব্য। এই বিভাগ শঙ্করমতানুযায়ী। অন্যান্য আচার্য্যগণ স্বীয় মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অন্যরূপ বিভাগ স্বীকার করেন। মোটের উপর তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর যাবতীয় প্রশ্নেরই মীমাংসা এই ব্রহ্মসূত্রে আছে। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিলেই তত্ত্বার্থী কৃতার্থ হইতে পারেন সন্দেহ নাই। এবং এই জন্যই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মসূত্রের বহুবিধ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বর্ত্তমান এবং সেই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকারগণ আবার নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে প্রধান প্রধান উপনিষৎ ও গীতারও ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—এক অদ্বৈতবাদ, অপর দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ। সমস্ত দর্শনেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ; অর্থাৎ আমি কি, এই জগৎ কি এবং জগৎ ও আমার অন্তরালে অন্য কিছু আছে কি-না, থাকিলে তাহার স্বরূপ কি। এই তিনটি প্রশ্নের সমাধানই প্রত্যেক দর্শনের মুখ্য কার্য্য। অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য এই যে, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর বস্তুগত্যা একই; দ্বৈতবাদের মর্ম্ম এই যে, ইহারা পৃথক্। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মতবাদের বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইলে এক একটী সুবিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে।* এস্থলে প্রধান কয়েকটি মতবাদের সামান্য আভাস প্রদত্ত হইল। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদই বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত

---

* অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী পাঠক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" পাঠ করিতে পারেন।

বিবরণ গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যাইবে। তবে প্রথমে অন্যান্য মতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শঙ্কর মতের মোটামুটি একটা আভাস দিব।

এই সমস্ত মতবাদ বুঝিতে হইলে 'ভেদ' কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যক। একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটী বট বৃক্ষ হইতে একটী মনুষ্য, একটী গরু, একখানি গৃহ, একটী নদী, একটী পাহাড়, একটী নক্ষত্র, ইত্যাদি ভিন্ন। এই যে বট বৃক্ষ হইতে মনুষ্যাদির ভেদ বা পার্থক্য, ইহার নাম **বিজাতীয় ভেদ**। আবার একটি বটবৃক্ষ হইতে একটি আম্র বৃক্ষ, একটি অশোকবৃক্ষ ইত্যাদি বৃক্ষের যে ভেদ, ইহার নাম **সজাতীয় ভেদ**। আর একটি মাত্র বট বৃক্ষেরই মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর যে ভেদ, ইহার নাম **স্বগত ভেদ**। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হইল—জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে উক্ত তিন প্রকার ভেদের কোনটীই নাই। দ্বৈতবাদ এই সমস্ত ভেদ স্বীকার করেন। তবে কোন কোন আচার্য্য কোন-না-কোন রকমের ভেদ স্বীকার করিয়াও আপনাদের মতকে অদ্বৈত আখ্যা প্রদান করেন। যেমন আচার্য্য রামানুজ বিজাতীয় ও সজাতীয় ভেদ স্বীকার না করিলেও স্বগত ভেদ স্বীকার করেন, এবং বলেন—অনন্ত জীব ও জগৎ পুরুষোত্তমের শরীর, পুরুষোত্তম সেই শরীরের আত্মা। ইহার মতবাদের নাম **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ**। এই মতে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও জীব ও জগৎ তাঁহার স্বগত ভেদ। অর্থাৎ জীব ও জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক এবং নিখিল কল্যাণগুণের আধার। জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্ম শক্তিরই একটা পরিণাম, অতএব সত্য। জীব অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র;

কাজেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জীব অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ, এবং জী
ও ব্রহ্ম ভিন্ন, এক নহে। জীব চিরকালই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকি
তবে মুক্তি দশায় ব্রহ্মের সন্নিধি লাভ করিয়া তাঁহার সেবকরূপে আ
উপভোগ করিতে থাকিবে। জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারিবে
ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়।

মধ্বাচার্য্যের মতবাদ **স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ** নামে পরিচি
ইহার অপর নাম **পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন**। এই মতে তত্ত্ব দুই
অখিল কল্যাণ গুণের আলয় ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র (স্বাধীন) তত্ত্ব,
ও জগৎ অ-স্বতন্ত্র, অর্থাৎ বিষ্ণুর অধীন, তত্ত্ব। জীব ভগবানের
তাহার কর্ত্তব্য ভগবানের সেবা দ্বারা সারূপ্য, সাযুজ্য বা সালোক্য
লাভ করা। জীব ও জগৎ চিরকালই ভগবান্ হইতে পৃথক্, অ
উহাদের ভগবানের সহিত এক হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ রাম
ও মধ্বের মত প্রায় একই রূপ, তবে মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী, রামা
কতকটা অদ্বৈতবাদী।

বল্লভাচার্য্য **শুদ্ধাদ্বৈতবাদী**। ইনি বলেন, ব্রহ্ম নি
নির্ব্বিশেষ; এবং তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কা
গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই শুদ্ধ। গোলো
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পতি
সেবা করিয়া সুখ বোধ করাই মোক্ষ। ইহার মতে জ্ঞানমা
ভক্তি মার্গ অকিঞ্চিৎকর, প্রীতিমার্গই শ্রেষ্ঠ।

ভাস্করাচার্য্য **ভেদাভেদবাদী**। ইহার মতে জীব ও
ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে—কার্য্যরূপে ভিন্ন, কার
অভিন্ন। ব্রহ্ম সগুণ, নিরাকার, অদ্বিতীয়। তাঁহার দুইটী শ
ভোগ্যশক্তি জগৎরূপে পরিণত, এবং ভোক্তৃশক্তি জীবরূপে পরি

জীব 'আমিই ব্রহ্ম' এই ভাবে ধ্যান করিতে করিতে মৃত্যুর পরে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

নিম্বার্কাচার্য্য **দ্বৈতাদ্বৈতবাদী**। ইঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন। ব্রহ্ম হইতেই জীব ও জগতের পরিণতি। ব্রহ্ম জগতের অতীতরূপেও বিদ্যমান, সুতরাং জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন; আবার জীব ও জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। অংশ ও অংশী পরস্পর ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে—ইহাই নিম্বার্ক মতের ভিত্তি।

আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ **অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী**। ইঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ ও নির্ব্বিকার। জীব ভগবানের সেবক। মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নই থাকেন। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে জগৎ তাঁহারই পরিণাম এবং সত্য।

একমাত্র ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া এই প্রকার বহুবিধ মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র অতি সংক্ষিপ্ত। যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে আপন মতানুযায়ী উহার একটা ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাসের বচন উদ্ধার করিয়া স্বমতের পোষকতা করাও বিজ্ঞ লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর নয়। বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই, এবং সেইজন্যই একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায়ই এত মতভেদ। আমার মনে হয়, এই সমস্ত মতভেদের মূলে সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক এক একজন আচার্য্য যুগানুকূল এক একটা মতবাদের সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ আবার সেই সেই মতের অভ্রান্ততা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপেই বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। তারপর সত্য এক হইলেও তাহার প্রকাশভঙ্গি এক একজনের হাতে এক একরূপ হইবেই।

বলিতে গেলে ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, সাকার কি নিরাকার, সক্রিয় কি নিষ্ক্রিয়—এই একটী মাত্র প্রশ্নের মীমাংসা উপলক্ষ্য করিয়াই বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি। ফলতঃ এই প্রশ্নটীর মীমাংসার উপরই জীব ও জগতের স্বরূপ নির্ণয় একান্তভাবে নির্ভর করে। আর, ব্রহ্মসূত্রের মূলভিত্তি উপনিষদে সগুণ, নির্গুণ উভয়বোধক বাক্যই আছে। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ কেহ বা ব্রহ্মের নির্গুণরূপের সত্যতা প্রমাণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, কেহ বা সগুণ রূপের; কেহ কেহ আবার উভয়রূপই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কেহ বা আবার এই পরস্পর বিরুদ্ধ রূপদ্বয়ের একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য শঙ্কর সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেহই নির্গুণত্বই একমাত্র পরমার্থ সত্য, এরূপ নির্ভীক সিদ্ধান্ত প্রচার করেন নাই। কোন সম্প্রদায় সগুণত্বই সত্যরূপে স্বীকার করিয়া নির্গুণ-বোধক শ্রুতি-বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে সেই বাক্যগুলির তাৎপর্য্যও সগুণপরই হয়। কোন সম্প্রদায় আবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের শক্তি যখন অসাধারণ, অনন্ত, অপার, অচিন্ত্য এবং শ্রুতিও যখন উভয়রূপের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন (আমাদের বুদ্ধিতে সগুণে নির্গুণে একটা বিরোধ অনুভূত হইলেও) ব্রহ্মে ওরূপ উভয়রূপতা হওয়া অসম্ভব নয়।

যাঁহারা ব্রহ্মের সগুণরূপতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেরই পরিণাম, অর্থাৎ ব্রহ্মই স্বশক্তি-প্রভাবে

একাংশে জীব ও জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। একটি ঘটের উৎপত্তি ব্যাপারে কুম্ভকার যেমন নিমিত্ত কারণ এবং মৃত্তিকা যেমন উপাদান কারণ, এই জগতের উৎপত্তি ব্যাপারে তেমন একমাত্র ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। সুতরাং ব্রহ্মপরিণাম বলিয়া জীব ও জগৎ সত্য। জীবের কর্তব্য সম্বন্ধে ইঁহাদের মত এই যে, সেবা দ্বারা ব্রহ্ম কৃপা লাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বগণরূপে আনন্দ উপভোগ করা—ইহাই জীবের মুক্তি। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিনের সত্যতা স্বীকার করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে ভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলা যায়। অদ্বৈতবাদী বলিতে হইলে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শঙ্কর সম্প্রদায়কেই বলা যায়। এস্থলে আর একটী বিষয়ে প্রণিধান করা প্রয়োজন। শঙ্কর সম্প্রদায় প্রধানভাবে শ্রুতির উপর নির্ভরশীল, এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কমবেশী পৌরাণিক বচনে সমধিক আস্থাসম্পন্ন। এই হিসাবে শাঙ্কর বেদান্তকে বৈদিক, এবং অন্যান্য সম্প্রদায় প্রবর্তিত বেদান্ত দর্শনকে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আবার, উপনিষৎ বিশেষভাবে সংসার-বিরক্ত জ্ঞানার্থীর আলোচ্য এবং পুরাণাদি সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মোপদেষ্টা। এই হিসাবে শাঙ্কর মত বিশেষ জ্ঞানার্থীর নিকট সমাদৃত, এবং অন্যান্য মত ধার্ম্মিক সাধারণের প্রিয়।

যাহা হউক, এক্ষণে শাঙ্কর মত সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শাঙ্কর দর্শন একান্তভাবে শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। শঙ্কর শ্রুতির উক্তিকে অভ্রান্ত সত্যরূপে স্বীকার করেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অসাধারণ পণ্ডিত, তীক্ষ্ণ মেধাবী, অদ্বিতীয় সাধক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপটু দার্শনিকও কেন যে শ্রুতির উপর এতটা নির্ভর করিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার মতে জীবনের মূল সত্যটি বিচার বুদ্ধির অতীত। সেই মূলসত্যের সম্বন্ধে যদি

কিছু জানিতে হয়, তবে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে প্রতারিত হইতে হইবে। একমাত্র শ্রুতিই সেই সত্যের কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করেন। যিনি সেই সত্যে যথার্থতঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি শ্রুতির সাহায্যে নিজ জীবনে উহা উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন।

শঙ্কর-মতে সেই সত্যটী শ্রুতিতে ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তাহাতে কি বিজাতীয়, কি সজাতীয়, কি স্বগত, কোন প্রকারের ভেদই নাই। তাহা কেবল, চৈতন্যমাত্র, প্রজ্ঞানঘন, অখণ্ডৈকরস, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না। ইহাই **পরমার্থ-সত্য**। তবে অনাদি অজ্ঞান প্রভাবে এই নির্ব্বিশেষ চৈতন্যঘন ব্রহ্মে রাম শ্যাম যদু, পশু পক্ষী কীট, বৃক্ষ লতা গুল্ম ইত্যাকার অশেষবিধ বিশেষ বা খণ্ডতা প্রতিভাত হয় মাত্র। ঠিক রজ্জু সর্পেরই মত জীব ও জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত; বাস্তবিক উহাদের কোন সত্তাই নাই। যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ জীব ও জগৎই একমাত্র সত্য, এবং ঈদৃশ সত্যকে বলা হয় **ব্যবহারিক সত্য**। যখন অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অন্যসব মিথ্যা—এই সত্যই পারমার্থিক সত্য। সুতরাং অজ্ঞান দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সবিশেষ, সগুণ, সক্রিয়, সাকার; জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার। শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়রূপ নির্দ্দেশ করিলেও পরমার্থদৃষ্টিতে নির্ব্বিশেষ রূপই সত্য, আর ব্যবহার বা অজ্ঞানদৃষ্টিতে সবিশেষই সত্য। ফলে পরমার্থ দৃষ্টিতে অজ্ঞানও নাই, জীবও নাই, জগৎও নাই, সৃষ্টি নাই, বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই, শাস্ত্র

নাই, গুরু নাই, শিষ্য নাই, সাধ্য নাই, সাধন নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সমস্তই আছে, বরং ব্রহ্মই নাই। মনে রাখিতে হইবে, অজ্ঞানও ব্যবহারদৃষ্টিতেই সত্য, পরমার্থদৃষ্টিতে উহারও কোন অস্তিত্ব নাই; সুতরাং পরমার্থতঃ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই।

ব্যবহারিক জগৎকে শঙ্কর মায়া নামে অভিহিত করেন। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে মনে করার নামই মায়া। অজ্ঞান প্রভাবেই এরূপ ভ্রম হয়। একগাছি দড়িকে সময়ে একটা সাপ বলিয়া ভ্রম হয়। বিচার করিলে ইহার সর্ব্ব প্রধান কারণ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অবশ্য সামান্য অন্ধকার, চক্ষুর দোষ ইত্যাদি অনেক সহকারী কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণ যে অজ্ঞান তাহা বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারযুক্তি বলে প্রমাণিত করিয়াছেন, বাহুল্য-ভয়ে সে সমস্ত এ স্থলে উল্লিখিত হইল না। এই যে একবস্তুকে অন্য বস্তুরূপে মনে করা রূপ ভ্রম, ইহা প্রতিনিয়তই আমাদের হইতেছে। এমন কি, আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই ঈদৃশ ভ্রম প্রসূত—ধীরভাবে বিচার করিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদিকে আত্মা বা আমিরূপে মানিয়া লইয়াই যত কিছু ব্যবহার, বাস্তবিক আত্মা কিন্তু দেহাদি নয়। আত্মবিষয়ক অজ্ঞানপ্রভাবেই ওরূপ ভ্রম হইতেছে। অজ্ঞানের শক্তি অতীব বিচিত্র। ইহার স্বরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইহা সৎ (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালস্থায়ী) নয়; কারণ, জ্ঞান হইলে আর ইহা থাকে না। আবার একেবারে অসৎও (আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক) নয়, কারণ তাহা হইলে ইহার প্রভাব কখনও অনুভূত

হইত না। সুতরাং এই অজ্ঞান বা মায়া অনির্ব্বচনীয়। অজ্ঞানের দুইটী শক্তি—এক আবরণশক্তি, অপর বিক্ষেপশক্তি। আবরণ শক্তির প্রভাবে বস্তুর স্বরূপটী আবৃত হয়, আর বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে বস্তুটী অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। রজ্জুসর্পস্থলে অজ্ঞানের আবরণশক্তি প্রভাবে রজ্জুর পরিচয় অজ্ঞাত থাকে, আর বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়। এতাদৃশ ভ্রমস্থলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন :—

(১) রজ্জু যখন সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, তখনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, সত্য সত্যই সর্প হইয়া যায় না ; বস্তুটী অবিকৃত থাকিয়াও অন্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় ;

(২) সুতরাং রজ্জুই সত্য, সর্প মিথ্যা ; তবে মিথ্যা বলিয়া একেবারে আকাশকুসুমের মত অলীক (non-existent) নয় ;

(৩) সর্প মিথ্যা হইলেও সর্প ধারণায় ভীতি, গাত্রকম্প, পলায়ন প্রভৃতি সত্যব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ;

(৪) যতক্ষণ সর্পজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ উহাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, রজ্জুজ্ঞান হইলেই মিথ্যা বোধ হয়, ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মায়ার শক্তি অতীব বিচিত্র অনির্ব্বচনীয়। এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সবিশেষরূপে প্রতিভাত হন। এই হিসাবেই ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানপ্রভাবে যেমন রজ্জু হইতেই সর্পের উৎপত্তি, রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই যেমন সর্পের অবস্থিতি, এবং জ্ঞানোদয়ে আবার যেমন সেই রজ্জুতেই সর্পের বিলয়, সেইরূপ মায়া প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আধারকে আশ্রয়

যাঁহাতে জগৎপ্রতীতি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। জগৎ-সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ার নাম বিবর্ত্ত।

অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বৈদান্তিক আচার্য্যগণও ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরিণামবাদী, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন (দুধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, মৃত্তিকা যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, কিম্বা, মাকড়সা হইতে যেমন জালের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ)। সুতরাং ব্রহ্মও যেমন সত্য, এই জগৎও তেমনই সত্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্ম যদি সত্য সত্যই পরিণামশীল হন, তবে বহু দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিকারী, ধ্বংসশীল, পক্ষপাতী, নির্দ্দয় ইত্যাদি বহু দোষ দুষ্ট বলিয়া বলাও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জীবের বন্ধমোক্ষের কোন অর্থই হয় না। মূলগ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। তবে মোটামুটি দুই একটী বিষয় সামান্যভাবে অবতারণা করিতেছি :—

(১) ব্রহ্ম যদি সত্য সত্যই সৃষ্টি করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার একটা অভাব বোধ আছে, ফলে তিনি অপূর্ণ।

(২) জীব ও জগৎ যদি সত্য হয়, তবে জীবের বন্ধনও সত্য এবং সত্য বলিয়া কোন কালেও তাহার অভাব হইতে পারে না, ফলে মুক্তি বলিয়া কোন কথাই থাকিতে পারে না।

(৩) ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য ইত্যাদি প্রাপ্তি অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে মুক্তি বলা যায় না। শৃঙ্খল স্বর্ণনির্ম্মিত হইলেও তদ্দারা বন্ধনের বাধা কি ?

(৪) ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ (perfect), তাঁহা হইতে এতটুকু পার্থক্য

থাকিলেও অপূর্ণতাই হয় —এই সমস্ত বিষয় জ্ঞানার্থী ধীরভাবে বিচার করিবেন।

যাহা হউক, শঙ্কর মতে জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নহে, সে অজ্ঞান প্রভাবে আপনাকে জীব বলিয়া মনে করিতেছে মাত্র। অজ্ঞান অপগত হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, সে চিরকাল ব্রহ্মই আছে— ইহারই নাম মুক্তি। এক কথায় শঙ্কর মত এই :—

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ;
জীব ব্রহ্মই, আর কিছুই নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ সকলেই মহাপুরুষ, সকলেই সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারাই যদি পরস্পরের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন, তবে সাধারণের পক্ষে কোন্ মত অবলম্বনীয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, ফলে কোন মতের প্রতিই লোকের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আচার্য্যগণ সর্ব্বপ্রযত্নে পর মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন কি, পর মত ভ্রান্ত, স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আচার্য্যদের এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচার করাতে বলিতে হয় যে, হয় তাঁহারা কেহই সত্য উপলব্ধি করেন নাই, না হয় ওরূপ বিরুদ্ধ মত প্রচারের একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আচার্য্যগণ কেহই সত্য উপলব্ধি করেন নাই, ইহা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ওরূপ বিরুদ্ধ মত প্রচারের উদ্দেশ্য কি? আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। বিজ্ঞপাঠক ইচ্ছানুরূপ মীমাংসা করিবেন।

বিরুদ্ধ মতগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক মতে জীব পূর্ণব্রহ্ম, অপর মতে জীব তাঁহার অংশ ও সেবক। একটীকে বলা যাইতে পারে জ্ঞান মার্গ, অপরটীকে কর্ম্ম বা ভক্তি মার্গ। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মহাপুরুষগণ যখনই যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা একমাত্র লোক শিক্ষার জন্য; তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা কে কি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা অপরের জানিবার সম্ভাবনা নাই। স্বমতানুযায়ী আচার ব্যবহার সম্পাদন করিয়া লোক-শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিলেও তাদৃশ আচার ব্যবহারই যে তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্য, তদপেক্ষা অধিক কিছুই যে তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই—এমন কথা বলা যায় না। প্রকৃত আচার্য্য যিনি, তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়"*। কিন্তু সাধনার শেষ সিদ্ধি যাহা, তাহা দেশ, কাল, পাত্রের অপেক্ষা রাখে না; সর্ব্ব স্থলে, সর্ব্ব কালে, ও সর্ব্ব সাধকের নিকটই তাহা একরূপ। সে বিষয়ে আচার্য্যদের কোন মতদ্বৈধ হইতেই পারে না। আর এই বিষয়টী বাস্তবিকই সমস্ত মতবাদের অতীত, অতএব প্রকাশেরও অযোগ্য, একমাত্র বোদ্ধারই স্বসম্পত্তি। তাই আমাদের মনে হয়, আচার্য্যদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই, থাকিতে পারে না; তবে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্যদের বাধ্য হইয়া বিভিন্ন মতের প্রচার করিতে হইয়াছে; এমন কি, স্বীয় মতের উপাদেয়তা প্রদর্শন করিবার জন্য অন্যমতের অসারতা প্রতিপাদন করিতেও যত্নবান্ হইতে হইয়াছে। একই তথ্য পাঁচজনকে

---

* শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্ম্ম ও চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম তুলনা করুন।

বুঝাইতে হইলে পাঁচরকমে বুঝান আবশ্যক হয়, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি, শক্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন।

এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতের বিরোধ, ইহাই অন্য আকারে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধরূপে বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মনে হয়, এই বিরোধ খুবই স্বাভাবিক। এই বিরোধ আছে বলিয়াই ধর্ম্মের ও জীবনের জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন রহিতেছে। এই বিরোধ না থাকিলে সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ফল কথা, বিরোধেই জীবনের পরিচয়। যাহা হউক, বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্মপরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, একযুগে কর্ম্মের প্রতি লোকের অধিক শ্রদ্ধা হইয়াছে, ঠিক তাহারই পরবর্ত্তী যুগে যেন কর্ম্মের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞানের উপর লোকে সমধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছে। মনে হয়, যেন কর্ম্ম ও জ্ঞানের একটা তরঙ্গ-প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। কখনও কর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, কখনও জ্ঞান। বৈদিক যুগের যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মবাহুল্য নির্জ্জিত করিয়া ঔপনিষদজ্ঞান প্রবলভাবে মস্তক উত্তোলন করিল। জ্ঞানের প্রাধান্য আবার ঐহিকসর্ব্বস্ব চার্ব্বাকাদির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কর্ম্মপ্রবাহে এবং কতক পারলৌকিক স্বর্গাদি কামুকের যাগযজ্ঞের আড়ম্বরে খর্ব্ব হইয়া গেল। এই আড়ম্বরের বিরুদ্ধে পুনরায় বৌদ্ধদের কর্ম্মস্বল্পতা ও জ্ঞানসাধনা প্রবল হইয়া উঠিল, বৌদ্ধদের কর্ম্মবিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাগিয়া উঠিল আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মাড়ম্বর। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই সাধনার্হ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অবশ্য ইহারাও কর্ম্মের উপরই অধিক জোর দিলেন। শঙ্করাচার্য্য আবার কর্ম্মকে নিম্নস্থান প্রদান করিয়া জ্ঞানের মাহাত্ম্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া

ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্ব কালক্রমে বিকৃতভাব ধারণ করিল। এই অদ্বৈততত্ত্বটী যথার্থ সাধকের অন্বেষণীয় না হইয়া সাধকম্মন্যের গর্ব্বের বিষয় হইলে বড়ই ভয়াবহ হইয়া পড়ে। তথাকথিত সাধক মুখে 'আমিই ব্রহ্ম' প্রচার করিয়া সর্ব্ববিধ অনাচারেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। হইয়াছিলও তাহাই। তাই রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য জীবের এই অকল্যাণকর মৌখিক অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন; এবং বলিতে বাধ্য হইলেন যে, জীব পূর্ণ ব্রহ্ম ত নয়ই, বরং তাঁহার দাসানুদাস। ঠিক এই ভাবটী প্রচার না করিলে তথাকথিত অদ্বৈতমানীর মিথ্যা অভিমান ও ঔদ্ধত্য আর কিরূপে চূর্ণ হইবে? এই সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যের শিক্ষার প্রভাবে কিছুকাল সমাজে খুব ভক্তি ও ভক্তিসাধন পূজার্চ্চনাদি কর্ম্মের স্রোত বহিল। কালক্রমে এই ভাবটী তিরোহিত হইল; লোকে ঐহিক সুখান্বেষণে তৎপর হইল এবং বিদ্বন্মণ্ডলী শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই শুষ্ক জ্ঞানপ্রাধান্যের [illegible] উত্থিত হইলেন ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য। কালক্রমে চৈতন্যের শিক্ষা বিকৃত হইয়া উঠিল। বৈদেশিক প্রভাবে দেশের লোক একরূপ ধর্ম্ম ভুলিয়াই গেল। ঐহিকতাই একমাত্র অনুসরণীয় বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিল। দেশের এই দুর্দ্দিনে একদিকে আর্য্যসমাজ বৈদিক কর্ম্মের, অপর দিকে ব্রাহ্ম সমাজ ঔপনিষদ জ্ঞানের পতাকা হস্তে লইয়া বিপথগামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিল। ব্রাহ্ম সমাজ ধর্ম্মজগতে কর্ম্মকে একরূপ বর্জ্জন করিয়া একমাত্র জ্ঞানেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরে আবার পরমহংস রামকৃষ্ণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিয়া ভারতের স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে থিয়োসোফিষ্টদের সমন্বয়-প্রচেষ্টাও

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের রামকৃষ্ণ যুগ চলিতেছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই যুগের প্রধান শিক্ষণীয় হইতেছে এই যে—কর্ম্মই বল, ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল, সকলই সত্যোপলব্ধির সহায়, কোনটীই অবহেলার যোগ্য নয়। আর ইহাই বেদান্তের সার সিদ্ধান্ত।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার স্বভাবগত পূর্ণতা যে কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যগ্র। তাই সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে সে ধ্বংসের চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকে, সৎশিক্ষা পাইলে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। যে কোন যুগে যে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে জীবের প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করা। কিন্তু দুর্নিবার কালের প্রভাবে ও বহির্মুখীন প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ অল্পদিনেই তাঁহার শিক্ষা বিকৃত করিয়া ফেলে। বিকৃতরুচি জীবকে প্রকৃতিস্থ করিতেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আচার্য্য-গণের মতবিরোধের কারণ দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী শিক্ষার প্রচার। আমাদের বিশ্বাস, সদ্‌গুরুর সহায়তায় নিজ নিজ রুচি, শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে, আন্তরিকতার সহিত যিনি যে কোন মতেই অনুসরণ করুন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণকাম হইতে পারেন। এই সমস্ত বিভিন্ন মত সত্যোপলব্ধির বিভিন্ন উপায় মাত্র। মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপায় বহু থাকিলেও নিষ্ঠাই সিদ্ধির মূল। এটা, ওটা, সেটা, এইরূপ পাঁচ মতের সমন্বয় করিতে গিয়া অনেকেই আপনাকে হারাইয়া ফেলেন ও ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া যান। কোন মতের বা উপায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়, কিন্তু নিজমতের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা না থাকিলেও সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। নিজ মতে

নিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে, পরমতকে নিন্দা করিতে হইবে। যিনি পরমতের দোষোদ্ঘাটনেই ব্যস্ত, তিনি সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য।

অনেকের বিশ্বাস শঙ্করাচার্য্যের প্রচারের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা সার সত্য তাহা অদ্যাবধি পূর্ণ ও প্রবলভাবে হিন্দু সমাজে রূঢ়গ্রন্থি হইয়া বিরাজ করিতেছে। তবে শঙ্করাচার্য্যের হাতে পড়িয়া আপন নাম ও রূপ এমন আশ্চর্য্যভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, এখন আর উহাকে সহজে চিনিবার উপায় নাই। এই জন্যই শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। হিন্দুধর্ম্মের এমন একটা অনন্যসাধারণ সার্ব্বভৌমিকতা আছে, যাহার সর্ব্বগ্রাসী উদরকুহরে যে কোন সত্য অতি সহজে আপন নামরূপ হারাইয়া উহারই অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই অদ্ভুত শক্তির আবর্ত্তনে অনার্য্য আর্য্য হইয়া গিয়াছে, বৌদ্ধ হিন্দু হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ইত্যাদিও হিন্দু হইতে চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের লিখিত গ্রন্থে তাঁহার বৌদ্ধবিরোধ খুব সামান্যই লক্ষিত হয়, বরং কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ ও সংগ্রাম সর্ব্বতোমুখী ও প্রবলতর।

সাধারণ সূচী

প্রথম অধ্যায় = সমন্বয়

প্রথম পাদ

স্পষ্ট ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সমূহের বিচার

দ্বিতীয় পাদ

অস্পষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সমূহের বিচার

তৃতীয় পাদ

অস্পষ্ট জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক শ্রুতির বিচার

চতুর্থ পাদ

সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের বিচার

দ্বিতীয় অধ্যায়—অবিরোধ

প্রথম পাদ

ব্রহ্ম কারণতার প্রতিকূল যুক্তি খণ্ডন

দ্বিতীয় পাদ

সাংখ্যাদি মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন

চতুর্থ পাদ

সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের আপাতঃবিরোধ পরিহার

তৃতীয় অধ্যায়—সাধন

প্রথম পাদ

দ্বিতীয় পাদ

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়

চতুর্থ অধ্যায়—ফল

প্রথম পাদ

নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও সগুণব্রহ্মোপাসনার প্রকার ও ফল

দ্বিতীয় পাদ

তৃতীয় পাদ

চতুর্থ পাদ

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বেদান্ত-দর্শন

উপক্রম

শিষ্য। গুরুদেব! এ সংসারে যে যেকার্য্যই করুক না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই 'সুখ' লাভ করা। কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, সে সুখলাভ বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহার কারণ কি?

গুরু। বৎস! একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, যে সুখ সুখ করিয়া সংসারের জীব ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে, সে সুখ কোথায়। দেখ, সাধারণতঃ বাহিরের কোন বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, সেই বস্তু সম্বন্ধে আমার একটা অনুভব হয়। সেই অনুভূতি বা জ্ঞানটী আমার অনুকূল বলিয়া বোধ হইলে, 'আমি সুখ পাইলাম' এইরূপ ধারণা হয়। সাধারণতঃ বাহিরের কোন 'ইষ্ট' বস্তু লাভ করিলেই সুখলাভ হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আবার দেখ, শত শত ভোগ্য যদি আমার আশে পাশে রাশীকৃত হইয়াও থাকে, তথাপি আমার মনটী যদি সেদিকে

না যায়, তবে সেই সব ভোগ্য সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই হয় না, আর আমি সুখও পাই না। আমার অতি সন্নিকটে উৎকৃষ্ট স্বর-লয়-সংযোগে গান হইতেছে; কিন্তু আমি অপর কোন বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন থাকিলে সে গানে আমার কোনই সুখ হয় না। তবেই দেখ, সুখ আমারই অনুভূতিসাপেক্ষ। বস্তুতঃ সুখ দুঃখ বাহিরের কোন জিনিষের গুণ নয়, মনেই সুখ বা দুঃখ। অথচ আমরা মনে করি, এই জিনিষটা লাভ হইলে আমার খুব সুখ হইবে, ওই জিনিষটা না হইলে আমি দুঃখে অভিভূত হইব।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, সুখ দুঃখ মনেরই ধর্ম্ম। তাহা হইলে বাহিরের কোন জিনিষ না হইলেও ত আমি সুখ লাভ করিতে পারি?

গুরু। হাঁ বৎস! সুখ দুঃখ যখন মনেই আছে, তখন এই মনকে আয়ত্ত করিতে পারিলে সুখের জন্য আর বাহিরের দিকে ছুটিতে হয় না। নিজের অন্তরেই পূর্ণ সুখের আস্বাদন পাওয়া যায়। এ বিষয় ক্রমে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! মনই হইল সুখ-দুঃখের আধার। তাহা হইলে সুখ দুঃখ সকলই মনের। তবে 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী'—এইরূপ জ্ঞান হয় কেন? মনই কি 'আমি'?

গুরু। বৎস! অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। মনই যদি 'আমি' বা 'আত্মা' হয়, তবে 'আমার' বা 'আত্মার'ও সুখ দুঃখ অবশ্যই থাকিবে। আর 'আমি' বা 'আত্মা' যদি মন ছাড়া আর কিছু হয়, তবে আমার সুখ দুঃখও কিছুই থাকিতে পারে না। অথচ আমরা সকলেই আপনাদিগকে সময়ে সুখী, সময়ে দুঃখী বলিয়া মনে করি। অতএব দেখ, 'আমি' বা 'আত্মা' যে কি পদার্থ, তাহা সম্যক্ জানা না থাকাতেই সুখ দুঃখ আহার, সুখে উৎফুল্ল

হওয়া, কিংবা দুঃখে অভিভূত হওয়া আমার উচিত কি-না ইত্যাদি বিষয় একেবারেই অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যে বলিলেন, 'আমি' বা 'আত্মা' সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাই যত অনর্থের মূল—এ' কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেন, সকলেই ত 'আমি আমি' করে। আত্মজ্ঞান ত সকলেরই আছে। আমি আছি, কি নাই, এরূপ সন্দেহ ত কাহারও হয় না। আত্মাসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ত স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ। তবে আমাদের আত্মজ্ঞান নাই, একথা বলেন কিরূপে?

গুরু। বৎস! সকলেই আমি আমি বলে সত্য, কিন্তু স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখ দেখিবে, এই 'আমি' বা 'আত্মা' সম্বন্ধে তোমার কি ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইবে। যখন বল, 'আমি অন্ধ,' 'আমি খোঁড়া,' 'আমি যাইতেছি,' তখন দেহকেই আত্মা বলিয়া মানিয়া লও। আবার যখন বল, '**আমার** হাতে বড় আঘাত লাগিয়াছে,' '**আমার** মনটা আজ ভাল নাই,' তখন দেহ ছাড়া অন্য কিছুকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর। তবেই দেখ, যদিও সকলেই আমি আমি বলে, তথাপি কোন্‌টা যে সত্যিকারের 'আমি' তাহা কিন্তু কেহই ধরিতে বা বুঝিতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকাই কি ইহার কারণ নয়?

শিষ্য। কিন্তু আমি যদি বলি যে, যখন দেহকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, তখন দেহই 'আমি,' আবার যখন দেহ ছাড়া অন্য কিছুকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, তখন সেই অন্য কিছুই 'আমি'—অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় 'আমি' বা 'আত্মাও' বিভিন্ন, তাহা হইলে দোষ কি?

গুরু। বৎস! দেখ, তুমি যত প্রকার অবস্থায়ই পতিত হও না কেন, একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি

যাহাকে 'আমি' বা 'আত্মা' বল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। শুধু আমি এরূপ ছিলাম, এরূপ আছি, এরূপ হইব—এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তোমার 'আমি'টিকে জড়িত করিয়াই আত্মাকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মনে কর। নতুবা যেরূপ অবস্থাতেই থাকনা কেন, সমস্ত অবস্থার অন্তরালে আত্মা অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডরূপে আছেন, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন সত্য। আমরা সেই চিরস্থির অখণ্ড বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে একেবারে বিজড়িত করিয়া ফেলি বলিয়াই, সেই সেই অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন মনে করি বলিয়াই, আত্মা পরিবর্ত্তনশীল, সুখী, দুঃখী ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হয়। এক বস্তুকে অন্যবস্তুরূপে মনে করাই ইহার কারণ, এইরূপ মনে করাকেই বেদান্তশাস্ত্রে অধ্যাস বলে। এই যে চৈতন্যরূপী আত্মাকে দেহাদি জড়রূপে মনে করা, ইহাই অধ্যাস।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলিলেন আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, আর আত্মা ব্যতীত অন্য সকলই জড়। তাহা হইলে আত্মা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে একেবারে বিরুদ্ধ স্বভাবের কিছু। কিন্তু দুইটী পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ বস্তুর একটী কি অন্যটী বলিয়া মনে হওয়া সম্ভব? অন্ধকারকে আলোক, কিম্বা আলোককে অন্ধকার বলিয়া কি কেহ মনে করিতে পারে? একান্ত বিরুদ্ধ স্বভাবের দুইটী বস্তুর একটীকে যখন অপরটী বলিয়া মনে করার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আপনার কথিত 'অধ্যাস' বলিয়া যে কিছু আছে, একথা স্বীকার করি কিরূপে?

গুরু। বৎস! তুমি ঠিকই বলিয়াছ, দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবের বস্তুর একটী অপরটী বলিয়া মনে করা সম্ভব বা সঙ্গতই নয়। তুমি যদি যুক্তি কিংবা বিচার প্রয়োগ কর তবে দেখিবে, 'অধ্যাস' বলিয়া কিছুই

নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যুক্তি বলে 'অধ্যাস' প্রতিপন্ন না হইলেও অধ্যাস যে একেবারেই নাই, একথাও বলিতে পার না। ব্যবহারক্ষেত্রে এই অধ্যাস অহরহই কার্য্য করিতেছে। এ যেন জীবের একান্ত স্বাভাবিক। ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেখ, আত্মা অবিকৃত চৈতন্যস্বরূপ, আর দেহ প্রভৃতির ধর্ম্ম জরা, মরণ, রোগ, শোক ইত্যাদি। এই দুইটী বিরুদ্ধ-স্বভাব বস্তুর পরস্পরে অধ্যাস হওয়া উচিত নয়; কিন্তু 'আমি জন্মিলাম' 'আমি রুগ্ন হইলাম,' 'আমি মরিলাম'—ইত্যাদি সংসারে যত কিছু ব্যবহার আমরা করি, সকলই ঐ অধ্যাস-মূলক। ঐ 'অধ্যাস' না হইলে কোন ব্যবহারই হইতে পারে না। অথচ বস্তুতঃ অধ্যাসের কিন্তু অস্তিত্বই হওয়া উচিত নয়।

শিষ্য। এ অধ্যাস কেন হয়?

গুরু। আত্মা দেহ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন—এই জ্ঞান না থাকাই ইহার কারণ। দেহাদিই আত্মা—এইরূপ একটা মিথ্যা জ্ঞানই এই অধ্যাসের কারণ।

শিষ্য। অধ্যাস কি, পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম না।

গুরু। বৎস! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মনে কর, তুমি আজ একখণ্ড রৌপ্য দেখিলে। এই রৌপ্য সম্বন্ধে একটা জ্ঞান তোমার স্মৃতিতে রহিয়া গেল। কিছুদিন পরে নদীর চড়ায় উত্তপ্ত বালুকার উপর তুমি যেন দেখিলে একখণ্ড রৌপ্য পড়িয়া আছে। বস্তুতঃ উহা কিন্তু একখানা ঝিনুক, সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে মাত্র। এই যে তুমি ঝিনুকখানাকে একখণ্ড রৌপ্য বলিয়া মনে করিলে, ইহাই হইল 'অধ্যাস' বা ভ্রম। এই যে ঝিনুকে রূপার জ্ঞান হইল, এটা কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান, কারণ, বস্তুতঃ রূপা ওখানে নাই। কাজেই একটী বস্তুকে

পূর্ব্বদৃষ্ট অপর কোন বস্তুরূপে মনে করাই 'অধ্যাস'; এবং এই অধ্যাস স্মৃতিজ্ঞানেরই মত।

এই অধ্যাস কি, কেনই বা হয়, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, একটী বস্তুতে অন্য একটী বস্তুর কোন গুণ বা ধর্ম্মের যে প্রতীতি তাহাই অধ্যাস; যেমন আকাশকে নীল মনে করা। কেহ বলেন, যে দুইটী পদার্থের পরস্পর অধ্যাস হয়, তাহাদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, তাহা যদি না জানা থাকে, তবেই ঐরূপ অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান হয়। আবার কেহ বলেন, যাহাতে অধ্যাস হয় তাহাতে তাহার বিপরীত কোন ধর্ম্ম বা গুণের বোধ হওয়াই অধ্যাস। কিন্তু যিনি যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, **"এক পদার্থে অন্য পদার্থের কিম্বা তাহাতে যে গুণ বা ধর্ম্ম নাই, সেই গুণ বা ধর্ম্মের কল্পনা"**-ই যে অধ্যাস এ বিষয়ে সকলেই একমত। এবং এইরূপ ভ্রম আমাদের অহরহই হইতেছে। *

---

* এই স্থলে অধ্যাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী অনুধাবনযোগ্য :—

(১) একগাছি দড়িকে যখন সাপ বলিয়া ভ্রম হয়, তখন কিন্তু 'এই দড়িগাছটী সাপের মত', এরূপ জ্ঞান হয় না; 'এই একটা সাপ'—এইরূপ জ্ঞানই হয়। পরে যখন ভ্রম চলিয়া যায়, তখনই বলা যায়, 'এই দড়িটী সাপের মত দেখাইতেছিল'। মোট কথা যতক্ষণ ভ্রান্তি থাকে, ততক্ষণ 'ন্যায়', 'মত' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা চলে না। এ বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

(২) যাহাতে অধ্যাস হয় অর্থাৎ অধ্যাসের আধারটীই (যেমন দড়ি) সত্য, আর যাহা অধ্যস্ত হয় (যেমন সর্প) তাহা মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া একেবারে আকাশ-কুসুমের মত অলীক নয়। তাহা হইলে তাহার কোন প্রতীতিই হইতে পারিত না। বাস্তবিক পক্ষে জিনিষটী নাই, অথচ যেন যথার্থই আছে—এরূপ বোধ হওয়া খুবই আশ্চর্য। কাজেই এই অধ্যাসের সঠিক রূপটী যে কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না, উহা 'অনির্ব্বচনীয়'। যাহা নাই তাহার অনুভূতি হওয়া

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি যেরূপ অধ্যাস বা ভ্রমের কথা বলিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। দেখুন, যাহা 'বিষয়' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, তাহাতেই অন্য একটী বিষয়ের অধ্যাস হইতে দেখা যায়। আমি আজ একটী বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম, কিছুদিন পরে আর একটী বিষয় দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়টী বলিয়া ভ্রম হইল। কিন্তু যে জিনিষটী কোন দিন দেখি নাই, কিম্বা যাহা প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায় নাই, সেরূপ কোন বিষয়ের ত ভ্রম হইতে পারে না। আর, আপনি বলেন, আত্মা কোন 'বিষয়' নয়, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অ-বিষয় আত্মাতে বিষয়ের (দেহ প্রভৃতির) এবং বিষয়-ধর্ম্মের (জরা, মরণ প্রভৃতির) অধ্যাস কিরূপে হইতে পারে ?

গুরু। শুন, আত্মা যে একেবারেই 'বিষয়' নয়, অর্থাৎ আত্মা-সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকারের সামান্য একটু উপলব্ধিও নাই—একথা ত বলা হইতেছে না। দেখ, সকলেই 'আমি' 'আমি' এরূপ বোধ করে ত ? তবেই আত্মা 'আমি আমি'—এই যে একটী সাধারণ বোধ, তাহার 'বিষয়'। 'আত্মা আছে, অর্থাৎ 'আমি আছি'—এরূপ জ্ঞান ত সকলেরই আছে। সুতরাং আত্মা যে একেবারেই অজ্ঞাত বস্তু, তাহা ত বলা যায় না। আর এমন ত কোন নিয়ম নাই যে, চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান একটী বিষয়েতেই অপর একটী প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের

উচিত নয়, অথচ হয়। কেন যে অনুভূতি হয়, তাহা যদি কেহ নির্ব্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসা করে, তবে সরলভাবে তাহাকে বলিতে হয়, "কেন হয় ঠিক বলিতে পারি না, হওয়া যে উচিত নয় তাহাও বুঝি, কিন্তু অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।" তবে এই মাত্র বলা যায় যে, অজ্ঞান প্রভাবেই অধ্যাস হয়। বস্তুটীর যথার্থ স্বরূপ জানা না থাকিলেই তাহাকে অন্যবস্তুরূপে মনে করা সম্ভব, অন্যথা নহে। যাহা হউক, এই বিষয়টী ক্রমে আরও পরিস্ফুট হইবে।

অধ্যাস হইবে, অন্য কোথাও হইতে পারিবে না। দেখ, আকাশ, কি না শূন্য। তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি 'আকাশ নীল, 'আকাশটা নামিয়া আসিয়াছে'—ইত্যাকার ভ্রম ত প্রায় সকলেরই হয়। সুতরাং আত্মাকে যদি একেবারে অবিষয় বলিয়াও মনে কর, তথাপি তৎসম্বন্ধে ভ্রম হইবার কোন বাধা নাই।

এই যে অধ্যাস ইহাকেই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা 'অবিদ্যা' নামে অভিহিত করেন। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে মনে করাই তাহা হইলে 'অবিদ্যা'; আর যথাযথ বিচার করিয়া ঐ বস্তুটী যথার্থ কি, উহার প্রকৃত স্ব-রূপ কি, তাহা জানাই বিদ্যা। এস্থলে আর একটী বিষয় জানিয়া রাখ :—দেখ, চাঁদকে দুই বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ চাঁদ আর কিন্তু দুই হইয়া যায় না; একগাছি দড়িকে সাপ বলিয়া মনে করিলেই কিন্তু দড়িগাছটি সাপ হইয়া যায় না—দড়ি সব সময়ে দড়িই থাকে, যখন তাহাকে সাপ বলিয়া মনে হয়, তখনও তাহা বস্তুতঃ দড়িই, তাহার পূর্ব্বেও দড়ি, পরেও দড়ি। কাজেই যে পদার্থটীর অধ্যাস হয়, তাহার দোষ বা গুণ বিন্দুমাত্রও যাহাতে অধ্যাস হয়, তাহাতে স্পর্শে না।

আরও দেখ, আমরা সংসারে যত কিছু কাজ করি, কি সাংসারিক ধনোপার্জ্জনাদি, কি পারলৌকিক ব্রতাদি সমস্তের মূলেই কিন্তু এই অধ্যাস বা অবিদ্যা। এমন কি প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ, বিবিধ শাস্ত্র—সমস্তই এই অধ্যাস-মূলক।

শিষ্য। গুরুদেব! অত্যন্ত বিস্ময়কর কথা বলিলেন। আমি একটী যথার্থ সর্পকে সর্প বলিয়া মনে করিলাম, ইহাও অবিদ্যার প্রভাব? ধ্যান, ধারণা, পূজা, অর্চ্চনা এই সমস্ত করিতে যেসব শাস্ত্রের উপদেশ তাহাও অবিদ্যার ফল? এ যে বড় সন্দেহজনক কথা।

গুরু। বৎস। অস্থির হইও না। ধীরভাবে শ্রবণ কর, সব বুঝিতে

পারিবে। দেখ, যখন আমরা কোন কাজ করি, তখন শরীরটাকেই কি 'আমি' বলিয়া মনে করি না? মনে কর, 'আমি লিখিতেছি—' এই কথা যখন বলি, তখন শরীরটাই কিন্তু কাজ করিতেছে, অথচ বলি 'আমি করিতেছি'। আবার শরীরকে যদি আমি বা আমার বলিয়া মনে না হয়, তবে কোন কাজ করাই সম্ভব হয় না। যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাক, তখন শরীরাদিতে আমি বা আমার বলিয়া কোন জ্ঞান থাকে না, ফলে তখন কোন কাজও হয় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে যদি আমি বা আমার বোধ না থাকে, তবে সেই সব ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন জ্ঞানলাভও করা যায় না। একটী সুন্দর ছবি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে; যতক্ষণ না তোমার চক্ষুতে আমি বা আমার জ্ঞান হইবে, ততক্ষণ ছবিখানি চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলেও তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। দেখ, এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমার কথা শুনিতেছ, তোমার চক্ষুও আমার প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমার রূপ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান এতক্ষণ হইয়াছে কি? তুমি তোমার কর্ণেন্দ্রিয়েই আত্মাভিনিবেশ করিয়াছিলে, তাই শুধু আমার কথাই শুনিয়াছ, চক্ষু প্রসারিত থাকা সত্ত্বেও আমার রূপের কোন জ্ঞান তোমার হয় নাই; কাজেই দেখ, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আমি বা আমার জ্ঞান না হইলে কোন কাজ হয় না; এবং চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আমি বা আমার জ্ঞান না হইলে কোন বস্তুর জ্ঞানও হয় না। ইন্দ্রিয়গণ আপনারা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না, উহাদের একটা আশ্রয় চাই। ঐ আশ্রয়টীই আমি; সেই আমিকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয় না হইলে আবার কোন বিষয়ের জ্ঞানও হয় না। সুতরাং দেখিতেছ, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপর আমি বা আমার বলিয়া একটা বোধ বা

অভিমান না থাকিলে কোন বিষয় জানাও যায় না, কিম্বা কোন কার্য্য করাও যায় না। অতএব শাস্ত্রের কোন আদেশ পালন করা, কিম্বা সাংসারিক কোন কার্য্য করা, সকলের মূলেই ঐ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আমি বা আমার বলিয়া মনে করা সাপেক্ষ। তাহা হইলে, শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় সকল কার্য্যই কি অধ্যাস-মূলক নয়?

আরও দেখ, ব্যবহারক্ষেত্রে সামান্য পশুতেও যেমন আচরণ করে বিবেকশালী মানুষেও সেইরকমই আচরণ করে। মনে কর, একটী শব্দ হইল। এখন একটী গরু দাঁড়াইয়া ঘাস খাইতেছিল। ঐ শব্দটী যেই তাহার কাণে গেল, অমনি সে কাণ উচু করিল। তারপর যদি বুঝিতে পারে যে, কেহ আদর করিয়া ডাকিতেছে, তবে আনন্দে তাহার নিকট ছুটিয়া যায়, আর যদি বুঝিতে পারে যে, ভীতিসূচক শব্দ হইতেছে, তবে দৌড়াইয়া পলায়ন করে। কেহ লাঠি দেখাইলে দৌড়াইয়া পলায়ন করে, আবার কেহ এক মুষ্টি ঘাস লইয়া অগ্রসর হইলে তাহার দিকেই ধাবিত হয়। বিবেকবান মনুষ্যও ঠিক এই ভাবেই আচরণ করে। পশুদের যে বিবেক নাই, ইহা ত সকলেই বলে। মনুষ্যও যখন তাহাদেরই মত আচরণ করে, তখন সেই সেই আচরণকালে মনুষ্যও অবিদ্যা বা অজ্ঞান দ্বারাই চালিত হয়। 'সেই সেই আচরণকালে'—এই কথা এই জন্য বলিলাম যে, পর মূহূর্ত্তে মানুষের বিচার আসিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ সে কার্য্য করিতে থাকে, ততক্ষণ সেই কার্য্যের পদ্ধতিতে, আর পশুর কার্য্যের পদ্ধতিতে কোন প্রভেদ থাকে না।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রত্যক্ষাদি সাংসারিক কার্য্যে মানুষে ও পশুতে একই ভাবে কার্য্য করে, এ কথা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু শাস্ত্রীয় কার্য্যে ত এরূপ হয় না। কেন না, শাস্ত্রের বাক্য যে বুঝিতে

পারে, এমন লোকই শাস্ত্রীয় কোন আদেশ মত কার্য্য করিতে পারে। আর শাস্ত্রোক্ত কার্য্য করিলে তাহার ফল প্রায় পরলোকেই হয়। সুতরাং আত্মা পরলোকেও থাকিবে—এরূপ জ্ঞান যাহার আছে, সে-ই শাস্ত্রের আদেশ মত কার্য্য করিবে। এই যে শাস্ত্র বুঝিবার ক্ষমতা ও পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান, এ দুইটী ত পশুদিগের নাই। সুতরাং শাস্ত্রীয় ব্যবহারেও মানুষ পশুর সমান, একথা ত বলা যায় না।

গুরু। না, তাহা বলা যায় না বটে। কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কোন যজ্ঞাদি করিতে চায়, সে যদি সাধারণ মানুষের মত জ্ঞানী হয়, এবং 'পরলোকে সে থাকিবে' শুধু এইটুকু জানে, তবেই সে সেই যজ্ঞাদি করিতে পারে। সে থাকিবে, কিন্তু কিরূপে থাকিবে, তাহার আত্মার যথার্থ স্বরূপ কি—এই সব তত্ত্ব জানিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই।

আরও দেখ, পাপক্ষয় কিম্বা পুণ্য উপার্জ্জনের জন্যই লোকে প্রায়শ্চিত্ত, যাগ যজ্ঞ, ব্রত পূজা ইত্যাদি করিয়া থাকে, অর্থাৎ সুখলাভ বা দুঃখ পরিহারই শাস্ত্রীয় কার্য্যেরও উদ্দেশ্য। যাগ যজ্ঞাদি আবার এক এক বর্ণের এক এক রকম। যে ব্যক্তি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কিম্বা এরূপ কোন বর্ণ-বিশেষের লোক বলিয়া মনে না করিবে, সে কিন্তু কোনরূপ যাগ যজ্ঞাদি করিবার অধিকারীই হয় না। কাজেই দেখিতেছ, যে যজ্ঞাদি করে, সে আপনাকে সুখী, দুঃখী, ব্রাহ্মণাদি জাতীয়, সংসারী মানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই মনে করে। কিন্তু যথার্থতঃ আত্মা ত এ সকল কিছুই নয়। বেদান্ত-শাস্ত্র আত্মাকে ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিভেদশূন্য, এক কথায় সংসারের যাবতীয় বিষয় হইতেই পৃথক্ বস্তু বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অতএব যত দিন আত্মাকে ঐ ভাবে জানা না যায়, ততদিন কি সাংসারিক, কি শাস্ত্রীয়,

যে কোন কার্য্যই বল না কেন, সবই অধ্যাস-মূলক। সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যাস বা অবিদ্যাকে মানিয়া লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখ, ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে—এ একটী শাস্ত্রবাক্য। এখন যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ, যজ্ঞ করিবার যোগ্য বয়স ও শক্তিসামর্থ্যবান বলিয়া মনে করিবে, সে-ই কেবল ঐ শাস্ত্রবাক্যটী পালন করিতে পারিবে। সুতরাং শাস্ত্রও অধ্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

যে বস্তু বাস্তবিক যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া মনে করাই 'অধ্যাস'—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যেমন আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক জনের একটী ছেলে বেশ খেলা করিতেছে, দেখিয়া তাহার খুব আনন্দ হইল। এস্থানে পুত্রের যে আনন্দ, সেই আনন্দ পিতা আপনাতে অধ্যাস করিয়া নিজেকে আনন্দিত বলিয়া মনে করিলেন। আবার ছেলেটা জ্বরে ছট ফট করিতেছে দেখিয়া পিতার একটা দারুণ অস্বস্তিবোধ হইল, যেন সে নিজেও ছট ফট করিতেছে। এস্থলেও পুত্রের কষ্ট আপনাতে আরোপ করিয়া পিতা আপনাকে দুঃখিত বলিয়া মনে করিলেন। এই দুই স্থলেই বাহিরের ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাস করা হইয়াছে। এইরূপ যখন বলি, 'আমি কৃশ, আমি কাল, আমি দাঁড়াইয়া আছি, কিংবা চলিতেছি,' তখন বাস্তবিক দেহের ধর্ম্ম বা ক্রিয়াগুলিই আত্মাতে অধ্যাস করিয়া ওরূপ বলি। যখন বলি, 'আমি অন্ধ বা বধির,' তখন ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাস করি। যখন বলি, 'আমার এরূপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমি এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি,' তখন অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করি। এইরূপ কখনও দেহ প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া মনে করি, কখনও বা আত্মা দেহাদি ব্যতীত অন্য কিছু—এরূপও একটা সামান্য বোধ হয়।

সুতরাং দেখা গেল, যত কিছু কার্য্য করি, যাহা কিছু চিন্তা করি,

সবই এইরূপ একটা কিছু অধ্যাস করিয়াই করি। আমি কিছু করি, বা কিছু ভোগ করি—এইরূপ মনে করার মূলে ঐ অধ্যাস, ঐ মিথ্যা জ্ঞান, ঐ ভ্রম। এ যেন জীবের একান্ত স্বাভাবিক। জন্মাবধি ঐরূপ অধ্যাসের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া চলা যেন জীবের স্বভাব। এই অধ্যাস যে কতদিন আরম্ভ হইয়াছে, আর কতদিনেই বা ইহার শেষ হইবে, তাহা বলা অসম্ভব। তবে আমাদের প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক চিন্তাই যে এই অধ্যাসদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা প্রত্যেকেরই অনুভবগম্য। এই অধ্যাসের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ অনাবশ্যক।

আর, এই অধ্যাস আছে বলিয়াই, প্রতিনিয়ত একটা প্রকাণ্ড ভ্রমের দাস হইয়া চলি বলিয়াই, যত দুঃখ, যত অনর্থ। দেহাদিতে যদি আত্মবুদ্ধি না থাকে, তবে ত দুঃখ পাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তবেই দেখ, যথার্থ আত্মা যে কি, তাহা না জানাই যত দুঃখের মূল। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং কিরূপেই বা তাহাকে জানা যায়, ইহা প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

বৎস। এস এক্ষণে মহর্ষি বাদরায়ণ ব্যাস প্রণীত "ব্রহ্মসূত্রের" ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে একে একে তোমার সকল সন্দেহের নিরাস হইবে।

বেদান্ত-দর্শন

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদ

গুরু। অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

অনন্তর [অথ], এই কারণে [অতঃ] 'ব্রহ্ম কি' তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেকেরই ইচ্ছা [ব্রহ্মজিজ্ঞাসা] হওয়া উচিত।

শিষ্য। 'অথ' শব্দের অর্থ বলিলেন 'অনন্তর', কিন্তু কিসের অনন্তর বুঝিলাম না। এমন কি আছে, যাহা না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতেই পারিবে না? এমন কোন্ সাধনের বিষয় আপনি বলিতেছেন যে, যাহা পূর্ব্বে অবশ্য লাভ করিতে হইবে, এবং তাহার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব হইবে? তবে আমার মনে হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির প্রত্যেকেরই উপনয়ন হইলে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বেদ অধ্যয়ন করা। তারপর গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী যাগযজ্ঞাদি কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে 'পূর্ব্বমীমাংসা' শাস্ত্রও আলোচনা করিতে হইবে। এবং সেই সমস্ত বিশেষরূপে জানিয়া পরে ব্রহ্ম কি, তাহা জানিবার জন্য বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে পূর্ব্বমীমাংসা ভালরূপে জানিয়া পরে ব্রহ্ম-শাস্ত্র বেদান্তের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সূত্রের 'অথ' শব্দ কি এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে?

গুরু। না, বৎস, তাহা নয়। কেন না, যিনি যাগযজ্ঞাদির বিচার না করিয়াছেন, তিনি যদি শুধু বেদান্ত (উপনিষৎশাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন,

তবেই তাঁহার ব্রহ্ম কি, তাহা জানিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। দেখ, যাগযজ্ঞাদির বিচারকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রম আছে, অর্থাৎ এই কাজটির পর এই কাজটি করিতে হইবে (যেমন, প্রথমে পশুর হৃদ্‌পিণ্ড লইয়া হোম করিতে হইবে, তারপর জিহ্বা লইয়া, ইত্যাদি)—এইরূপ একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। ঐ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হইলে সে যজ্ঞের আর কোনই ফল হইবে না। কিন্তু ব্রহ্ম-বিচারে সেরূপ কোন নিয়মের প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না। যেমন নারায়ণ পূজা করিতে হইলে প্রথমে গণেশ পূজা করিয়া লইতেই হয়, ব্রহ্ম জানিতে হইলেও সেইরূপ প্রথমে যজ্ঞাদি জানিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

তারপর, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও যজ্ঞাদি-জিজ্ঞাসা—এই দুই বিচারের বিষয়ও পৃথক্, ফলও পৃথক্। যজ্ঞাদির ফল ঐশ্বর্য্যলাভ, অর্থাৎ স্বর্গাদি-সুখ প্রাপ্তি। বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিলেই তাহার ফল পাওয়া যায় না, ঐ যজ্ঞ যথানিয়মে অনুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল পাওয়া যায়, নতুবা নয়। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলে তাহার ফল পরম শান্তি, যথার্থ কল্যাণ। আর, ব্রহ্মকে কেবল জানিলেই ফল পাওয়া যায়, তাহার জন্য আর কোনরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। একটী যজ্ঞ কিরূপ ভাবে করিতে হইবে, তাহা জানিয়া লইলাম ; তখনও কিন্তু আমার কোন ফল লাভ হইল না, কেবল অনুষ্ঠান করিলেই ফল পাইব। ঐ যজ্ঞের ফল তাহা হইলে আমার অনুষ্ঠানের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে। ফল এখন নাই, আমি অনুষ্ঠান করিলে পরে উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম চিরকালই বর্ত্তমান, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে না, কেবল তাঁহাকে জানিলেই ফললাভ হইবে। আমার কোনরূপ অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ ব্রহ্ম উৎপন্ন হইবে না।

আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত একটী বিষয়ের সংযোগ হইলে সেই বিষয়টী সম্বন্ধে যেমন আমার জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আমার যে সকল সংশয় আছে, তাহা দূর হইলে আপনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূরিত হইবে, তাহার জন্য আর কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে যে যাগযজ্ঞাদি (অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা) জানিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

শিষ্য। তাহা হইলে কিসের অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পারে?

গুরু। বৎস, শোন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, সংসারে যত কিছু পদার্থ লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করি, তাহা সবই অনিত্য, কিছুই চিরকাল, এমন কি অনেক দিনও, স্থায়ী হয় না, আজ আছে ত কাল নাই। কতকগুলি পদার্থ দেখা যায় একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যেমন ৫০ কি ৫০০ বৎসর। কিন্তু, অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচশত বৎসর কত ক্ষুদ্র। আর একটু প্রণিধান কর, দেখিবে এই যে বাহ্য পদার্থের স্থায়িত্ব, ইহাও ভ্রম। প্রত্যেক পদার্থই প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তোমার শরীর, তোমার মন, বৃক্ষ, লতা, যাহা কিছু ব্যবহারযোগ্য পদার্থ সমস্তই এই মুহূর্ত্তে যাহা আছে, পরমুহূর্ত্তে আর তাহা থাকে না, একটু-না-একটু পরিবর্ত্তন তাহার হয়ই। এই যে অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন, ইহাই সংসার। এই পরিবর্ত্তনের অন্তরালে এমন কি কোন স্থির নিত্য পদার্থ নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ চলিতেছে? একটু ধ্যানাবিষ্ট হও, অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও তোমার অন্তরে একটি চিরস্থায়ী বস্তুর আভাস পাইবে। সহসা সেই বস্তুটিকে ধরিতে পারিবে না, কিন্তু কি যেন কিছু চিরস্থির পদার্থ আছে, এরূপ একটা অনুভূতি তোমার হইবে। বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তাহা হইতে জানিতে পারিবে, এমন একটি নিত্য

বস্তু আছে, আছে, আছে। কিন্তু চঞ্চল মন তোমার, কলুষিত মন তোমার, ধরি ধরি করিয়াও সেই নিত্য বস্তুটিকে ধরিতে পারিতেছে না। বৎস! যখন বুঝিতে পারিবে যে, সংসারের যাবতীয় পদার্থই অনিত্য, আর ইহার অন্তরালে একটি নিত্য বস্তু আছে, তখন কি আর তোমার এই অনিত্য বস্তুর জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিবে? বিষয়ের অনিত্যতা ধ্যান করিতে করিতে স্বতঃই তোমার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। ইহলোকের ভোগ্য বস্তু ত উপেক্ষা করিবেই, পরলোকের স্বর্গাদি সুখ ভোগও যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন তাহার জন্যও তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। তখন আর তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়ের রস আস্বাদনের জন্য ছুটাছুটি করিবে না। তখন আর তাহারা বাহিরের দিকে ছুটিবে না—বাহিরে যে নিত্য সুখের চিহ্ন-মাত্র নাই। তাই তাহারা ছুটিয়া যাইবে তোমার অন্তরের দিকে—সেখানে যদি নিত্য সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। মনের আর তখন চাঞ্চল্য থাকিবে না, ইন্দ্রিয়গণ আর তখন মনের সম্মুখে সহস্র ভোগ্য জিনিষের ছবি প্রসারিত করিয়া ধরিবে না। তখন তোমার মনও দমিয়া যাইবে, বিষয়ভোগের বাসনা আর তোমার মনে জাগিবে না। শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ যাহাই কেন আসুক না, কিছুতেই তুমি তখন আর ভ্রূক্ষেপ করিবে না। সব যে অনিত্য। তোমার মন তখন সমস্ত বাহ্য বিষয় অবহেলা করিয়া কেবল মাত্র সেই নিত্য, চিরস্থির বস্তু লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে, সদাই তাহারই চিন্তায়, তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইবে। তখন দেখিবে, তখন বুঝিবে, গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্য কত সত্য; ঐ দুই বাক্যই ত তোমাকে চিরসুখের অধিকারী হইবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। কি অসীম শ্রদ্ধা হইবে তখন তোমার সেই গুরু ও বেদান্তবাক্যে। আর, তুমি তখন বুঝিতে

পারিবে, হায়! এই অনিত্য বিষয়ের লালসায় কতই যাতনা পাইতেছি। এই যে ভোগাকাঙ্ক্ষা, এ'ত আমাকে চতুর্দিক হইতে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি যে এই অনিত্যের মাঝে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছি, ইহা হইতে কি আমার উদ্ধার হইবে না? এই শৃঙ্খল কি আমার খুলিয়া যাইবে না! আমি কি ইহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি মজিয়া থাকিতে পারিব না! বৎস! এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহাই তোমাকে নিত্যবস্তু লাভের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। যখন এই মুক্তির ইচ্ছা তোমার বলবতী হইবে, তখন স্বতঃই তোমার ব্রহ্ম পদার্থ জানিবার ইচ্ছা হইবে। তাহা না হইলে সহস্র যাগ যজ্ঞ কর, মুখে মুক্তি মুক্তি কর, কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সত্যিকারের ইচ্ছা তোমার হইবে না। আর সত্য সত্যই যদি ব্রহ্ম কি তাহা জানিবার তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠে, সংসার-বন্ধনের অসহনীয়তা যদি তুমি সত্যসত্যই সুতীব্রভাবে অনুভব না কর, তবে ব্রহ্মবিচার, বেদান্ত আলোচনা শুধুই বিড়ম্বনা। কেবল পাণ্ডিত্যই তাহাতে অর্জন করিতে পারিবে, সুখ বা শান্তি লাভ তোমার ভাগ্যে আদৌ হইবে না। তাদৃশ আলোচনা নিতান্তই নিষ্ফল। বৎস, বেদান্তের পণ্ডিত ত অনেক দেখিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও, কয়জন আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন? কেবল একটা মানসিক বৃত্তির কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি, কিঞ্চিৎ যশ, কিঞ্চিৎ মান —এই যদি বেদান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে আলোচনায় কি ফল? যে বিচারে পরম সুখের অধিকারী হইতে না পারিলে, তাহার আলোচনা কি ব্যর্থ নয়? ফলের নিত্যতার দিক হইতে দেখিলে তাদৃশ শুষ্ক বিচার এবং নিতান্ত ঘৃণ্য বৃত্তিও একই শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য এইরূপ আলোচনার একটা ফল

এই হয় যে, ঐরূপ আলোচনা করিতে করিতে আত্মা সম্বন্ধে একটা পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং হয়ত সৌভাগ্যক্রমে কাহারও অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য শাস্ত্রালোচনাই নয়, তত্ত্ব উপলব্ধিই উহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সিদ্ধ হইবে, শাস্ত্রালোচনাও সেই পরিমাণেই সার্থক।

যাহা হউক, তবেই দেখ, **নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুত্ব।** (১) এই কয়টি সাধন যাহার আছে, সে-ই বস্তুতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী; যজ্ঞাদি জানুক বা না জানুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

বৎস! বর্ত্তমান যুগে এই অধিকারী নির্ণয় ব্যাপারটা একান্তই অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। ব্যবহারিক জগতে একটি সামান্য ভৃত্য নিয়োগ করিতে হইলেও লোকে তাহার শক্তি সামর্থ্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে যোগ্যাযোগ্য বিচারের কোন বালাই নাই!

---

(১) **শম**—লৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা না করা।

দম—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বাহিরের বিষয়ে ধাবিত হইতে না পারে, তাহা করা।

উপরতি—আত্মা কি তাহাই জানিতে হইবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম ত্যাগ করা।

তিতিক্ষা—শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করা।

শ্রদ্ধা—গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করা।

সমাধান—আলস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মসম্বন্ধেই ভাবনা করা।

মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের যথার্থ আগ্রহ।

এ ক্ষেত্রে নিরক্ষর কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই সমান অধিকারী! সকলেই গুরু। ঈদৃশ আত্মপ্রবঞ্চনার ফলও প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। কি সামান্য সর্দ্দি, কি রাজযক্ষ্মা, সর্ব্বরোগেই জায়ফল ব্যবস্থা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, কাহার কতটা অভাব, কে কতটুকু গ্রহণ করিবার যোগ্য ইত্যাদি নির্ণয় না করিয়া বেদান্তাদি আলোচনার ব্যবস্থাও সেইরূপই ফলপ্রদ। অন্যান্য সকল বিষয়েই অধিকারী নির্ণয়ের একান্ত কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হইলেও, একমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। যাহা হউক, ভারতীয় মনীষিগণ ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই আচার্য্যগণ অধিকারী নির্ণয় করিতে এতটা প্রযত্ন করিয়াছেন।

শিষ্য। 'অথ' শব্দের অর্থ বুঝিলাম। এক্ষণে 'অতঃ' শব্দের তাৎপর্য্য কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। 'অতঃ' শব্দের অর্থ 'এই-হেতু', 'এইজন্য'। অর্থাৎ এই কারণে ব্রহ্মকে জানিতে যত্নবান্ হইবে।

শিষ্য। কোন্ কারণে?

গুরু। পূর্ব্বেই দেখিয়াছ, ইহলোকে যত কিছু ভোগৈশ্বর্য্য, সমস্তই অনিত্য। আর শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, স্বর্গাদি লোকও চিরস্থায়ী নয়, এবং কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই চিরশান্তি লাভ করা যায়। এই কারণেই পূর্ব্বোক্ত সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে যত্নবান্ হইবে—ইহাই হইল প্রথম সূত্রের অর্থ।

শিষ্য। গুরুদেব! 'ব্রহ্মকে জানিতে হইবে'—এ সম্বন্ধে আমার একটী প্রশ্ন আছে। দেখুন, যে বিষয় সম্বন্ধে কোন কালে আমাদের কোন জ্ঞান হয় নাই, সেই বিষয়টী কিরূপ, তাহা আছে, কি নাই,

ইত্যাদি প্রশ্ন ত কখনও আমাদের মনে উদয়ই হয় না। সুতরাং তাহা জানিবার ইচ্ছাও আমাদের হয় না। পক্ষান্তরে যদি বিষয়টী জানাই থাকে তবে আবার তাহাকে জানিবই বা কি? ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ত ঐ সমস্যা উপস্থিত হয়?

গুরু। দেখ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে আমাদের কোনরূপ ধারণাই নাই, তাহা ত নয়। তুমি বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তাহাতে দেখিবে ব্রহ্মকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তারপর, ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। বৃহ্ ধাতুর সহিত মন্ প্রত্যয় যোগ করিয়া ব্রহ্ম শব্দ হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি, আর মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হইল "যাহা হইতে বড় বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।" এইরূপ শাস্ত্র, শব্দের অর্থ ও লৌকিক উক্তি হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। আরও দেখ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে আমাদের কোনই ধারণা নাই, একথা বলা যায় না। **ব্রহ্ম ত "আত্মা" ছাড়া আর কিছুই নন।** সুতরাং আত্মা বা আমি সম্বন্ধে যখন সকলেরই একটা জ্ঞান আছে, "আমি নাই" এরূপ জ্ঞান যখন কাহারও হয় না, তখন আত্মা বা ব্রহ্ম যে আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত, তাহা বলি কি প্রকারে? তবে বলিতে পার, যদি ব্রহ্ম বা আত্মা আমাদের জ্ঞাতই থাকে, তবে আবার তাঁহাকে জানিব কি? হ্যাঁ, আত্মা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই আছে বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ত নাই। লোকে ব্রহ্ম আছে, আমি আছি—এই মাত্র জানে; উহার ঠিক ঠিক স্বরূপটী যে কি, তাহাত জানে না। আত্মা বা ব্রহ্ম যে কি, তাহা যদি সকলের জানা থাকিবে, তবে আর আত্মা সম্বন্ধে নানা

লোকের নানা মত হইবে কেন? দেখ, সাধারণ লোকে ও চার্ব্বাকগণ মনে করে যে, চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে এই দেহ উৎপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চারও হয়। আবার কেহ বলেন, ক্রিয়াশীল বা চেতন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা। কেহ বলেন, মনই আত্মা। কেহ বলেন, আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, শূন্যই আত্মা। কেহ বলেন, দেহ আত্মা নয়, কিন্তু দেহ অবলম্বন করিয়া যে কাজকর্ম্ম করে ও তাহার ফলভোগ করে সেই আত্মা। কেহ বলেন, আত্মা কোন কাজ করেন না, শুধু ভোগ করেন। কেহ বলেন, সংসারী আত্মা ছাড়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি আর এক আত্মা আছেন। কেহ বলেন, ভোক্তাও আত্মা নয়, আত্মা চৈতন্য মাত্র। এইরূপ আত্মা সম্বন্ধে বহু লোকের বহুমত দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের যে কোন একটী মত যদি নির্বিচারে স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ করা যায়, তবে ত পরম কল্যাণ লাভ হইতে পারে না।

শিষ্য। তাহা হইলে উপায়?

গুরু। বৎস! আত্মতত্ত্ব কেবল শুষ্ক তর্ক দ্বারা কখনও লাভ করা যায় না। আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত বস্তু, একথা ক্রমে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। সেই ইন্দ্রিয়াতীত ও মনের অতীত বস্তুকে ইন্দ্রিয় বা মন দ্বারা কিরূপে ধরিতে পারিবে? তর্ক একটা মানসিক বৃত্তি বই ত নয়। সুতরাং তর্কের দ্বারা আত্মা যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। আত্মা সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত উপনিষৎ বা বেদান্তে রহিয়াছে। তবে উপনিষৎ বহু। আপাততঃ মনে হয়, বিভিন্ন উপনিষদে, এমন কি একই উপনিষদেই, যেন আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের

উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন উপনিষৎ বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে কতকটা বিচারেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই বিচার বা তর্ক যদি আপনার খেয়ালমত হয়, তবে কিন্তু প্রকৃত তথ্য জানা যাইবে না ; কারণ, বিভিন্ন লোকের খেয়াল বিভিন্ন রকমের, এবং প্রকৃত তথ্য তর্কের অতীত। তবে উপনিষৎ বা শ্রুতি বাক্যের অনুকূল তর্ক বা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আপাত-বিরুদ্ধ বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। "ব্রহ্মসূত্রে" বা "বেদান্তদর্শনে" এইরূপ অনুকূল যুক্তির সাহায্যে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে।

শিষ্য। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে—একথা বলিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম কিরূপ, তাঁহার লক্ষণ কি, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। **জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥২॥**

যাহা হইতে, যে **কারণ** হইতে [যতঃ] ইহার অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতের [অস্য] জন্ম প্রভৃতি, অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও লয় [জন্মাদি] হয়, তাহাই ব্রহ্ম।

(অনন্ত রকমের, অনন্ত নামের অনন্ত পদার্থে পরিপূর্ণ এই জগৎ ; কত কর্ত্তা, কত ভোক্তা, এই জগতে বিরাজ করিতেছে ; এখানকার সমস্ত কার্য্যই কেমন একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মে পরিচালিত হইতেছে ; কেমন সুশৃঙ্খলে সাজান এই জগৎ—যাহা ভাবিতে গেলে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়—ঈদৃশ জগৎ যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান পরম **কারণ** হইতে উদ্ভূত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই জগতের অবস্থান, এবং কালে এই জগৎ যাহাতে বিলীন হইয়া যায়, সেই **পরমকারণই** ব্রহ্ম। এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম ব্যতীত, জড়

প্রকৃতি, পরমাণু, শূন্য অথবা সংসারী কোন জীব হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, তাহা পরে বিশদভাবে বুঝাইব।

শিষ্য। কিন্তু আমি যদি বলি যে, এই জগৎ আপনা হইতেই হয়, আবার আপনা আপনি লয় পায় ?

গুরু। না, তাহা হইতে পারে না। দেখ, এ জগতে যে কোন কার্য্যই সংঘটিত হউক না কেন, একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা নিয়মিত কারণ আছে। কোন কারণ নাই, অথচ একটা কিছু হইল, এমন দেখা যায় না। অবশ্য হইতে পারে, কারণটী আমরা ধরিতে পারি না; কিন্তু কারণ অবশ্যই আছে। যদি বিনা কারণেই সব হইত, তবে আমের আঁটি পুতিলে কাঁটাল গাছও হইতে পারিত; খাইলে এক সময় ক্ষুধা বন্ধও হইতে পারিত, এক সময় বাড়িয়াও যাইতে পারিত। এ বিষয়ে পরে আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। জগৎটা একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মে চলিতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া একজন জগৎ-কর্ত্তা আছেন। যেমন কুম্ভকার না হইলে ঘট হয় না, সেইরূপ একজন জগৎকর্ত্তা না হইলে জগৎ হইতে পারে না। এইরূপ একটা অনুমান-বলে তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

শিষ্য। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রেও সেই অনুমানেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এ কথা বলিলে দোষ কি ?

গুরু। দোষ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মসূত্রে কেবল যুক্তি বা অনুমানের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় নাই। এই সমস্ত সূত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে বেদান্ত বা উপনিষৎ বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা। মালাকর যেমন নানারকম ফুল দিয়া একটী মনোরম

মালা প্রস্তুত করে, ভগবান্ সূত্রকারও সেইরূপ বেদান্ত-বাক্য যথাযথ-ভাবে সজ্জিত করিয়া ব্রহ্মসূত্র-রূপ এই মালা গাঁথিয়াছেন। (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্রহ্ম হইতেই হয়—এ কথা শ্রুতিতে [বেদে] আছে (তৈঃ ৩.১)। আর ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই সিদ্ধান্তের একমাত্র প্রমাণ শ্রুতি। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই সূত্রে এই কথারই ইঙ্গিত আছে।) কোনরূপ অনুমান প্রদর্শন করা ঐ সূত্রের উদ্দেশ্য নয়। তবে শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ না হয়, এমন যুক্তি যদি প্রয়োগ করা যায়, তবে সে যুক্তিও গ্রহণযোগ্য, কেন-না, সেরূপ যুক্তির দ্বারা বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবার সহায়তা হয়। শ্রুতিতেও যুক্তিপ্রয়োগ একটী সহায়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও দেখ, যাগযজ্ঞ কিরূপে করিতে হয়, তাহার ফল কি, ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে, একমাত্র শ্রুতির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। অমুক যজ্ঞ করিলে অমুক ফল হয়—এ কথা শ্রুতিতে আছে ; কিন্তু সেরূপ ফল যে সত্যই হয়, তাহা একমাত্র বেদবাক্যে বিশ্বাস ছাড়া অন্য প্রমাণে জানা যায় না। আর, কোন একটা কাজ করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। আমি ইচ্ছা করিলে করিতেও পারি, না করিতেও পারি, কিম্বা যেভাবে করিবার বিধান আছে, তাহার বিপরীতভাবেও করিতে পারি। কোন একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ উহার কোন অস্তিত্বই হয় না। 'এরূপ করিলে এরূপ হয়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য শুধু ঐ বাক্য বিশ্বাস করা বা না করার-উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে বস্তু চিরদিনই আছে, তাহা কিন্তু মোটেই আমার ইচ্ছাধীন নয়। তাহা ত আছেই, তাহা আর উৎপন্ন করিতে হয় না। আমার সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হউক, বা না হউক, সেটী কিন্তু থাকিবেই। আবার, 'এই বস্তুটী ঠিক্

এইরূপই'—এই যে বস্তুটীর যথার্থ জ্ঞান তাহাও আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অগ্নি উষ্ণ, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা শীতল বোধ হইবে না। সুতরাং বস্তুর যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা সেই বস্তুটীর স্বভাবের উপরেই নির্ভর করে। একটা গাছকে গাছ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, উহাকে একটা মানুষ বা অন্য কিছু মনে করা ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই দেখ, যথার্থ জ্ঞান আমাদের অধীন নয়, উহা বস্তুরই অধীন। যথার্থ জ্ঞানের বিষয়টা যদি কোন স্থায়ী পদার্থ হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতে সে বিষয়টা হইবে, এমন যদি না হয়, তবে সেই জ্ঞান বস্তুটীর অধীন, আমাদের ইচ্ছানুসারে তাহার পরিবর্তন হইবে না। একটা বৃক্ষকে ইচ্ছানুসারে মনুষ্য বা অন্য কিছু মনে করিলে তাহা ভ্রমই হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম যখন চিরস্থায়ী, অনাদিকাল হইতে বর্তমান বস্তু, তখন তাঁহার যথার্থ জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপেরই অধীন, আমাদের ইচ্ছাধীন নয় (ব্রঃ সূঃ ১-১-৪ দ্রষ্টব্য)।

আবার দেখ, যে জিনিষটী নাই, যাহা একেবারে নূতনভাবে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, সেই জিনিষটী সম্বন্ধে কেহ যদি বলে যে, অমুক জিনিষটি হইবে, তবে সেই জিনিষটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ লোকটীর বাক্যই একমাত্র প্রমাণ; কারণ, বস্তুটা যখন নাই, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই, অনুমান করিয়াও স্বতন্ত্রভাবে উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যে বস্তুটা আছে, তাহার সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু বলে, তবে ইচ্ছা করিলে তাহা আমরা, প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইলে, প্রত্যক্ষ করিতে পারি, অনুমান সম্ভব হইলে, অনুমানও করিতে পারি। সুতরাং এরূপ বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বস্ত লোকের বাক্যও যেমন প্রমাণ, প্রত্যক্ষাদিও যথাসম্ভব প্রমাণ। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তাহাই।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি চিরকাল বর্ত্তমান বস্তুই হন, তবে আপনার প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগেও ত তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। বেদান্তের আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র বেদান্তই অবলম্বন করিতে হইবে, এরূপ নির্ব্বন্ধ কেন করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার প্রকৃষ্ট স্বাধীন চিন্তাশক্তি রহিয়াছে। কেন, সে কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারে না? অসহায় শিশু যেমন মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল, কেন যে আপনি মানুষকেও সেইরূপ বেদান্তের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইতে বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস! মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বটে, তাহার অসাধারণ চিন্তাশক্তিও আছে—একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, মানুষকে যত বড়ই মনে কর না কেন, তাহার শক্তি কত ক্ষুদ্র, তাহার চিন্তার সীমা কত ছোট, অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। ভাবরাজ্যে চিন্তা করিতে করিতে মানুষ কতটুকু অগ্রসর হইতে পারে? কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সমস্ত চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত বিচার-শক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; তাহাতে জগতের যত পদার্থের জ্ঞান হয়, ছয়টি ইন্দ্রিয় থাকিলে কে জানে আরও কত পদার্থের জ্ঞান না আমাদের হইত। আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ যে কিছু নাই, তাহা কিরূপে বলি? জন্মান্ধের নিকট রূপ বলিয়া কিছু নাই, তা' বলিয়া রূপ কি নাই? কে জানে, আমরাও জন্মাবধি কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়বিশেষ হইতে বঞ্চিত, কি-না? অতএব বৎস, ইন্দ্রিয়ের

অতীত বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে ত চলিবে না। সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ের বাণী যে ঘোষণা করে, এবং তাহা লাভের যে পন্থা সে নির্দ্দেশ করে, তাহার বাণীকে বিশ্বাস করিয়া সেই পথে চলা ছাড়া ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের ত আর গত্যন্তর নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! সেই বাণীকে বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কাজ করিলেই যে আমার সত্য লাভ হইবে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। বৎস! সত্য লাভ হইবে কি-না, তাহা ভাবিবার ত তোমার তেমন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তোমার উদ্দেশ্য শান্তি-লাভ করা। সেই পথে চলিয়া দেখ, শান্তি পাও কি-না, তোমার প্রকৃত শান্তি পাইলেই হইল। একটী অজ্ঞ লোককে যদি একজন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এক একটী নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক বড়, তবে কি সে তাহা বিশ্বাস করে? কিন্তু সে যদি যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্বয়ং পরীক্ষা করে, তবেই তাহার প্রত্যয় হয়। ঐ বিষয়টী যে তাহার সাধারণ জ্ঞানের বাহিরে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ের সত্যতা বা অসত্যতা তুমি স্বয়ং উপলব্ধি করা ছাড়া কিছুতেই সহস্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াও প্রমাণ করিতে পারিবে না। *

আরও দেখ, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বাহিরের বিষয়ই গ্রহণ করে, অন্তরে কি, তাহা দেখিতে পারে না। সুতরাং সকলের অন্তরতম যে ব্রহ্ম, তাঁহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিরূপে হইবে?

---

* যতদিন আমি এবং আমাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছুর বোধ থাকে ততদিনই সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ। যখন সমস্তই আত্মরূপে বোধ হয়, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছুরই অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় না, তখন সন্দেহ করিবারও কিছু থাকে না। অদ্বৈততত্ত্বে সন্দেহের অবকাশ নাই, সুতরাং তাহাই চরম সত্য।

আবার, অগ্নি ও ধূম উভয়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায়; সুতরাং যখন শুধু ধূম দেখা যায়, তখন অগ্নি হইতেই ঐ ধূম উঠিতেছে—এরূপ অনুমানও করা যায়। কিন্তু অগ্নি যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ না হইত, তবে কি শুধু ধূম দেখিয়া অগ্নিকে উহার কারণ বলা যাইত? 'কারণ' ও তাহা হইতে উৎপন্ন 'কার্য্য'—এই দুইটীই যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের যোগ্য হয়, তবেই কার্য্যটী দেখিয়া কারণের অনুমান করা যায়। 'কার্য্য' হইলে অবশ্য তাহার একটা কারণ থাকিবে। কিন্তু ঐ কারণটী যে কিরূপ, তাহা যদি কোন কালে জানা না হইয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান কিরূপে হইতে পারে? অতএব ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নয়, তখন জগৎরূপ এই কার্য্য দেখিয়া তাঁহার অনুমানও হইতে পারে না। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, বেদান্তবাক্য বিচার করাই ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ অনুমানের ইঙ্গিত করা উহার অভিপ্রায় নয়; এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধানভাবে বেদান্তের উপরই নির্ভর করিতে হইবে; অবশ্য ব্রহ্ম চিরস্থির বস্তু বলিয়া অনুকূল অনুমানাদিও যথাসম্ভব সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব, যাহা হইতে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়, যাহাতে অবস্থিতি করে এবং কালে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই আদি কারণ যে সর্ব্বশক্তিযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন, সেই আদিকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞও বটে (ব্রঃ সূঃ ১.১.২)। কিন্তু তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহা কিরূপে বুঝি?

গুরু। কেন?

শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ ॥৩॥

ব্রহ্মই ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রের কারণ, সুতরাং তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহা ত বলাই বাহুল্য। যাবতীয় বিষয়ই শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে, ঈদৃশ সর্ব্বজ্ঞানময় শাস্ত্র যাহা হইতে সমুদ্ভূত, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন বিনা আয়াসে সম্পন্ন হয়, বেদাদি শাস্ত্রও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অনায়াসে আবির্ভূত হইয়াছে—ইহা শ্রুতির বাক্য (বৃহঃ ২.৪.১০)। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞও বটে।

এই সূত্রটী অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা শুধু শাস্ত্র (বেদান্তাদি শাস্ত্র) হইতেই জানা যায়; অর্থাৎ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিবার শাস্ত্রই একমাত্র উপায়। পূর্ব্বেই এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

শিষ্য। আপনি বলেন, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিতে হইলে শাস্ত্রই অবলম্বন করিতে হইবে; এবং সেই শাস্ত্র প্রধানভাবে বেদান্ত বা উপনিষৎ—ইহাও বুঝিলাম। কিন্তু উপনিষৎ বহু, এবং উহাতে এত বিভিন্ন প্রণালীর আলোচনা দেখিতে পাই যে, উহাতে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, অন্য কিছু নহে,

তৎ তু সমন্বয়াৎ ॥৪॥

তাহা [তৎ] কিন্তু [তু] সমস্ত উপনিষদের সমন্বয় দেখিয়া [সমন্বয়াৎ] স্থিরীকৃত হয়। উপনিষৎ বাক্যসমূহের পূর্ব্বাপর

সমালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ। কোন কোন উপনিষৎ বাক্যের অক্ষরার্থ একটু এদিক ওদিক বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও, তাহাদের তাৎপর্য্য যে ঐ সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। সুতরাং সমুদায় বেদান্ত-শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন সে বিষয়ে আর সন্দেহের স্থান কোথায়? দুই চারিটী বেদান্ত বাক্য বলিতেছি। "হে সৌম্য শ্বেতকেতু, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল সৎ-স্বরূপে বিদ্যমান ছিল" (ছাঃ ৬-২-১)। "তখন কেবল আত্মাই ছিল" (ঐঃ ২-১-১-১)। "সেই ব্রহ্মই জগৎ" (মুঃ ২-১-১১)। "ব্রহ্ম পূর্ব্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন, এখনও আছেন, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র" (বৃঃ ২-৫-১৯)।

শিষ্য। গুরুদেব! বেদান্ত-শাস্ত্র বলে যে, ব্রহ্ম পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান। আবার, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন। কিন্তু এরূপ চিরসিদ্ধ কোন এক বস্তুর নির্দ্দেশ করা ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল, মনুষ্যকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান, কিম্বা কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করান। যেমন, 'দরিদ্রকে দান করিবে'; অথবা, 'সুরাপান করিও না',—এই প্রকার মনুষ্যকে কোন সৎকর্ম্ম করিতে, কিম্বা কোন পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেয় বলিয়াই লোকে শাস্ত্র মানে। শাস্ত্র যদি শুধু বলে, 'ওহে, মানুষের দুইটা হাত আছে,' তবে সেরূপ বর্ণনায় লোকের কি উপকার হয়? অবশ্য কেহ যদি কোন অজ্ঞাত ও অপ্রাপ্ত বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলিয়া দেয়, তবে লোকে তদনুসারে কার্য্য করিয়া উহা পাইতে

পারে। কিন্তু আপনি বলেন, ব্রহ্ম কিরূপ, শুধু তাহা জানিলেই হইল, তাঁহাকে পাইবার জন্য কোনরূপ কর্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজন নাই এবং বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মকে পাইবার জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানেরও বিধান দেয় না, কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়। যদি তাহাই হয়, তবে ঈদৃশ শাস্ত্র ত নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। শাস্ত্র শব্দের অর্থই হইল, যাহা শাসন করে, অর্থাৎ কোন কর্মে প্রবৃত্ত করায়, বা কোন কর্ম হইতে নিবৃত্ত করায়। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র যদি কেবল 'ব্রহ্ম আছেন,' কিম্বা 'এরূপ এরূপ আছেন' শুধু এই কথাই বলে, তবে সে শাস্ত্র ত নিরর্থক।

কিন্তু শাস্ত্রের এক অংশ (কর্মকাণ্ড) সত্য, আর অপরাংশ (জ্ঞানকাণ্ড) মিথ্যা, ইহাও সম্ভব নয়। সুতরাং মনে হয়—

"আত্মাকে দর্শন করিবে" (বৃঃ ২৪.৫)। "আত্মা নিষ্পাপ, তাঁহাকে অন্বেষণ কর, তাঁহাকে জান, তাঁহার উপাসনা কর" (ছাঃ ৮.৭.১)—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্মেরই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মাকে জানিতে উপদেশ করা হইয়াছে। বেদান্তের এই অংশ কর্ম প্রতিপাদক বলিয়া সার্থক। তবে আত্মা কিরূপ, যে তাঁহাকে জানিব—এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। তদুত্তরে বেদান্ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, আত্মা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রের যে অংশে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কর্মবিধিরই সহায়ক বলিয়া সার্থক, স্বতন্ত্রভাবে উহার কোন সার্থকতাই নাই। স্বর্গলাভ করিতে হইলে যেমন অগ্নিহোত্রাদি যাগের বিধান আছে, সেইরূপ মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞান বা উপাসনার বিধান আছে। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনামূলক বেদান্তশাস্ত্র এইভাবে গ্রহণ করিলেই সার্থক বলিয়া স্বীকার করা যায়। অন্যথা শাস্ত্র কিছুই

করিতে উপদেশ করিল না, কেবল একটী বস্তুর বর্ণনা করিয়া গেল, তাহাতে সেই শাস্ত্র নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

গুরু। দেখ বৎস! শ্রুতি বলিতেছেন, "শরীরাভিমানী * আত্মার প্রিয় (সুখ) ও অপ্রিয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই" (ছাঃ ৮.১২.১)। যতকাল শরীরের উপর আমিত্ব বুদ্ধি থাকিবে, তত কাল কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী। শরীরাদিতে আত্মাভিমান লইয়া কায়িক, বাচিক, বা মানসিক, যে কোন কর্ম্মই কর-না কেন, তাহার ফল, হয় কিঞ্চিৎ সুখ, না হয় দুঃখ। নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারাই সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর, শরীরাভিমান না থাকিলে কোন কর্ম্ম করাও সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে শ্রুতি বলেন, "প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, অ-শরীর আত্মাকে স্পর্শ করে না" (ছাঃ ৮.১২.১)। যাঁহার শরীরের উপর আত্মাভিমান নাই, তাঁহার কোন কর্ম্মও নাই; সুতরাং কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখও তাঁহার হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন, "ধীর ব্যক্তি, শরীরে অশরীর, অবিরাম পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্য স্থির, মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন" (কঃ ১.২.২১)। "আত্মার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি নির্ম্মল, সমস্ত পুণ্য পাপের অতীত" (মুঃ ২.১.২)। "এই পুরুষ বা আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন না" (বৃঃ ৪.৩.১৫)। এই সমস্ত শ্রুতি বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, অশরীরত্ব কখনও কোন কার্য্যদ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহা স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ। ইহা জন্মে না, সর্ব্বকালেই আছে। ইহাই আত্মার সত্যিকারের স্বরূপ। তবে অজ্ঞান-প্রভাবে শরীরে আত্মাভিমান হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র।

* এস্থলে শরীর বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীরকেই বুঝাইতেছে।

(প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, এই অশরীরত্বেরই অপর নাম মোক্ষ বা মুক্তি। শরীরকে 'আমি' মনে করাই বন্ধন এবং তাহা না-করাই মুক্তি। মোক্ষলাভ, আত্মলাভ বা ব্রহ্মলাভ একই কথা)। সুতরাং মোক্ষ কোন কর্ম্মদ্বারা উৎপাদন করা যায় না। বিশেষ, মোক্ষ যদি কোন কর্ম্মদ্বারা উৎপাদ্য হয়, তবে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে। কারণ, কর্ম্মদ্বারা উৎপাদিত কোন পদার্থকেই চিরস্থায়ী হইতে দেখা যায় না, কোন শাস্ত্রও একথা বলে না। কিন্তু মোক্ষবাদিমাত্রেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। আর, মোক্ষ যদি অনিত্য, নশ্বরই হয়, তবে তাহা লাভ করিয়াই বা ফল কি ?

আরও দেখ, শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন" (মু: ৩.২. ৯), "সেই পরাৎপর পরম আত্মাকে দর্শন করিলে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়" (মু: ২.২.৮)—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মকে জানা ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। সুতরাং ব্রহ্ম যখন চিরকালই বর্ত্তমান আছেন, তখন একথা বলা যায় না যে, ব্রহ্মকে জানা যজ্ঞাদির ন্যায় এক রকমের ক্রিয়া, এবং তাহা দ্বারা ব্রহ্মরূপ ফল উৎপন্ন হয়। ফল কথা এই যে, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ নামক কোন পদার্থ জন্মে না। মোক্ষ চিরকালই আছে; কেবল সংসারী অবস্থায় উহা অজ্ঞানে আবৃত থাকে। আত্মজ্ঞান সেই আবরণ দূর করিবামাত্র মোক্ষ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। যখন একগাছি রজ্জুতে (দড়ি) সর্পভ্রান্তি চলিয়া গিয়া রজ্জুজ্ঞান হয়, তখন কি সেই রজ্জুজ্ঞানে ঐ স্থলে একটা নূতন রজ্জু তৈয়ারী হয় ? রজ্জু ত সব সময়েই ছিল। রজ্জুর জ্ঞানে সর্পভ্রান্তি চলিয়া যায় মাত্র। সেইরূপ চিরকাল একই ভাবে বর্ত্তমান আত্মা বা ব্রহ্মকে সংসার-দশায় কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া মনে হয়। সেই ভ্রান্তি চলিয়া গেলে

আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। ভ্রান্তি মোচনের নামই মোক্ষ। সুতরাং কোন ক্রিয়ার ফলে মোক্ষ নামক একটা নূতন পদার্থ জন্মে না। "তুমি সেই ব্রহ্মই" (ছাঃ ৬.৮.৭), "আমি ব্রহ্ম" (বৃঃ ১.৪.১০)—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব ও ব্রহ্মে কোনরূপ পার্থক্য নাই। উভয়ই পরমার্থতঃ এক; এবং এই যে একত্ব, এই যে অভেদ, ইহা স্বাভাবিক, নিত্য ও চিরবর্ত্তমান। কোনরূপ কল্পনা বা ভাবনা দ্বারা ঐরূপ স্বাভাবিক একত্ব বলিয়া একটা কিছু জন্মান যায় না। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কোনরূপ কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মরূপ একটা ফল জন্মান যায় না। সুতরাং কোনরূপ কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের কোন সংস্রব নাই।

শিষ্য। কেন, "ব্রহ্মকে জানিবে"—এই বাক্যে ব্রহ্ম জানারূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম (বিষয়) বলিয়াই বোধ হয় ?

গুরু। না, তাহা হয় না। শ্রুতি বলেন, "তিনি বেদনক্রিয়ার অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার অতীত" (কেনঃ ১.৩)। "যাঁহা দ্বারা সকল জানা যায়, তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে" (বৃঃ ২.৪.১৩) ?—ইত্যাদি বহু শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে জ্ঞানক্রিয়ার অবিষয় রূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্ম উপাসনারূপ মানসিক ক্রিয়ারও অবিষয়, যেহেতু শ্রুতি বলেন,—"তাহাই ব্রহ্ম, তুমি তাঁহাকেই জান ; যাহাকে উপাসনা করা হয়, সে ব্রহ্ম নয়" (কেনঃ ১.৪)।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি কোন কিছুরই বিষয়ই না হন, তবে 'ব্রহ্মকে শাস্ত্রদ্বারা জানা যায়'—এই কথা বলি কিরূপে ? তিনি যে শাস্ত্রেরও অবিষয় হইয়া পড়েন ?

গুরু। হ্যাঁ, ব্রহ্ম বস্তুতঃ শাস্ত্রেরও অবিষয় বটে। তবে শাস্ত্রের সার্থকতা এই যে, শাস্ত্র কেবল অবিদ্যাকল্পিত নানাত্ব জ্ঞানের নিবৃত্তি

করে। শাস্ত্র বলে, 'নানা বলিয়া কিছুই নাই, এক ব্রহ্মই সত্য'। না হইলে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে শাস্ত্রও অক্ষম। শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা আভাস দেয় মাত্র। তিনি বস্তুতঃ একমাত্র অনুভবগম্য। ব্রহ্মের অমুক অমুক গুণ আছে, জীব তাঁহাকে জানিবে ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। ব্রহ্ম একটা পদার্থ, অপর কেহ তাঁহাকে জানুক—এইরূপ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ শাস্ত্রই স্বয়ং নিষেধ করেন। শ্রুতি বলেন, "যিনি ব্রহ্মকে মানসিক ক্রিয়ার অগোচর বলিয়া জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন; আর যিনি মনে করেন যে, তাঁহাকে মন দিয়া ধরা যায়, তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন নাই। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী জানেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নন, অজ্ঞানীই বলে যে, তাঁহাকে জানা যায়" (কেঃ ২.৩)। "যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাঁহাকে জানা যায় না" (বৃঃ ৩.৪.২)—এইরূপ বহুশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মকে ধরা যায় না। তবে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে অবিদ্যাজনিত সংশয় বা ভ্রম বিদূরিত হয়; তখন আত্মা নিত্য মুক্তরূপে স্বতঃই প্রকাশ পান। এইরূপ হয় বলিয়াই মোক্ষ নিত্য, অন্য কোনরূপে মোক্ষের নিত্যতা স্বীকার করা যায় না। এ তথ্যটী ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

তারপর দেখ, কার্য্য বা ক্রিয়ার ফল চার রকমের হইতে পারে। (১) একটী কার্য্য হইলে তাহার ফলে হয় কোন নূতন জিনিষ উৎপন্ন হয়; যেমন, কুম্ভকার একটী ঘট প্রস্তুত করিল। (২) অথবা, কোন একটা বিকার জন্মে; যেমন, দুধ বিকৃত হইয়া দধি হয়। (৩) অথবা, কোন কিছু পাওয়া যায়; যেমন, হাঁটিয়া কোন নগর পাওয়া। (৪) অথবা, কোনরূপ সংস্কার জন্মে, অর্থাৎ কোন একটা জিনিষের কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিম্বা কোন দোষ দূর হয়; যেমন, একখানা আয়না

ঘষিয়া পরিষ্কার করা। এই চার রকম ছাড়া ক্রিয়ার ফল আর কিছু হইতে পারে না। এক্ষণে মোক্ষ যদি কোন ক্রিয়ার ফল হয়, তবে এই চার রকমের এক রকম হইবে। মোক্ষ যদি ঘটের মত একটা উৎপন্ন পদার্থ হয়, কিম্বা দধির ন্যায় বিকৃত পদার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাহা অনিত্য হইবে। কারণ, কোনও উৎপন্ন বা বিকৃত পদার্থই চিরস্থায়ী হইতে দেখা যায় না। মোক্ষ নগরের মত প্রাপ্য পদার্থও হইতে পারে না। কেন-না, আমা ছাড়া যাহা ভিন্ন, তাহাই আমি আমার ক্রিয়াদ্বারা পাইতে পারি। কিন্তু মোক্ষ বা ব্রহ্ম যখন আত্মারই স্বরূপ, মোক্ষ বা ব্রহ্ম যখন আত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন আর কে কাহাকে পাইবে? যদি স্বীকারও করি যে, ব্রহ্ম আত্মা হইতে পৃথক্, তথাপি তাঁহাকে কোন ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়—একথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন ত তিনি চিরদিন প্রাপ্ত হইয়াই আছেন (ব্রঃ সূঃ ৪.৩.১৪ দ্রষ্টব্য)। আবার মোক্ষের কোনরূপ সংস্কারও হইতে পারে না। কারণ, সংস্কার, হয় কোন গুণ উৎপন্ন করে, না হয় কোন দোষ দূর করে। কিন্তু মোক্ষ বা ব্রহ্ম হইতে মহান্ বা শ্রেষ্ঠ যখন আর কিছুই নাই, তখন তাহাতে আর কোন্ গুণের সমাবেশ হইতে পারে? এবং ব্রহ্ম যখন সদা শুদ্ধ, সর্ব্বপ্রকার দোষ-মুক্ত, তখন তাহার কোন্ দোষ দূর হইবে?

শিষ্য। আচ্ছা, কাচ স্বভাবতঃ ভাস্বর, চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে। কিন্তু ময়লা পড়িয়া সেই স্বাভাবিক ভাস্বরত্ব ঢাকা থাকে, ঘর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ময়লা দূর করিলে কাচের আপন ধর্ম্ম ভাস্বরত্ব আপনা হইতে প্রকাশ পায়। সেইরূপ যদি বলি যে, মোক্ষ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা রূপ, সেই ধর্ম্ম আবৃত আছে, কোন ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে সুসংস্কৃত করিলে সেই মোক্ষ ধর্ম্ম প্রকটিত হয়; তবে দোষ কি?

গুরু। দোষ আছে। দেখ, ক্রিয়ার স্বভাবই এই যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যে আশ্রয়ে থাকিয়া সে হইবে, সেই আশ্রয়ের কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি সে ঘটাইবেই। যে স্থলে ক্রিয়াটী হইতেছে, তাহার একটা যে কোন রকমের পরিবর্ত্তন করার নামই ক্রিয়া। এক্ষণে যে ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে, সেই ক্রিয়া আত্মার অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া, হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চয়ই আত্মার একটা-না-একটা বিকার জন্মিবেই ; ফলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়িবে, এবং "আত্মা অবিকার্য্য" ইত্যাদি শ্রুতির সঙ্গেও বিরোধ হইবে। (প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখিতে পার যে, অন্ততঃ দুইটী পরমাণুর চলাচল না হইলে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না ; অর্থাৎ যে স্থলে ক্রিয়া হয়, সে স্থলটীতে একাধিক অবয়ব থাকা দরকার ; নিরবয়ব পদার্থে কোনরূপ ক্রিয়া সম্ভবই হইতে পারে না। আত্মা নিরবয়ব বলিয়া তাহাতেও কোন ক্রিয়া হইতে পারে না)।

শিষ্য। আচ্ছা, আত্মা নিরবয়ব ও অবিকার্য্য বলিয়া তাহাতে না হয় কোন ক্রিয়া না হইল, কিন্তু অন্য কিছুতে ক্রিয়া হইলে সেই ক্রিয়ার ফলে আত্মার সংস্কার হইতে বাধা কি ?

গুরু। এ ত বেশ কথা বলিলে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। ক্রিয়া হইল এক জায়গায়, আর তার ফল হইল অন্য জায়গায় ? ভাত খাইলে তুমি, আর ক্ষুধা নাশ হইল আমার ?

শিষ্য। কেন, এরূপও ত হইতে দেখা যায়। দেখুন, গঙ্গাস্নান করিলে আত্মা পবিত্র হয়। কিন্তু স্নান-ক্রিয়া ত হয় দেহে ; সেই দেহের ক্রিয়া দ্বারা দেহী পবিত্র হয় কিরূপে ?

গুরু। বৎস ! গঙ্গাস্নানে কি শুদ্ধ আত্মা পবিত্র হয় ? যাহার দেহে

আত্মাভিমান আছে, সেই অজ্ঞানী জীবই গঙ্গাস্নানে পবিত্র হয়। মনে কর, তোমার একটা ফোঁড়া হইয়াছে। তুমি ভাব, 'ওঃ ফোঁড়াটায় আমি কি যন্ত্রণাই পাইতেছি'। তারপর ডাক্তার আসিয়া ফোঁড়াটা কাটিয়া ঔষধ দিয়া ওটাকে আরাম করিয়া দিল। তখন ভাব, 'আঃ বাঁচিলাম'। এখন দেখ, ফোঁড়াটা তোমার দেহেই ছিল, অস্ত্রোপচার সেই দেহেতেই হইয়াছিল; তুমি দেহে আত্মাভিমান সম্পন্ন ছিলে বলিয়াই 'মরিলাম' বা 'বাঁচিলাম' এইরূপ উক্তি করিয়াছ। অন্যের শরীরে যদি ঐরূপ একটা ফোঁড়া হইত, তবে কিন্তু তুমি যন্ত্রণা পাইতে না। কারণ, তাহার শরীরে তোমার আত্মাভিমান নাই। সুতরাং যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, সে-ই গঙ্গাস্নানে পবিত্র হয়; নতুবা বিশুদ্ধ পরমাত্মার আবার পবিত্র হওয়া-না-হওয়া কি? যত কিছু কর্ম্ম দেহাভিমানী জীবই করে, আর তাহার ফলও সেই ভোগ করে। শ্রুতি বলেন, "জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দুই-এর মধ্যে জীবাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবল প্রকাশমান থাকেন, কিছুই ভোগ করেন না" (মুঃ ৩ ১.১.)। "দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটীতে যে অভিমানী সেই ভোক্তা" (কঃ ১.৩.৪)। "সেই দেব সর্ব্বভূতে এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ; কেবল অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকেন বলিয়া অপ্রকাশ বলিয়া বোধ হয়। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্রিয়াসমূহের দ্রষ্টা মাত্র, সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্থল, এক, নিগুর্ণ" (শ্বেঃ ৬.১১)। "তাঁহার কোনরূপ শরীর নাই, তিনি অক্ষত, স্থির, শুদ্ধ" (ঈঃ ৮)। এই সমস্ত শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম যে নিত্য শুদ্ধ ও গুণাতীত, একথাও জানা যায়। আর ব্রহ্মভাব ও মোক্ষ একই কথা। সুতরাং এক জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ হয়, একথা একেবারেই অযৌক্তিক।

শিষ্য। কেন, জ্ঞানও ত একরূপ মানসিক ক্রিয়া?

গুরু। হ্যাঁ, জ্ঞান মানসিক হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার একটা মস্ত পার্থক্য রহিয়াছে। দেখ, ক্রিয়াতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপের কোন অপেক্ষা নাই, এবং তাহা লোকের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে করা যায়, না করাও যায়, অথবা যেরূপ করিতে বলা হইল, তাহার বিপরীত ভাবেও করা যায়। যেমন, "যে দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃত আহুতি দিবে, সেই দেবতার ধ্যান করিবে"। এই যে এ স্থলে ধ্যান করা, এটা মানসিক ব্যাপার। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে সে ধ্যান করিতেও পারে, না করিতেও পারে, কিম্বা যেরূপভাবে ধ্যান করার বিধি আছে, তাহার ব্যতিক্রমও করিতে পারে। যদি না করে, বা ব্যতিক্রম করে, তবে সে শুধু বিধিটা মানিল না এই মাত্র, অন্য কোন হানি হয় না। কিন্তু জ্ঞান ত কাহারও আদেশের বা কোন বিধির অপেক্ষা করে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের ফলেই জ্ঞান হয়। সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া প্রযুক্ত হয়। কাজেই তাহা ইচ্ছামত করা, না করা, বা তাহার ব্যতিক্রম করা যায় না। অতএব জ্ঞান বস্তুর অধীন, কোন আদেশের অধীন নহে, কিম্বা পুরুষেরও অধীন নহে। দেখ, "হে গোতম! পুরুষ অগ্নি এবং স্ত্রীও অগ্নি" (ছাঃ ৫.৭; ৮.১)—এই একটী শ্রুতিবাক্য। এস্থলে পুরুষকে ও স্ত্রীকে অগ্নিরূপে ভাবনা করিবার বিধান আছে। এক্ষণে ঐরূপ ভাবনা করা ঐ বিধানের বলেই হইয়া থাকে, এবং সম্পূর্ণভাবে কর্তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু যথার্থ অগ্নিতে যে অগ্নিজ্ঞান, তাহা একজনে বলিয়া দিলেই হয় না; কিম্বা আমি যদি ইচ্ছা করি যে, না, আমি সত্য অগ্নিকে অগ্নি

বলিয়া বুঝিব না, অথবা জল বলিয়া বুঝিব, তাহা হইলে আমার পাগলামিই হইবে। আমি ইচ্ছা করি, বা না করি, কেহ বলুক, বা না বলুক, অগ্নি প্রত্যক্ষ হইলে অগ্নির জ্ঞান আমার হইবেই। সুতরাং জ্ঞান মানসিক হইলেও তাহাকে ঠিক ক্রিয়া বলা যায় না। সুতরাং যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানও কোন বিধি বা আদেশের দ্বারা হইতে পারে না; এবং ব্রহ্ম যখন বিষাদির ন্যায় ত্যজ্য, বা চন্দনাদির ন্যায় গ্রাহ্য—এর কিছুই নয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান 'কর', 'করা উচিত' ইত্যাদি আদেশ-বাক্যও তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে যে "আত্মাকে দেখিবে, তাঁহাকে জানিবে"—এই প্রকার আদেশ-বাক্যের মত শ্রুতি আছে, তাহা মনুষ্যকে তাহার সংস্কারবদ্ধ প্রবৃত্তি হইতে বিমুখ করিয়া ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্যই। সাধারণতঃ দেখা যায়, 'আমার ভাল হউক', 'আমার যেন কোন অনিষ্ট না হয়' এই চিন্তাতেই মানুষ সর্ব্বদা বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রাণান্ত চেষ্টাতেও তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, পরম শান্তি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। শাস্ত্র সেই ভোগাভিলাষী পুরুষকে ভোগের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সুখস্বরূপ ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই প্রথমে বলেন, "ব্রহ্মকে জান, পরম শান্তি লাভ করিবে।" তারপর যখন সে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়, তখন শ্রুতি তাহাকে লাভ অলাভের, ইষ্টানিষ্টের অতীত আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। তখন শ্রুতি বলেন, "এই যাহা কিছু দেখিতেছ সবই আত্মা" (বৃঃ ২. ৪. ৬), "যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে জানে" (বৃঃ ৪. ৫.১৫)? "যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কিরূপে জানিবে" (বৃঃ ৪. ৫.১৫)? "এই আত্মাই ব্রহ্ম" (বৃঃ ২. ৫. ১৯)।

সুতরাং লোককে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা, কিম্বা কোন কার্য্য

হইতে নিবৃত্ত করা সাধারণতঃ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইলেও ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্র বস্তুতঃ 'ব্রহ্মকে জান'—এরূপ কোন আদেশ বা বিধান করেন না। সুতরাং যে শাস্ত্র ব্রহ্মের স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা যজ্ঞাদিকর্ম্ম-বিধায়ক শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়, এবং চিরসিদ্ধ বস্তুর নির্দ্দেশ করিলেও অনর্থক নয়। ব্রহ্ম চিরসিদ্ধ হইলেও আমাদের অজ্ঞানতার ফলে আমাদের নিকট তাঁহার অস্তিত্বই একরূপ বিলুপ্ত। বেদান্তশাস্ত্র তাঁহার স্বরূপের ইঙ্গিত করে বলিয়া জীবের পরম কল্যাণকর।

শিষ্য। গুরুদেব! ব্রহ্মের অস্তিত্বই আমাদের নিকট বিলুপ্ত, এ' কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আপনিই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই। আর আত্মা ত 'আমি আমি' এইরূপ অনুভবের দ্বারা সকলেই প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং ব্রহ্ম যখন সকলের প্রত্যক্ষই হইতেছে, তখন উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র লোকের আর কি বিশেষ উপকার করে?

গুরু। বৎস! লোকে যে 'আমি আমি' বলে, সেই 'আমি' বোধ মনেরই একটা বৃত্তিমাত্র, উহা মুখ্য আত্মা নহে। মুখ্য আত্মা ঐ অহং বোধেরও দ্রষ্টা বা সাক্ষী। লোকে যে 'আমি আমি' করে, সেই আমি জীব ছাড়া আর কেহ নয়। আত্মচৈতন্য 'আমি আমি' এইরূপ যে একটা মানসিক ভাব, সেই ভাবের উপর প্রতিফলিত হয় এবং তাহাই সাধারণ লোকের নিকট 'আমি' বা 'আত্মা' রূপে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু মুখ্য আত্মা সমস্ত মানসিক ভাবের অতীত। এই রহস্য কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। উহা কেবল বেদান্তশাস্ত্রেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই যে অহংবুদ্ধিরও সাক্ষী, সর্ব্বভূতে বিরাজমান, এক, নির্ব্বিকার, চিরস্থির পরমপুরুষ, তাঁহাকে কোনরূপ যুক্তিদ্বারাও প্রতিপন্ন করা যায় না। কিম্বা যাগযজ্ঞাদির ন্যায় কোন

অনুষ্ঠান করিলে ওরূপ একটী বস্তু জন্মিবে, এমনও নয়। কর্ম্মদ্বারা হয় কিছু পরিহার করা যায়, না হয় কিছু লাভ করা যায়। কিন্তু সেই পরম পুরুষ ও আত্মা একই পদার্থ। ব্রহ্মই সকলের আত্মা, উহাই সকলের স্ব-রূপ বা স্ব-ভাব। স্ব-ভাব কি কেহ পরিহার করিতে পারে? আর যাহা স্বভাব, তাহা ত চিরকাল লব্ধ হইয়াই আছে; তাহাকে আবার লাভ করিবে কি? সুতরাং ব্রহ্ম বিষয়ে কোন কর্ম্মেরই স্থান নাই। শ্রুতি বলেন, "সেই উপনিষৎ বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি"। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপনিষৎ হইতেই জানা যায়। এবং এই অজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়াই বেদান্তশাস্ত্র সবিশেষ সার্থক।

শিষ্য। আত্মা বিষ প্রভৃতির ন্যায় পরিহারের যোগ্যও নয়, কিম্বা অর্থাদির ন্যায় আহরণের যোগ্যও নয়, কারণ, স্বভাবের আর পরিহার বা উপার্জ্জন কি? সুতরাং বলিতে হয়, উপনিষদে যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে তাহা কেবল আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-মাত্র। সেরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়া শাস্ত্র লোকের এমন কি বিশেষ উপকার করিতেছে বুঝিতেছি না। অবশ্য, 'মানুষ হাসিতে পারে, অন্য কোন প্রাণী পারে না'—এ' একটা স্বরূপ কথা, ইহা জানিলে একটা কথা শিক্ষা হয় বটে। কিন্তু উহা যদি জানিতেও না হয়, তবে ত ঐ কথা নিরর্থক। সেইরূপ উপনিষৎও বলেন, 'আত্মা এরূপ এরূপ', কিন্তু তাঁহাকে জান, এরূপ কোন আদেশ দেন না। তাহা হইলে এইরূপ বস্তুমাত্রের উপদেশও নিরর্থক।

গুরু। কেন, বস্তুমাত্রের উপদেশ যে সর্ব্বত্রই নিরর্থক, তাহা বল কিরূপে? এক জনের একগাছি দড়িতে সাপ বলিয়া ভ্রম হওয়ায় তাহার গাত্রকম্প আরম্ভ হইল। তখন যদি কেহ বলে, 'ওহে দেখ, এটা

সাপ নয়, একগাছি দড়ি', তখন তাহার কম্প নিবারণ হইতে দেখা যায়। সুতরাং শুধু বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেই যে তাহা অনর্থক হইবে, তাহা ত নয়। সেইরূপ আত্মার স্বরূপ বর্ণনও নিরর্থক নয়।

শিষ্য। 'এটা সাপ নয়, একটা দড়ি'—এইরূপ স্বরূপ কথার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে,—স্বীকার করিলাম। কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ বহুবার শুনিয়া বা পাঠ করিয়াও ত লোকের কোন উপকার হয় বলিয়া মনে হয় না। তাহারা ত পূর্ব্বের মতই বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং অজ্ঞানীর মত ব্যবহার করে। ইহাত প্রতিনিয়তই আমরা দেখিতেছি।

গুরু। না বৎস! দেখ, 'এটা সাপ নয়, একটা দড়ি'—ইহা যাহাকে বলা হয়, সে যদি সে কথায় সন্দিহান হয়, তবে তাহার সন্দেহের নিরাস না হওয়া পর্য্যন্ত, সে কিন্তু কাঁপিতেই থাকে। সেইরূপ যাহার 'আমি ব্রহ্মই' এইরূপ স্থির নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার আর সংসারে মজ্জিয়া থাকা সম্ভব হয় না। যাহার স্থির অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় নাই, সেই কেবল পূর্ব্বের মত ব্যবহার করে। যতদিন শরীরাদিতে আমি বলিয়া জ্ঞান থাকে (দড়িতে সাপের জ্ঞানের মত), ততদিন সংসারের সুখ দুঃখ সে অনুভব করে। কিন্তু যখন 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ় ধারণা হয়, তখন আর দেহাদিকে আমি বা আমার বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং দেহাদিনিমিত্ত যে সুখ দুঃখ তাহাও তাহার হয় না, তখন আবার তাহার সংসার কি? একজনের অনেক টাকা আছে, টাকা যেন তাহার গায়ের রক্ত। সেই টাকা যদি চোরে লইয়া যায়, তবে তাহার মনঃকষ্টের অবধি থাকে না। কিন্তু সেই ব্যক্তির যদি প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং সে যদি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তবে সেই টাকা থাকুক আর যাউক, তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায়

না। ছোট বেলায় পুতুল লইয়া খেলা করিতে, একটি পুতুল ভাঙ্গিয়া গেলে কাঁদিয়া অস্থির হইতে ; কিন্তু সেই পুতুলের জন্য কি এখন কোন দুঃখ হয় ? হয় না ; কেন না, তখন পুতুলটিকে অতি আপনার বলিয়া মনে করিতে, এখন আর পুতুলে কোন মমতা নাই, সেইজন্য। সেইরূপ সংসারকে যতদিন আপনার বলিয়া ভ্রম থাকে, ততদিন তাহার সুখ দুঃখও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যখন নিশ্চয় ধারণা হয় যে, সংসারের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি অশরীরী ব্রহ্ম, তখন সংসারীর ন্যায় ব্যবহার করা ত সম্ভবই নয়। দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকিলে ত কোনরূপ ব্যবহার সম্ভব হইবে ? সেইজন্য শ্রুতিও বলেন, "শরীরাভিমান শূন্য ব্যক্তিকে প্রিয় বা অপ্রিয় স্পর্শ করে না" (ছাঃ ৮. ১২.১)। শরীরাদিতে আত্মাভিমান নষ্ট হইলেই "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হয়। আর "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ স্থায়ী উপলব্ধি সাধনসাপেক্ষ। শাস্ত্র পাঠে বা লোকমুখে শুনিয়া আত্মাসম্বন্ধে একটা পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞানে শরীরাদিতে আত্মাভিমান নষ্ট হয় না, ফলে সহস্র শাস্ত্রই পাঠ কর, আর মুখে "আমি ব্রহ্ম" "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া যতই চীৎকার কর, সংসারাসক্তি পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়।

শিষ্য। কিন্তু অশরীরত্ব বা শরীরাভিমানশূন্যতা যতদিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন হইবে কিরূপে ? মৃত্যুর পরেই শরীরহীন হওয়া যায়। সুতরাং বাঁচিয়া থাকিতে আর আত্মজ্ঞান লাভের আশা নাই।

গুরু। কেন থাকিবে না ? দড়িকে সাপ বলিয়া ভ্রম হইল। এখন দড়িগাছটি নষ্ট হইলেই সাপের ভ্রম চলিয়া যাইবে এবং দড়িকে দড়ি বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং দড়ি থাকিতে সত্য জ্ঞান হইবে না, এমন ত কোন কথা নাই। সত্য জ্ঞান দড়ি থাকিতেও হইতে পারে, দড়ি নষ্ট হইলেও হইতে পারে, বরং দড়ি থাকিতে হওয়াই সহজ। পক্ষান্তরে

দড়ি নষ্ট হইলেও সর্পজ্ঞান থাকিতে পারে। সুতরাং দড়িকে দড়ি বলিয়া বুঝিতে দড়ির থাকা না থাকায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। বস্তুতঃ মিথ্যাজ্ঞানেই সর্পভ্রান্তি জন্মে। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই দড়িতে দড়িবুদ্ধি জন্মে। সেইরূপ শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাও মিথ্যা, এবং তাহারই নাম সশরীরত্ব; তাহা ছাড়া আত্মার শরীর বলিয়া সত্যিকারের একটা কিছু নাই। এই মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেই আত্মজ্ঞান হয়, শরীর থাকুক বা যাউক। আর এই যে শরীরশূন্যতা, ইহার অর্থ শরীরের উপর মিথ্যা আত্মাভিমান না থাকা; এইটাই আত্মার স্বরূপ, এই প্রকার শরীর-শূন্যতা কোনরূপ কর্ম্মদ্বারা লাভ করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ইহা নিত্যকালই বর্ত্তমান; মরিলেই শরীরশূন্যতা হইবে ইহা অযৌক্তিক। মরিলে স্থূল শরীরের প্রতি মমতা অপগত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অসঙ্গস্বভাব আত্মার যথার্থ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে অভিমান অব্যাহতই থাকিয়া যায়। আর মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরই যত অনর্থের মূল। সুতরাং স্থূল শরীর নাশের সঙ্গে শরীরাভিমানশূন্যতার কোনই সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ আত্মার সঙ্গে শরীরের সত্যিকারের কোনই সম্পর্ক নাই।

শিষ্য। কেন, আত্মার কৃত পাপপুণ্যের ফলেই ত এই শরীর হইয়াছে। সুতরাং শরীর ত আত্মার স্বোপার্জ্জিত বস্তু, তাহার সহিত আত্মার কোনরূপ সম্পর্ক নাই কিরূপ?

গুরু। বৎস! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। অসঙ্গস্বভাব আত্মাতে যে কোনরূপ কর্ম্ম হইতেই পারে না, ইহাত বহুপ্রকারেই বুঝাইয়াছি। সুতরাং তাহার কর্ম্মের ফলে শরীর হয়, একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। আরও দেখ, তোমার মতে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলে শরীর হয়। কিন্তু শরীর না

হইলে কোন কর্ম্মও সম্ভব হয় না। সুতরাং ফল এই দাঁড়ায় যে, কর্ম্ম না হইলে শরীর হয় না, আবার শরীর না হইলে কর্ম্ম হয় না। ইহাকে ন্যায়শাস্ত্রে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ বলে। এরূপ স্থলে বাস্তবিক কোন্‌টা হইতে কোন্‌টা হয়, তাহা স্থির করা যায় না, ফলে সত্যনির্দ্ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য আত্মকৃত কর্ম্মের ফলে শরীর হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক।

শিষ্য। কেন, বীজ না হইলে গাছ হয় না, আবার গাছ না হইলে বীজ হয় না—এও একপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়। কিন্তু তা' বলিয়া বীজ হইতে গাছ হয় না, কিম্বা গাছে বীজ হয় না—এমন ত কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়কে দোষ বলি কিরূপে?

গুরু। তুমি যে বীজ ও গাছের দৃষ্টান্ত দিলে, সে সম্বন্ধে একটু প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, বীজ হইতে গাছ হয়, আবার গাছ হইতে বীজ হয়—এটা আমরা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং এস্থলে অন্যোন্যাশ্রয় হইলেও তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—এ যেন অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাজেই দেখিতেছ, বীজ ও গাছের দৃষ্টান্তে অন্যোন্যাশ্রয় হইলেও ঐ ব্যাপারটা আমাদের প্রত্যক্ষ বলিয়া উহা প্রামাণিক। নতুবা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত না হইলে অন্যোন্যাশ্রয় একপ্রকার দোষই। কারণ, তাহা দ্বারা কোন একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মকৃত কর্ম্মের ফলে শরীর হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, এমন কি শাস্ত্রীয় প্রমাণও কিছুই নাই। সুতরাং এস্থলে অন্যোন্যাশ্রয় একটা দোষই। শাস্ত্র আত্মাকে নিষ্ক্রিয়রূপেই নির্দ্দেশ করে এবং আত্মার পক্ষে যে কোনরূপ কর্ম্ম করা সম্ভব নয়, তাহা ত পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। (ব্রঃ সূঃ ২.৩.৩৩—৪৭ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম যে, আত্মা নিজে কিছু করে না ; তথাপি তাহাকে কর্ত্তা বলা যায়। রাজা নিজ হাতে কিছু করেন না, তাঁহার কর্ম্মচারীরাই সব করে। তথাপি লোকে বলে, 'অমুক রাজা এই কূপটী খনন করিয়া দিয়াছেন'। বস্তুতঃ কিন্তু রাজা নিজহস্তে কোদাল ধরিয়া কূপ খনন করেন নাই, তাঁহার লোকেরাই করিয়াছে। সেইরূপ আত্মাকে কর্ত্তা বলিতে দোষ কি ?

গুরু। না, তাহাও বলিতে পার না। রাজা অর্থাদি দ্বারা লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া লন, অতএব তাহাদের সঙ্গে রাজার প্রভু-ভৃত্যরূপ একটা বাস্তব সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভৃত্যের কর্তৃত্ব রাজাতে আরোপ করায় বিশেষ কোন দোষ হয় না। কিন্তু শরীরাদির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহা ভ্রান্তিমূলক, এবং আত্মার সহিত শরীরাদির প্রভুভৃত্যাদিরূপ সত্যিকারের কোন সম্বন্ধ না থাকায় শরীরাদির কৃত কার্য্যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, একটা লোকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা বুঝিলাম লোকটা নিতান্ত মূর্খ। তখন বলি, 'এ লোকটা একটা গাধা'। এক্ষণে গাধার কতকগুলি গুণ ঐ লোকটার সত্য সত্যই আছে, সেইজন্যই বলি, লোকটা গাধা। এস্থলে এই যে একটা হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি জীবকে গাধা বলা, এ কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয় ; তবে মুখ্যতঃ মানুষটা গাধা না হইলেও গৌণভাবে তাহাকে গাধা বলায় কোন দোষ হইতে পারে না। সেইরূপ যখন দেখিতে পাই যে, শারীরিক সুখ দুঃখে আত্মাও সুখী দুঃখী হয়, তখন 'আত্মা শরীরই' ঈদৃশ জ্ঞানও একেবারে মিথ্যা নয়, তবে গৌণ এইমাত্র। অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি মিথ্যা নয়, গৌণ।

গুরু। না, উহা মিথ্যাই। দেখ, যখন একটা মনুষ্যের প্রতি

গাধা শব্দ প্রয়োগ কর, এবং তাহাকে গাধা বলিয়া জ্ঞান কর, তখন ঐ লোকটা যে একটা মনুষ্য সে জ্ঞানও তোমার থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উহার গাধার মত ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া উহাকে গাধা এইরূপ গৌণ আখ্যা দাও। কিন্তু মনে কর, লোকটা অন্ধকারে এক ধোপার বাড়ীর কাছে বসিয়া আছে। তখন তুমি ঐ লোকটাকে একটা গাধা বলিয়া মনে করিলে; হয়ত বা ধোপাকে ডাকিয়া বলিলে, 'ওরে তোর গাধাটা এখানে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে কেন'? তখন কি তোমার জ্ঞানকে গৌণ বলিব, না মিথ্যা বলিব? সুতরাং দেখিতেছ, যে স্থলে গৌণ প্রয়োগ হয়, সেস্থলে দুইটী বস্তুই জানা থাকে; আর যেস্থলে একটী বস্তুর কোনরূপ জ্ঞানই হয় না; অথচ তাহাকে অন্য বস্তুরূপে জ্ঞান হয়, সেস্থলে সেই জ্ঞান মিথ্যা বই আর কি হইতে পারে? সেইরূপ দেহাদিকে যখন 'আমি' বলিয়া মনে হয়, তখন আমি একটী পৃথক্ সত্তা, আর দেহাদি পৃথক্ সত্তা— এমন জ্ঞান হয় না। সুতরাং তাহা গৌণ হইতে পারে না। যখন দেহাদি ও আত্মা অভিন্ন, এক বলিয়াই মনে হয়, তখন তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা বা ভ্রান্তি জ্ঞান। সুতরাং আত্মা যখন দেহাদি হইতে পরমার্থতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তখন দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি গৌণ নয়, মিথ্যা। এবং মিথ্যা বলিয়া শরীর থাকিতেও আত্মার অশরীর হইতে কোন বাধা নাই। শরীর থাকা সত্ত্বেও যে আত্মা অশরীর, তাহা শ্রুতিই বলেন, "সাপের খোলশ যেমন উইএর ঢিবিতে পড়িয়া থাকে (সেই খোলশের উপর সাপের আর কোন আত্মাভিমান থাকে না), জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের শরীরও সেইরূপ (সে শরীরে তাহার আমি বা আমার বলিয়া অভিমান হয় না), তারপর তিনি অশরীর, অমৃত, অপ্রাণ, ব্রহ্ম এবং কেবল তেজঃস্বরূপ হন" [বৃঃ ..৪.৭]; "তখন তিনি চক্ষু থাকিতেও চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিতেও কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়

থাকিতেও বাক্‌শূন্য, মন থাকিতেও অ-মনা, প্রাণ থাকিতেও প্রাণহীন হন"। এই প্রকার শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ভ্রমমাত্র। আবার শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি না হইলে যখন কোন কর্ম্ম হইতে পারে না, তখন যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি না থাকায়, কোন কর্ম্ম করিতেই পারেন না। সুতরাং তুমি যে বলিয়াছ যে, বেদান্তাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াও অনেকে পূর্ব্বের মত সংসারে মজিয়া থাকে, তাহার রহস্য এই যে, তাঁহারা ঐ ভাবে একটা পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র লাভ করেন; যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিলে তাঁহার পক্ষে কোন কর্ম্ম করা ত সম্ভবই নয়। সুতরাং যিনি বেদান্তাদি বিচার করিয়াও পূর্ব্ববৎ সংসারে আসক্ত থাকেন, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। (অবশ্য জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র—সে সম্বন্ধে পরে বলিব)।

শিষ্য। বেদান্তে আছে, "আত্মাকে শুনিবে, মনন করিবে এবং তাহার ধ্যান করিবে"। সুতরাং শ্রবণের পরেও যখন মনন ও ধ্যানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই, তখন বেদান্ত যে শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়—একথা বলা যায় না; উপরন্তু ব্রহ্ম কিরূপ প্রথমে তাহা শ্রবণ করিয়া, পরে মনন ও ধ্যানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবে, বেদান্ত এইরূপ বিধিই প্রদান করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, বৎস! দেখ, অগ্নিহোত্রাদি যাগ কিরূপে করিতে হয় তাহা জানিয়া, তার পরে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যাগের সাফল্য অনুষ্ঠান সাপেক্ষ; যাগটী করা হইলেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু ব্রহ্ম কিরূপ, তাহা শ্রবণ করিয়া আর কোন-রূপ অনুষ্ঠান করা যায় না। শ্রবণের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানই হয়;

মনন ও ধ্যানের উদ্দেশ্যও সেই শ্রবণ-লব্ধ জ্ঞানেরই দৃঢ় প্রতিষ্ঠামাত্র, এবং উহাও জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নহে। জ্ঞান যে ক্রিয়া নয়, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞাদির ন্যায় কোন শাস্ত্রীয় বিধানের বিষয় নহে। আর, সমস্ত বেদান্ত বাক্য পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি জগৎকারণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, **সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা। সেই ব্রহ্মের সঙ্গে কোনরূপ ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই,** তাহাও বুঝিলাম। আর **ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও জগতের কারণ,** একথাও বুঝিলাম।

কিন্তু সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনে দেখিতে পাই যে, সেই সমস্ত দার্শনিকেরা 'প্রধান', 'পরমাণু' প্রভৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় যাহাকে জন্মাইতে হয় না, যাহা চিরকালই আছে, তাহা প্রত্যক্ষই জানা যায়, অথবা অনুমান দ্বারা জানা যায়, শাস্ত্রের তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহারা অনুমান বলে 'প্রধান', পরমাণু' বা অন্য কিছুকে জগতের কারণ বলিয়া নিরূপণ করেন; এবং উপনিষদে যে সমস্ত সৃষ্টি বিষয়ক বাক্য আছে, তাহা প্রধানাদিরই বোধক—এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। শ্রুতিতেও কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করিবার বিধি আছে। "হে সৌম্য, তেজরূপ কার্য্য দেখিয়া সৎরূপ কারণের অনুসন্ধান কর" —ইত্যাদি।

বিশেষতঃ, সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, জড় ভিন্ন কেবল চেতনকে কাহারও উপাদান হইতে দেখা যায় না। 'উপাদান' কারণ (Material

Cause) জড়ই হয়; চেতন হয় তাহার 'নিমিত্ত' কারণ (Efficient Cause); যেমন, জড় মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, এবং চেতন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। আবার কেবল জড়ে কিছু উৎপন্ন হয় না। তাহার সহিত চেতনের সম্বন্ধ না থাকিলে জড় স্বতন্ত্রভাবে কিছুই উৎপন্ন করিতে পারে না। একটা মাটির ডেলা আপনা হইতে কখনও একটা ঘটে পরিণত হইতে পারে না। চেতন ও জড়, এই দুই পদার্থ লইয়াই জগৎ। এই বিশ্বের কতক চেতন, আর কতক জড়। সুতরাং ইহার আদি কারণও 'চেতনসংযুক্ত জড়'। তন্মধ্যে জড়াংশ উপাদান, এবং চেতনাংশ নিমিত্ত। জগতে যত কিছু জড় পদার্থ, সমস্তই তাহার মূল কারণ 'প্রকৃতি' বা 'প্রধানের'ই পরিণাম বা বিকৃতি। এবং জগতের চেতনাংশমাত্রই পুরুষ বা আত্মা। এই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' স্বরূপ ও সম্বন্ধ জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করা যায়। সাংখ্য দার্শনিকেরা অনুমান বলে স্থির করিয়াছেন যে, জগতের মূল কারণ 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ' এই তিন গুণ বিশিষ্ট '**অচেতন প্রধান**'। এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ও বলা যায়। সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব কি-না, সমস্ত উৎপাদন করিবার ক্ষমতা। এক জায়গায় খুব ভাল গান হইতেছে, শ্রোতারা সব গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছে। তখন লোকে বলে, "ওঃ গায়কের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!" এখন গানের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়াই গায়কের অদ্ভুত শক্তিমত্ত্বের বোধ হয়। এইরূপ কার্য্যের শক্তি দেখিয়াই কারণের শক্তিমত্ত্বের অনুমান করা হয়। সুতরাং জগতের সর্ব্বপদার্থ যে মূল কারণ 'প্রধান' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার যে সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব আছে, ইহাও অনুমান করা যায়। প্রধানের সর্ব্বজ্ঞত্বও আছে। জ্ঞান জিনিষটী সত্ত্বগুণেরই একটা অবস্থা বিশেষ।

গীতা বলেন, "সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞান জন্মে" (গীঃ ১৪. ১৭)। যত রকমের জ্ঞানই হউক না কেন, তাহার উপাদান কারণ সত্ত্বগুণ। ত্রিগুণ বিশিষ্ট প্রধানের সেই সত্ত্বগুণ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাতেও পূর্ণমাত্রায়ই থাকে। সুতরাং প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞও বলা যায়। 'সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থাতে সত্ত্বগুণরূপ কারণের কোন কার্য্য (জ্ঞান) থাকে না, ফলে তখন প্রধানের জ্ঞান না থাকায় তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না'—এরূপ বলাও অসঙ্গত। কেন-না, একজন লোক গাইতে পারে, সে যখন গান না করে, তখন তাহার গান করিবার শক্তি নাই, এমন কেহ বলে না। ফলকথা, সব জানিবার শক্তি যাহার আছে, তাহাকেই সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়, সে শক্তির ক্রিয়া সব সময়ে হউক্, বা না হউক্। ব্রহ্মের যে সর্ব্বজ্ঞতা কল্পনা করা হয়, তাহাও এই ভাবেই। কারণ, জ্ঞান সব সময়েই হইতেছে, একথা বলিলে, জ্ঞানে ব্রহ্মের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, একথা বলিতে হয়। সুতরাং জ্ঞান কখনও হয়, কখনও হয় না; অর্থাৎ জ্ঞান ব্রহ্মের ইচ্ছাধীন, একথা বলিলে ব্রহ্মের যখন জ্ঞান হয় না, তখন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বও থাকে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, সব জানিবার শক্তি যাহার আছে, সে-ই সর্ব্বজ্ঞ। সত্ত্বগুণের মূল উৎস প্রধান, সমুদায় জানিবার শক্তি সেই সত্ত্বগুণ হইতেই উদ্ভূত হয়, সুতরাং প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে বাধা কি?

বরং বেদান্ত দর্শনে প্রতিপাদিত ব্রহ্মেরই সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না। সত্ত্বগুণের অত্যন্ত উৎকর্ষ হইলে যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হন—একথা সকলেই জানে। কিন্তু তাদৃশ উৎকর্ষ হইলে ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন ব্যক্তিরই সর্ব্বজ্ঞত্ব হয়। যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, শরীর নাই, কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতন ব্রহ্ম, তাহার আবার সর্ব্বজ্ঞত্বই বা কি, অজ্ঞত্বই বা কি? তাদৃশ ব্রহ্ম সব জানে, বা কিছু কিছু জানে—এমন কোন প্রশ্নই ত উঠিতে পারে

না। বিশেষ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম শুধু এক, অদ্বিতীয় বস্তুই থাকে, তাহার কোনরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কিছুই থাকে না। কিন্তু জ্ঞান হইতে হইলে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না; ফলে তাহাকে সর্ব্বজ্ঞও বলা যায় না। পক্ষান্তরে প্রধানের তিনটী গুণ আছে, সে আপনা হইতে এই বিশ্বাকারে পরিণত হয়, সুতরাং জ্ঞান জন্মিবার উপকরণ (সত্ত্বগুণ) তাহাতে পূর্ণরূপে আছে বলিয়া তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু অসহায় অখণ্ড ব্রহ্মের কোন উপকরণই নাই, সে আবার জগতের কারণ হইবে কিরূপে? অতএব, **ত্রিগুণ, অচেতন প্রধানই জগতের কারণ**।

ইহাই হইল মোটামুটি সাংখ্য দার্শনিকদের মত। ইহাদের যুক্তিটাও ত বেশ হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। গুরুদেব! এক্ষণে কৃপা করিয়া যেটী যথার্থ কারণ তাহাই বলুন।

গুরু। না, বৎস! সাংখ্য কল্পিত অচেতন প্রধান জগতের মূল কারণ হইতে পারে না—

ঈক্ষতেঃ ন অশব্দম্ ॥ ৫ ॥

যেহেতু, সেই প্রধান শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে নাই [অশব্দম্], শ্রুতির কুত্রাপি অচেতনকে সৃষ্টির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, বরং সৃষ্টি প্রসঙ্গে শ্রুতির সর্ব্বত্রই 'ঈক্ষণ,' আলোচনা বা ভাবনার উল্লেখ দেখিতে পাই, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ যিনি, তিনি, 'ঈক্ষণ' অর্থাৎ ভাবনা পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, শ্রুতি সর্ব্বত্রই এই কথা বলেন। 'ঈক্ষণ' চেতনেরই সম্ভব, অচেতনের নহে। সুতরাং এই ঈক্ষণ ক্রিয়ার উল্লেখ থাকায় [ঈক্ষতেঃ]

প্রমাণিত হয় যে, অচেতন প্রধান সৃষ্টি ব্যাপারে শ্রুতির অনভিপ্রেত, অতএব তাহা জগৎকারণ নয়।

সাংখ্য-দর্শনে জড় প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলা হয়, এবং সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, শ্রুতিও তাহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। কিন্তু শ্রুতি অচেতনকে জগৎকারণ বলেন না। শ্রুতি বলেন, "হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় 'সৎ'-ই ছিল" (ছাঃ ৬.২.১)। "সেই এক অদ্বিতীয় সৎ **'ঈক্ষণ'** অর্থাৎ ভাবনা করিলেন, 'আমি বহু হইয়া জন্মিব'; তারপর তিনি আকাশ, বায়ু, তেজ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৩)। এইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক অন্যান্য শ্রুতি-বাক্যেও দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিবিধ নামরূপে প্রবিভক্ত জগৎ একমাত্র সৎ-রূপে বর্ত্তমান থাকে। তারপর সেই সৎ ধ্যান করিয়া জগৎরূপে আপনাকে ব্যক্ত করেন। এক্ষণে এই যে 'ঈক্ষণ' বা ভাবনা-পূর্ব্বক সৃষ্টি করা, ইহা কোন জড় পদার্থের সম্ভব হয় না। সুতরাং শ্রুতিবাক্য দ্বারা অচেতন প্রধানকে জগতের কারণরূপে প্রতিপন্ন করা যায় না।

আর, অচেতনের আবার সর্ব্বজ্ঞত্ব কি?

শিষ্য। কেন, প্রথমেই ত বলিয়াছি যে, জ্ঞান সত্ত্বগুণেরই কার্য্য, এবং সেই সত্ত্বগুণ জড় প্রকৃতিতে পূর্ণরূপে আছে বলিয়া তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ঠিক সমানভাবে থাকিলেও সত্ত্বগুণ আছে বলিয়া, প্রকৃতিতে জ্ঞানক্রিয়া না হইলেও জ্ঞানের শক্তি আছেই, সুতরাং তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে বাধা কি?

গুরু। আচ্ছা, সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতিতে সম পরিমাণেই থাকে, কোনটীই কোনটী হইতে অধিক নহে।

এখন সত্ত্ব আছে বলিয়া যদি প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বল, তবে তমঃ আছে বলিয়া তাহাকে অজ্ঞ কেন বলিবে না? অজ্ঞান ত তমোগুণেরই কার্য্য।

আরও দেখ, জ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য হইলেও সেই জ্ঞানের যদি একজন সাক্ষী বা দ্রষ্টা (অর্থাৎ চেতন জ্ঞাতা) না থাকে, তবে তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। সত্ত্বগুণের ক্রিয়াতে যখন চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তখনই তাহাকে জ্ঞান বলা হয়, নতুবা তাহা ত একটা ক্রিয়ামাত্র। প্রধান যখন জড়, তখন তাহার দ্রষ্টৃত্ব বা সাক্ষিত্ব হইতে পারে না। সুতরাং প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না।

শিষ্য। অত্যুষ্ণ চা পান করিবার সময় যদি কাহারও ঠোঁট পুড়িয়া যায়, তখন সে বলে যে, চায়ে ঠোঁট পুড়িয়া গেল। বাস্তবিক কিন্তু চায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট যে অগ্নির উত্তাপ,তাহাতেই ঠোঁট পুড়িয়া গিয়াছে। সেইরূপ চেতন পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধানকেও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা বলা যায় বটে। কিন্তু তদপেক্ষা যাহার জন্য প্রধানের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ঈক্ষিতৃত্ব, সেই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ বা ব্রহ্মকেই কি সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ বলা অধিক সঙ্গত নয়?

শিষ্য। কিন্তু ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে যে দোষ হয়!

গুরু। কি দোষ?

শিষ্য। আপনি বলেন ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, অর্থাৎ তাহা চিরকাল একইভাবে হইতেছে, কোন সময়ে তাহার বিচ্ছেদ হয় না। কিন্তু জ্ঞান যদি সর্ব্বদাই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞানবিষয়ে ব্রহ্মের কোন স্বাধীনতা নাই বলিতে হয়।

গুরু। কেন, জ্ঞান নিত্য হইলে সেই জ্ঞান ক্রিয়া বিষয়ে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে, এমন কি কথা আছে? জ্ঞান নিত্য হইলেও ব্রহ্ম

ইচ্ছামত জানিতেছেন, এরূপ বলা চলে। দেখ, সূর্য্য সর্ব্বদা আলোক বিতরণ করিলেও লোকে বলে, 'সূর্য্য আলোক দান করিতেছে।' ব্রহ্মের জানা সম্বন্ধেও ঐরূপই লোকব্যবহার হইতে বাধা নাই। যাঁহার জ্ঞানের কদাপি বিচ্ছেদ হয় না, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বলাই বাহুল্য।

শিষ্য। সূর্য্য সর্ব্বদা আলোক দিলেও যখন কোন বস্তু বিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই বলা হয় যে, সূর্য্য সেই বস্তুটিকে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই থাকে না, তখন জ্ঞানেরও কোন বিষয় না থাকায়, 'ব্রহ্ম জানেন'—এরূপ বলা যায় না।

গুরু। কেন, কোন বস্তু বিশেষকে লক্ষ্য না করিয়াও ত লোকে বলে, 'সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে'। সেইরূপ জ্ঞানের বিষয় না থাকিলেও, 'ব্রহ্ম জানেন'—এরূপ বলা যায়। বস্তুতঃ তখনও জ্ঞানের বিষয় থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, এমন বস্তু আছে। তবে সে বস্তুটী ঠিক্ যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ব্রহ্ম ঈক্ষণ পূর্ব্বক যে জগৎ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন, সেই জগতেরই একটা অবস্থা-বিশেষ তখন ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু সেই অবস্থাটী তখনও অব্যাকৃত, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ জল, স্থল, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতিরূপে অপরিণত, তখনও তাহার কোন নাম বা আকৃতি হয় নাই। সেই জগদ্বীজ, বা মায়া, বা অবিদ্যাই তখন ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়।

শিষ্য। আচ্ছা, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের ত কোন শরীর বা ইন্দ্রিয় থাকেনা, তবে তাঁহার 'ঈক্ষণ' বা চিন্তা করা সম্ভব হয় কিরূপে ?

গুরু। দেখ, ব্রহ্মের যে জ্ঞান তাহা নিত্য, অনাদিকাল হইতেই তাহা আছে ; সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। যে খণ্ডজ্ঞানের কোন এক

ক্ষণে উৎপত্তি হয়, তাহারই ইন্দ্রিয়াদি উপকরণের আবশ্যক হয়। সংসারী জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন; তাহার কোন জ্ঞান হইতে হইলে সেই অজ্ঞানের আবরণ নাশ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু জ্ঞানময় ব্রহ্মের চিরন্তন জ্ঞানের কোনই আবরণ নাই, তাহা নিত্য ও স্বপ্রকাশ। সুতরাং তাঁহার আবার ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন কি? শ্রুতি বলেন, "তাঁহার শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সদৃশও কিছু নাই, তাহা অপেক্ষা মহৎও কিছু নাই, তাঁহার অসীম শক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞান" (শ্বে: ৬. ৮)। আবার, "তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি সর্ব্বগ্রাহী ও দ্রুতগামী; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ দেখেন; কর্ণ নাই, তবু শোনেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য জানেন, তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। তাঁহাকে মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা হয়" (শ্বে: ৩.১৯)।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিই যখন বলেন যে, "ব্রহ্ম ভিন্ন দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা আর কেহই নাই" (বৃ: ৩.৭.২৩), তখন কিরূপে বলেন যে, জ্ঞান হইতে হইলে সংসারী জীবের শরীরাদি থাকা প্রয়োজন, ব্রহ্মের সেরূপ কিছুর প্রয়োজন নাই? তাহা হইলে যে ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিয়া আরও একটা জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়।

গুরু। বৎস! পরমার্থতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় [illegible] নাই, সংসারী জীব বলিয়াও কেহ নাই। তথাপি দেহাদি উপাধি র* সংযোগে সংসারী জীব বলিয়া একজন পৃথক্ জ্ঞাতা ব্যবহার ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হয়। দেখ, আকাশ (space, ফাঁক) সর্ব্বত্রই আছে। উহা এক, আকাশ একটী ছাড়া দুইটী নাই। ঘরের মধ্যেও যে আকাশ,

* একখণ্ড স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর একটী রক্ত জবার প্রতিবিম্ব পড়িলে স্ফটিকখণ্ডকেও রক্তবর্ণ দেখায়; এস্থলে রক্তজবা 'উপাধি'।

বাহিরেও সেই আকাশ; কিন্তু গৃহরূপ উপাধির সংযোগে ঘরের মধ্যের আকাশকে (অবকাশকে, শূন্যস্থলকে, ফাঁককে) বলি গৃহাকাশ, বাহিরের আকাশকে বলি বহিরাকাশ। এইরূপ উপাধিভেদে একই বস্তুর নামেরও পার্থক্য হয় এবং তৎসম্বন্ধে এক একটা পৃথক্ পৃথক্ ধারণাও হয়। বস্তুতঃ উপাধি ত্যাগ করিলে সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুই থাকে। একই মানুষ বিবিধ উপাধির সংযোগে দৃষ্ট হইলে কখনও হয় পিতা, কখনও পুত্র, কখনও শিক্ষক, কখনও ছাত্র ইত্যাদি। এইরূপ একই অদ্বিতীয় জ্ঞাতা দেহাদি উপাধির সংযোগে সংসারী জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। গৃহের আকাশকে বহিরাকাশ হইতে পৃথক্ মনে করা যেমন ভ্রম, জীবকেও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করাও সেইরূপ ভ্রম। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সংসারী জীবের জ্ঞান হইতে হইলে শরীরাদির প্রয়োজন, ব্রহ্মের সেরূপ কিছুর প্রয়োজন নাই—এই কথা বলিলেই যে ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় একজন জ্ঞাতা যথার্থই স্বীকার করা হইল, এমন নয়। পরমার্থতঃ ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই সত্য। তথাপি দেহাদি উপাধির সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্মছাড়া আরও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদিও সেই কিছুর অস্তিত্ব মিথ্যাজ্ঞানেই হয়। এই বিষয়টী ক্রমশঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক ৫ম সূত্রের তাৎপর্য্য হইল এই যে, কোনরূপ শ্রুতি প্রামাণ্যে প্রধানকে জগতের কারণ বলা যায় না। কোনরূপ যুক্তি তর্ক দ্বারাও যে প্রধানের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না, তাহা পরে বিস্তৃতভাবে দেখাইব।

শিষ্য। শ্রুতিতে জগৎকারণ ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, একথা আছে; এবং ঈক্ষণ করা কোন অচেতনের সম্ভব হয় না, ইহাও সত্য।

কিন্তু অচেতন পদার্থে চেতনোচিত ব্যবহার বস্তুতঃ না হইলেও লোকে অচেতনে চেতনের কার্য্য আরোপ করে। অচেতন নদীর পাড় পড়-পড় দেখিয়া আমরা বলি 'নদীর পাড়টী পড়িল আর কি'। এস্থলে যেমন অচেতন নদীর কূলে চেতনের কার্য্য আরোপিত হয়, সেইরূপ স্বষ্ট্যুন্মুখ অচেতন প্রধানে মুখ্যতঃ ঈক্ষণ সম্ভব না হইলেও, গৌণভাবে ('প্রধান ঈক্ষণ করিল' ইত্যাদি প্রয়োগ) হইতে পারে। যেমন, কোন চেতন ব্যক্তি "স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বৈকালে গাড়ীতে বেড়াইতে যাইব," মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই সঙ্কল্পিত ক্রম অনুসারে কার্য্য করে, প্রধানও সেইরূপ মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র ইত্যাদি সুনির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে পরিণত হয়। একটা সুনির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে কার্য্য হওয়া চেতনেই দেখা যায়। সুতরাং তাদৃশ নিয়ম পরিপাটি দেখিয়া অচেতন প্রধানেও চেতনোচিত ঈক্ষণ উপচারিত হইতে পারে।

আরও দেখুন, শ্রুতিতে ঐ ঈক্ষণ শব্দ প্রায়ই গৌণভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে। "সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন," "সেই জল ঈক্ষণ করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৩-৪)—এইরূপ অচেতন তেজ, জল প্রভৃতিতে ঈক্ষণ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। বহুস্থলেই যখন ঈক্ষণ ক্রিয়া গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, তখন জগৎকারণের ঈক্ষণও

গৌণঃ চেৎ ?

গৌণ [গৌণঃ], এরূপ যদি [চেৎ] বলি ?

গুরু। তুমি বলিতে চাও যে, শ্রুতিতে 'সৎ'শব্দে অচেতন প্রধানকেই বুঝাইতেছে এবং তাহর সম্বন্ধে উক্ত ঈক্ষণ ক্রিয়া গৌণ ; কিন্তু তাহা

—ন, আত্মশব্দাৎ ।।৬।।

হইতে পারে না [ন], যেহেতু 'আত্ম'শব্দ সেই ঈক্ষণকারীর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে [আত্মশব্দাৎ]।

ঈক্ষণশব্দ শ্রুতিতে গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে—একথা বলা যায় না। যে স্থলে সংশব্দবাচ্য ঈক্ষিতৃকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেই শ্রুতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিবে, প্রথমে আছে "হে সৌম্য! পূর্ব্বে এই জগৎ সংরূপেই ছিল" (ছাঃ ৬.২.১)। "তারপরসেই সৎ ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প করিয়া ক্রমে তেজ, জল, অন্ন, প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৩)। তারপর শ্রুতিতে সেই সৎকে ও তৎ-সৃষ্ট তেজ, জল ও অন্নকে 'দেবতা' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তারপর শ্রুতিতে আছে, "সেই সৎ-দেবতা এইরূপে সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি জীবাত্মারূপে তেজ, জল ও অন্ন এই তিন দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব" (ছাঃ ৬.৩.২)। এক্ষণে অচেতন প্রধানকে যদি গৌণভাবেও ঈক্ষিতা বলা হয়, তবে তাহাকে দেবতাপদেও অভিহিত করিতে হইবে। কিন্তু সেই দেবতা কিরূপে জীবকে নিজের আত্মারূপে অভিহিত করিবে? জীব হইল চেতন, শরীরের মালিক, প্রাণবান্। সেই জীবকে অচেতন প্রধানের আত্মা কিরূপে বলা যায়? আত্মা কি?—না, স্ব-রূপ। স্ব-রূপই আত্মা শব্দের অর্থ। সুতরাং অচেতন প্রধানের স্বরূপ চেতন জীব—এ কথা একেবারেই অসঙ্গত। অতএব শ্রুতিতে, 'এক অদ্বিতীয় সংবস্তু স্বয়ং জীবাত্মারূপে সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নাম ও রূপ

অভিব্যক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন,' এইরূপ বাক্য থাকায় প্রধানকে গৌণভাবেও ঈক্ষিতা বলা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু চৈতন্যময় ব্রহ্মকেও মুখ্য আত্মা বলিলে তিনিই বা কিরূপে শরীরধারী জীবকে নিজের আত্মা (স্বরূপ) বলিয়া অভিহিত করেন ?

গুরু। বৎস! জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সেই জন্য ব্রহ্ম জীবকে আত্মা বলিলে কোন দোষ হয় না। শ্রুতি বলেন, "এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্বস্তু, সমগ্র বিশ্বই তন্ময়, সে-ই কেবল সত্য (তাহা ছাড়া আর যত কিছু বিকার সবই মিথ্যা, সুতরাং সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপ বা আত্মা তিনিই); হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই আত্মা" (ছাঃ ৬.১৪.৩)। এই শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মিথ্যা, জীবের জীবত্ব মিথ্যা, জীবের ব্রহ্মত্বই সত্য। সুতরাং ব্রহ্ম জীবকে আত্মা বলিলে প্রকৃত কথাই বলা হয়।

জল, তেজ প্রভৃতি জড় পদার্থ। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ না বলিয়া উপায় নাই ; কিন্তু যে স্থলে ঈক্ষণ কার্য্য মুখ্য অর্থেই সঙ্গত হয়, সে স্থলে গৌণ অর্থের কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রুতির বর্ণিত ঈক্ষণকারী ব্রহ্মই, প্রধান নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, অচেতন প্রধানেও ত আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। রাজার প্রতিনিধি রাজার সমস্ত কার্য্য করেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে বলিতে পারেন যে, সেই প্রতিনিধি তাঁহারই স্বরূপ, তাঁহারই আত্মা। সেইরূপ আত্মা বা পুরুষের সমস্ত কার্য্য করে বলিয়া প্রধানকেও পুরুষের আত্মা বলা যায়। সাংখ্য-বাদীরা বলেন, '**পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদন করাই প্রধানের কার্য্য**'। সুতরাং শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে

বলিয়াই যে ঈক্ষণ কার্য্য গৌণ হইতে পারিবে না, এমন কি কথা আছে ?

গুরু। না, জড়স্বভাব প্রকৃতিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতেই পারে না। কারণ—

তৎ-নিষ্ঠস্য মোক্ষ-উপদেশাৎ ॥৭॥

শ্রুতিতে যাঁহাকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে যে ব্যক্তির একান্ত নিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ যাহার আত্মজ্ঞান হয়, তাহার [তন্নিষ্ঠস্য] মোক্ষের উপদেশ আছে [মোক্ষোপদেশাৎ]।

আত্মজ্ঞ পুরুষের মোক্ষলাভ হয়, এই কথাই শ্রুতি বলেন। অচেতন প্রকৃতি সেই আত্মা হইতে পারে না। শ্রুতি প্রথমে পরমসূক্ষ্ম, অতি দুর্জ্ঞেয় সৎ-বস্তুকে আত্মা নামে অভিহিত করিয়া পরে, "হে শ্বেতকেতো! সেই আত্মাই তুমি" (ছা ৬.১৪.৩), এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। শ্বেতকেতু মোক্ষাভিলাষী, আত্মনিষ্ঠা হইলেই, অর্থাৎ আত্মাতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেই (গুরুকৃপায় সমুদায় ভেদবুদ্ধির অবসান হইলে শ্বেতকেতুর যখন আপনাকে আত্মা বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইবে তখন) তাহার মোক্ষলাভ হইবে। এখন অচেতন প্রধানকে যদি সৎ ও আত্মা বলা হয়, তবে মোক্ষাভিলাষী চেতন শ্বেতকেতুর অচেতন হইয়া যাওয়াই তাহার মোক্ষ—এই কথাই শ্রুতির তাৎপর্য্য, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। চেতনকে অচেতন বলা যদি শ্রুতির উদ্দেশ্য হয়, তবে সে শ্রুতি লোকের মিথ্যাজ্ঞান জন্মায় বলিয়া অনর্থের হেতুই হয়, এবং ঐরূপ শ্রুতি লোকে প্রামাণ্য বলিয়াও মানিতে বাধ্য নয়। অজ্ঞানী অথচ মোক্ষাভিলাষী এবং শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন শ্বেতকেতুকে যদি সেই শাস্ত্র বলে যে, তোমার আত্মা বা তুমি

অচেতন, তবে সে নিশ্চয়ই সে কথা বিশ্বাস করিবে, বস্তুতঃ যাহা আত্মা নয়, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করিবে, দৃঢ়ভাবে তাহাকেই আঁকড়াইয়া থাকিবে। কাজেই প্রকৃত আত্মা যে কি, তাহা জানিবার আর তাহার স্পৃহাও হইবে না; ফলে তাহার মোক্ষলাভও হইবে না। সে যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। এরূপ হইলে শাস্ত্রকে ঘোর প্রতারক বলিতে হয়। অতএব শাস্ত্র যে শ্বেতকেতুকে 'সেই আত্মাই তুমি,' এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রকৃত আত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই দিয়াছেন,—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু অচেতন প্রধান হইতে পারে না।

রাজা আপন প্রতিনিধিকে যদি, 'আমার আত্মা এই প্রতিনিধি', এইরূপ বলেন, তবে তাহাতে দোষ হয় না। কারণ, সেস্থলে রাজা ও তাহার প্রতিনিধি, এই দুই জনের পার্থক্য প্রত্যক্ষই জানা যায়। সুতরাং সে স্থলে প্রতিনিধিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ বই মুখ্য হইতে পারে না। কিন্তু যেস্থলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার স্বাভাবিক অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য, সেস্থলে গৌণ অর্থ স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আর ব্যবহার ক্ষেত্রে একস্থলে গৌণ প্রয়োগ দেখিয়া সর্ব্বত্রই সেই গৌণ অর্থ স্বীকার করিলে সমুদায় শব্দের অর্থেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং রাজা ও প্রতিনিধির দৃষ্টান্তে আত্মশব্দের গৌণ অর্থ কল্পনা করা সঙ্গত নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, চেতন ও অচেতন, এই উভয়েতেই ত আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি। সুতরাং অচেতন প্রধানকেই বা কেন আত্মশব্দের দ্বারা অভিহিত করা যাইবে না?

গুরু। না, একই স্থলে একটী শব্দের দুইটি বিপরীত অর্থ কল্পনা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। তবে ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি যে বলা হয়, তাহার কারণ এই যে, ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও চেতন অধিষ্ঠাতা আছে। যে চেতনকে আশ্রয় করিয়া ভূতাদির অস্তিত্ব সম্ভব হয়, সেই চেতনকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আর, আত্মশব্দের চেতন ও অচেতন দুই অর্থই হয়, একথা বলিলেও কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থলে সেই দুই অর্থের কোন্‌টি সঙ্গত, তাহা দেখা আবশ্যক। দুইটি অর্থের মধ্যে সঙ্গত অর্থটি নির্দ্ধারণ করিবার দুইটি উপায় আছে। হয়, সেই প্রকরণের তাৎপর্য্য অর্থাৎ যে বিষয় সম্বন্ধে কথা হইতেছে, তাহার ভাব দেখিয়া সঙ্গত অর্থটা নির্ণয় করা যায়; না হয়, সেই বাক্যে যদি এমন কোন অসন্দিগ্ধ শব্দ থাকে, যাহা সেই সন্দিগ্ধ শব্দের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত, তবে সেই অসন্দিগ্ধ শব্দের সাহায্যেও সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যে স্থলে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সতের প্রকরণে এমন কোন তাৎপর্য্য বা নিঃসন্দিগ্ধ বিশেষণ শব্দ পাওয়া যায় না, যাহাদ্বারা আত্মশব্দের অচেতন অর্থই নির্ণয় করা যায়। পক্ষান্তরে, বাক্যমধ্যে শ্বেতকেতু শব্দ আছে, এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেই চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বা স্বরূপ অচেতন কিছু হইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্থির।

অতএব, শ্রুতিতে জগৎ কারণ সৎকে আত্মশব্দে অভিহিত করায়, এবং আত্মশব্দের কোনরূপ অচেতন অর্থ স্বীকার করিতে না পারায়,

সেই আত্মা হইতে অভিন্ন সৎ কখনও অচেতন প্রধান হইতে পারে না।

আরও

হেয়ত্ব-অবচনাৎ চ ॥ ৮ ॥

শ্রুতিতে সৎপদার্থের হেয়ত্ব অর্থাৎ ত্যাজ্যত্ব বলা হয় নাই [হেয়ত্বা-বচনাৎ চ], অর্থাৎ 'সৎ'পদার্থ হেয়, তুচ্ছ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন কিছুর জ্ঞানে মোক্ষ হয়—এরূপ কোন উপদেশ শ্রুতিতে নাই, এই জন্যও এই 'সৎ'পদার্থকে প্রধান বলা যায় না।

প্রধানকে আত্মা বলা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছ। শ্রুতিতে আবার 'সৎ' পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, "সে-ই সত্য, সে-ই আত্মা, শ্বেতকেতো, তাহাই তুমি" (ছাঃ ৬.১৪.৩)। শ্বেতকেতুকে যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেওয়াই শ্রুতির উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রধানকে যদি সৎ বলা হয়, তবে শ্বেতকেতুকে যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেওয়া হয় না, যেহেতু প্রধান আত্মা নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রধান মুখ্য আত্মা না হইলেও, প্রস্তাবিত শ্রুতিতে তাহাকেই আত্মা বলা হইয়াছে, একথাও ত বলিতে পারি। যেমন নববিবাহিতা পত্নীকে স্বামী অরুন্ধতী নামক তারা দেখাইবেন – এইরূপ একটা নিয়ম আছে। কিন্তু অরুন্ধতী অতি দুর্লক্ষ্য, সহজে দেখা যায় না। নববধূ সেই তারাটি চেনে না। তখন স্বামী সেই অরুন্ধতীর নিকটবর্ত্তী একটা উজ্জ্বল তারা দেখাইয়া বলে, 'ঐ দেখ অরুন্ধতী তারা'। ঐ উজ্জ্বল তারাটী প্রকৃত অরুন্ধতী না হইলেও বধূর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এরূপ বলা হয়। তারপর ক্রমে যথার্থ অরুন্ধতীই

তাহাকে দেখান হয়। সেইরূপ যথার্থ আত্মতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। শ্বেতকেতু সহজে তাহা বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং প্রকৃত আত্মার উপদেশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে প্রধানকে **সৎ আত্মা** বলিয়া শ্বেতকেতুকে উপদেশ দেওয়া হইল। তারপর তাহাকে যথার্থ আত্মার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। অতএব এই অরুন্ধতী প্রদর্শন পদ্ধতিতে প্রধানকেও **সৎ আত্মা** বলায় দোষ হয় না।

গুরু। না বৎস! ঐ দৃষ্টান্তটী এস্থলে খাটে না। অরুন্ধতী প্রদর্শন স্থলে যে উজ্জ্বল তারাটাকে প্রথমে অরুন্ধতী বলা হয়, পরে সেটা যে যথার্থ অরুন্ধতী নয়, এরূপ কথাও বলা হয়। কিন্তু শ্রুতিতে ত পরেও এমন কথা বলা হয় নাই যে, প্রথমোপদিষ্ট আত্মা যথার্থ আত্মা নয়, উহা ব্যতীত অপর মুখ্য ও যথার্থ আত্মা আছে। যে শ্রুতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহার আগা গোড়াই সৎস্বরূপ একই আত্মার কথা বলা হইয়াছে। সৎ আত্মা যথার্থ আত্মা নয়, তাহা তুচ্ছ, হেয়, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত আত্মা আছে—এমন কোন কথাই আমাদের আলোচিত শ্রুতিতে নাই। সুতরাং শ্রুতিতে মুখ্য আত্মারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য অরুন্ধতী প্রদর্শনের ন্যায় বর্ত্তমান শ্রুতি বাক্যে সৎ বলিতে প্রধানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, একথা বলিতে পার না।

আরও দেখ, আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যে মুখ্য আত্মা এবং তাহা যে হেয় নয়, তাহার আরও একটী কারণ আছে। শ্বেতকেতু গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করিয়া আপনাকে খুব বিদ্বান্ মনে করিয়া যখন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কি গুরুর নিকট এমন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়াছ,

যে কেবলমাত্র সেই বিষয়টি জানিলেই **অন্যান্য** যত কিছু পদার্থ আছে, সবই জানা হইয়া যায়" (ছাঃ ৬.১) ? শ্বেতকেতু বলিল, "পিতঃ, সে কিরূপে হইতে পারে ? শুধু একটি বিষয় জানিলে কি করিয়া অপর সব বিষয় জানা হইয়া যাইতে পারে ?" পিতা বলিলেন, "সৌম্য ! একটী মাটির ডেলা জানিলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত সমস্ত জিনিষেরই (ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদির) জ্ঞান হইয়া যায়। ঘট, শরা প্রভৃতি বস্তুতঃ মাটি ছাড়া আর কিছু নয় ; এক মাটিরই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নাম দেওয়া হইলে ঘট, শরা ইত্যাদি **বিকার** হয়, সুতরাং উহারা মিথ্যা, মাটিই সত্য"। শ্রুতিতে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, **কারণই** সত্য, আর **কার্য্য** মিথ্যা, এবং কারণের জ্ঞান হইলেই সমস্ত কার্য্যেরও জ্ঞান হইয়া যায় (এবিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে, ব্রঃ সূঃ ২.১.১৪ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য)। পরে সেই কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে জগৎকারণ **সৎ আত্মার** উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই জগৎকারণকে জানিলে সমস্তই জানা হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে যে জগৎকারণ সৎ আত্মার উল্লেখ আছে, তাহাই সমস্ত কারণের কারণ, তাহার আর কোন কারণ নাই, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সত্য আর কিছুই নাই, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য ; না হইলে সেই সৎ যদি হেয় হয়, তবে তাহারও একটী কারণ থাকিবে, ফলে তাহাকে জানিলে সব জানা হইবে না।

আরও দেখ, সাংখ্য মতেও প্রধান ভোগ্য পদার্থের কারণ, ভোক্তা বা পুরুষদিগের কারণ নয়। সুতরাং প্রধানকে জানিলে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর জ্ঞান হইলেও ভোক্তৃবর্গের জ্ঞান হয় না। এবং তাহা হইলে, একটী পদার্থ

জানিলে সব জানা হইয়া যায়, এই যে শ্বেতকেতুর পিতার প্রথম উক্তি, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। **এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান** কিরূপে হয়, ইহা দেখানই শ্রুতির উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত সৎকে যদি প্রধান বল, তবে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রধানকে জগৎকারণ সৎ বলা যায় না।

আরও দেখ, স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় জীবের

স্ব-অপ্যয়াৎ ॥ ৯॥

(অপ্যয় = লয়)

আপন স্বরূপে লয় হয় বলিয়া [স্বাপ্যয়াৎ], প্রধানকে জগৎকারণ সৎ বলা যায় না।

শ্রুতির যে স্থলে জগৎকারণ সতের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই সৎকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, জীব যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, তখন সে সতের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যায় ; সতের সঙ্গে এক হইয়া যায় ; এবং সেই সতের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া শ্রুতির মতে **আপন স্বরূপে** বিলীন হওয়া। অর্থাৎ শ্রুতি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জীব সত্যিকারের যাহা, তাহাই হয়। মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ রসাদি বিষয় উপলব্ধি করে, তখন সেই মনোরূপ উপাধিতে আত্মবোধ হইলে জীবের **জাগ্রভাবস্থা** হয়। আবার যখন ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার অনুভূতিগুলি বাসনাকারে মনের মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে, তখন সেই মনোপহিত জীবকে **স্বপ্নদ্রষ্টা** বলা যায়।

আবার যখন ইন্দ্রিয় বা মন কাহারও কোন ক্রিয়া থাকে না, জীব যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, তখন সে যেন যথার্থ যাহা, তাহাই হইয়া যায় ; কারণ, তখন উপাধিগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে (বস্তুতঃ তখনও অজ্ঞানরূপ একটা সূক্ষ্ম মনের ক্রিয়া থাকে বলিয়া সুষুপ্তিকেই মুক্তি বলা যায় না ; এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে,(ব্রঃ সূঃ ৩.২.১-৯ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে জীব জগৎকারণ সৎ-বস্তুতে লীন হইয়া যায়, এবং সেই সৎ বস্তুই তাহার স্ব-রূপ। কিন্তু অচেতন প্রধানকে সৎ বলিলে চেতন জীব অচেতন হইয়া যায়, অথবা চেতন জীবের স্বরূপ অচেতন, এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। অন্য শ্রুতি বাক্য হইতেও জানা যায় যে, সুষুপ্তিকালে চেতনেই লয় হয়। সুতরাং জগৎকারণ সৎবস্তু অচেতন প্রধান নয়।

আরও দেখ, যদি উপনিষৎসমূহের কোনটীর কোন স্থলেও অচেতনকে জগতের কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট দেখিতাম, তবে না হয় বর্ত্তমান আলোচ্য শ্রুতির 'ঈক্ষতি' প্রভৃতি শব্দের একটা গৌণ অর্থ কল্পনা করিয়া প্রধানকেই জগতের কারণ বলিতাম। কিন্তু উপনিষদের কোনও স্থলে অচেতনকে জগতের কারণ বলা হয় নাই। সুতরাং

গতি-সামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

(গতি = অবগতি, সামান্য = এক রকম)

জগৎকারণ সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে যাহা কিছু অবগত হই, তাহা সর্ব্বত্রই একই রকমের, এইজন্য জগৎ কারণ প্রধান নয়।

অর্থাৎ জগৎকারণ সম্বন্ধে সমস্ত শ্রুতিই একই কথা বলেন।

কোথাও চেতন, কোথাও অচেতন, জগতের কারণ সম্বন্ধে এরূপ বৈষম্য কোন শ্রুতিতেই দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে সর্ব্বত্রই আত্মাকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে এবং আত্মা যে চেতন ছাড়া আর কিছু নয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব সমস্ত বেদান্ত বাক্যই যখন চেতনকেই জগতের কারণ বলেন, তখন সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই হইতে পারে না। সমস্ত শ্রুতির একমত হওয়া একটা অকাট্য প্রমাণ। যেমন, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা শুধু রূপেরই জ্ঞান হয়, একথাটি স্থির নিশ্চয় হয় কখন, না—যখন দেখি যে, প্রত্যেকেই চক্ষু দ্বারা বস্তুর রূপই দেখে,তখন। তাহা না হইয়া যদি দেখিতাম যে, কেহ চক্ষু দ্বারা দেখে, কেহ গন্ধ লয়, কেহ স্বাদ গ্রহণ করে, তবে কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ই রূপ জ্ঞানের কারণ, একথা জোর করিয়া বলিতে পারিতাম না। সেইরূপ শ্রুতির সর্ব্বত্রই যখন দেখিতে পাই যে, আত্মাকেই জগৎ কারণ রূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তখন সে কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। আর,

শ্রুতত্বাৎ চ ॥ ১১ ॥

যেহেতু এমন শ্রুতিও আছে, যেস্থলে জগৎকারণ যে চেতন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই উপস্থিত হয় না। যেমন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, "সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ" (শ্বেঃ ৬-৯)।

সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান বা অন্য কিছু নহে।

["জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১-১-২) এই দ্বিতীয় সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "শ্রুতত্বাচ্চ" এই পর্য্যন্ত দশটি সূত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর এই বিশ্বচরাচরের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের এক মাত্র কারণ; এবং সৃষ্টি বিষয়ক যে সমস্ত উপনিষৎ বাক্য আছে, তাহার সর্ব্বত্রই চেতনকেই জগতের কারণ বলা হইয়াছে।

শ্রুতিতে আবার ব্রহ্মকে দুইভাবে দেখান হইয়াছে। এক—সগুণ, অপর—নির্গুণ। একভাবে তিনি নামরূপাত্মক অনিত্য পদার্থরূপ উপাধি বিশিষ্ট, একভাবে আবার সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত। যেমন,

"যখন দ্বৈতের মত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ এটা, ওটা, সেটা ইত্যাকার বহু বস্তুর জ্ঞান থাকে, ততক্ষণই একে অন্যকে দেখে। কিন্তু যখন সমস্তই আত্মস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ যখন সবই একমাত্র আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দেখে, কি দিয়াই বা দেখে, অর্থাৎ তখন এক আত্মা ছাড়া আর কিছুই থাকেনা, দুই বলিয়া কিছুই থাকে না; সুতরাং কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি ভেদ আর থাকিতে পারে না" (বৃঃ ৪.৫ ১৫)।

"যখন দেখিবার, শুনিবার, জানিবার, আর দ্বিতীয় কিছু থাকে না, অর্থাৎ যে স্বরূপে এক ছাড়া দুই থাকে না, তাহাই ভূমা। তাহার চেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আবার যখন বা যে স্বরূপে অন্য দর্শন হয়, নানা জ্ঞান হয়, আত্মা ব্যতীত আরও বহু পদার্থের প্রতীতি হয়, তখন তাহা অল্প, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। ভূমাই অমৃত, তাহার আর নাশ নাই, সে-ই নিত্য চিরস্থায়ী। আর যাহা অল্প, তাহা নশ্বর, ক্ষণিক" (ছাঃ ৭.১৪.১)। (এই ভূমারই অপর নাম নির্গুণ ব্রহ্ম, এবং অল্পই সগুণ)।

"সেই ধীর ঈশ্বর সমস্ত রূপ সৃষ্টি করিলেন, তারপর তাহাদের এক একটা নাম দিলেন" (তৈঃ ৩.১২.৭)।

"যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, মোক্ষের সেতু" (শ্বেঃ ৬.১৯)।

এইরূপ বহুস্থলে ব্রহ্মের দুইটী রূপের উল্লেখ আছে। একই ব্রহ্মকে দুই দিক হইতে দুইভাবে দেখান হইয়াছে। অবিদ্যার ভিতর দিয়া দেখিলে দেখা যায়, ব্রহ্ম নানা, বহু ও সগুণ। তখনই তাঁহার পূজা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি সম্ভব হয়। আবার যখন বিদ্যা বা জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন দেখা যায়, ব্রহ্ম এক, এক বই দুই আর তখন থাকে না। কাজেই উপাস্য উপাসক ভেদ আর তখন থাকে না। তখন কেই বা কাহার উপাসনা করিবে? তখন ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁহার আর উপাসনা হয় না।

আবার শ্রুতিতে উপাসনাবোধক যে সমস্ত শ্রুতি বাক্য আছে, তাহারও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপাসনা এবং উপাসনার রকম অনুসারে তাহার ফলও বিভিন্ন রকমের। একরকম উপাসনায় অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, এক রকমে ক্রমমুক্তি, এক রকমে যাগযজ্ঞের ফলাধিক্য। যদিও একই সগুণ ঈশ্বর উপাস্য, তথাপি উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্যে এবং উপাসকের শক্তি সামর্থ্য ভেদে যে যেরূপ উপাসনা করে, সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন, "তাহাকে যে যেরূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপই হন"। "ইহলোকে যে যেরূপ ভাবনায় আপনাকে ভাবিত করে, মৃত্যুর পরেও সে সেই ভাবাবিষ্ট হয়" (ছাঃ ৩.১৪.১)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আছে, "হে অর্জ্জুন, জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ ভাবনায় ভাবিত হয়, মৃত্যুর পরে সে সেইরূপই হয়" (গীঃ ৮.৬)।

আরও দেখ, একই সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্রই কিরণ বিতরণ করেন, কিন্তু

স্বচ্ছ দর্পণে তাঁহার যেরূপ প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, কাংস্য পাত্রে তদ্রূপ পায় না। সেইরূপ একই পরমাত্মা যদিও স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি চিত্তের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে তাঁহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়, এবং উপাধির ভেদে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তিরও কম বেশী প্রাকট্য অনুভূত হয়। বৃক্ষাদি হইতে পশু প্রভৃতির, পশ্বাদি হইতে মানুষের উত্তরোত্তর শক্তিবিকাশের আধিক্য সকলেরই প্রত্যক্ষ। এক মনুষ্যের মধ্যেও ঐশ্বরিক শক্তির তারতম্য বিশেষভাবেই দেখা যায়। শ্রুতিও বলেন, "যিনি আপনাকে যতটা স্বপ্রকাশরূপে অনুভব করেন, তিনি ততটাই ফল পান" (ঐঃ আঃ ২. ৩. ২. ১)। গীতাতেও আছে, "হে অর্জ্জুন! যাঁহাকে গুণী, শ্রীমান্ ও শক্তিশালী দেখিবে, তাঁহাকে আমার 'তেজের' অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও" (গীঃ ১০. ৪১)। এইরূপ যে যে স্থলে ঈশ্বর-শক্তির আবেশ বা আধিক্য আছে, তাহাতেই ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। যেমন সূর্য্যের উপাসনা। সূর্য্যে যে অসাধারণ প্রকাশ-শক্তি রহিয়াছে, তাহা ঐশ্বরিক শক্তির এক অদ্ভুত বিকাশ। সুতরাং সুনির্ম্মল সূর্য্য-মণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষবিশেষের ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে দুই রকমের বাক্য আছে। তন্মধ্যে কোন স্থলে ব্রহ্মকে একটা-না-একটা উপাধির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে, কোন কোন স্থলে বা ব্রহ্মকে সর্ব্ববিধ উপাধিবর্জ্জিতরূপে দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান সদ্যোমুক্তির কারণ। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রুতিতে উপাধিবিশেষ অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু কোন বিষয়ের উপদেশ করিতে হইলে একটা-না-একটা উপাধি স্বীকার করিতেই হয়; কাজেই যে স্থলে ঐরূপ উপাধির সহায়ে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সব স্থলে সন্দেহ হয় যে, উপদিষ্ট আত্মা পরব্রহ্ম কি অপর

ব্রহ্ম, সগুণ কি নির্গুণ। সেই সন্দেহ নিরাসার্থ শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রুতির যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। শ্রুতির এই যথার্থ অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্যই পরবর্ত্তী সূত্রসমূহের অবতারণা। এবং একই ব্রহ্ম উপাধি সহযোগে উপাস্য, এবং উপাধি রহিত ভাবে জ্ঞেয়—বেদান্তের ইহাও প্রতিপাদ্য – এই কথা নির্ণয় করাও পরবর্ত্তী সূত্রের উদ্দেশ্য। আর, পূর্ব্বে যে "গতিসামান্যাৎ" সূত্রের দ্বারা 'চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ, অন্য কিছু নহে'—এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী সূত্রের বিষয়।]

শিষ্য। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে দেখিতে পাই যে, অন্নময় কোষের*

---

* তরবারির খাপ যেমন তরবারিকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ পর পর পাঁচটী কোষ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই পঞ্চ কোষের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া আত্মার অনুসন্ধান করিতে হয়। পঞ্চকোষ যথা:—(১) অন্নময় কোষ—এই স্থূল (gross) দেহকেই অন্নময় কোষ বলা হয়। মাতা পিতার ভুক্ত অন্ন (খাদ্য, food) শোণিত ও শুক্ররূপে পরিণত হইয়া এই স্থূল শরীরের উৎপত্তি করে, এবং অন্নের দ্বারাই ইহার পুষ্টি সাধিত হয়। সুতরাং অন্নের বিকার বা পরিণাম বলিয়া এই স্থূল দেহের নাম অন্নময় কোষ। (২) প্রাণময় কোষ—জিহ্বা, হস্ত, পদ, গুহ্য ও লিঙ্গ---এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটী প্রাণ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। (৩) মনোময় কোষ---চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (চর্ম্ম) এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। (৪) বিজ্ঞানময় কোষ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়। [বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়, এই তিন কোষের ১৭টি অবয়ব বা অংশ (কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫+জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫+প্রাণ ৫+মন ১+ বুদ্ধি ১=১৭) এবং ইহারই অপর নাম সূক্ষ্মদেহ]। (৫) আনন্দময় কোষ---প্রিয়, হর্ষ, আমোদ ইত্যাদি অন্তঃকরণের ভাবসমূহকে আত্মার আনন্দময় কোষ বলা হয় এবং ইহার অপর নাম কারণ শরীর। আত্মা এই পঞ্চবিধ কোষ বা ত্রিবিধ শরীর দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ, প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ—এইরূপ ক্রমান্বয়ে একটির পর একটী করিয়া চারটী কোষের কথা বলা হইয়াছে। তারপর বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় কোষের অন্তরে **আনন্দময় আত্মা**। বিজ্ঞানময় আনন্দময় দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ বিজ্ঞানময়কে যেমন একটি পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এই আনন্দময় আত্মাকেও তদ্রূপ একটী পুরুষরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। "প্রিয় * সেই আনন্দময় পুরুষের মস্তক, মোদ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব, প্রমোদ বাম পার্শ্ব, আনন্দ আত্মা, **ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা**" (তৈঃ ২. ৫)। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, এই আনন্দময় আত্মার প্রসঙ্গে ব্রহ্মকে যে পুচ্ছ (লাঙ্গুল) বলিয়া বলা হইল, তবে কি ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়ব বা অঙ্গবিশেষ, না ব্রহ্ম স্ব-প্রধান, অর্থাৎ ব্রহ্ম কি ঐ স্থলে প্রধানভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, না আনন্দময়ের অঙ্গরূপে ?

ওঁ। আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

আনন্দময় আত্মার প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মকে পুচ্ছরূপে বলা হইয়াছে, সে ব্রহ্ম [আনন্দময়ঃ] স্বপ্রধানই, কাহারও অবয়ব নয়; যেহেতু, পুনঃ পুনঃ শুদ্ধ স্বপ্রধান ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে [অভ্যাসাৎ]।

যেহেতু, তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহারে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও শুদ্ধ, স্বপ্রধান নিরবয়ব ব্রহ্মের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সেই হেতু আনন্দময় বাক্যে যে ব্রহ্মের উল্লেখ, তাহাও স্ব-প্রধান, কাহারও অবয়ব নহে।

---

* প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদি আনন্দেরই বিভিন্ন অবস্থা (modes)।

শিষ্য। বিকারশব্দাৎ ন, ইতি চেৎ ?—

বিকার বোধক শব্দ অর্থাৎ অবয়ব বোধক 'পুচ্ছ' শব্দ আছে বলিয়া [বিকারশব্দাৎ] ব্রহ্মকে স্বপ্রধান বলা যায় না [ন], এই কথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ? অর্থাৎ প্রস্তাবিত স্থলে ব্রহ্মকে পুচ্ছ বলা হইয়াছে, অতএব তাঁহাকে স্বপ্রধান বলা যায় না, এই কথা যদি বলি ?

গুরু। ন, প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, প্রাচুর্য্যক্রমে ঐ বিকারবোধক শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে [প্রাচুর্য্যাৎ]। অর্থাৎ শ্রুতিতে অন্নময় প্রভৃতি আত্মার প্রত্যেকেরই মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত এক একটা অবয়ব কল্পনা করা হইয়াছে। মস্তকাদির কল্পনা প্রচুর পরিমাণেই করা হইয়াছে। সেই প্রাচুর্য্যের রেশ পরবর্ত্তী আনন্দময় বাক্যেও অনুসৃত হইয়াছে; কারণ তাহা হইলে সাধারণ জিজ্ঞাসুর বুঝিবার সুবিধা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যে প্রত্যেকটী আত্মারই মস্তকাদি কল্পনা দেখিয়া আনন্দময় বাক্যে আনন্দময় আত্মার মস্তকাদি কি—এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উদয় হয়। সেই কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশ্যেই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পুচ্ছ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, না হইলে ব্রহ্ম যে আনন্দময় আত্মার সত্য সত্যই একটা অঙ্গবিশেষ, একথা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, পুচ্ছ যেমন পক্ষী প্রভৃতির আধার, তাহাদের শরীরের সামঞ্জস্যের নিদান-স্বরূপ, সেইরূপ ব্রহ্মও আনন্দময় আত্মার আধার, একমাত্র অবলম্বন। আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। ইহাই শ্রুতির

তাৎপর্য্য। আনন্দময় আত্মাই স্বপ্রধান, ব্রহ্ম তাহার অঙ্গ, একথা শ্রুতির অভিপ্রেত না। কারণ, সর্বান্তর বা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য। আনন্দময় আত্মাই যদি সর্বান্তর আত্মা হইত, তবে উপসংহারে তাহার কথাই বলা হইত; কিন্তু উপসংহারে দেখিতে পাই যে, কেবল শুদ্ধ, স্বপ্রধান ব্রহ্মের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং বিকার বোধক শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইলেও শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারি যে, আনন্দময় বাক্যে ব্রহ্মকে স্ব-প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বিকার বাচক শব্দটি [পুচ্ছ] কেবল প্রায়িকক্রমে উক্ত হইয়াছে।

তৎ-হেতু-ব্যপদেশাৎ চ ॥ ১৪ ॥

সেই আনন্দময়েরও হেতু অর্থাৎ কারণ [তদ্ধেতু] উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া [ব্যপদেশাৎ], অর্থাৎ ঐ তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের শেষের দিকে দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মকেই সমগ্র বিকারবর্গের কারণ বলা হইয়াছে, আনন্দময় আত্মারও তিনিই কারণ। সুতরাং ব্রহ্মকে যখন আনন্দময়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তখন তিনি আনন্দময়ের অবয়ব হইতে পারেন না, প্রত্যুত তিনি স্বপ্রধান।

মান্ত্রবর্ণিকম্ এব চ গীয়তে ॥১৫॥

মন্ত্রেও [চ], মন্ত্রের অক্ষরদ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই [মান্ত্রবর্ণিকমেব] আমাদের আলোচিত স্থলেও উক্ত হইয়াছে [গীয়তে]। অর্থাৎ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২-১) ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমে ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই; তারপর সেই ব্রহ্ম হইতেই চরাচর

বিশ্বের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করিতেছেন—একথাও পাই। পরে সেই সর্বান্তর ব্রহ্মকে বিশেষভাবে বোধগম্য করিবার জন্য শ্রুতি অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত একটী হইতে অপরটী অন্তরতর—এইরূপ ভাবে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন। সেই প্রথমোক্ত ব্রহ্মই এই আনন্দময় বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন। অতএব আনন্দময় বাক্যের ব্রহ্ম স্ব-প্রধানই।

শিষ্য। আচ্ছা, অন্নময়, প্রাণময় ইত্যাদি স্থলে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে পরমাত্মা নয়, জীবাত্মা, এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নাই। সেইরূপ আনন্দময় বাক্যেও জীবাত্মার নির্দ্দেশ করিয়াই ঐ প্রস্তাব শেষ করা হইয়াছে—এরূপ বলি না কেন?

গুরু। **ন ইতরঃ, অনুপপত্তেঃ ॥১৬॥**

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ অর্থাৎ জীব [ইতরঃ] আনন্দময় বাক্যের প্রতিপাদ্য সর্বান্তর আত্মা হইতে পারে না [ন], যেহেতু তাহা অসঙ্গত [অনুপপত্তেঃ]। অর্থাৎ—

আনন্দময় বাক্যে জীবাত্মাই প্রতিপাদ্য, একথা বলা যায় না; কারণ, ঐ বাক্যে যাহাকে প্রধানভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার জন্য আনন্দময় বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই আত্মাকেই 'সর্ব্বস্রষ্টা' বলা হইয়াছে। জীবাত্মার পক্ষে সমস্ত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহ আনন্দময় বাক্যে প্রতিপাদিত হয় নাই।

ভেদব্যপদেশাৎ চ ॥১৭॥

আর [চ], আনন্দময় বাক্যে যাহাকে প্রতিপাদন করা শ্রুতির মুখ্য

উদ্দেশ্য, তাহা হইতে আনন্দময় জীবাত্মার ভেদ দেখান হইয়াছে, এইজন্যও [ভেদব্যপদেশাৎ] বলিতে হয় যে, জীব ঐ বাক্যে প্রতিপাদিত হয় নাই।

আনন্দময় বাক্যের প্রধান প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, জীবাত্মা নহে। কারণ, ঐ বাক্যের শেষাংশে প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মা হইতে আনন্দময় জীবাত্মা ভিন্ন, এরূপ দেখান হইয়াছে। যথা, "সে (অর্থাৎ আনন্দময় বাক্যে যাহার কথা বলা হইয়াছে সে) রসস্বরূপ। জীবাত্মা সেই রস (আনন্দ) লাভ করিয়া আনন্দময় হয়" (তৈঃ ২. ৭)। এস্থলে দেখিতে পাই, আনন্দময় ও রসস্বরূপ আত্মা পৃথক্। এক লব্ধা, অপর লভ্য। অতএব এই ভেদ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইতর (অর্থাৎ জীব) আনন্দময় বাক্যের প্রধান প্রতিপাদ্য নয়। পরন্তু অন্যান্য শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকেই রসস্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং এই আলোচ্য শ্রুতির শেষাংশেও রসস্বরূপ বলিতে যখন "সেই পূর্ব্বোক্ত" —এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আনন্দময় বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আনন্দময় বাক্যে ব্রহ্মকেই প্রধানভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—আনন্দময়-জীবাত্মার অঙ্গ বিশেষরূপে নহে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আমার একটী গুরুতর সন্দেহ হইতেছে। শ্রুতির উপদেশে বুঝা যায় যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম একই। "তত্ত্বমসি" (তুমিই সেই), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্ম) ইত্যাদি বহু শ্রুতি অতি স্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু আপনি বলিলেন, পরমাত্মা রসস্বরূপ, আর জীবাত্মা সেই রস গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ জীবাত্মা লাভ করে, পরমাত্মা লভ্য হয়, এবং উভয়ের এই ভেদ শ্রুতি-সম্মত

বলিয়া আনন্দময় বাক্যে জীবের প্রধানভাবে নির্দ্দেশ হয় নাই, ১৭ সূত্রে আপনি ইহাই দেখাইয়াছেন। শ্রুতির এরূপ বিরোধের সামঞ্জস্য কি?

গুরু। বৎস! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই। বস্তুতঃ, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোনই ভেদ নাই। কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া জীব বুঝিতে পারে না যে, সে স্বয়ংই পরমাত্মা; বরং সে দেহাদিকেই আমি বা আত্মা বলিয়া মনে করে। কেহই আত্মার যথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধান করে না, তাহাকে জানিবার, বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে না। সাধারণ মানুষের নিকট সেইজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্নই। জীবের এই ভ্রান্ত আত্মধারণা দেখিয়া শ্রুতি তাহাকে উপদেশ করিতেছেন, "আত্মার অন্বেষণ কর", "তিনি পূর্ণানন্দ, তুমি সেই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিও না, পরিপূর্ণানন্দ তোমারই স্বরূপ, কেন ভ্রান্তির বশে তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত মনে করিতেছ?" এরূপ উপদেশে আপাততঃ মনে হয় যে, শ্রুতি পরমাত্মা ছাড়া জীবাত্মা বলিয়া দ্বিতীয় কাহারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কেন না, জীবাত্মা অন্বেষণকারী, পরমাত্মা অন্বেষ্টব্য। হাঁ, শ্রুতি দেহাভিমানী, কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের ভোক্তা জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, তবে তাদৃশ জীবের অস্তিত্ব অজ্ঞানেই; অজ্ঞান তিরোহিত হইলে একমাত্র পরমাত্মাই থাকেন, জীব বলিয়া কিছুই থাকে না। সুতরাং শ্রুতির চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান দশায় জীবাত্মাও যে, পরমাত্মাও সে, কোনই পার্থক্য নাই। ইহাই পরমার্থ সত্য। আর অজ্ঞান দশায় জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অজ্ঞানী যাহাকে আত্মা মনে করে, সে যথার্থ আত্মা নয়, পরমাত্মাই যথার্থ আত্মা। সুতরাং অজ্ঞান-কল্পিত আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। একজন যাদুকর একগাছি সূতা আকাশে ছুঁড়িয়া মারিল। সূতাগাছটি আকাশে ঝুলিতে লাগিল।

তারপর সে একখানা তলোয়ার লইয়া সেই সূতা ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, একখানা কাটা হাত, একটা কাটা মাথা আকাশ হইতে মাটিতে পড়িতে লাগিল ইত্যাদি। এখন এই সব ব্যাপার বস্তুতঃ কিন্তু হয়ই না। অথচ দর্শকগণ মনে করে, সত্য সত্যই ওরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। সুতরাং আকাশে কল্পিত যাদুকর হইতে মাটিতে দাঁড়ান যাদুকর যে ভিন্ন, একথাও যেমন ঠিক, আবার আকাশের যাদুকরের যখন বস্তুতঃ কোন অস্তিত্বই নাই, কেবল চোখের ধাঁধা মাত্র, তখন সেই কল্পিত যাদুকর ও সত্যিকারের যাদুকর এক, অভিন্ন, একথাও ঠিক। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ পরমার্থতঃ না থাকিলেও অজ্ঞানদৃষ্টিতে অবশ্যই আছে। এইভাব লইয়াই পূর্ব্বোক্ত দুইটী সূত্রের অবতারণা। যাহা হউক, এই বিষয় ক্রমশঃ আরও বিশদ ভাবে বুঝাইব। তবে বেদান্তের আলোচনা কালে এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, যতকাল অজ্ঞান থাকে, জগতের যাবতীয় পদার্থ, যাবতীয় ব্যবহার, সকলই সত্যরূপে অনুভূত হয়। ইহাকে বেদান্তদর্শনে **ব্যবহারিক সত্যতা** বলা হয়, আর, অজ্ঞান অপগমে যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন জাগতিক সমস্ত পদার্থ, সমস্ত ব্যবহারই মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই তখন সত্য; ইহাকে বলা হয় **পারমার্থিক সত্যতা**। বিচারের এই দুইটী বিভাগ যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, জীবাত্মা চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে না হয় আনন্দময় প্রকরণের (section) প্রধান প্রতিপাদ্য না বলিলাম, কিন্তু সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে ত ঐ প্রকরণের মুখ্য প্রতিপাদ্য বলিতে পারি, কারণ 'প্রধান' সমস্ত পদার্থের আদি কারণ, তাহা হইতেই সমস্ত সৃষ্ট হয়।

৩৯। কামাৎ চ ন অনুমানাপেক্ষা ॥১৮॥

যেহেতু প্রস্তাবিত শ্রুতিতে যাহাকে জগৎস্রষ্টা বলা হইয়াছে, তিনি কামনা বা সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টি করেন—এইরূপ কথাও আছে, সেইজন্য [কামাৎ], অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ কেবল যুক্তি দ্বারা কল্পিত যে প্রধান তাহার 'অপেক্ষা' অর্থাৎ সেই প্রধানকে এস্থলে স্বীকার করিবার সম্ভাবনা [অনুমানাপেক্ষা] নাই [ন]।

আনন্দময় প্রকরণে "তিনি কামনা করিলেন, 'আমি বহু হইয়া জন্মিব'' (তৈঃ ২. ৬)—এইরূপ উল্লেখ আছে। এস্থলে 'তিনি' বলিতে প্রকরণে প্রতিপাদ্য মুখ্য বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য বস্তু যদি সাংখ্যকল্পিত প্রধান হয়,তবে তাহার পক্ষে কামনা বা সঙ্কল্প করা সম্ভব হয় কিরূপে ?—প্রধান যে অচেতন। সুতরাং এই প্রকরণে প্রধানও প্রতিপাদ্য নয়। ["ঈক্ষতের্নাশব্দম্'' (ব্রঃ সূঃ ১.১.৫) এই সূত্রেই প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকৃত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত শ্রুতির একইরূপ তাৎপর্য্য, ইহা বিস্তৃত ভাবে দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে এস্থলেও তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল।]

আরও দেখ, শ্রুতি

অস্মিন্ অস্য চ তৎ-যোগং শাস্তি ॥১৯॥

আনন্দময় প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুতে [অস্মিন্] আত্মজ্ঞ প্রবুদ্ধ জীবের [অস্য] প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুস্বরূপে মিলন অর্থাৎ তাহাই হইয়া যাওয়ার কথা [তদ্যোগং] উপদেশ করিয়াছেন [শাস্তি]।

আনন্দময় বাক্য প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন যে, জীব যখন যথার্থ জ্ঞান লাভ করে, তখন সে আনন্দময় বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত

অভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু জীবও হইতে পারে না, প্রধানও হইতে পারে না। কারণ, জীব জীবের সঙ্গে এক হইয়া যায়—এরূপ নিরর্থক কথা বলার কোনই আবশ্যক নাই; এবং চেতন জীব অচেতন প্রধান হইয়া যায়—এরূপ কথাও সঙ্গত হয় না। অতএব আনন্দময় বাক্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু মুখ্য আত্মা বা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই ওস্থলে স্ব-প্রধান। *

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, "সূর্য্যমণ্ডলে এক হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, অধিক কি তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই হিরণ্ময়।......তিনি সমস্ত পাপের অতীত। যে ইহাকে জানে, সে সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়" [ছাঃ ১.৬.৬-৮]। এস্থলে সূর্য্য দেবতাকে অবলম্বন করিয়া অধিদৈব + উপাসনার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। তারপর আবার চক্ষুর অভ্যন্তরে এক পুরুষের ঐরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম উপাসনার বিধি দেখিতে পাই। এই যে সূর্য্য ও চক্ষুর অভ্যন্তরে এক পুরুষের উল্লেখ পাই, তিনি কে?

---

* দ্রষ্টব্য :—এই আনন্দময় অধিকরণে সূত্রগুলি যেরূপভাবে নিবদ্ধ আছে, তাহাতে মনে হয় যে, আনন্দময়ই জগৎ কারণ পরম ব্রহ্ম—ইহা প্রতিপাদন করাই যেন সূত্রকারের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ সূত্রগুলিকে সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করও প্রথমে সেই ভাবে সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকটী বিশেষ কারণে সেই ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, একটু কষ্ট কল্পনা করিয়াও অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা শঙ্করের নিজমতই উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল দেখিবেন।

+ ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহাকে বলা হয় অধিদৈব। মৃত্তিকা, জল, প্রভৃতি পঞ্চভূত সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহাকে বলা হয় আধিভৌতিক। শরীর সম্বন্ধীয় মন, প্রাণ ইত্যাদিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা অধ্যাত্ম। সর্ব্বব্যাপী অসীম পরমেশ্বরের উপাসনা অতীব দুঃসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে এই প্রকার এক একটী বস্তু অবলম্বনে উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে।

গুরু। অন্তঃ তৎ-ধর্ম্ম-উপদেশাৎ ॥২০॥

সূর্য্যমণ্ডল ও চক্ষুগোলকের অভ্যন্তরে বর্ণিত পুরুষ [অন্তঃ] পরমেশ্বর ; যেহেতু, তাঁহারই [তৎ] লক্ষণ বা গুণ [-ধর্ম্ম-] ঐ শ্রুতিতে উপদিষ্ট আছে [উপদেশাৎ]।

উক্ত অন্তঃপুরুষ পরমেশ্বরই, যেহেতু ঐস্থলে সেই পুরুষের যে সমস্ত ধর্ম্ম বা গুণের উল্লেখ আছে, তাহা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে পারে না। সমস্ত পাপের অতীত হওয়া, সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া প্রভুত্ব করা প্রভৃতি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভব হয় না।

শিষ্য। পরমেশ্বর অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়—ইহাই ত শ্রুতি বলেন। তাঁহার কোন রূপ বা আকার নাই, ইহাই শ্রুতির শিক্ষা। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলস্থ ও চক্ষুস্থ পুরুষের সুবর্ণময় শ্মশ্রু ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা তাঁহার রূপের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ঐ রূপবান্ পুরুষকে পরমেশ্বর বলা যায় কিরূপে ?

গুরু। হ্যাঁ, বস্তুতঃ পরমেশ্বরের কোন রূপ নাই, একথা সত্য। কিন্তু ইচ্ছাময় তিনি, সাধকানুগ্রহের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি মায়াময়রূপ ধারণ করিতে পারেন। স্মৃতিতে আছে, ভগবান্ বলিতেছেন, "হে নারদ ! স্বরূপতঃ আমার কোনই রূপ নাই, সুতরাং আমাকে দেখাও তোমার সম্ভব নয়, তথাপি যে সর্ব্বগুণবিশিষ্টভাবে আমাকে দেখিতেছ, ইহার কারণ, তোমার প্রতি কৃপা করিয়া আমি এই এক মায়িক রূপ ধারণ করিয়াছি।"

বস্তুতঃ যখন পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, তখন শাস্ত্র বলেন, 'তাঁহাতে কোনপ্রকার রূপ, গুণ প্রভৃতি বিশেষ নাই, তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ' ইত্যাদি। সেই নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোনরূপ

উপাসনা হইতে পারে না। তাঁহার কোন ধ্যানও সম্ভব হয় না, তিনি শুধু অনুভব করিবার বস্তু ; বস্তুতঃ বর্ণনারই অযোগ্য, সেই জন্যই শাস্ত্র সর্ব্বত্র নিষেধমুখেই তাঁহার সম্বন্ধে একটা আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি ইহা নন, উহা নন—এইরূপে সর্ব্বভাবের নিষেধ করিয়া শাস্ত্র সর্ব্বাতীত পরম সত্তার একটা আভাস দিয়াই প্রতিহত হয়। সুতরাং তাঁহার আর উপাসনা সম্ভব হয় না। উপাসনা হইতে হইলে তাঁহার কোন না কোন গুণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে—সে উপাসনা মানসিক ধ্যান ধারণাই হউক, কিম্বা প্রতিমাদি অবলম্বনেই হউক। সেই জন্যই শাস্ত্র যে স্থলে পরমেশ্বরকে উপাস্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি বাহ্য পদার্থের গুণ-সমূহ-বিশিষ্ট বলিয়াই উপদেশ করিয়াছেন। 'হিরণ্যশ্মশ্রু' প্রভৃতি রূপ বর্ণনাও উপাসনার জন্য। তাহাতে পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্বের হানি হয় না।

শিষ্য। পরমেশ্বর আপন মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে ধারণ করিয়া থাকিতে পারে, এমন কোন আধার নাই ; তিনি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সর্ব্বব্যাপী, চিরস্থির। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে ও চক্ষুতে যে পুরুষবিশেষের উপদেশ আছে, তাহার ত আধার বর্ণনা দেখিতে পাই। যেমন, এক সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডলে আছেন, আবার অন্য সময়ে চক্ষুতে আছেন। অতএব তিনি পরমেশ্বর হন কিরূপে ?

গুরু। বৎস ! সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের এই আধারবর্ণনা, অর্থাৎ তিনি একটা সীমাবদ্ধ স্থানে আছেন—এরূপ বর্ণনা, ইহাও উপাসনার সুবিধার জন্যই। তিনি যখন সর্ব্বত্রই আছেন, তখন সূর্য্যমণ্ডলাদিতে—এমন কি প্রতি ধূলিকণায় পর্য্যন্ত, অবশ্যই আছেন। তবে স্থানবিশেষে পরমেশ্বরশক্তির বিশেষ বিকাশ থাকায়, সেই সেই স্থানে তাঁহার

ধ্যানোপাসনার সুবিধা হয়। এই জন্যই আধার কল্পনা। এইরূপ, তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্য ধারণায় আসে না বলিয়া উপাসনার জন্যই সেই ঐশ্বর্য্যকে সীমাবদ্ধভাবেও বর্ণনা করা হইয়াছে।*

আরও দেখ, একটী পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে আছে—এইরূপ কথায় সেই পুরুষকে সূর্য্য-শরীরাভিমানী† কোন জীব বিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, অন্য এক শ্রুতিতে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, তিনি—

ভেদব্যপদেশাৎ চ অন্যঃ ॥ ২১ ॥

সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী জীববিশেষ হইতে ভিন্ন [অন্যঃ]; যেহেতু, ঐ সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী জীব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে [ভেদব্যপদেশাৎ]।

অন্য শ্রুতিতে আছে, "যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সূর্য্য যাঁহার শরীর, অথচ সূর্য্যাভিমানী জীব যাঁহাকে জানে না, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী, তিনি অবিনাশী" [বৃঃ ৩.৭.৯]। এই শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী জীব হইতে ভিন্ন।

অতএব, এই শ্রুতি এবং আমাদের আলোচ্য-শ্রুতি যখন

---

* প্রতিমা পূজার ইহাই রহস্য।

† যে শরীরের প্রতি যাহার অহং সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে সেই শরীরাভিমানী জীব। যেমন, আমার শরীরাভিমানী জীব আমি, তোমার শরীরাভিমানী জীব তুমি; সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলে অহংজ্ঞান যুক্ত জীববিশেষ সূর্য্যাভিমানী জীব।

একই প্রকার, তখন সূর্য্যমণ্ডলস্থ ও চক্ষুস্থ পুরুষ যে পরমেশ্বরই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবত্য নামক এক ব্রাহ্মণ ও জৈবলি নামক এক রাজার মধ্যে এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে। শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "এই জগতের আশ্রয় কি ?" উত্তরে জৈবলি বলিলেন, "আকাশই এই বিশ্ব চরাচরের আশ্রয়। আকাশ হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, আকাশেই অবস্থিতি করে, আবার আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। আকাশ এই সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, উহাই সকলের পরম আশ্রয়, মূলাধার" [ছাঃ ১.৯.১]। এস্থলে এই আকাশ বলিতে কি বুঝাইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, আকাশ বলিতে ত এই বাহ্য ভূতাকাশই বুঝায়, এবং এই অর্থেই জনসমাজে—এমন কি বেদেও, আকাশ শব্দের ব্যবহার হয়। আবার, কোন কোন শ্রুতিতে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে আকাশ শব্দের ব্রহ্ম-অর্থও নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং জৈবলি কি অর্থে আকাশ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হয়, এস্থলে বাহ্য এই ভূতাকাশ অর্থই ঠিক। কারণ, আকাশ শব্দের এই অর্থই অধিক প্রসিদ্ধ। 'আকাশ' এই শব্দটী শুনিবামাত্র ভূতাকাশেরই বোধ হয়, সুতরাং ভূতাকাশই উহার মুখ্য অর্থ। তবে ব্রহ্মে যে আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা গৌণ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। যে স্থলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে কোন বাধা জন্মে না, সে স্থলে গৌণ অর্থ স্বীকার করা দোষেরই। সেরূপ করিলে কোন শব্দেরই একটা নিশ্চিত অর্থ বুঝা অসম্ভব হয়।

গুরু। কিন্তু এস্থলে যদি আকাশ বলিতে বাহ্য ভূতাকাশই

বোঝ, তবে "আকাশ হইতেই এই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়"—এই উক্তি সঙ্গত হয় কি প্রকারে ?

শিষ্য। কেন, ভূতাকাশ প্রথমসৃষ্ট পদার্থ। তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল—এইরূপ ক্রমান্বয়ে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টির কথা শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য সকল পদার্থের কারণ আকাশ, তাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়, এবং সেই আকাশই অন্যান্য সমস্ত ভূত হইতে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের মূলাধার—এরূপ বলায় দোষ কি ? অতএব আমার মনে হয়, এস্থলে আকাশ বলিতে ভূতাকাশই বুঝাইতেছে।

গুরু। না,

আকাশঃ তৎ-লিঙ্গাৎ ॥২২॥

আকাশ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে [আকাশঃ]; যেহেতু, আলোচ্য স্থলে সেই ব্রহ্মের [তৎ] লিঙ্গ, চিহ্ন অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক কথা আছে [লিঙ্গাৎ]। জৈবলি কথিত আকাশ ব্রহ্মই। যেহেতু, সেই আকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধেই ঠিক ঠিক খাটে। ভূতবর্গের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হয়—ইহা সমস্ত উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত। আকাশ হইতেই যখন সমস্ত ভূতের উৎপত্তির কথা এস্থলে বলা হইয়াছে, তখন এই আকাশ ব্রহ্ম ছাড়া আর কি হইতে পারে ? ভূতাকাশ বায়ু প্রভৃতির কারণ হইলেও এস্থলে সে অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এস্থলে দেখিতে পাই, আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, অন্য কিছু হইতে নয়—এইরূপ বিশেষ করিয়া একমাত্র আকাশকেই সর্ব্বকারণের কারণ বলা হইয়াছে। বায়ু প্রভৃতি ভূতাকাশ হইতে উৎপন্ন হইলেও ঐ ভূতাকাশই উহাদের

একমাত্র কারণ নয়, মূলতঃ ঐ ভূতাকাশ যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাই উহাদেরও আদি কারণ। সুতরাং জৈবলি কথিত আকাশ ব্রহ্মই।

আরও দেখ, ঐ স্থলে নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভূতেরই উৎপত্তি ঐ আকাশ হইতে হয়—এইরূপ বর্ণনা আছে। সুতরাং ভূতাকাশও, ঐ সমস্ত ভূতের অন্তর্গত একটী ভূত বলিয়া, জৈবলি কথিত আকাশ হইতে উৎপন্ন—ইহাই প্রমাণিত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বমূলাধার মুখ্যভাবে ব্রহ্মই। এইরূপ ঐ আকাশ প্রসঙ্গে আরও এমন সব কথা আছে, যাহা ব্রহ্মের পক্ষেই সম্ভব হয়। আকাশ শব্দে প্রথমে ভূতাকাশের বোধ হইলেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া সেই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। অতএব জৈবলি কথিত আকাশ ব্রহ্মই।

এইরূপ,

ছান্দোগ্য উপনিষদের একস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে—'সামগানের এক অংশে ধ্যানের জন্য যে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই দেবতাটী কে?' উত্তরে বলা হইয়াছে, "তাহা প্রাণ, কেন-না, এই সমস্ত ভূত প্রাণ হইতেই জন্মে, আবার প্রাণেই লয়প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ১.১১.৪-৫) ইত্যাদি। এস্থলেও—

অতঃ এব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণেই [অতএব] প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে [প্রাণঃ]। ঐ প্রাণের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন সব কথা আছে, যাহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই খাটে; সুতরাং প্রাণ ঐ স্থলে ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে, "যে জ্যোতিঃ দ্যুলোকের পরপারে প্রদীপ্ত হইতেছে, উত্তমাধম সমস্ত ভুবন ব্যাপিয়া

বিশ্বময় যে জ্যোতিঃ, মনুষ্যের অন্তরেও সেই জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩.১৩.৭)। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দদ্বারা কোন্ বস্তুর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ?

গুরু। জ্যোতিঃ, চরণ-অভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মেরই বোধক [জ্যোতিঃ]; যেহেতু, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ঐ জ্যোতির এক পাদ বা অংশ রূপে [চরণ] বলা হইয়াছে [অভিধানাৎ]।

যে মন্ত্রে জ্যোতিঃশব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঐ জ্যোতিরই চতুষ্পাদের একপাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি কোন জ্যোতিষ্ককে বুঝান অসম্ভব। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহারও অংশ-বিশেষকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করা যায় না। অতএব জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ এস্থলে ব্রহ্ম।

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতে চান যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রেও সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধেই কথা হইতেছে, কেবল জ্যোতিঃ শব্দের পার্থক্য। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে ত ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই, পরন্তু

ছন্দঃ-অভিধানাৎ ন ইতি চেৎ ?—

গায়ত্রী নামক ছন্দেরই [ছন্দঃ—] উল্লেখ থাকায় [অভিধানাৎ] জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্মের বোধক নয় [ন]—এই কথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি ?—

গুরু।— ন, তথা চেতঃ-অর্পণ-নিগদাৎ ; তথা হি দর্শনম্ ॥২৫॥

না, সে কথা বলিতে পার না [ন] ; যেহেতু, সেই গায়ত্রী নামক ছন্দ

দ্বারা, অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দ অবলম্বন করিয়া [তথা] চিত্তের সমাধান [চেতোর্পণ] বিহিত হইয়াছে [নিগদাৎ] ; এবং যেহেতু [হি] এইরূপ বিকার অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ অবলম্বন করিয়া চিত্ত সমাধানের ব্যবস্থা [তথা] অন্যান্য শ্রুতিতেও দেখা যায় [দর্শনাৎ]।

গায়ত্রী এক প্রকার ছন্দ। পূর্ব্বমন্ত্রে ঐ গায়ত্রী শব্দ আছে বলিয়া যে সে স্থলে ব্রহ্ম কথিত হয় নাই, কেবল ছন্দোবিশেষের কথাই বলা হইয়াছে—একথা সঙ্গত নয়। একটু প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবে, ঐ মন্ত্রে ব্রহ্মকেই গায়ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ওরূপ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য গায়ত্রীরূপে ব্রহ্মের ধ্যানের ব্যবস্থা। অন্যান্য শ্রুতিতেও এরূপ **প্রতীক** অবলম্বনে পরম ব্রহ্মের ধ্যানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। শালগ্রাম প্রভৃতি মূর্ত্তিপূজার রহস্যও এই।

ভূত-আদি-পাদ-ব্যপদেশ-উপপত্তেঃ চ এবম্ ॥২৬॥

আর [চ] পূর্ব্ব মন্ত্রে ব্রহ্মই গায়ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, একথা স্বীকার করিতে হইবে [এবম্] ; যেহেতু, তাহা হইলেই ভূত প্রভৃতিকে গায়ত্রীর পাদরূপে বলা সঙ্গত হয় [ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ]।

পূর্ব্বমন্ত্রে যে গায়ত্রীর উল্লেখ আছে, তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়—এই চারিটি তাহার পাদ। ব্রহ্ম অর্থ ছাড়া গায়ত্রীর অন্য অর্থ স্বীকার করিলে ঐ কথা সঙ্গত হয় না। অতএব পূর্ব্ব মন্ত্রে ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন ; পরমন্ত্রে সেই ব্রহ্মই দ্যুলোক প্রভৃতির উপরে ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রে 'দ্যুলোকে' এইরূপ সপ্তমী বিভক্তি আছে। আর পর বাক্যে 'দ্যুলোক হইতে' এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তি আছে। এক স্থলে দ্যুলোককে আধার, অপর স্থলে তাহাকে সীমা বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে যে বস্তুর বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দ্যুলোকে অবস্থিত, আর পরবাক্যে যে জ্যোতির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্যুলোক হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত। সুতরাং

উপদেশ-ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ?—

দুই বাক্যে দুইটী বিভক্তি দ্বারা দুই রকমের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া [উপদেশ ভেদাৎ] উভয় বাক্যের প্রতিপাদ্য একই ব্রহ্ম—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না [ন], যদি [চেৎ] এরূপ [ইতি] বলি ?—

গুরু। ন, উভয়স্মিন্ অবিরোধাৎ ॥২৭॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, দুইবাক্যে দুই রকমের বিভক্তি থাকিলেও [উভয়স্মিন্] উভয় বাক্যে একই বস্তুর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—একথা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই [অবিরোধাৎ]।

পূর্ব্ববাক্যে যে বস্তুর বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দ্যুলোকে অবস্থিত, আর পরবাক্যে যে জ্যোতির বর্ণনা আছে, তাহা দ্যুলোকের পরপারে অবস্থিত। ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, দুইটী বাক্যে দুইটী পৃথক্ বস্তুর আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। কারণ বিভক্তির পার্থক্য থাকিলেও পরবর্ত্তী বাক্যের জ্যোতিকে পূর্ব্ববাক্যোক্ত বস্তু বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা হয় না। বিভক্তির একটা ধরাবাঁধা অর্থ নাই। সাধারণ লোকেও সেইজন্য অনেক সময় যেমন তেমন করিয়া বিভক্তি প্রয়োগ করে। গাছের উর্দ্ধে একটি পাখী দেখিয়া লোকে বলে, 'গাছের উপরে একটা পাখী'। আর ব্রহ্ম

সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তিনি দ্যুলোকেও আছেন, তাহার উর্দ্ধেও আছেন। অতএব উভয় মন্ত্রে দ্যুলোকের সম্বন্ধে একই বস্তুর প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করায় কোন আপত্তি হইতে পারে না; এবং সেই বস্তু ব্রহ্ম। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিতে জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। কৌষীতকি উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই। একসময়ে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন স্বীয় পুরুষকার বলে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হন। ইন্দ্র তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া একটি বর দিতে চাহিলে প্রতর্দ্দন বলিলেন, "মানুষের যাহা পরম কল্যাণ, আপনি তাহাই আমাকে বলুন।" ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা আমাকে আয়ু ও অমৃতজ্ঞানে উপাসনা কর" (কৌঃ ৩.১)। একটু পরে আবার বলিলেন, "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণই এই শরীর ধারণ করিয়া আছে" (কৌঃ ৩.২)। আবার, "বাক্য জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকেই জান"। অবশেষে বলিলেন, "এই যে প্রাণ, ইনিই প্রজ্ঞাত্মা, ইনি আনন্দ, অজর, অমর" (কৌঃ ৩.৮)।

এস্থলে, আনন্দ, অজর, অমর, ইত্যাদি শব্দ থাকায় উক্ত প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়াই মনে হয়। আবার, ইন্দ্র যখন নিজেকেই উপাসনা করিতে বলিতেছেন, তখন প্রাণ অর্থ দেবতাবিশেষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আবার, এই প্রাণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, সে শরীর ধারণ করিয়া থাকে; অতএব বলিতে হয়, ঐ প্রাণ প্রাণশক্তি মাত্র। পক্ষান্তরে 'বক্তাকে জান'—এই কথায় জীবকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং প্রাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ এস্থলে কি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন।

গুরু। প্রাণঃ তথা অনুগমাৎ ॥২৮॥

প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে [প্রাণঃ]; যেহেতু, প্রাণ শব্দের ঐ অর্থই [তথা] প্রতীয়মান হয় [অনুগমাৎ]।

ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন সংবাদে যে প্রাণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেই প্রাণ ব্রহ্মই, কেননা ঐ আখ্যায়িকার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণ শব্দের ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য অর্থ স্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ দেখ, প্রতর্দ্দন জানিতে চাহিলেন জীবের পরম কল্যাণ। উত্তরে ইন্দ্র প্রাণকেই জীবের পরমপুরুষার্থরূপে বর্ণনা করিলেন। জীবের পরম পুরুষার্থ ব্রহ্ম ছাড়া আর কি হইতে পারে? তারপর, যে প্রাণের জ্ঞানে সর্ব্বপাপ ক্ষয়, তিনিই প্রজ্ঞাত্মা (জীবাত্মা), তিনি আনন্দ, অজর, অমর ইত্যাদি উক্তি প্রাণের ব্রহ্ম অর্থ স্বীকার করিলেই সুসঙ্গত হয়।

শিষ্য। কিন্তু

ন বক্তুঃ আত্মোপদেশাৎ ইতি চেৎ ?—

প্রতর্দ্দনের প্রশ্নের উত্তর দাতা ইন্দ্রের [বক্তুঃ] আপন আত্মাকেই ঐ আখ্যায়িকায় প্রাণরূপে উপদেশ করা হইয়াছে ["আমিই প্রাণ"], অতএব [আত্মোপদেশাৎ] প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায় না [ন], একথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি? অর্থাৎ ঐ আখ্যায়িকায় শরীরধারী ইন্দ্র নামক এক দেবতা "আমাকেই জান, আমি প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদিরূপে আপন আত্মাকেই প্রাণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণ ব্রহ্ম হইবে কিরূপে?

গুরু। বক্তা ইন্দ্র আপনাকেই প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও ওস্থলে প্রাণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়,

অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা হি অস্মিন্ ॥২৯॥

যেহেতু [হি] ঐ আখ্যায়িকা যে অধ্যায়ে আছে, সেস্থলে [অস্মিন্] আত্মার প্রসঙ্গই [অধ্যাত্মসম্বন্ধ] ভূমা অর্থাৎ প্রচুর [ভূমা]।

যদিও ঐ আখ্যায়িকায় ইন্দ্র নামক একটী দেবতা আপনাকেই প্রাণ বলিতেছেন, তথাপি ঐ অধ্যায়ে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাণকে এরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সেই প্রাণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ, বামদেববৎ ॥৩০॥

তবে [তু] ইন্দ্রের স্বীয় আত্মারূপে যে প্রাণের নির্দ্দেশ, তাহা [উপদেশঃ], বামদেব ঋষির ন্যায় [বামদেববৎ], উপনিষৎ শাস্ত্রের শিক্ষা অনুসারেই [শাস্ত্রদৃষ্ট্যা] করা হইয়াছে।

"আমি ব্রহ্ম"—এইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দৃষ্টি উপনিষদের চরম শিক্ষা। ইন্দ্র আত্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম'—এই দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনাকে প্রাণব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। বামদেব নামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মনু, আমি সূর্য্য" ইত্যাদি। এস্থলেও ইন্দ্র আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া প্রাণব্রহ্মের সহিত আপনার একত্বের কথা বলিয়াছেন। অতএব প্রাণ ব্রহ্মই।

শিষ্য। কিন্তু ঐ প্রাণকে ত বক্তা বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর বক্তা বলিতে যখন শরীরেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ জীবকেই বুঝায়, তখন প্রাণ শব্দে জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, একথা বলি না

কেন? পক্ষান্তরে আবার, 'ঐ প্রাণ শরীর ধারণ করিয়া আছে' এই কথায়, শরীর ধারণ মুখ্য প্রাণ শক্তিরই কার্য্য বলিয়া আলোচ্য প্রাণকে মুখ্য প্রাণই বলিতে হয়। অতএব

জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ?—

জীববোধক ও মুখ্য প্রাণ বোধক কথা থাকায় [জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ] প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় না [ন], একথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

প্রস্তাবিত শ্রুতিতে প্রাণের এমন সব ধর্ম্মের কথা আছে, যাহাতে সেই প্রাণকে জীব বলিয়াই বোধ হয়। আবার এমন সব ধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, যাহাতে তাহাকে মুখ্য প্রাণশক্তি বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং আলোচ্য প্রাণকে ব্রহ্ম বলা সঙ্গত নয়, একথা যদি বলি ?—

গুরু। ন, উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ ; আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ॥৩১॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন], কারণ তাহা হইলে এস্থলে তিন বস্তুর উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে, এরূপ বলিতে হয় [উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ], অতএব অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিয়া যেমন প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থ স্বীকার করা হইয়াছে [১. ১. ২৩ দ্রষ্টব্য] সেইরূপ [আশ্রিতত্বাৎ] এই স্থলেও [ইহ] সেই ব্রহ্মবোধক শব্দের যোগ থাকায় [তদ্যোগাৎ] প্রাণ বলিতে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন প্রস্তাবে জীব, মুখ্য প্রাণ ও ব্রহ্ম—এই তিনটি বিভিন্ন বস্তুর বিষয়ই বলা হইয়াছে, এ কথা যদি বল, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এস্থলে জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা ও ব্রহ্মের উপাসনা—এই তিন জনের উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু ঐ প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শুধু একটি

মাত্র বস্তুরই উপাসনার বিধি দেওয়া ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য। অতএব অন্যত্রও যখন ব্রহ্ম নিশ্চায়ক শব্দের সামর্থ্যে প্রাণশব্দে ব্রহ্মকেই স্বীকার করা হইয়াছে (১. ১. ২৩ দ্রষ্টব্য), তখন এস্থলেও ব্রহ্মনিশ্চায়ক 'হিততম' (সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর) ইত্যাদি শব্দ থাকায় প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

শরীর ধারণাদির মুখ্য প্রাণের ক্রিয়াও ব্রহ্মেরই অধীন। ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই প্রাণের কার্য্য সম্ভব হয়—একথা শ্রুতিই বলেন। সুতরাং ব্রহ্মকে গৌণভাবে মুখ্যপ্রাণ বলিলেও দোষ হয় না।

আর, বক্তাও যথার্থতঃ ব্রহ্মই। তাঁহার প্রেরণাতেই বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। বস্তুতঃ জীবও ব্রহ্ম হইতে একেবারে স্বতন্ত্র, পৃথক্ কিছু নয়। "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ঘোষণা করেন। তবে অন্তঃকরণাদি উপাধির যোগেই ব্রহ্মকে কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হয় এবং সেই উপাধি পরিত্যাগ করিলে জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীবের স্ব-রূপ। এই তত্ত্ব বলিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি বলিতেছেন, "বাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, বক্তাকেই জান।" বাক্য কোন্ স্থান হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাই অনুসন্ধান কর, দেখিবে উপাধিহীন ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যা প্রভাবে এক একটা উপাধি জুড়িয়া দিয়াই তাঁহাকে বক্তা, শ্রোতা ইত্যাদি বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ অনুসন্ধানে বস্তুতঃ বাক্যের মূল কি, তাহা জানিতে পারিবে। শ্রুতি জীবকে ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। অতএব নির্দ্ধারিত হইল যে, প্রাণ ব্রহ্মই।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

[প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এক মাত্র ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। যেহেতু তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সেই হেতু তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বময়, নিত্য ও সর্ব্বজ্ঞ—ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। ইহা প্রতিপাদনের জন্য আর অন্য যুক্তির আবশ্যক করে না। যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাঁহার এই সমস্ত ধর্ম্ম স্বাভাবিক। তাহা না হইলে তিনি কারণই হইতে পারেন না। তারপর, কতক শ্রুতিতে এমন সব শব্দ আছে, যাহার অর্থ ব্রহ্ম কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সব শব্দের তাৎপর্য্যও যে ব্রহ্মপর, তাহাও যুক্তি সহকারে প্রথম পাদে দেখান হইয়াছে। কিন্তু এমন আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, যে স্থলে ব্রহ্ম-নিশ্চায়ক কোন স্পষ্ট শব্দ নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সেই সমস্ত অস্পষ্ট বাক্যসমূহের বিচার হইতেছে।]

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "এ সমস্তই ব্রহ্ম ; কারণ, সবই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করে, এবং তাঁহাতেই লীন হয়। অতএব, শান্ত মনে উপাসনা করিবে। জীব কর্ম্মময়, ভাবময়। যে যেরূপ ভাবনায় আপনাকে ভাবিত করে, মৃত্যুর পরেও সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব, হৃদ্-পদ্মে মনোময়, প্রাণ-শরীর, জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যান

করিবে" (ছাঃ ৩. ১৪. ১, ২)। এই শ্রুতিতে মনোময়, প্রাণশরীর ইত্যাদি কথায় কি জীবের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, না ব্রহ্মের ?

গুরু। এই শ্রুতিতে বর্ণিত **মনোময় পুরুষ** ব্রহ্ম। তাঁহারই উপাসনার বিধি এস্থলে দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ-উপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সমস্ত শ্রুতিতে [সর্ব্বত্র] জগৎকারণরূপে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম [প্রসিদ্ধ], এই শ্রুতিতেও তাঁহারই উপদেশ করা হইয়াছে, এইজন্য [উপদেশাৎ] বলিতে হইবে, মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য শ্রুতির প্রারম্ভেই "সমস্তই ব্রহ্ম"—এই বাক্য দ্বারা অন্যান্য শ্রুতিতে যে জগৎ কারণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মেরই বর্ণনা করা হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহার বিষয়ই আলোচিত হইতেছে—এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। সহসা একই প্রসঙ্গে নূতন কিছুর অবতারণা হইয়াছে—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। অতএব মনোময় প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিবক্ষিত-গুণ-উপপত্তেঃ চ ॥ ২ ॥

আরও [চ] উপাসনার জন্য স্বীকার্য্য অভ্যুক্ত গুণ [বিবক্ষিত-গুণ] ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় বলিয়া [উপপত্তেঃ] মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-উপাসনার বিধি আছে। সুতরাং সেই উপাসনার জন্য কতকগুলি গুণের আবশ্যক। যে সমস্ত গুণ

অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে, শ্রুতি 'মনোময়', 'প্রাণ শরীর', 'জ্যোতিঃস্বরূপ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সেই সমস্ত গুণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত গুণগুলির নির্দ্দেশ যাহাতে সার্থক হয়, সেইজন্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনোময় প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্মই। 'সত্যসঙ্কল্প', 'নিষ্পাপ', 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি গুণ ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়। 'মনোময়', 'প্রাণশরীর'—এই দুইটী কথা জীব সম্বন্ধীয় হইলেও ব্রহ্ম যখন সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বময়, তখন জীবের ধর্ম্মও তাঁহারই ধর্ম্ম। শ্রুতি ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলেন, "তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ, তুমি শিশু" (শ্বেঃ ৪. ৩) ইত্যাদি। অতএব প্রস্তাবিত শ্রুতিতে মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং তিনিই উপাস্য।

অনুপপত্তেঃ তু ন শারীরঃ ।। ৩ ।।

পক্ষান্তরে [তু] শরীরে আবদ্ধ যে জীব সে [শারীরঃ] মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা লক্ষিত উপাস্য পুরুষ নয় [ন] ; যেহেতু, শ্রুত্যুক্ত গুণ-সমূহ তাহার পক্ষে খাটে না [অনুপপত্তেঃ]।

'সত্যসঙ্কল্প', 'আকাশাত্মা', 'অবাক্য', 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি গুণ শরীরাবদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভবই হয় না। অতএব জীব যে আলোচ্য শ্রুতিতে উপাস্যরূপে বর্ণিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

ঐ শ্রুতিতে বর্ণিত মনোময় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পুরুষ যে জীব নয়, তাহার অন্য কারণও আছে—

কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ব্যপদেশাৎ চ ।। ৪ ।।

ঐ পুরুষকে 'কর্ম্ম', আর জীবকে 'কর্ত্তা' রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, এইজন্যও [কর্ম্মকর্ত্তৃব্যদেশাচ্চ] ঐ পুরুষকে জীব বলা যায় না।

ঐ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, জীব মৃত্যুর পর ঐ পুরুষের সহিত এক হইয়া যায়। সুতরাং জীব এক হইয়া যাওয়ার কর্ত্তা আর যাহা প্রকারে যে পুরুষের সহিত এক হইয়া যাইবে, সে তাহার কর্ম্ম, লভ্য। অন্যের জীব উপাসক, ঐ পুরুষ উপাস্য, অর্থাৎ জীব উপাসনা ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং ঐ পুরুষ সেই ক্রিয়া দ্বারা লভ্য বস্তু (কর্ম্ম)। সুতরাং এই স্পষ্ট ভেদ নির্দ্দেশ থাকায় ঐ পুরুষকে জীব বলা যায় না।

আর,

শব্দ-বিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

অন্যশ্রুতিতেও এই ভাবের কথা প্রসঙ্গে জীববোধক শব্দ ও মনোময় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পুরুষ-বোধক শব্দের বিশেষ, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ থাকায় [শব্দবিশেষাৎ] এস্থলে জীব উপাস্য নয়, ইহা নিশ্চয় হয়।

এখানে যেরূপ মনোময় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পুরুষের কথা আছে, অন্যশ্রুতিতেও সেইরূপ আছে। কিন্তু সেস্থলে পৃথক্ পৃথক শব্দ দ্বারা জীব ও ঐ পুরুষকে স্পষ্টভাবেই পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে এস্থলেও মনোময় পুরুষ জীব নয়—ইহা স্থির করা যায়।

স্মৃতেঃ চ ॥ ৬ ॥

স্মৃতিতেও জীব ও অন্তর্যামী পরমাত্মার ভেদ দেখান হইয়াছে। যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে * "হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্ব-প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করেন। তাহার মায়ায় সর্ব্বজীব যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়" (গীঃ ১৮.৬) ইত্যাদি। অতএব জীব উপাস্য নয়, ব্রহ্মই উপাস্য।

শিষ্য। গুরুদেব! পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটী সূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার

---

* গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দার্শনিকগণ বলেন।

একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সূত্র কয়টার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম নয়, তাঁহা হইতে ভিন্ন। কিন্তু আপনি ত অন্যান্যস্থলে 'জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়'—এই কথাই বলিয়াছেন। আবার, "ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্রষ্টা শ্রোতা কেহই নাই" (বৃঃ ৩.৭.২৩)—ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই। গীতাতেও, "জীবও আমি" (গীঃ ১৩.২), এইরূপ জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং আপনার এই বিরুদ্ধ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বৎস! শোন। পরমাত্মা ভিন্ন যে অন্য আত্মা নাই—ইহাই পরমার্থ সত্য। তথাপি সেই পরমাত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধি-সংযোগে অজ্ঞানীর নিকট জীবাত্মারূপে একটা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তাদি শাস্ত্রও অজ্ঞানীর জন্যই। তাহাকে প্রকৃত সত্য বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রের উদ্ভব। সুতরাং যাহাতে সে বুঝিতে পারে, সেই পথ অবলম্বন করাই শাস্ত্রের আবশ্যক। অজ্ঞানী জীব উপাধিশূন্য অদ্বয় ব্রহ্মের ধারণাই করিতে পারে না। তাহাকে উপাধি ও দ্বৈতের ভিতর দিয়াই নিরুপাধি ও অদ্বৈতে লইয়া যাইতে হইবে। আর, কোন কথা বলিতে হইলেই দ্বৈত ছাড়া গত্যন্তর নাই। অদ্বৈত পরমাত্মা সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন কথা বলাই চলে না। (এ বিষয় ক্রমে বুঝিতে পারিবে)। কাজেই, জীব ও পরমাত্মার ভেদ কল্পিত ও মিথ্যা হইলেও, শাস্ত্র আপাততঃ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য, না হইলে কোন কথা বলাই চলে না। সুতরাং যতদিন না জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হয়, ততদিন কল্পিত ভেদও মানিতেই হইবে। অভেদজ্ঞান হইলে শাস্ত্রেরও কোন

প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা থাকে না। অতএব ঐ চারিটী সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখান হইলেও, তাহা দোষের নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, আর একটী কথা। ঐ শ্রুতিতেই আছে, ঐ মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন, এবং ধান্য বা যব হইতেও ক্ষুদ্র। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, মহান্, বিরাট পুরুষ। তাঁহাকে কিরূপে অত ছোট এবং অতটুকু স্থানে আবদ্ধ বলা যায়? অতএব

অর্ভক-ওকস্ত্বাৎ, তৎ-ব্যপদেশাৎ চ ন ইতি চেৎ ?—

ঐ পুরুষের হৃদয়পদ্মরূপ অতি ক্ষুদ্র নিবাস স্থলের কথা বলা হইয়াছে, এই জন্য [অর্ভকৌকস্ত্বাৎ] [অর্ভক = ক্ষুদ্র, ছোট ; ওকঃ = বাসস্থান] এবং ধান্যাদি হইতে অণু, ক্ষুদ্র রূপে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইজন্য [তদ্ব্যপদেশাৎ]—মনোময়ত্বাদিগুণ বিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম হইতে পারে না [ন]—ইহা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

গুরু। ন, নিচায্যত্বাৎ এবম্ ; ব্যোমবৎচ ॥৭॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন], কারণ পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য, অর্থাৎ হৃদ্‌পদ্মে উপলব্ধি করিবার জন্য [নিচায্যত্বাৎ] ওরূপ [এবম্] বলা হইয়াছে ; আর [চ] ইহা আকাশের মত [ব্যোমবৎ]।

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, মহান্, বিরাট—ইহা সত্য। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সেইজন্য হৃদ্‌পদ্মেও অবশ্যই আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম হৃদ্‌পদ্মে আছেন বলিলে কি দোষ হইতে পারে? বিরাট সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের ধারণা করা যায় না বলিয়াই হৃদ্‌পদ্মে তাঁহাকে সূক্ষ্মরূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা

ঐ শ্রুতিতে করা হইয়াছে। যেমন শালগ্রামে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ বিষ্ণুর পূজা। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও অতিবৃহৎ হইলেও সূচীর ছিদ্রে আকাশ আছে—একথা বলায় কোন দোষ হয় না, সেই-রূপ সর্ব্বব্যাপী বিরাট ব্রহ্মের ক্ষুদ্র হৃদ্‌পদ্মে অবস্থানের কথা বলায়ও কোন দোষ হইতে পারে না। তবে ঐরূপ বলার উদ্দেশ্য উপাসনার সুবিধা—এইমাত্র।

শিষ্য। আকাশের ন্যায় ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আছেন, এবং তিনি চৈতন্য-রূপে সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। অতএব তিনি ও জীব একই, অর্থাৎ ব্রহ্ম জীবের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। আর, শ্রুতিও পরমাত্মা ভিন্ন অন্য জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কাজেই বলিতে হয় যে, জীবের যেমন সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ব্রহ্মেরও সেইরূপ ভোগ করিতে হয়। অতএব আকাশের মত ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলিলে, ব্রহ্মেরও জীবের ন্যায়

সম্ভোগ-প্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ ?—

সুখদুঃখ ভোগ হয় [সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ], একথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি ?

গুরু। **ন, বৈশেষ্যাৎ ॥৮॥**

না, তাহা বলিতে পার না [ন], যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের বৈশেষ্য, পরস্পর পার্থক্য আছে [বৈশেষ্যাৎ]। জীব কর্ত্তা, ভোক্তা; সে পাপ পুণ্য অর্জ্জন করে এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে। আর, ব্রহ্ম তাহার বিপরীত—নিষ্পাপ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। তাঁহার আবার সুখই বা কি, দুঃখই বা কি ? ব্রহ্মের ঈদৃশ বিশেষত্ব আছে বলিয়া জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও তাঁহার সুখদুঃখভোগ হয় না। একটী পদার্থের

সহিত অন্য একটী পদার্থের খুব নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, একটার দোষ-গুণ সমস্তই অপরটীতেও প্রকাশ পাইবেই, এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। জলন্ত অগ্নির সহিত আকাশের (space) খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আকাশে অবস্থিত হইয়াই অগ্নি জ্বলে। কিন্তু তা' বলিয়া অগ্নি জ্বলে, অতএব আকাশও জ্বলে—একথা ত বলা চলে না। বাস্তবিক দেখিতে হইবে প্রত্যেকটী পদার্থের স্বাভাবিক নিজ নিজ গুণ (property) কি। প্রকৃতিগত গুণ না দেখিয়া, শুধু নিকট সম্বন্ধ দেখিয়াই একটীর কার্য্য অপরটীতে আরোপ করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম জীবহৃদয়ে চৈতন্যরূপে আছেন বলিয়াই যে, তাহাকেও জীবের সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। আর, ব্রহ্ম ছাড়া জীবাত্মা বলিয়া পৃথক কোন কিছু নাই, একথা শিখিলে কোথা হইতে?

শিষ্য। কেন, শ্রুতিই ত বলেন, "তত্ত্বমসি," তুমিই সেই; "অহং ব্রহ্মাস্মি", আমিই ব্রহ্ম; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," এই সমস্ত তাবৎই ব্রহ্ম; "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," দুই বলিয়া কিছু নাই; "নান্যোতোঽস্তি দ্রষ্টা", ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় দ্রষ্টা নাই, ইত্যাদি।

গুরু। তাহা হইলে শ্রুতির বাক্যে নির্ভর করিয়াই বলিতে চাও যে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন আত্মা নাই? কেমন? আচ্ছা, জীবের যে সুখ দুঃখ হয়, ইহা জানিলে কিরূপে?

শিষ্য। কেন, ইহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই।

গুরু। কেন, শ্রুতি জীবের সুখদুঃখ হয়, একথা বলেন না?

শিষ্য। তাহা বলিবেন কিরূপে? ব্রহ্ম ছাড়া যখন জীবের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তখন আবার তাহার সুখ দুঃখের কথা কি বলিবেন?

গুরু। বেশ। কিন্তু তোমার কথায় একটী গল্প মনে পড়িল।

একজনের একটা মুরগী ছিল। সে একদিন মুরগীটার মাথার দিকটা কাটিয়া রান্না করিয়া খাইল। মনে করিল, পিছনের দিকটা থাক্, ডিম হইবে। তোমারও দেখিতেছি তাহার মত আবস্থা।

শিষ্য। সে কিরূপ?

গুরু। কিরূপ কি? তুমি বলিলে, শ্রুতিই বলেন, ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ নাই; কাজেই জীবের সুখ দুঃখ আছে, কি নাই, তাহা বলিবারও শ্রুতির কোন প্রয়োজন নাই। তাহাই যদি হইল, তবে জীবের সুখ দুঃখে ব্রহ্মেরও সুখ দুঃখ হয়—এটা কিরূপ কথা হইল? ফল কথা, যদি শ্রুতির উপরই নির্ভর কর, তবে বলিতে হইবে, জীব নাই, সুখ দুঃখও নাই। কাজেই জীবের সুখ দুঃখে ব্রহ্মের সুখ দুঃখ হয়, কি না, এ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বন্ধ্যার আবার পুত্রশোক কি? আর যদি জীবের সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষই দেখিতেছ—এ কথা বল, তবে প্রত্যক্ষ ইহাও জানিতেছ যে, জীব ব্রহ্ম নয়। অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় সুখ দুঃখ কিছুই নাই, সুতরাং ব্রহ্ম জীবের সুখ দুঃখের ভাগী হন, কি না—একথা তখন উঠিতেই পারে না। আর, অজ্ঞানের অবস্থায়, অর্থাৎ সংসার দশায়, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র এক আত্মা—ইহা অজ্ঞানী মাত্রেরই প্রত্যক্ষ। সে অবস্থায়ও যে ব্রহ্মের সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে না, তাহা প্রথমেই দেখাইয়াছি। অজ্ঞ লোকে আকাশকে নীল বলে বলিয়া ত আর আকাশ সত্য সত্যই নীল হইয়া যায় না।

বৎস। এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিও। কারণ, আজকাল অনেকেই এই মুরগীওয়ালার ভাবে ভাবিত হইয়া অদ্বৈতবাদের প্রতি কটাক্ষ করেন। অনেককেই বলিতে শুনি, 'আমি বুঝি বা না বুঝি তোমার শাস্ত্র যখন বলেন, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আছেন, তখন তাঁহারও সুখ দুঃখ কেন হইবে না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্রই আছেন—

একথা তুমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বল, না শাস্ত্রে বলে বলিয়া মানিয়া লও ? যদি অনুভব করিয়া বল, তবে অবশ্যই ইহাও অনুভব করিবে যে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, কারণ আর কিছু যদি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে, তবে সে স্থলে ব্রহ্ম নাই—একথাও বলিতে হইবে, ফলে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র আছেন, একথাও বলিতে পারিবে না। আর যদি নিজে অনুভব না কর যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আছেন, তবে তোমার নিকট জীবই আছে (ব্রহ্ম বলিয়া কিছু নাই), সুখ দুঃখও আছে। ব্রহ্ম যখন তোমার অনুভবে আসে না, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাইও না। আর যদি শাস্ত্র মানিয়া লইয়াই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী—একথা বল, তবে শাস্ত্রে যে বলে ব্রহ্মের সুখ দুঃখ নাই—একথাও মানিয়া লও। মোট কথা জ্ঞান দশায়ই অদ্বৈত, অজ্ঞান দশায় দ্বৈত। কাজেই একটার মাথা অপরটার লেজ জুড়িয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার গড়িয়া তুলিও না। কতক শাস্ত্র, কতক প্রত্যক্ষ অনুভব—এই উভয়ের মিশ্রণে যে সিদ্ধান্ত করিবে তাহা অদ্ভুতই হইবে।

শিষ্য। কঠ উপনিষদে আছে, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যাঁহার ওদন অর্থাৎ অন্ন, ভক্ষ্য সামগ্রী, মৃত্যু যাঁহার উপকরণ (ডাল, তরকারী সদৃশ), তিনি কোথায়, কি ভাবে আছেন—কে জানে"? (কঃ ১.২.২৪)। এই শ্রুতিতে অত্তা অর্থাৎ ভোজনকারী বলিয়া এক জনের উল্লেখ দেখিতে পাই। আর, এই কঠ উপনিষদে অগ্নি, জীব ও ব্রহ্ম—এই তিনটী পদার্থেরই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং অত্তা বলিতে ইহাদের কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। অত্তা, চরাচর-গ্রহণাৎ ॥৯॥

উক্ত অত্তা [অত্তা] ব্রহ্ম; যেহেতু, ঐ স্থলে চরাচর, স্থাবর জঙ্গম ঐ অত্তার অন্নরূপে প্রতীত হয় [চরাচর-গ্রহণাৎ]।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অত্তা পরমাত্মা ব্যতীত আর কে হইতে পারে? অত্তা শব্দের এস্থলে বাস্তবিক সাধারণ ভোজনকারী অর্থ নয়। ব্রাহ্মণাদিকে কেহ খাইয়া ফেলে, ইহা অতি হাস্যকর কথা। অত্তা শব্দে এস্থলে, যে আত্মসাৎ করে, তাহাকেই বুঝায়। পরমাত্মাই সমস্ত চরাচর জগৎকে আপনাতে সংহৃত করেন, গুটাইয়া লন, লীন করেন বলিয়া বলা যায় যে, তিনি সব ভক্ষণ করেন, উদরসাৎ করেন। অতএব অত্তা এস্থলে ব্রহ্মই।

শিষ্য। শ্রুতিতে ত চরাচর শব্দ নাই, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুইটী কথা আছে। তবে সমস্ত জগৎ তাঁহার ভক্ষ্য—একথা পাইলেন কোথায়?

গুরু। ঐ যে মৃত্যুকে উপকরণ বলা হইয়াছে, ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, যাবৎ নশ্বর পদার্থই তাঁহার ভক্ষ্য? তবে যে শ্রুতিতে শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ—'অন্যান্য ইতর জীবের কথা আর কি বলিব, এমন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাহারাও যাঁহার ভক্ষ্য'—এই ভাবটী বুঝান।

শিষ্য। কিন্তু ব্রহ্মকে অত্তা, কি—না, ভোক্তা বলি কিরূপে? শ্রুতিই ত বলেন, "ব্রহ্ম কিছুই ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষীরূপে সব দেখেন।"

গুরু। হ্যাঁ, তাহা ঠিক বটে। তবে ওস্থলে অদন অর্থ যে খাওয়া বা ভোগ করা নয়, তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অদন অর্থ সংহরণ,

লয় করা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? আর ব্রহ্মই যে, সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ, ইহা ত সমস্ত শ্রুতিরই অভিমত।

প্রকরণাৎ চ ॥ ১০ ॥

আরও [চ] যে স্থলে অত্তার কথা আছে, তাহা ব্রহ্ম প্রসঙ্গেই, অতএব [প্রকরণাৎ] ব্রহ্মই অত্তা। যদিও কঠোপনিষদে অগ্নি, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি আমাদের আলোচ্য স্থলটি ব্রহ্মবিষয়েই। "অত্তের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই" (কঃ ১. ২. ১৪) এইরূপেই আলোচ্য প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মই অত্তা।

শিষ্য। কঠোপনিষদের এক স্থলে আছে, "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বিশিষ্ট কর্মীরা বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলে লব্ধ এই শরীরে পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হৃদয় আছে। তাহাতে একটি গুহা, ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রে দুইজন কর্ম্মফল ভোক্তা প্রবিষ্ট আছেন। তাঁহারা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন" (কঃ ১. ৩. ১)। ঐ দুজন কে ?

গুরু। গুহাং প্রবিষ্টৌ, আত্মানৌ হি তৌ—

হৃদয়ের ছিদ্রে [গুহাম্] প্রবিষ্ট যে দুইজন [প্রবিষ্টৌ], তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; যেহেতু [হি], তাহারা দুইজনেই [তৌ] আত্মা—একজন জীবাত্মা আর একজন পরমাত্মা [আত্মানৌ]।

এক সঙ্গে একই অবস্থাপন্ন দুই বা ততোধিক পদার্থের যদি উল্লেখ থাকে, তবে প্রায় সর্ব্বত্রই তাহারা সমান স্বভাবের ও একজাতীয় পদার্থই হইয়া থাকে ; যেমন : 'এই গাভীর দ্বিতীয়টি অন্বেষণ কর'—এই

কথা বলিলে অন্য একটী গাভীরই অন্বেষণ করা হয়, কোন অশ্ব বা মনুষ্যের অন্বেষণ করা হয় না। উক্ত শ্রুতিতে কর্ম্মফল ভোগ দেখিয়া একজন যে জীবাত্মা, তাহা নিশ্চয় হয়। তৎসঙ্গে উক্ত অপরটি কে, ইহা অনুসন্ধানকালে সেটীও জীবাত্মার সজাতীয় কেহ হইবেন, ইহা স্থির করা যায়। আর জীবাত্মার সজাতীয় পরমাত্মা— উভয়েই আত্মা, সচেতন চৈতন্যস্বরূপ। অতএব শ্রুতিতে গুহায় প্রবিষ্ট যে দুই জনের উল্লেখ আছে, তাহার একজন জীবাত্মা ও অপর জন পরমাত্মা।

শিষ্য। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা ক্ষুদ্র হৃদয় গুহায় প্রবিষ্ট আছেন —এ কিরূপ কথা হইল ?

গুরু। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, উপলব্ধির সুবিধার জন্য ওরূপ ক্ষুদ্র স্থানের কল্পনায় কোন দোষ হয় না! আর শ্রুতি স্মৃতির বহুস্থলেই—

তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

তাহা, অর্থাৎ হৃদয়গুহায় ব্রহ্মের অবস্থান [তৎ] উল্লিখিত দেখা যায়, এই জন্য [দর্শনাৎ] উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মই হৃদয়গুহায় অবস্থিত আছেন, ইহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই।

শিষ্য। কিন্তু পরমাত্মাও কর্ম্মফল ভোগ করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?

গুরু। মনে কর, এক জায়গায় দুই দল লোক গান করিতেছে। একদলে একটি খোল বাজিতেছে, আর একদল এক জোড়া ডুগি-তবলা বাজাইয়া গান করিতেছে। তখন লোকে বলিতে পারে, তবলা-ওয়ালাদের অপেক্ষা খোলওয়ালারা ভাল গায়। এখানে দেখ, খোল যদিও মাত্র একজনের হাতে আছে, তথাপি সেই দলের সকলকেই

খোলওয়ালা বলা হইল। এরূপ কথা সচরাচরই বলা হয়। বস্তুতঃ জীবত্মাই কেবল কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, তথাপি উপচারক্রমে পরমাত্মাও ভোগ করেন—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক পরমাত্মা কিছুই ভোগ করেন না।

অথবা, ঐ কর্ম্মফল ভোগ এই ভাবেও গ্রহণ করিতে পার—জীব ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করান। যে রান্না করায় তাহাকেও পাচক বলায় যেমন দোষ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা ভোগ করাইলেও তাঁহাকে ভোক্তা বলা যায়। এ শুধু ভাষার একটু শিথিলতামাত্র।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল-ভোগ দেখিয়া প্রথমে জীবত্মা ঐ দুইজনের একজন, ইহা স্থির হইলে, অপর জন তাহার সজাতীয় ও সমান স্বভাববিশিষ্ট পরমাত্মাই হইবে, ইহা স্থির করা যায়। কিন্তু ঐ শ্রুতিতেই ত ঐ উভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাবের বলা হইয়াছে।

গুরু। হাঁ, তাহা হইয়াছে সত্য। কারণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিরুদ্ধ স্বভাবেরও বটে। যতক্ষণ তাহারা দুইজন, ততক্ষণ জীবাত্মা সংসারী সুখী দুঃখী, আর পরমাত্মা তাহার বিপরীত। অবিদ্যা অবস্থাতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন, দুই; এবং সেই অবস্থায় তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবেরও বটে। সেই জন্যই শ্রুতি আলোক ও অন্ধকারের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদশায় উভয়ের স্বরূপ একই। তখন আর দুইজন থাকে না। যে জীবাত্মা, সেই পরমাত্মা। এই রহস্যটী বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি একবার বলিতেছেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই স্বভাববিশিষ্ট, আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ।

আর উক্ত শ্রুতিবাক্য যে প্রকরণে আছে, তাহাতে

বিশেষণাৎ ॥ ১২ ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা বোধক বিশেষণ আছে, এইজন্যও [বিশেষণাচ্চ] স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ দুই জন জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

ঐ শ্রুতির শেষে জীবাত্মাকে রথীরূপে এবং পরমাত্মাকে গন্তব্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বেও 'জীবাত্মা ধ্যানযোগে হৃদয়-গুহায় অবস্থিত পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া সুখ দুঃখের অতীত হয়'—এইরূপ বিশেষ বিশেষ কথা আছে। প্রকরণটিও পরমাত্মা সম্বন্ধেই। আর "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন"—এই যে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞদের উল্লেখ, ইহাও পরমাত্মাপক্ষেই সার্থক। অতএব পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে যখন দেখা যায় যে, বিশেষভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রসঙ্গই ঐ প্রকরণে আছে, তখন আমাদের সন্দিগ্ধস্থলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মাই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৪) একটি আখ্যায়িকা আছে। ভগবান্ জাবালের উপকোসল নামে এক শিষ্য ছিল। এক সময় গুরু শিষ্যের উপর অগ্নি পরিচর্য্যার ভার অর্পণ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন। উপকোসল বার বৎসর যাবৎ একনিষ্ঠ হইয়া অগ্নি-পরিচর্য্যা করিলে অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়া তাহাকে "প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম"—এই বলিয়া ব্রহ্মোপদেশ করেন। এবং বলেন, "এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় তোমার গুরু বলিবেন"। অনন্তর জাবাল ফিরিয়া আসিলে উপকোসলকে এইভাবে শিক্ষা দিলেন, "চক্ষুতে যে পুরুষ দেখা যাইতেছে, ইনি আত্মা। ইনি অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম। চক্ষুগোলকে ঘৃত অথবা জল নিক্ষেপ করিলে, তাহা চোখের পাতায়

গড়াইয়া পড়ে" (ছাঃ ৪.১৫.১)—ইত্যাদি। এই যে চক্ষুর অভ্যন্তরে এক পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, ইনি কি প্রতিবিম্ব (ছায়া, যাহা সম্মুখস্থ ব্যক্তির চোখের ভিতরে তাকাইলে দেখা যায়), না জীব, না চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি, না ব্রহ্ম ?

গুরু। **অন্তরঃ উপপত্তেঃ ॥১৩॥**

ঐ স্থলে যে সমস্ত বিশেষণ পদ আছে, তাহা ব্রহ্মপক্ষেই উপপন্ন, সঙ্গত হয়, এইজন্য [উপপত্তেঃ] চক্ষুর অভ্যন্তরে অবস্থিত উক্ত পুরুষ [অন্তরঃ] ব্রহ্ম।

ঐ শ্রুতিতে যে সমস্ত বিশেষণ পদ আছে, তাহা ঐ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিলেই সঙ্গত হয়। (১) 'আত্মা' শব্দের মুখ্য অর্থ ব্রহ্ম। (২) 'অমৃত', 'অভয়'—এই দুইটি শব্দও ব্রহ্মজ্ঞাপক। (৩) তারপর, চক্ষুগোলকে ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিলে তাহা পাতায় (ভোয়াতে) সরিয়া যায়—একথার তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুস্থ পুরুষে কোন মালিন্য স্পর্শে করে না। ব্রহ্মই নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, নির্লেপ। এইরূপ আরও অনেক শব্দ ওস্থলে আছে, যাহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব ঐ চক্ষুস্থ পুরুষ ব্রহ্ম।

শিষ্য। কিন্তু সর্ব্বগত ব্রহ্মের ক্ষুদ্র চক্ষুগোলকে অবস্থান সঙ্গত হয় কি প্রকারে ?

গুরু। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, উপাসনার সুবিধার জন্য ওরূপ ক্ষুদ্র স্থানের নির্দ্দেশ দোষের হয় না।

স্থানাদিব্যপদেশাৎ চ ॥১৪॥

বিশিষ্ট বাসস্থান প্রভৃতির নির্দ্দেশ আছে বলিয়াও [স্থানাদি-ব্যপদেশাচ্চ] ঐ পুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। কেবল যে চক্ষুগোলকই

ব্রহ্মের একমাত্র অবস্থানক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এমন ত নয়। "যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া—" ইত্যাদি বাক্যে আরও অনেক স্থানেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেবল যে অনুচিত স্থাননির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা নয়; অশব্দ, অরূপ ব্রহ্মের নাম এবং রূপের নির্দ্দেশও বহুস্থলে দেখিতে পাই। ইহার উদ্দেশ্য এই মাত্র যে, নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানাদি হইতে পারে না, কাজেই তাঁহাকে নাম, রূপ, স্থানাদি দ্বারা সগুণ কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধান করা।

সুখবিশিষ্ট-অভিধানাৎ এব চ ॥১৫॥

আর [এব চ] প্রকরণের প্রারম্ভে প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্যে যে সুখরূপী [সুখবিশিষ্ট] ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, এখানেও তাঁহারই উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া [অভিধানাৎ], চক্ষুস্থ পুরুষকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। প্রথমে অগ্নিদেবতা উপকোসলকে "ব্রহ্ম সুখ" ইত্যাদি রূপে ব্রহ্মের উপদেশ করেন, এবং তিনিই গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্ম কিরূপে পাইতে হইবে, তাহা জানিয়া লইতে বলেন। আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে সেই প্রসঙ্গেরই বিচার হইতেছে। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্রহ্মই যে এস্থলেও আলোচ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? উপকোসল গুরুর নিকট জানিতে চাহিল, ব্রহ্ম কি; আর গুরু চক্ষুস্থ পুরুষের উপদেশ করিলেন। সুতরাং সেই চক্ষুস্থ পুরুষ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না।

শ্রুত-উপনিষৎ ক-গতি-অভিধানাৎ চ ॥১৬॥

আর [চ], উপনিষৎরহস্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির [শ্রুতোপনিষৎক-] যে গতি, অর্থাৎ দেবযান পথে গমন, চক্ষুস্থ পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহারও

সেই দেবযান পথেই গতি [গতি-] হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, এইজন্য [অভিধানাৎ] চক্ষুস্থ পুরুষকেও ব্রহ্মই বলিতে হইবে।

অন্যান্য শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মৃত্যুর পরে দেবযান (ব্রঃ সূঃ ৪. ৩. ১-৬ দ্রষ্টব্য) পথে গমন করেন—এরূপ উক্তি আছে। এস্থলেও বলা হইয়াছে যে, চক্ষুস্থ পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি দেবযান পথে গমন করেন এবং অন্যান্য শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ দেবযান পথে যাইতে পারে না। সুতরাং ঐ চক্ষুস্থ পুরুষ ব্রহ্মই।

শিষ্য। কিন্তু "চোখের মধ্যে দেখা যায়"—শ্রুতির এই কথায় ত মনে হয়, উক্ত পুরুষ সম্মুখস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিবিম্ব, ছায়া। কিম্বা জীব যখন চক্ষু দ্বারা কিছু দেখে, তখন বলা যায় যে, সে চক্ষুতে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং ঐ পুরুষকে জীবও বলা যাইতে পারে। অথবা চক্ষুর অনুগ্রাহক, সাহায্যকারী সূর্য্য কিম্বা অগ্নি প্রভৃতিকেও ঐ পুরুষ বলিতে পারি; কারণ, সূর্য্যাদির আলোকের সাহায্য ব্যতীত শুধু চক্ষু দ্বারা ত আর কিছু দেখা যায় না।

গুরু। **অনবস্থিতেঃ, অসম্ভবাৎ চ, ন ইতরঃ ॥১৭॥**

ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ—প্রতিবিম্ব, কিম্বা জীবাত্মা, কিম্বা সূর্য্যাদি [ইতরঃ] ঐ পুরুষ হইতে পারে না [ন]; যেহেতু উহাদের কেহই সর্ব্বদা চক্ষুতে অবস্থান করে না [অনবস্থিতেঃ], এবং [চ] অমৃতত্বাদি গুণও উহাদের সম্ভব হয় না [অসম্ভবাৎ]।

যখন কেহ চক্ষুর সম্মুখে অবস্থান করে, তখনই তাহার ছায়া চক্ষুতে প্রতিফলিত দেখা যায়, সরিয়া গেলে আর সে প্রতিবিম্ব থাকে না। আর নিজের চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষের উপাসনাই ঐস্থানে বিহিত

হইয়াছে। উপাসনার সময় চক্ষুর সম্মুখে একজনকে স্থাপন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, এ বড় অদ্ভুত কল্পনা। বস্তুতঃ যাহার চক্ষুতে প্রতিবিম্ব পড়ে, সে তাহা দেখিতেই পায় না। জীবাত্মাও সব সময়ে চক্ষুতে থাকে—একথা বলা চলে না। সূর্য্যাদিরও সেই অবস্থা। অমৃতত্বাদি গুণ ইহাদের কাহারও থাকা সম্ভব নয়। সূর্য্যাদি দেবতার অমরত্বও আপেক্ষিক মাত্র। বহুকাল থাকে বলিয়াই দেবতাদিগকে অমর বলা হয়। তাহাদেরও জন্মমৃত্যু আছে—ইহা শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। অতএব ঐ পুরুষ ব্রহ্মই।

জাবালের এইরূপে ব্রহ্মোপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে **মূলকারণ** হইতে শক্তি লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হয়, সেই মূল কারণই ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়-শক্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করিলেও ব্রহ্ম কি, তাহা জানা যায়। এইরূপ যে কোন পদার্থ অবলম্বনে মূলানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্মে পৌছান যায়। এইরূপ অনুসন্ধানই প্রকৃত ধ্যান বা উপাসনা।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থলে, "যিনি ইহলোক, পরলোক ও সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন" (বৃ ৪. ৭. ১)—এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে "যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী, অমৃত" (বৃঃ ৪.৭.১,২) ইত্যাদি —এইরূপ বর্ণনা আছে। এইরূপ যিনি সকল দেবতায়, সকল লোকে, সকল বেদে, সকল যজ্ঞে, সকল ভূতে, সকল আত্মায় থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন ইত্যাদি বাক্যে অধিদৈব, অধিলোক,

অধিদেব, অধিযজ্ঞ, অধিভূত, অধ্যাত্মক্রমে এক অন্তর্যামী নিয়ন্তার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই অন্তর্যামী[1] কে?

গুরু। অন্তর্যামী অধিদৈবাদিষু তৎ-ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ ॥১৮॥

সমস্ত দেবতায়, সমস্ত লোকে ইত্যাদি দেবাদি সম্বন্ধে [অধিদৈবাদিষু] উক্ত যে অন্তর্যামী [অন্তর্যামী], তিনি ব্রহ্ম ; যেহেতু, সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মই অন্তর্যামী পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে [তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ]।

ব্রহ্মের যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম্ম বা লক্ষণ—যথা, সর্ব্বান্তর্যামিত্ব, অমরত্ব, আত্মত্ব ইত্যাদি—সেই সমস্তই ঐ অন্তর্যামী পুরুষেরও ধর্ম্ম বলিয়া আলোচ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব ঐ অন্তর্যামী—ব্রহ্ম।

শিষ্য। ব্রহ্মের ত শরীরও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, তবে তিনি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন করেন কিরূপে?

গুরু। দেখ, চৈতন্যরূপী ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই জড়পদার্থে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সেই ক্রিয়ার নামই নিয়মন বা পরিচালন। সুতরাং নিয়মন ব্যাপারে ব্রহ্মের শরীর বা ইন্দ্রিয়ের কি প্রয়োজন আছে?

শিষ্য। আচ্ছা, সাংখ্যস্মৃতিকল্পিত প্রধানকে যখন সাংখ্য-মতাবলম্বীরা সর্ব্ববস্তুর কারণ বলেন, তখন তাহাকেও ত নিয়ন্তা বলা যায় ; কারণের সত্তায়ই কার্য্যের সত্তা। বিশেষতঃ অন্তর্যামীকে অ-দ্রষ্টা (যিনি কিছু দেখেন না), অ-শ্রোতা (যিনি কিছু শোনেন না) ইত্যাদিরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়হীনরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। অচেতন প্রধানও ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত। সুতরাং অন্তর্যামীকে প্রধান বলিলে দোষ কি?

---

(১) বাঙ্গলায় 'অন্তর্যামী' শব্দের প্রচলিত অর্থ 'যিনি মনের কথা জানেন', কিন্তু এস্থলে ইহার অর্থ—'যিনি অন্তরে থাকিয়া চালিত করেন'।

গুরু। ন চ স্মার্ত্তম্, অ-তৎ-ধর্ম্ম-অভিলাপাৎ ॥১৯॥

সাংখ্যস্মৃতিকল্পিত প্রধানও [স্মার্ত্তম্ চ] অন্তর্যামী হইতে পারে না [ন]; যেহেতু, এস্থলে প্রধান-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে [অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ]।

প্রধান অন্তর্যামী হইতে পারে না। অদ্রষ্টা, অশ্রোতা ইত্যাদি ধর্ম্ম প্রধানে সম্ভব হইলেও, তাহাতে সম্ভব হয় না এমন ধর্ম্মেরও এস্থলে উল্লেখ আছে; যেমন আত্মা, দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি। অন্তর্যামীকে যেমন অ-দ্রষ্টা ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তেমন তাঁহাকে আত্মা, দ্রষ্টা ইত্যাদিও বলা হইয়াছে। প্রধানকে যখন সাংখ্যকার অচেতন বলেন, তখন সে দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্মা হইবে কিরূপে?

শিষ্য। তাহা হইলে জীবকেই কেন অন্তর্যামী বলি না? সেও ত আত্মা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা ইত্যাদি।

গুরু। শারীরঃ চ ন, উভয়ে অপি হি ভেদেন এনম্ অধীয়তে ॥২০॥

জীবও [শারীরশ্চ] অন্তর্যামী হইতে পারে না [ন]; কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামক উভয় শাখাই [উভয়েঽপিহি] জীবকে [এনম্] অন্তর্যামী হইতে পৃথক্‌রূপে [ভেদেন] বর্ণনা করিয়াছেন [অধীয়তে]।

জীবও অন্তর্যামী হইতে পারে না। কারণ, কাণ্ব শাখায় আছে, "যিনি **বিজ্ঞানে** থাকিয়া" ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৭.২২)। আর, মাধ্যন্দিন শাখায় আছে, "যিনি **আত্মায়** থাকিয়া" ইত্যাদি। ঐ উভয় স্থলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'যিনি' বলিতে অন্তর্যামী, এবং 'বিজ্ঞান'

ও 'আত্মা' বলিতে জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত অন্তর্যামী নয়—ইহা নিশ্চয়।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতি বলিতেছেন, 'ব্রহ্ম অন্তর্যামীরূপে জীবাত্মায় থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন'। কিন্তু একই শরীরে অন্তর্যামী ব্রহ্ম ও তাঁহার পরিচালিত জীব—এই দুই জন দ্রষ্টা কিরূপে থাকিতে পারে? শ্রুতিই ত ব্রহ্ম ব্যতীত অপর দ্রষ্টার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অথচ এস্থলে অন্তর্যামী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এক জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই কথাই ত আপনি বলিলেন।

গুরু। দেখ, এইটি জীব, এইটি অন্তর্যামী—এই যে ভেদ, এই যে পার্থক্য, ইহা বাস্তব নয়। অজ্ঞানকল্পিত উপাধিই এই ভেদের কারণ। একই আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি সংযোগে ঘটাকাশ, মহাকাশ, ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা উপাধি সম্পর্কে জীবাত্মা—দ্রষ্টা, শ্রোতা, ইত্যাদি; আর উপাধিশূন্য অবস্থায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপে উক্ত হন। তখন তিনি বাস্তবিক অদ্রষ্টা, অশ্রোতা ইত্যাদি। সুতরাং ভেদ বাস্তব নয়, কেবল উপাধিকল্পিত; এবং এই কল্পিত মিথ্যা ভেদ আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। না হইলে, জ্ঞান লাভ হইলে কোন ভেদই থাকে না, ফলে কোন ব্যবহারও সম্ভব হয় না, শাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

আলোচ্য শ্রুতিতে একই অন্তর্যামী পুরুষকে অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, আবার দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তির একমাত্র সামঞ্জস্য এই যে, ব্রহ্ম উপাধি সম্পর্কে দ্রষ্টা, শ্রোতা—সগুণ; আর উপাধিরহিতভাবে অ-দ্রষ্টা, অ-শ্রোতা—নির্গুণ।

শিষ্য। মুণ্ডকোপনিষদের একস্থলে (মুঃ ১. ১.৩-৯) শৌনক আঙ্গিরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এমন একটি বস্তু কি আছে, যাহা জানিলে সবই জানা হইয়া যায়?" আঙ্গিরস উত্তর করিলেন, "দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে। একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপরাবিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বলেন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদাদি যাবতীয় কর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র অপরাবিদ্যা (নিকৃষ্ট বিদ্যা), আর পরাবিদ্যা (শ্রেষ্ঠবিদ্যা) তাহাই, যাহাদ্বারা সেই **অক্ষরকে** (যাঁহার ক্ষরণ অর্থাৎ বিনাশ বা হ্রাস নাই) জানা যায়, যিনি অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর), অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), যাঁহার কোন আদি পুরুষ নাই, যাঁহার ব্রাহ্মণাদি কোন জাতিত্ব নাই, যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই, যিনি নিত্য,প্রভু,সর্ব্বব্যাপী, অতি সূক্ষ্ম, অব্যয়,**ভূতযোনি**—সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কারণ; ধীর ব্যক্তিরাই তাঁহাকে জানেন" ইত্যাদি (মুঃ ১.১.৫—৬)। এস্থলে ঐ অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ভূতযোনি কে?

গুরু। অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ, ধর্ম্মোক্তেঃ ॥২১॥

অদৃশ্যত্ব, অগ্রাহ্যত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ভূতযোনি [অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ] ব্রহ্ম; যেহেতু, ব্রহ্মের ধর্ম্মই এস্থলে ঐ ভূতযোনি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে [ধর্ম্মোক্তেঃ]।

ঐ ভূতযোনিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে?

শিষ্য। কিন্তু উক্ত অদৃশ্যত্বাদি গুণগুলি ত সাংখ্যকল্পিত প্রধানেরও হইতে পারে?

গুরু। কিন্তু অচেতন প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় কি প্রকারে?

শিষ্য। না, তাহা বলা যায় না সত্য। কিন্তু এস্থলে ভূতযোনি ও অক্ষর শব্দে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই অক্ষরকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হয় নাই। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (পরমাত্মা অক্ষরেরও অতীত, মুঃ ২. ১. ২.)-এই বাক্যে অক্ষরের অতীত বস্তুকেই সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। আবার শ্রুতিতে, "যেমন মাকড়সার শরীর হইতে সূত্র নির্গত হয়, মাটি হইতে ঘাস জন্মে, শরীরে কেশ লোম গজায়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়" (মুঃ ১. ১. ৭)—ইত্যাদি দৃষ্টান্তে অচেতনকেই উৎপত্তির কারণরূপে দেখান হইয়াছে। পক্ষান্তরে যদি যোনিশব্দের 'কারণ' অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে জীবকেও ভূতযোনি বলা যায়, কারণ জীবের পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মই ভূতোৎপত্তির 'কারণ'। অতএব অদৃশ্যত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট ভূতযোনি, হয় প্রধান, না হয় জীব।

গুরু। বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ ন ইতরৌ ॥২২॥

প্রধান বা জীবও [ইতরৌ চ] ভূতযোনি হইতে পারে না [ন] ; যেহেতু, ঐ শ্রুতিতে ভূতযোনির এমন সব বিশেষণ রহিয়াছে, যাহা জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না, এবং প্রধান হইতে ভূতযোনিকে পৃথক্ করিয়াও দেখান হইয়াছে [বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাম্]।

ভূতযোনি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তিনি দিব্য অমূর্ত্ত-পুরুষ, বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, জন্মরহিত, প্রাণরহিত, মনরহিত, শুদ্ধ" ইত্যাদি (মুঃ ২. ১. ২)। শরীরাদিতে আত্মাভিমান বিশিষ্ট জীবের কখনও এই সব লক্ষণ হইতে পারে না।

আর "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"—এই বাক্যে যে অক্ষরাতীত পরপুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি এবং আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে বর্ণিত ভূতযোনি একই ; কারণ, ঐ প্রকরণে পরাবিদ্যার

বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং সেই বিদ্যার জ্ঞেয় ভূতযোনি, তাহাকেই "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" বলা হইয়াছে। তবে বলিতে পার যে, ভূতযোনিকেও ত 'অক্ষর' বলা হইয়াছে, সুতরাং সেই ভূতযোনি আবার অক্ষরের অতীত হইবে কিরূপে? হাঁ, তাহা বলা হইয়াছে সত্য। কিন্তু ভূতযোনি সম্বন্ধে যে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ 'ক্ষরণরহিত' অর্থাৎ অবিনাশী, এইমাত্র। আর, সেই ভূতযোনিকেই যখন অক্ষরাতীত রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন সেই অক্ষর বলিতে '**সমস্ত ভূতের আদি সূক্ষ্মাবস্থা, নাম ও রূপের বীজশক্তি, পরমেশ্বরের অধীন মায়া বা অব্যাকৃতকেই** লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রুতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় যে, প্রথমোক্ত পরাবিদ্যার জ্ঞাতব্য অদৃশ্যত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট ভূতযোনি যিনি, অক্ষরাতীত পুরুষও তিনিই। সুতরাং ভূত-যোনিকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হয় নাই—একথা বলিতে পার না।

জীব যে আলোচ্য শ্রুতির বর্ণিত ভূতযোনি হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর সমস্ত ভূতের আদি পরম সূক্ষ্মাবস্থা, নাম ও রূপের বীজশক্তিকে যদি 'প্রধান' নামে আখ্যাত করিতে চাও, তবে সেই প্রধান হইতে আলোচ্য ভূতযোনি যে পৃথক্, স্বতন্ত্র, তাহা "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ," এই বাক্যে স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং প্রধানও ভূতযোনি নয়।

মনে রাখিও, নামরূপের বীজশক্তিকে 'প্রধান' বলিলেই যে সে সাংখ্যকল্পিত প্রধান, তাহা নয়। সাংখ্যের প্রধান হইতে এই আদি বীজ শক্তি একান্তই ভিন্ন। শ্রুতিতে 'অক্ষর' বলিতে যে বীজশক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পরমেশ্বরের একান্তই অধীন, সাংখ্যকল্পিত

প্রধানের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন বস্তু বা সত্তা নয়। প্রধান যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই (ঈক্ষতের্না শব্দম্ ইত্যাদি সূত্রে) দেখান হইয়াছে। যুক্তিদ্বারাও যে প্রধান বলিয়া কিছু স্বীকার করা যায় না, তাহা পরে দেখান হইবে।

আর যে অচেতন দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছ, তদুত্তরে বলি, যাহার সহিত উপমা করা হয়, এবং যাহাকে উপমিত করা হয়, তাহা—এই দুইটি সর্ব্বাংশে সমান হইবে, এমন কি নিয়ম আছে? প্রত্যুত উভয়েই যদি একরূপ হয়, তবে ত তাহাদের উপমাই হইতে পারে না। দৃষ্টান্তোক্ত মৃত্তিকা প্রভৃতি অচেতন, অতএব ভূতযোনিও অচেতন—এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। তাহা হইলে মৃত্তিকাদি যখন স্থূল দৃশ্যবস্তু, ভূতযোনিও স্থূল দৃশ্যবস্তু—একথাও তুমি বলিতে বাধ্য, কিন্তু তাহা ত বল না। অতএব অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট ভূতযোনি পরমেশ্বর—প্রধানও নয়, জীবও নয়।

রূপ-উপন্যাসাৎ চ ॥ ২৩ ॥

আরও [চ] ঐ ভূতযোনিরই বিশ্বময় রূপের বর্ণনা আছে, এইজন্য [রূপোপন্যাসাৎ] উঁহাকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে।

"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"—ইহার পরে "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি বলিয়া শ্রুতি সেই ভূতযোনির বিশ্বময় রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—"অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সকল তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ,—ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" (মু.২.১.৪)। ঈদৃশ রূপ সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বরেরই সম্ভব

হয়, অল্পশক্তি জীব বা অনাত্মা প্রধানের সম্ভব হয় না। অতএব ভূতযোনি পরমেশ্বরই।

শিষ্য। প্রথমে ভূতযোনিকে অদৃশ্য, চক্ষুকর্ণাদি রহিত রূপে বর্ণনা করিয়া পরে তাহারই আবার উপরি উক্ত রূপ বর্ণনা সঙ্গত হয় কিরূপে?

গুরু। এই যে অগ্নি প্রভৃতিকে তাঁহার অঙ্গরূপে বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায়, বাস্তবিকই পরমেশ্বরের ওরূপ একটা রূপ আছে, ইহা নহে; পরন্তু **তিনি সর্ব্বময়** এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্যই ওরূপ রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। নির্গুণই সগুণরূপে প্রতিভাত হন, অ-রূপই স-রূপ হইয়া প্রতীয়মান হন।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৫.১১.১—৬) একটি আখ্যায়িকা আছে। একসময় প্রাচীনশাল প্রভৃতি পাঁচ জন বেদজ্ঞ গৃহস্থ 'আত্মা কি,' 'ব্রহ্ম কি'—এ সম্বন্ধে বিচার করিতেছিলেন। কোন নিশ্চিত মীমাংসা করিতে না পারিয়া তাঁহারা উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন। তিনিও কোন সমাধান করিতে না পারায় ছয় জনে মিলিত হইয়া কৈকেয় রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি '**বৈশ্বানর আত্মা**' অবগত আছেন, তাহা আমাদিকে বলুন।" রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা জ্ঞানে উপাসনা করেন?" (অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে আপনাদের কাহার কি ধারণা?) কেহ বলিলেন দ্যুলোককে, কেহ সূর্য্যকে, কেহ বায়ুকে, কেহ আকাশকে, কেহ জলকে, কেহ পৃথিবীকে। কৈকেয় বলিলেন, "ইহাদের কেহই প্রকৃত বৈশ্বানর নয়, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। অবশ্য এইরূপ আংশিক উপাসনারও

একটা ফল আছে সত্য, তথাপি অংশকেই পূর্ণ ভাবিয়া আরাধনা করিলে আপনাদের বিশেষ অনিষ্টও হইত। আপনারা আসিয়া ভালই করিয়াছেন।" এইরূপে রাজা এক এক অঙ্গের উপাসনার নিন্দা করিয়া পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বানর উপাসনার উপদেশ করেন, এবং বলেন, "যিনি এই প্রাদেশ প্রমাণ* সর্ব্বজ্ঞ আত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি সকললোকে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্বদেহে সর্ব্বভোগ প্রাপ্ত হন। দ্যুলোক এই বৈশ্বানরের মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাহার প্রাণ......"(ছাঃ ৫.১৮.২)।

এই আখ্যায়িকায় 'বৈশ্বানর' ও 'আত্মা'—এই দুইটি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে বৈশ্বানর শব্দটি জঠরাগ্নি, পার্থিব সাধারণ অগ্নি, ও অগ্নিদেবতা এই তিন অর্থেই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। বৈশ্বানর শব্দ এই তিনের সাধারণ নাম (common name)। আবার, আত্মা-শব্দও জীব এবং ব্রহ্মের সাধারণ নাম। সুতরাং কৈকেয়ের উক্ত বৈশ্বানর আত্মা কে, বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৈশ্বানরঃ, সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ ॥২৪॥

বৈশ্বানর [বৈশ্বানরঃ] পরমেশ্বর; যেহেতু, বৈশ্বানর ও আত্মা এই দুইটি শব্দ সাধারণ হইলেও তাহাদের বিশেষত্ব আছে [সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ]; যাহাতে বৈশ্বানর আত্মা বলিতে ব্রহ্ম অর্থই নির্দ্ধারিত হয়।

যদিও 'বৈশ্বানর' শব্দটি জঠরাগ্নি, ভৌতিক অগ্নি ও অগ্নিদেবতার সাধারণ নাম, এবং 'আত্মা' শব্দ জীব ও ব্রহ্মের সাধারণ নাম, তথাপি ঐ শ্রুতিতে এই দুইটি শব্দের এমন বিশেষত্ব আছে, যাহাতে

* প্রাদেশ=প্রায় অর্দ্ধ হস্ত, হৃদয়ের পরিমাণ।

বৈশ্বানরের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। দ্যুলোক প্রভৃতিকে অবয়বরূপে কল্পনা, বৈশ্বানরের জ্ঞানে সর্ব্বফল প্রাপ্তি, সর্ব্বপাপ নাশ, প্রস্তাবের আরম্ভে 'আত্মা কি', 'ব্রহ্ম কি', এইরূপ বিচার—এই সব কারণে বৈশ্বানর পরমেশ্বর বলিয়াই নিশ্চিত হয়।

স্মর্য্যমাণম্ অনুমানং স্যাৎ ইতি ॥ ২৫ ॥

আর স্মৃতিতে যে পরমেশ্বরের ত্রিলোকমূর্ত্তির বর্ণনা আছে [স্মর্য্যমাণম্], তাহাতে শ্রুতিতেও পরমেশ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান [অনুমানম্] হয় [স্যাৎ], এই জন্যও [ইতি] পরমেশ্বরই বৈশ্বানর।

সমগ্র স্মৃতি শাস্ত্রই শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতিই তাহাদের মূল। এবং সেই জন্যই স্মৃতির প্রামাণ্য। শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অশ্রদ্ধেয়। শ্রুতির কোন স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তদনুরূপ স্মৃতির সাহায্যে সেই সন্দেহের মীমাংসা হইতে পারে। কারণ শ্রুতিতে যাহা অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে সামান্য ভাবে উল্লিখিত, স্মৃতিতে তাহাই স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং স্মৃতিতে যখন স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, পরমেশ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তখন ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঐ স্মৃতির মূল যে শ্রুতি, তাহাতেও পরমেশ্বরকেই ত্রিলোকমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বৈশ্বানরের যেরূপ দ্যুলোক প্রভৃতি মস্তকাদিরূপে বর্ণিত আছে, স্মৃতিতেও সেইরূপ পরমেশ্বরেরই দ্যুলোকাদি মস্তকাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্মৃতির সাহায্যেও বুঝা যায় যে, বৈশ্বানর পরমেশ্বরই।

শিষ্য। দ্যুলোকাদিকে অবয়বরূপে কল্পনা ইত্যাদি বিশেষ

কারণে বৈশ্বানর শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলেও তাহার পরমেশ্বর অর্থই গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু ওরূপ বিশেষ কারণ ত জঠরাগ্নির পক্ষেও দেখান যাইতে পারে। যেমন, (১) বৈশ্বানর শব্দটিই জঠরাগ্নি অর্থে প্রসিদ্ধ, (২) ঐ বৈশ্বানরকেই অন্নাদির আহুতির আধার বলা হইয়াছে; (৩) সেই বৈশ্বানর জীবের অভ্যন্তরে আছে ইত্যাদি। এই সব বিশেষ উক্তি থাকায় বৈশ্বানরের জঠরাগ্নি অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব,

শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ চ ন ইতি চেৎ ?

যেহেতু বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নি অর্থে প্রসিদ্ধ এবং ঐ বৈশ্বানরকে আহুতির আধারও বলা হইয়াছে [শব্দাদিভ্যঃ] এবং [চ] যেহেতু সেই বৈশ্বানরের অন্তরে অবস্থানের কথাও বলা হইয়াছে [অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ], সেই জন্য বৈশ্বানর পরমেশ্বর নয় [ন]—একথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

গুরু। ন, তথা দৃষ্টি-উপদেশাৎ,—

না, তাহা বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, সেই জঠরাগ্নি-রূপেও, [তথা] পরমেশ্বরেরই ধ্যানের উপদেশ ওস্থলে করা হইয়াছে।

বিশেষ কারণ উভয় পক্ষেই আছে, স্বীকার করি। কিন্তু সেজন্য বৈশ্বানর পরমেশ্বর নয়, জঠরাগ্নি—একথাও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, ওরূপ একপক্ষ স্বীকার করিবার কোন বিশেষ হেতু নাই। ফলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকেই জঠরাগ্নিরূপেও ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে ওরূপ ভাবে বর্ণনা

করা হইয়াছে। যেমন অন্যশ্রুতিতে মনকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ।

আর, কেবল জঠরাগ্নিই বৈশ্বানরের অর্থ, একথা বলিলে

---অসম্ভবাৎ,---

বৈশ্বানরের ত্রিলোকমূর্ত্তি সম্ভব হয় না, ফলে, শ্রুতির সেই অংশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দ্যুলোকাদি কখনও জঠরাগ্নির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে পারে না।

আর, জঠরাগ্নি পুরুষের অভ্যন্তরে আছে বটে, কিন্তু জঠরাগ্নিকে ত আর পুরুষ বলা যায় না। কিন্তু

পুরুষম্ অপি চ এনম্ অধীয়তে ॥ ২৬ ॥

যজুর্ব্বেদে এই বৈশ্বানরকে [এনম্] পুরুষরূপেও [পুরুষমপি] নির্দ্দেশ করা হইয়াছে [অধীয়তে]।

সর্ব্বত্র বিদ্যমান পরমেশ্বর জঠরেও আছেন, পুরুষরূপেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং বৈশ্বানরের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ করিলেই শ্রুতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে এবং প্রত্যেক কথারই সার্থকতা রক্ষা পায়।

আর,

অতএব ন দেবতা, ভূতং চ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণেই [অতএব] অগ্নিদেবতা [দেবতা] কিম্বা [চ] ভৌতিক সাধারণ অগ্নিও [ভূতম্] বৈশ্বানর শব্দের অর্থ হইতে পারে না [ন]।

বিশেষতঃ, কি জঠরাগ্নি, কি অগ্নিদেবতা, কি পার্থিব অগ্নি, 'আত্মশব্দ' কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। জীবেরও ত্রিলোকমূর্ত্তি প্রভৃতি বর্ণনা সম্ভব হয় না। অতএব বৈশ্বানর-আত্মা পরমাত্মাই।

২৬ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে, আলোচ্য শ্রুতিতে ধ্যানের জন্য পরমেশ্বরকে জঠরাগ্নিরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু

সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন যে, ঐ প্রকার জঠরাগ্নিরূপ একটা অবলম্বন কল্পনা না করিয়াও, সাক্ষাৎভাবেই [সাক্ষাদপি] ওস্থলে পরমাত্মারই উপাসনার ব্যবস্থা আছে, একথা বলিলেও কোন বিরোধ হয় না [অবিরোধম্]। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে স্থির হয় যে, বৈশ্বানর ব্রহ্মই, যদিও উহার সাধারণ অর্থ জঠরাগ্নি। বৈশ্বানর কি-না সমগ্র বিশ্বের নেতা, নায়ক, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বময়। বৈশ্বানর শব্দের এই অক্ষরার্থ দ্বারাও তাঁহার ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর বলিলে 'তিনি প্রাদেশ-পরিমাণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন'—একথা সঙ্গত হয় কিরূপে?

গুরু। অভিব্যক্তেঃ ইতি আশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯॥

যদিও পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (size) নাই, তিনি অসীম, তথাপি উপাসকের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি হৃদয়াদি সীমাবদ্ধ স্থানে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হন, প্রকট হন,—এইজন্য [অভিব্যক্তেঃ] বলা হইয়াছে যে, 'তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে আছেন'—ইহা [ইতি] আচার্য্য আশ্মরথ্য [আশ্মরথ্যঃ] বলেন।

অনুস্মৃতেঃ বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন, প্রাদেশ পরিমাণ হৃদ্‌পদ্মে অবস্থিত মনের দ্বারা অনুস্মৃত হন বলিয়া (অর্থাৎ তাদৃশ মন দ্বারা তাঁহাকে ধ্যান করা হয় বলিয়া) [অনুস্মৃতেঃ] পরমেশ্বরকে প্রাদেশ প্রমাণ বলা হইয়াছে।

একরকমের উপাসনা আছে, যাহাকে সম্পত্তি বলে। যেমন, একটি শালগ্রামশিলা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে যখন উপাসকের সেই শিলাকে আর শিলা বলিয়া জ্ঞান হয় না, পরন্তু তাহাতে বিষ্ণুবুদ্ধিই দৃঢ় হয়, তখন সেই বুদ্ধিকে বিষ্ণু-সম্পত্তি বলে। সেইরূপ প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে উপাসকের 'পরমেশ্বর-সম্পত্তি' হয়।

সম্পত্তেঃ ইতি জৈমিনিঃ, তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

উক্ত প্রকার পরমেশ্বর-সম্পত্তি লাভের জন্য [সম্পত্তেঃ] পরমেশ্বরকে প্রাদেশপরিমাণ বলা হইয়াছে—ইহা [ইতি] আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন ; যেহেতু [হি] ঐরূপ পরমেশ্বর-সম্পত্তি লাভের জন্য তাঁহার প্রাদেশ পরিমাণ [তথা] অন্য শ্রুতিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন [দর্শয়তি]।

আমনন্তি চ এনম্ অস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

আর [চ] অন্যশ্রুতিও এইরূপ প্রাদেশ পরিমিত স্থানে [অস্মিন্] পরমেশ্বরকে [এনম্] উপদেশ করেন [আমনন্তি]। জাবাল-শাখায় পরমেশ্বরের প্রাদেশ পরিমাণ স্থানে অবস্থানের উল্লেখ আছে। সুতরাং 'বৈশ্বানর প্রাদেশ পরিমিত স্থানে অবস্থান করেন', এইরূপ উক্তি আছে বলিয়াই যে বৈশ্বানর পরমেশ্বর হইতে পারিবে না, এমন কোন কথা নাই। অতএব বৈশ্বানর পরমেশ্বরই।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। মুণ্ডক উপনিষৎ বলেন, "স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, মন, ইন্দ্রিয় এই সকল যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই অদ্বয় আত্মাকে জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর; তিনিই অমৃতের [মোক্ষের, ভবসমুদ্র পারের] সেতু" [মুঃ ২.২.৫]। এস্থলে দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতির আধাররূপে উক্ত বস্তুটি কি?

দ্যু-ভূ-আদি আয়তনম্, স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

গুরু। দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতির আয়তন বা আধার [দ্যুভ্বাদ্যয়-তনম্] পরম ব্রহ্ম; যেহেতু, ঐ আধারকে 'আত্মা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে [স্ব-শব্দাৎ]।

"সেই এক আত্মাকেই জান"—এই বাক্যে ঐ আয়তনকে 'অদ্বয় আত্মা' বলা হইয়াছে। আবার, কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে স্পষ্টভাবেই 'আয়তন' বলা হইয়াছে। এস্থলেও পূর্ব্বে এবং পরে ব্রহ্ম শব্দ আছে। সুতরাং উক্ত আয়তন ব্রহ্মই।

শিষ্য। আচ্ছা, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পৃথিবী প্রভৃতির আয়তন বা আধার বলা হইল, আবার, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতিকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে! ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম একও বটে, আবার বহুও বটে। যেমন, 'একটি গাছ', এই হিসাবে সে এক; আবার, ডাল, পাতা ইত্যাদিরূপে সে বহু। অর্থাৎ ডাল, পাতা ইত্যাদির সমষ্টিই গাছ—বহুর একত্র সমাবেশ হইলে তাহাকে এক

বলা হয়। সেইরূপ পৃথিবী, স্বর্গ ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তু একত্র করিয়া যে সমষ্টি হয়; তাহাই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম সমস্ত-প্রপঞ্চবিশিষ্ট, তাঁহাকেই জানিবার উপদেশ ঐ শ্রুতিতে দেওয়া হইয়াছে।

গুরু। বৎস! অতি প্রয়োজনীয় কথাই উত্থাপন করিয়াছ। কারণ, আজকাল অনেকেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এইভাবে গ্রহণ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হন, এবং ইহাকে Pantheism ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহারা মনে করেন, বেদান্তের অদ্বৈতের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম যেন একটি বৃক্ষ, দৃশ্য প্রপঞ্চ যেন তাহার শাখা পল্লব ইত্যাদি। অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চও ব্রহ্মেরই অংশ। তাহা হইলে ইহাদের মতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থও ব্রহ্মেরই মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সমগ্র শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে দৃশ্যপ্রপঞ্চের সত্যত্ব কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। শ্রুতি বলেন, "যে অখণ্ড একরস আত্মাতে নানাত্ব দেখে, ভেদ অনুভব করে, [অর্থাৎ আত্মাকে বহুর সমষ্টি বলিয়া মনে করে, বৃক্ষের ডাল, পাতা ইত্যাদিরূপ], সে মৃত্যু-প্রাপ্ত হয়" [কঃ ২. ৪. ১১]। এস্থলে নানাত্বদর্শনের নিন্দা করা হইয়াছে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—এই আত্মাতে নানা অর্থাৎ ভেদ বলিয়া কিছুই নাই"—ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে নানাত্ব বা ভেদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই। আবার, "যেমন এক টুকরা লবণ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই লবণ, একরস, সেইরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে একরস, চিন্মাত্র, চৈতন্যঘন" (বৃঃ ৪. ৫. ১৩)—ইত্যাদি শ্রুতির প্রতি দৃষ্টি করিলে—এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা যায় না যে, ব্রহ্ম বা আত্মা সমস্ত-প্রপঞ্চ-বিশিষ্ট অর্থাৎ নানা বা ভেদের সমষ্টি। তবে যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে মিথ্যা; তাহার সত্যত্ববুদ্ধি দূর

করিয়া মিথ্যাত্ববোধ উৎপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে বলা হয়, 'যাহাকে সর্প বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা সর্প নয়, রজ্জু।' এস্থলে রজ্জু ও সর্পের অভেদউক্তিতে সর্পের মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হয়, রজ্জুবিশিষ্ট সর্প—এরূপ অর্থ হয় না। দুইটী বস্তু দুইটী বস্তুই থাকিবে, অথচ তাহারা অভিন্ন, এক,—ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। যখন বল, সর্পই রজ্জু, তখন রজ্জু ও সর্প উভয়েই সত্য হইতে পারে না। উভয়ে সত্য হইলে, উভয়ের পার্থক্যও সত্য, কারণ সেই পার্থক্যই তাহাদের পরস্পরকে **দুইটি** বস্তুরূপে প্রতিভাত করে। যতক্ষণ দুইটি থাকে, ততক্ষণ তাহাদের অভেদউক্তি প্রলাপ-মাত্র, কল্পনারও অগোচর, কেবল কথার কথা মাত্র। যে মুহূর্তে দুইটি বস্তুর অভেদ বলা হয়, সেই মুহূর্তে উহাদের একটি মিথ্যা বলিয়া অবশ্যই প্রতিপন্ন হয়। সেইরূপ "এই সমস্ত ব্রহ্ম" এই কথায় সমস্ত পদার্থের সমষ্টি লইয়া ব্রহ্ম, এ অর্থ কল্পনা করা যায় না, বরং সমস্ত পদার্থ সমস্ত পদার্থরূপে মিথ্যা—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করে ; এবং সমস্ত প্রপঞ্চ-বিশিষ্ট আত্মাকে জানিবার উপদেশও আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে করা হয় নাই, কেবল অজ্ঞানকল্পিত দৃশ্যবর্গ জ্ঞানের দ্বারা বিলয় করিয়া তাহার আধারভূত পরমাত্মাকেই জানিবার উপদেশ করা হইয়াছে। যদি কেহ বলে, 'রাম যে চেয়ারে বসিয়া আছে, সেই চেয়ারখানা লইয়া আইস,' তবে যেমন কেবল চেয়ারখানাই আনা হয়, রামকে শুদ্ধ আনা হয় না, সেইরূপ "দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহাতে অবস্থিত, তাঁহাকে জান" বলিলেও দৃশ্যপ্রপঞ্চ-**বিশিষ্ট** সর্ব্বাধারকে জানিতে বলা হয় না। প্রত্যুত কেবল সেই সর্ব্বাধারকেই জানিতে বলা হয়।

আর, ঐ দ্যুলোকাদির আধারকে

মুক্ত-উপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ ॥২॥

মুক্তপুরুষের গম্য [উপসৃপ্য] বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই জন্যও ঐ আধারকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। শ্রুতির সর্ব্বত্রই মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিতই এক হইয়া যান—এরূপ সিদ্ধান্ত আছে। এস্থলেও যখন মুক্তব্যক্তি ঐ আধারের সহিত অভিন্ন হইয়া যান, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন,—এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন ঐ আধারকে ব্রহ্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধান সকল বস্তুর কারণ বলিয়া তাহাকেও ত আধার বলা যায়; কারণকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত কার্য্য বর্ত্তমান থাকে।

গুরু।　　## ন অনুমানম্, অ-তৎ-শব্দাৎ ॥৩॥

সাংখ্যের অনুমান-প্রমাণ দ্বারা কল্পিত প্রধান [অনুমানম্] দ্যুলোকাদির আধার হইতে পারে না [ন]; যেহেতু, আলোচ্য শ্রুতিতে প্রধানবোধক কোন শব্দই নাই [অতচ্ছব্দাৎ]। আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে এমন কোন শব্দ নাই, যাহা প্রধানকে বুঝায়। পক্ষান্তরে অচেতন প্রধানের বিপরীত শব্দই আছে। যথা, ঐ আধার 'সর্ব্বজ্ঞ'। সুতরাং প্রধান দ্যুলোকাদির আধার নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব সমস্ত ভোগ করে, বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহার ভোগ্য বস্তু। এই হিসাবে জীবকেও দ্যুলোকাদির আধার বলা যাইতে পারে, দ্যুলোকাদি জীবের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। আর প্রধান অচেতন বলিয়া তাহাকে 'আত্মা' বা 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যায় না বটে, কিন্তু জীব ত আত্মা ও চেতন। সুতরাং তাহাকেই কেন আধার বলি না?

গুরু। প্রাণভৃৎ চ ॥৪॥

জীবও (যাহার প্রাণ আছে, অর্থাৎ প্রাণী) [প্রাণভৃৎ চ] উক্ত আধার হইতে পারে না। হঁ্যা, জীব আত্মা ও চেতন বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। আর ক্ষুদ্র জীবকে দ্যুলোকাদির আধার বলাও সমীচীন নয়।

"একমাত্র সেই আত্মাকেই জান"—এই বাক্যে 'সেই আত্মাকেই' এই শব্দদ্বারা ঐ আধারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং সেই আত্মাকে জানিবার উপদেশ জীবকেই দেওয়া হইয়াছে। অতএব এস্থলে জীব ও ঐ আধারের স্পষ্টভাবেই

ভেদ-ব্যপদেশাৎ ॥ ৫ ॥

ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হওয়ায় [ভেদব্যপদেশাৎ] ঐ আধার যে জীব নয়, তাহা নিশ্চিত হয়।

আর,

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

প্রকরণটী অর্থাৎ প্রস্তাবটীও পরমাত্মা সম্বন্ধেই, জীবসম্বন্ধে নয়। "এমন একটী বস্তু কি, যাহা জানিলে সবই জানা হইয়া যায়" (মুঃ ১.১.৩) —এই বাক্য দ্বারাই প্রস্তাব আরম্ভ করা হইয়াছে। পরে দ্যুলোকাদির আধারই ঐ বস্তু—এরূপ নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং ঐ আধার জীব হইতে পারে না, কারণ জীবকে জানিলে সব জানা হয় না।

আবার, ঐ প্রস্তাবের অন্তর্গত একটী বাক্য এই—"এক বৃক্ষে (দেহে) দুইটী পক্ষী (আত্মা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) আছে……। তাহাদের মধ্যে একটী (জীবাত্মা) স্বাদু পিপুল (কর্ম্মফল) ভক্ষণ করে,

অপরটী (পরমাত্মা) কিছু ভক্ষণ করেনা, কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করে" (মু ৩.১.১)। এস্থলে দেখিতে পাই, একজনের ভক্ষণ ও অপরের কেবল উদাসীন ভাবে অবস্থানের উল্লেখ আছে।

এই

স্থিতি-অদনাভ্যাং চ ॥ ৭ ॥

উদাসীনভাবে অবস্থিতি ও অদনের (ভক্ষণের) উল্লেখ হইতেও [স্থিত্যদনাভ্যাংচ] বুঝা যায় যে, শ্রুতি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য এই যে, দ্যুলোকাদির আধারকে যেন জীবাত্মা বলিয়া সন্দেহ না হয়। পরমাত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রুতি তাঁহাকে দ্যুলোকাদির আধাররূপে নির্দ্দেশ করিলেন। এই আধার বর্ণনায় পাছে কেহ তাহাকে জীব বলিয়া সন্দেহ করে, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "ভোক্তা জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন ; বিশ্বপ্রপঞ্চের ভোগকারী বলিয়া জীবকে আধার বলা যায় না, যে পরমাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে এবং যাঁহাকে আধাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই পরমাত্মা হইতে ভোক্তা জীব পৃথক্"।

আর, জীব যে কি, তাহা বর্ণনা করাও শ্রুতির অভিপ্রেত নয় ; কারণ, কর্ত্তা-ভোক্তারূপে জীব সকলেরই জানা, জীবভাব প্রতিপাদন করা শ্রুতির নিষ্প্রয়োজন। পরমাত্মাই অজ্ঞাত—শ্রুতি তৎসম্বন্ধেই উপদেশ করেন। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে।

সুতরাং দ্যুলোকাদির আধার জীব নয়, পরমাত্মাই।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে—এক সময় নারদ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া সনৎকুমারের নিকট গমন করেন

সনৎকুমার কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া তিনি বলেন যে, তিনি বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু এত অধ্যয়ন করিয়াও তিনি আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন, "ভগবন্, আমি আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষদের মুখে শুনিয়াছি যে, আত্মজ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত শোকের অতীত হওয়া যায়। আমি দুঃখে একান্ত অভিভূত, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শোকের পারে নিয়া চলুন। কি হইলে পরম সুখ লাভ হয়, তাহা আমাকে বলুন।" উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন, "যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন (limited), ক্ষুদ্র, তাহা সুখ নহে ; যাহা ভূমা, মহৎ, বৃহৎ, সব চেয়ে বড়, অবিচ্ছিন্ন, তাহাই (প্রকৃত) সুখ, তাহাই জ্ঞান।" নারদ বলিলেন, "আমাকে সেই ভূমার উপদেশ করুন।" সনৎকুমার বলিলেন, "যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, জানা যায় না, অর্থাৎ যাহাতে এক বই দুই নাই, কোনরূপ ভেদ নাই, তাহাই ভূমা ; আর, যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, জানা যায়, অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈত আছে, তাহা অল্প, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ" (ছাঃ ৭. ২৩ ২৪)।

এই ভূমা বুঝাইবার জন্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, নাম হইতে বাক্ বড়, বাক্ হইতে মন বড়, মন হইতে সঙ্কল্প বড়, ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বশেষে আশা হইতে প্রাণ বড়—এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ হইতে কি বড়, তাহা আর বলা হয় নাই। সুতরাং মনে হয়, **প্রাণই ভূমা**। বিশেষ, স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয় ; সেই অবস্থাকে **সম্প্রসাদও** বলে—কারণ, এই অবস্থায় আত্মা সম্যক্ প্রসন্ন, শান্ত, সুখী থাকেন। সেই সম্প্রসাদ অবস্থায় কিছু দেখাও যায় না, শুনাও যায় না, জানাও যায় না। সে অবস্থাটা যে সুখস্বরূপ

তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়, আমরাও তাহা অনুভব করি। আর সমগ্র জগৎও প্রাণময়। সুতরাং প্রাণই ভূমা।

গুরু। না, প্রাণকে ভূমা বলিতে পার না,

ভূমা, সম্প্রসাদাৎ অধি-উপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

পরমাত্মাই ভূমা [ভূমা],—যেহেতু, সম্প্রসাদ হইতে অর্থাৎ প্রাণ হইতে [সম্প্রসাদাৎ] অধিক, বড়, শ্রেষ্ঠ বস্তুর [অধি] উপদেশও করা হইয়াছে [উপদেশাৎ]।

সম্প্রসাদ অবস্থায় অর্থাৎ স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার অবস্থায় প্রাণবৃত্তিমাত্র জাগ্রত থাকে, ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে, সেই জন্য প্রাণকেও সম্প্রসাদ বলা হয়, (এবং জীবের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া প্রাণন ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হওয়ায় স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রামগ্ন জীবকে প্রাণ বা সম্প্রসাদ নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে)। আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে প্রাণ (যাহার অপর নাম সম্প্রসাদ) হইতেও বড়, শ্রেষ্ঠ কিছুর উপদেশ আছে, সুতরাং প্রাণই ভূমা নয়। যিনি বুঝিয়াছেন যে, সমুদায় দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রাণেরই ক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ স্পন্দন, তিনি অবশ্য সাধারণ লোক অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু জানিয়াছেন; এবং সেই অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি যখন বলেন, তখন তাঁহাকে 'অতিবাদী—'এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য যিনি প্রাণের তত্ত্ব বলিতে পারেন শ্রুতি তাঁহাকে অতিবাদী আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে প্রাণের মহিমা কীর্ত্তন করার পরেই শ্রুতি বলিতেছেন, "**কিন্তু** প্রকৃত অতিবাদী তিনিই, যিনি সত্যের তত্ত্ব বলিতে পারেন" (ছাঃ ৭.১৬)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ঐ স্থলে 'কিন্তু'

শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই শ্রুতির শেষ সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুর উপদেশ থাকাতে প্রাণকে ভূমা বলা যায় না। প্রকরণের প্রারম্ভে নারদ আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন, ভূমা শব্দ দ্বারা সেই আত্ম-তত্ত্বেরই উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং পরমাত্মাই ভূমা।

ধর্ম্ম-উপপত্তেঃ চ ॥ ৯ ॥

ঐ ভূমার যে সমস্ত ধর্ম্ম বা গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাও পরমাত্মার পক্ষেই উপপন্ন, সঙ্গত হয়, এই জন্যও ভূমা পরমাত্মা। 'যাহাতে ভেদজ্ঞান থাকেনা, যাহা সুখ-স্বরূপ, যাহা সর্ব্বব্যাপী, অমৃত'— ইত্যাদি ধর্ম্ম পরমাত্মারই মুখ্য ধর্ম্ম, প্রাণাদিতে ঐ সব ধর্ম্ম প্রয়োগ করিতে হইলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং পরমাত্মাই ভূমা।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (বৃঃ ৩.৮), গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যাবতীয় পদার্থ কিসে অবস্থিত, কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "আকাশে"। গার্গী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আকাশ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, বিধৃত?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অয়ে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন, তাহা সেই অক্ষর, যাহা স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, হ্রস্বও নয়, দীর্ঘও নয়—" ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৮.৬-৭)। অর্থাৎ অস্থূলাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট অক্ষর নামক বস্তুতে আকাশাদি সমস্তই ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই অক্ষর কি?

গুরু।　　অক্ষরম্, অম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

উক্ত অক্ষর [অক্ষরম্] ব্রহ্ম; যেহেতু, পৃথিব্যাদি অম্বর অর্থাৎ আকাশ পর্য্যন্ত সবই [অম্বরান্ত-] সেই অক্ষর ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে [-ধৃতেঃ]। উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সেই অক্ষরে বিধৃত, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অক্ষরকে অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় পদার্থ বর্ত্তমান আছে। আকাশাদি সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিয়া রাখা ব্রহ্ম ছাড়া আর কাহার সম্ভব? অক্ষর শব্দের অর্থ যাঁহার ক্ষরণ, ক্ষয়, নাশ নাই। ব্রহ্মই একমাত্র অব্যয়, নিত্য, অবিনাশী বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই অক্ষর। কারণরূপে তিনি সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া আছেন,—কারণকে ছাড়িয়া কার্য্য এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

শিষ্য। প্রধানকেও ত তাহা হইলে কারণরূপে ধারণকর্ত্তা বলা যাইতে পারে?

গুরু।　　সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

না, প্রধানকে অক্ষর বলিতে পার না; কারণ, সেই আকাশাদির ধৃতি, ধারণ [সা চ] ব্রহ্মেরই কার্য্য, অচেতন প্রধানের নয়; যেহেতু, অক্ষর সমস্ত পদার্থকে **শাসন** করিয়া ধরিয়া আছেন, এইরূপ উক্তি আছে [প্রশাসনাৎ]। ঐ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে, "হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে" (বৃঃ ৩.৮.৯)। এই যে শাসন, নিয়মন, সুশৃঙ্খলায় পরিচালন—ইহা কোন অচেতনের সম্ভব নয়। সুতরাং অক্ষর প্রধান নয়, পরম ব্রহ্মই অক্ষর।

আর ঐ শ্রুতিতে

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেঃ চ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য প্রধানাদির [অন্য—] ধর্ম [ভাব—] ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও [-ব্যাবৃত্তেঃ চ] অন্য কিছুকে অক্ষর বলা যায় না। "সেই অক্ষরকে দেখা যায় না, অথচ তিনিই দ্রষ্টা" [বৃঃ ৩.৮.১১]—ইত্যাদি বাক্যে প্রধানাদির বিপরীত ধর্ম্মেরই ('দ্রষ্টা' ইত্যাদি) উল্লেখ আছে। এই জন্য প্রধানাদি অক্ষর নয়, পরম ব্রহ্মই অক্ষর শব্দবাচ্য।

শিষ্য। প্রশ্নোপনিষদে [৫.২.৫] পিপ্পলাদ সত্যকামকে বলিতেছেন, "সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর (নির্গুণ ও সগুণ) ব্রহ্ম। যিনি ইহাকে জানেন, তিনি ঐ ওঁকাররূপ অবলম্বনের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত দুইরকম ব্রহ্মের একটী প্রাপ্ত হন।" তারপর আবার বলিলেন, "যে সাধক এই অ-উ-ম্ এই তিন মাত্রাবিশিষ্ট ওঁকাররূপ অক্ষরদ্বারা পর পুরুষের ধ্যান করে, সে সূর্য্যলোক হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে—" ইত্যাদি। এই স্থলে ওঁকার অবলম্বনে যে পুরুষের ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, সেই পুরুষ কি অপর ব্রহ্ম, * না পরম ব্রহ্ম? ঐ পুরুষকে ধ্যান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ নয়। সুতরাং এই সামান্য

---

* অপর ব্রহ্ম—ইহার অপর নাম সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ, বিরাট, ব্রহ্মা, ইত্যাদি। ইনিও বিনশ্বর, কেবল কল্পস্থায়ী। ইনি সৃষ্টিকর্তা, পুরাণের পিতামহ। অপর-ব্রহ্ম অর্থ নিকৃষ্ট ব্রহ্ম, আর পর-ব্রহ্ম অর্থ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম। (ব্রঃ সূঃ ৪.৩.১৪ দ্রষ্টব্য)।

ফলের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, ঐ পুরুষ অপর ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্ত্তা)।

গুরু। না, ঐ ধ্যেয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ নয়, কিন্তু

ঈক্ষতি-কর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

সেই ধ্যেয় পুরুষ [সঃ] পর ব্রহ্ম ; যেহেতু, ঐ পুরুষকে ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন ক্রিয়ার কর্ম্ম (object) রূপে বলা হইয়াছে [ঈক্ষতি-কর্ম্মব্যপদেশাৎ]।

পিপ্পলাদ বাক্যশেষে বলিলেন, "উপাসক সেই ধ্যেয় পুরুষকে **ঈক্ষণ করে**, দেখে, আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎ করে, উপলব্ধি করে" (প্রঃ ৫.২.৫)। দেখ, ধ্যানের বিষয়টী কল্পিতও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। তুমি ইচ্ছা করিলে শৃঙ্গ-লাঙ্গুল বিশিষ্ট একটী মনুষ্যের ধ্যান করিতে পার। কিন্তু তাদৃশ কল্পিত বস্তুর **সাক্ষাৎকার** (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হওয়া) সম্ভব নয়। সত্য বস্তুরই সাক্ষাৎকার হইতে পারে। শ্রুতি যখন 'সাক্ষাৎকার করে', 'উপলব্ধি করে'—এরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, সেই সাক্ষাৎকারের বিষয়টী কল্পিত নয়, পরন্তু অকল্পিত, সত্য-স্বভাব। অপর ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ কাল্পনিক, সেও মায়ার অধীন। কিন্তু পরব্রহ্ম অকল্পিত-স্বভাব, সত্য-স্বরূপ। সুতরাং ঈক্ষণ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে উক্ত হওয়ায় সেই পুরুষ পর ব্রহ্মই। একজনের ধ্যান করিয়া অন্য জনের সাক্ষাৎকার হয়, একথাও অযৌক্তিক। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিতে যে পুরুষের ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তিনি পরব্রহ্ম, কার্য্যব্রহ্ম নন।

আর, ত্রিমাত্র [অ-উ-ম্] ওঁকার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিলে তাহার ফল ব্রহ্মলোক সত্য; কিন্তু সেই ব্রহ্মলোকেই উপাসকের পরমফল পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। সুতরাং ক্রমমুক্তির প্রায় শেষ সোপান ব্রহ্মলোক সামান্য ফল নয়। কাজেই সামান্য ফল দেখিয়া ঐ ধ্যেয় পুরুষকে পরব্রহ্ম বলিব না—ইহাও যুক্তিসঙ্গত নয়। (চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী বাক্য এইরূপ—"এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) যে একটী দহর (ক্ষুদ্র, অল্প-পরিসর) পদ্মাকার গৃহ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যে **দহর আকাশ,** অর্থাৎ হৃদ্‌পদ্মরূপ গৃহের অভ্যন্তরে যে দহর আকাশ আছে, তাহাকে অন্বেষণ কর, তাহাকে জান" (ছাঃ ৮.১.১)। এই বাক্যে দহরাকাশ শব্দে কি এই বাহ্য ভূতাকাশকে (অর্থাৎ হৃদয় পদ্মের মধ্যস্থিত ফাঁকা জায়গাটুকু), কিম্বা জীবকে, অথবা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। **দহরঃ উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥**

বাক্যশেষে এমন সব কারণ আছে, যাহার বলে [উত্তরেভঃ] ঐ দহরাকাশ [দহরঃ] পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হয়।

শ্রুতি প্রথমে দহরাকাশ অন্বেষণ (দর্শন) করিবার উপদেশ দিয়া পরে, কেহ পাছে মনে করে যে, এই দহর আকাশ হৃদ্‌পদ্মের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র একটী শূন্যমাত্র, সেইজন্য তাদৃশ আশঙ্কা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "এই বাহিরের আকাশ যত বড়, যত ব্যাপী, এই দহরাকাশও ততই ব্যাপী (অর্থাৎ দহরাকাশ ক্ষুদ্র নয়, মহৎ); ভূর্লোক, স্বর্লোক, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র—

এমন কি, যাহা কিছু এখানে আছে, যাহা কিছু এখানে নাই (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় যাহা কিছু) তাহা সবই এই দহরাকাশেই অবস্থিত" (ছাঃ ৮.১.৩)। এই বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উক্ত দহরাকাশ বাহ্য ভূতাকাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটী শূন্যবিশেষ নহে। তার-পর, "ভূলোকাদি ইঁহাতে অবস্থিত, ইনি আত্মা, নিষ্পাপ, অজর, অমর, শোকরহিত (পূর্ণসুখস্বরূপ), ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" (ছাঃ ৮.১.৫)—এই সকল কথা একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আর, প্রস্তাবের শেষে বলা হইয়াছে, "এই সমস্ত প্রজা (জীব) এই ব্রহ্মলোকে গমন করে, কিন্তু জানে না" (ছাঃ ৮.৩.২)। এই বাক্যে দহরাকাশকে 'ব্রহ্মলোক' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং 'সুষুপ্তিকালে (স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রার কালে) জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়', ব্রহ্মলোকে গমনের ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং দহরাকাশকে উদ্দেশ করিয়াই যখন তাহাতে জীবের প্রাত্যহিক 'গমন' ও 'ব্রহ্মলোক শব্দের' প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখন এই

গতি-শব্দাভ্যাম্—

গমন ও 'ব্রহ্ম-লোক' শব্দের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে।

আর

তথা হি দৃষ্টম্, লিঙ্গং চ ॥ ১৫ ॥

যেহেতু [হি] সেইরূপ গতি [তথা] অর্থাৎ (সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) অন্য শ্রুতিতেও উল্লিখিত দেখা যায় [দৃষ্টম্], সেই জন্য দহরাকাশকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে—অন্যশ্রুতি পরমেশ্বরেই জীবের দৈনিক

গমনের কথা বলেন। অন্য শ্রুতির স্পষ্ট উক্তি আলোচ্য শ্রুতির দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিবার লিঙ্গ, সঙ্কেত, গমক [লিঙ্গম্], অর্থাৎ অন্য শ্রুতির স্পষ্ট উক্তির সাহায্যে এস্থলে দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়।

আবার ঐ প্রস্তাবের শেষভাগে এই দহরাকাশ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তিনি সমুদায় লোকের বিধারক। 'ক্ষেতের আলি যেমন এক ক্ষেতের জল অন্য ক্ষেতে যাইতে দেয় না, ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ সেই আত্মা জগতের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া ধারণ করিয়া আছেন' (ছাঃ ৮.৪.১)। এই যে দহরাকাশের সর্ব্ব বিধারণরূপ মহিমা, তাহা অন্য শ্রুতিতে পরমেশ্বরেরই মহিমা বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। সুতরাং এই ধৃতি বা ধারণ কথার বলেও দহরাকাশের পরমেশ্বর অর্থ স্থিরীকৃত হয়।

ধৃতেঃ চ মহিম্নঃ অস্য অস্মিন্ উপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

দহরাকাশ সমুদায় লোক ধারণ করিয়া আছেন, এই উক্তি হইতেও [ধৃতেঃ চ] দহরাকাশ যে ব্রহ্ম, তাহা বুঝা যায়; যেহেতু, অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মেই [অস্মিন্] এই জগৎধারণরূপ মহিমার [অস্য মহিম্নঃ] উল্লেখ দেখিতে পাই [উপলব্ধেঃ]।

প্রসিদ্ধেঃ চ ॥ ১৭ ॥

আর, আকাশ শব্দ পরমেশ্বর অর্থে অন্যান্য শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ, সুতরাং [প্রসিদ্ধেঃ] দহরাকাশ পরমেশ্বরই। (ব্রঃ সূঃ ১.১.২২ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। আচ্ছা, ঐ প্রকরণের শেষ অংশের বর্ণনা হইতে দহরাকাশ

অর্থ পরমেশ্বর স্থির করিলেন; কিন্তু ঐ শেষ ভাগে ত জীবের বর্ণনাও আছে। সুতরাং

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ? —

ইতর অর্থাৎ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য, কে-না জীব, তাহার উল্লেখ বা বর্ণনা থাকায় [ইতরপরামর্শাৎ] দহরাকাশ সেই জীবই [সঃ]— এ কথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি ?—

গুরু। 　　　　ন, অসম্ভবাৎ ॥১৮॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, দেহেন্দ্রিয়াদি সসীম বস্তুতে আত্মাভিমানী জীবকে আকাশের সহিত তুলনা করা সম্ভব হয় না [অসম্ভবাৎ] কিন্তু দহরাকাশের সসীমত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব (অল্পপরিসরত্ব) নিরাকরণ করিবার জন্যই তাহাকে অসীম আকাশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ইহা ১৪ সূত্রেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এই তুলনা সম্ভব হয় না বলিয়া জীবকে দহরাকাশ বলিতে পার না। তারপর, ইহাতে ভূলোকাদির অবস্থিতি, ইনি অজর, অমর—ইত্যাদি উক্তি ত জীবের পক্ষে সম্ভবই হয় না। তবে পরবর্ত্তী অংশে জীবের বর্ণনা কেন করা হইয়াছে, তাহা ২০সূত্রে বলিব।

শিষ্য। ইন্দ্র শুনিয়াছিলেন যে,—নিষ্পাপ, অজর, অমর, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। সেই আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি প্রজাপতির শরণাপন্ন হন। প্রজাপতি ইন্দ্রের জ্ঞানশক্তির ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে উপদেশ করিতেছেন, "এই যে চক্ষুতে পুরুষ দেখা যাইতেছে, এ-ই আত্মা" (ছাঃ ৮.৭.৪)। এস্থলে মনে হয়, জীবাত্মার জাগ্রত অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে, কারণ জীবাত্মাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত

হইয়া বিষয় দর্শন (উপভোগ) করে। তারপর, "এই আত্মাকে পুনর্ব্বার বুঝাইয়া দিতেছি" (ছাঃ ৮.৯.৩)—এই বলিয়া প্রজাপতি বলিলেন, "এই যিনি স্বপ্নে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা" (ছাঃ ৮.১০.৩)—এবাক্যে জীবের **স্বপ্নাবস্থার** কথা বলা হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পুনরায় তোমাকে এই আত্মা কি, তাহা বুঝাইতেছি, যখন ইনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সমস্তইন্দ্রিয়কার্য্যরহিত হন, এবং সম্যক্ প্রশান্ত হন, তখন ইনি স্বপ্নও জানেন না—ইনিই আত্মা" (ছাঃ ৮.১১.১,২)।—এবাক্যে জীবের সুষুপ্তাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। এই রূপে জাগ্রৎ,স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতে জীবের বর্ণনা করিয়া প্রজাপতি বলিলেন, "ইহাই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম"। এই তৃতীয় উপদেশেও ইন্দ্র আত্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারায় প্রজাপতি আবার বলিলেন, "আচ্ছা, এই আত্মাই অন্যরকমে তোমায় বুঝাইতেছি। সাধারণে যাহাকে আত্মা বলিয়া বুঝে, তাহার সহিত বাস্তব আত্মার কোনই সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বে যে সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন জীবের কথা বলিয়াছি, তাহাকে 'সম্প্রসাদ'ও বলা হয়, সে এই **শরীর হইতে উত্থিত হইয়া** পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সে-ই উত্তম পুরুষ" (ছাঃ ৮.১২.৩)। এই চতুর্থ উপদেশে শরীর হইতে উত্থিত জীবকেই উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। আর এই যে জীবের বর্ণনা, তাহা দহরাকাশ প্রসঙ্গের শেষ অংশেই করা হইয়াছে। সুতরাং

উত্তরাৎ চেৎ ?—

এই প্রস্তাবের শেষাংশে জীবের বর্ণনা থাকায় [উত্তরাৎ] দহরাকাশ জীব—এ কথা যদি [চেৎ] বলি ?—

গুরু।　　আবির্ভূত-স্বরূপঃ তু ॥ ১৯ ॥

কিন্তু [তু] তাহা কিরূপে বলিবে, অর্থাৎ বলিতে পার না ; কেন না তুমি যে জীবের বর্ণনা দেখাইলে, তাহা জীবের জীবত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই ; পরন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপের আবির্ভাব বা প্রকাশ মাত্র [আবির্ভূত-স্বরূপঃ] দেখানই উহার উদ্দেশ্য।

প্রজাপতির উপদেশের সার মর্ম্ম এই :—

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মা নহে। এবং আত্মার কোন পরিবর্ত্তন নাই। প্রজাপতি নানা রকমে ইন্দ্রের দেহাত্মজ্ঞান দূর করিয়া ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা দেখাইয়া জীবের যেটী সত্যিকারের স্বরূপ, তাহাই ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন। জীবের যে জীবভাব, অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই যে জীব, একথাটী সকলেই জানে। সুতরাং জীবকে জীবরূপে নির্দ্দেশ করা শাস্ত্রের অনাবশ্যক। অজ্ঞাত বস্তুর তথ্য উদ্ঘাটন করে বলিয়াই শাস্ত্রের সার্থকতা (ব্রঃ সূঃ ৩.২.১২ দ্রষ্টব্য)। তবে প্রজাপতি যে জীবের বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, জীবের সত্যিকারের স্বরূপ প্রদর্শন করা। উক্ত শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্তব্য যে পরম জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরম ব্রহ্ম এবং সেইটীই জীবের পারমার্থিক রূপ। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতেও জানা যায় যে, নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরম ব্রহ্মই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ। জীবের জীবত্ব কি?—একটা মরা গাছের গুঁড়িকে একটা মানুষ বলিয়া মনে করাও যা' নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে জীব বলিয়া মনে করাও তা'। উভয়ই ভ্রমাত্মক, মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গুঁড়িতে মনুষ্যবুদ্ধি

থাকে, ততক্ষণ উহা যে মানুষ নয়, একটা গুঁড়ি মাত্র, সে ধারণাই হয় না। ভ্রমাত্মক মনুষ্যজ্ঞান দূর হইলেই গুঁড়িকে গুঁড়ি বলিয়া জ্ঞান হয়। সেইরূপ ভ্রমাত্মক জীববোধ যতদিন থাকে, ততদিনই জীবের জীবত্ব। যখন যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন জীব বলিয়া আর কিছু থাকে না। যাহাকে এতকাল জীব বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে-ই তখন অখণ্ড চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়। অনুধাবন করিয়া দেখ, গাছের গুঁড়িকে মনুষ্যই মনে কর, কোন জন্তুই মনে কর, গাছের গুঁড়ি কিন্তু সর্ব্বদাই গাছের গুঁড়িই থাকে। তোমার নানা রকম মনে করায় কিন্তু সেও নানা রকম হইয়া যায় না; সে যাহা তাহাই থাকে; তবে তোমার ঐ বিবিধ কল্পনা যখন আর হয় না, তখন সে তোমার নিকট স্বস্বরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। সেইরূপ যতদিন না আপনাকে নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, ততদিনই তোমার জীবত্ব। কিন্তু যখন শ্রুতি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি দেহাদি নও, সংসারী নও, পরন্তু তুমি পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ, তখন সেই কল্পিত জীবের আর দেহাদিতে আমি বা আমার অভিমান থাকে না, দেহাদি হইতে সেই অভিমান উঠিয়া গিয়া চিরস্থির নিত্যচৈতন্যে প্রবেশ করে। তখন আর তাহার জীবত্ব থাকে না; সে চিরকাল (কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন-ভাবে) যাহা ছিল, সেই নিত্য চৈতন্যরূপে আপনাকে অনুভব করে। ইহারই নাম শরীরাদি হইতে উত্থান। এই যে চৈতন্যপ্রাপ্তি, ইহাই সমুত্থান। এই অখণ্ড চৈতন্যই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, জ্ঞান হইলে জীবের যাহা স্বরূপ অর্থাৎ অখণ্ড-চৈতন্য, তাহা প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ জ্ঞান হইলে সেই চৈতন্য আবির্ভূত বা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা ত সম্ভব নয়। নির্ব্বিকার

ব্রহ্মচৈতন্য নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, সেত চিরকালই আছে; তাহার আবার আবির্ভাব তিরোভাব কি? সুবর্ণ মলিন হইলে এসিড্ প্রভৃতি দ্বারা সেই মালিন্য নষ্ট করিলে তাহার স্বরূপ পুনরায় আবির্ভূত হয়। দিবসে সূর্য্যকিরণে নক্ষত্রের স্বরূপ আচ্ছন্ন বা অভিভূত থাকে, রাত্রে সূর্য্যকিরণ অপসৃত হইলে নক্ষত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মের ত এরূপ মলিন বা অভিভূত হওয়া সম্ভবই হয় না। সে চৈতন্য আকাশের (space) ন্যায়ই অসঙ্গ স্বভাব, নির্লেপ। অন্য কোন কিছুই তাহাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না।

আর, জীবের স্বরূপের আবির্ভাব হয়—একথা বলিলে একটা গুরুতর দোষও হয় বলিয়া মনে হয়। জীবের স্বরূপ কি?—দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান, ইহাই জীবের লক্ষণ, ইহাই জীবের স্বরূপ। এই স্ব-রূপ আপনার কথিত শরীর হইতে সমুত্থানের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে; দর্শনাদি দ্বারাই জীব যাবতীয় জাগতিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। সুতরাং সমুত্থান হইলেই জীবের স্ব-রূপ নিষ্পাদিত হয়, একথা বলিলে ঐ সমুত্থানের পূর্ব্বে তাহার কোন কার্য্য করাই সম্ভব হয় না। কিন্তু কার্য্য ত সে করিতেছেই। সুতরাং এই যে শরীর হইতে সমুত্থান এবং স্ব-স্বরূপ নিষ্পত্তি—এ দুটী কথা আমি সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না; কৃপা করিয়া একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। শুন! একটী লাল কাচের গ্লাসে জল রাখিলে সে জল লাল বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ জলের কিন্তু কোন রংই নাই; যতক্ষণ না ঐ লাল কাচের গ্লাস হইতে জলকে পৃথক্ করিয়া দেখিবে, ততক্ষণ জলকে লাল বলিয়াই ভ্রম হইবে। যখন ঐ গ্লাসরূপ উপাধি তিরোহিত হইবে, তখন জল আপনার স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইবে; তখন বলা যায় যে, জলের স্বরূপ প্রাপ্তি হইল, যদিও যতক্ষণ জলকে

লাল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, ততক্ষণও তাহার স্বরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। সেইরূপ যতদিন না বিবেক-জ্ঞান জন্মে, ততদিন আত্মাও নানা রকম উপাধির সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কাচের লাল রং যেমন জলেরই আপনার রং বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ জীবের দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞান প্রভৃতি আত্মারই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কিছুই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হয় না, তখন আত্মা স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হন, অখণ্ড নিত্য চৈতন্য রূপেই তিনি তখন আবির্ভূত হন। তখন বলা যায় যে, আত্মার স্বরূপের আবির্ভাব হইল, যদিও সেই স্বরূপ ভ্রমদশাতেও অক্ষুণ্ণই ছিল। এই যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যের স্ফুরণ, ইহারই নাম শরীর হইতে সমুত্থান এবং এই শুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই স্ব-রূপপ্রাপ্তি। শ্রুতি বিবেক ও অবিবেক নিবন্ধনই আত্মাকে সশরীর ও অশরীর বলিয়াছেন। যথা, "আত্মা শরীরে অশরীর" (কঃ ১.২.২২)। স্মৃতিও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, "হে অর্জ্জুন, আত্মা শরীরস্থ হইলেও তিনি কিছু করেন না, কোন কর্ম্ম ফলেও লিপ্ত হন না" (গীঃ ১৩.৩১)। সুতরাং অজ্ঞানকালে আত্মার স্ব-রূপ অজ্ঞাত থাকে বলিয়া তখন সেই স্বরূপের যেন অস্তিত্বই থাকে না, পরে জ্ঞানোদয়ে সেই স্বরূপ জ্ঞাত হয় বলিয়া তাহার আবিভাব হইল বা প্রাপ্তি হইল—এরূপ বলা যাইতে পারে। আর, এইরূপ (জ্ঞান ও অজ্ঞান নিবন্ধন) আবির্ভাব ও তিরোভাব ছাড়া অন্য কোন রকমেই আবির্ভাব ও তিরোভাব কোন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যায় না। যাহার যাহা স্বরূপ, সত্যিকারের প্রকৃতি, তাহা চিরকালই অবিকৃত থাকে। স্বরূপের অভাব বা বিকৃতি হইতেই পারে না। যাহার অস্তিত্বে বস্তুটীর অস্তিত্ব, তাহার

অভাব মানে বস্তুটীরই অভাব। সুতরাং জীবের যাহা পারমার্থিক রূপ, সত্যিকারের রূপ, তাহা চিরকালই অবিকৃত থাকে। তবে হইতে পারে সময়ে তাহা অজ্ঞনাবৃত হয়, এই মাত্র। না হইলে তাহার অভাব হয় বা তাহা কখনও উৎপন্ন হয়, এরূপ কথা হইতেই পারে না।

সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, পার্থক্য, তাহা মিথ্যাজ্ঞান-নিবন্ধন। বস্তুতঃ ঐ উভয়ের কোন ভেদই নাই। জীবের যাহা জীবত্ব, তাহা অজ্ঞানকৃত, কাল্পনিক। সেই কাল্পনিক ভাবটী অপগত হইলে জীবের যাহা সত্যিকারের স্বরূপ, তাহা ও ব্রহ্ম একই। জীবত্ব যে কাল্পনিক, তাহা প্রজাপতির বাক্য পর্য্যালোচনা করিলেও প্রমাণিত হয়। প্রজাপতি, "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন"---এই কথা বলিয়াই বলিলেন, "ইনি অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম"। চক্ষুতে ত একটা প্রতিবিম্বই দেখা যায়। সে প্রতিবিম্ব আর কিছু অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম হইতে পারে না। সুতরাং প্রজাপতি 'চক্ষুতে দৃষ্ট পুরুষ' বলিতে যে যথার্থ আত্ম-স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে জাগ্রৎ দশায় দর্শনাদির কর্ত্তা জীব বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ সে দর্শনাদির কর্ত্তা নয়, পরন্তু অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম; অর্থাৎ জীবভাবটী বাস্তব নহে, ব্রহ্মভাবটীই বাস্তব, সত্য। তারপর, "পুনর্ব্বার তোমাকে **ইহারই** বিষয় বুঝাইতেছি" বলিয়া প্রজাপতি দ্বিতীয় উপদেশে বলিলেন, "ইনিই স্বপ্নে কামনাময় বিষয়ে বিচরণ করেন।" অর্থাৎ যিনি জাগ্রৎ দশায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় ভোগ করিতেছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল, তিনিই আবার স্বপ্নে বাসনাময় বিষয় ভোগ করেন বলিয়া বোধ হয়। তারপর তৃতীয় উপদেশে সুষুপ্তি সম্বন্ধে বলেন, "তখন আমি অমুক, এই সব বিষয় দেখিতেছি, এরূপ জ্ঞান থাকে না,

যেন সবই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।" এই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ জ্ঞানই (ঘটের জ্ঞান, পটের [বস্ত্রের] জ্ঞান ইত্যাদি) থাকে না, কিন্তু জ্ঞাতা যিনি, তিনি অবশ্যই থাকেন। সুষুপ্তি ভঙ্গের পর স্মরণ হয় যে, "আমি কিছুই জানি নাই"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালে কেবল অজ্ঞান বিষয়ক একটা জ্ঞান হইয়াছিল। এবং "বেশ সুখে ঘুমাইয়াছি" এই স্মৃতি হইতে তখন অব্যক্ত রকমের একটা সুখের অনুভূতি হইয়াছিল, এ অনুমানও করা যায়। ইহা ছাড়া সুষুপ্তিকালে বাহ্য বা আভ্যন্তর অন্য কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না। যাহাদের সাহায্যে অন্য পদার্থের জ্ঞান হইবে, সেই সব ইন্দ্রিয়, মন, সকলই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। কেবল আত্মচৈতন্যই জাগ্রত থাকে। সেই আত্মচৈতন্যের অভাব কখনও হইতে পারে না। তবে সাধারণতঃ সেই চৈতন্য যখন বিশেষ বিশেষ বস্তু অবলম্বনে ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হয়, তখনই আমরা তাহার আভাস পাই। যেমন প্রাণশক্তি (force) যখন কোন জড় পদার্থের ভিতর দিয়া ক্রিয়াশীল হয়, তখনই আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, কিন্তু ওরূপ ক্রিয়াশীল না হইলেও যে তাহার অস্তিত্ব থাকে না, এরূপ ত কেহ বলে না, তবে তাহাকে ধরা যায় না—এইমাত্র। সেইরূপ অখণ্ড আত্মচৈতন্যও সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির নিষ্ক্রিয়তায় অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে হইলেও তাহার অস্তিত্ব বাস্তবিক অব্যাহতই থাকে। তার পর প্রজাপতি চতুর্থ উপদেশে "আমি তোমাকে পুনর্ব্বার ইহারই বিষয় বলিতেছি" এই বলিয়া বলিলেন, "সম্প্রসাদ নামক সুষুপ্তি অবস্থার জীব শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।" এই চার উপদেশ একটু প্রণিধান করিয়া দেখ, দেখিবে, প্রজাপতি বুঝাইতে চান যে, যিনি জাগ্রৎ অবস্থার আত্মা তিনিই স্বপ্নাবস্থার আত্মা, তিনিই সুষুপ্ত অবস্থার আত্মা, তিনিই অভয়, অমৃত, ব্রহ্ম। একই

অমৃত অভয় ব্রহ্ম জাগ্রদাদি অবস্থার ভিতর দিয়া, জাগ্রদাদি উপাধি সহযোগে, একবার জাগ্রত, একবার সুষুপ্ত ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে প্রজাপতির উপদেশ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, এই সব অবস্থার পরিবর্ত্তনেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবিকৃতই থাকে; সুতরাং জীবের জীবত্ব—যাহার জন্য জীবকে জীব বলা হয় তাহা— কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অতএব মিথ্যা; আর তাহার যেটী প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নিত্য স্থির, তাহাই সত্য। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। (ব্রঃ সূঃ ৪. ৪. ১-৭ দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ বলেন, জীব জীবরূপেই সত্য। কিন্তু এই মত নিরাকরণ করিবার জন্যই বেদান্তসূত্রের অবতারণা। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর এক, তিনি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার অবিদ্যা বা মায়া নামে অনির্ব্বচনীয় এক শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে ইনি বহুরূপে প্রতীয়মান হন। বস্তুতঃ তিনি ছাড়া জীব, ঈশ্বর ইত্যাদি অন্য স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সূত্রকার পরমেশ্বর বোধক বাক্যে জীবের আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া "অসম্ভবাৎ" এই কারণ দেখাইয়া সেই জীবাশঙ্কার নিরাস করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা এক, নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সৎস্বরূপ। অজ্ঞানী লোক যেমন অজ্ঞান প্রভাবে আকাশকে নীল,মলিন বলে, সেইরূপ পরমাত্মার স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে তাঁহাকে জীব, ঈশ্বর ইত্যাদি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি কাল্পনিক, মিথ্যা। শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে সেই জীবত্ব নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করাই সূত্রকারের অভিপ্রায়। কাজেই জীবকে যদি জীব বলিয়াই মনে কর, তবে সে নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র—প্রথমে এই ভাবে জীবের ভিন্নত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, স্বীকার করিয়া লইয়া, সেরূপ জীব যে দহরাকাশ প্রভৃতি শব্দের

প্রতিপাদ্য হইতে পারে না, তাহা দেখাইলেন। না হইলে জীব বলিয়া যে সত্য সত্যই একটা স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ আছে, একথা প্রতিপাদনের অভিপ্রায় সূত্রকারের নাই। কেবল লোক-প্রসিদ্ধ জীবের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াই সূত্রকারকে ওরূপ বলিতে হইয়াছে, বস্তুতঃ ওরূপ জীবের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির ও সূত্রকারের অভিপ্রায়। সেই জন্যই সূত্রকার বলিতেছেন—

অন্যার্থঃ চ পরামর্শঃ ॥২০॥

এই যে দহরবাক্যের শেষে জীব বর্ণনা তাহা [পরামর্শঃ] জীবের জীবত্ব প্রদর্শনের জন্য নহে, তাহার পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদনার্থই [অন্যার্থঃ]।

প্রজাপতি জীবের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য জীবরূপ প্রতিপাদন করা নহে, পরন্তু তাহার পরমেশ্বররূপ দেখানই ঐ বর্ণনার উদ্দেশ্য। সম্প্রসাদ নামক জীব জাগ্রৎকালে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে বাহ্য বিষয় ভোগ করেন, পরে স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎকালীন অনুভূতির সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্বপ্ন অনুভব করেন; অনন্তর যেন পরিশ্রান্ত হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই রকমের বাসস্থানের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হন। তখন তিনি দহর-নামক পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান, এবং স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাই হইল প্রজাপতির উপদেশের মোটামুটি কথা। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছ যে, জীবের যাহা সত্যিকারের রূপ (অর্থাৎ পরমেশ্বরত্ব), তাহা দেখানই ঐরূপ বিস্তৃত জীব বর্ণনার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু দহর শব্দের অর্থ ত অল্প, ক্ষুদ্র, ছোট। সুতরাং ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য বস্তুকে যখন 'দহর' বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে

পরমেশ্বর বলি কি প্রকারে ?—ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্ববৃহৎ, তাহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই।

অতএব

অল্পশ্রুতেঃ ইতি চেৎ ?---

শ্রুতিতে এই অল্প (দহর) শব্দ আছে বলিয়া যদি দহরাকাশকে ব্রহ্ম না বলি ?---

গুরু।　　**তৎ উক্তম্ ॥২১॥**

একথার উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। ১. ২. ৭ সূত্রে এরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, "যেখানে অগ্নি দূরে থাকুক, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ইহারাও প্রকাশ পায় না। তিনিই কেবল প্রকাশ পাইতেছেন ; তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সূর্য্যাদি প্রকাশ পায়, আলোক বিতরণ করে ; তাঁহারই আলোকে সমস্ত পদার্থ প্রতিভাত হয়" ইত্যাদি (মুঃ ২. ২. ১০)। অর্থাৎ তাঁহারই সত্তায় সূর্য্যাদির সত্তা, তাঁহারই অস্তিত্বে ইহাদের অস্তিত্ব, তাঁহারই আলোকে ইহাদের আলোক। ইহারা সম্পূর্ণরূপে সেই স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর অধীন ; তিনি স্বপ্রকাশ, অন্য সব তাঁহারই প্রকাশের—তাঁহারই জ্যোতির **অনুকরণ** করে মাত্র। তিনিই স্বীয় জ্যোতিতে সকল প্রকাশিত করেন, অন্য কিছুই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই শ্রুতিতে বিশ্বের প্রকাশক, অবভাসক যে বস্তুর কথা বলা হইল, তাহা কি সূর্য্যাদি হইতে অধিক প্রকাশবান্ কোন অলৌকিক জ্যোতিঃ-পদার্থ, না ব্রহ্ম ?

গুরু। তিনি ব্রহ্মই,

অনুকৃতেঃ

"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্"—তিনি প্রকাশ পান বলিয়া অন্য সব প্রকাশ পায়, তাঁহারই প্রকাশের অনুকরণ অন্য সকলে করে—এই অনুকরণ কথায় তাঁহার ব্রহ্মত্বই নিশ্চিত হয়। একটী প্রদীপ দিয়া আর একটী প্রদীপ দেখিতে হয় না। সেইরূপ সূর্য্যাদির ন্যায় একটী অলৌকিক জ্যোতিষ্কের আলোকে আলোকিত হইয়া সূর্য্যাদি প্রকাশ পায়—একথা সঙ্গত হয় না।

শিষ্য। তাহা হইলে কি সূর্য্যাদি স্বতঃই প্রকাশ পায়?

গুরু। না,

তস্য চ ॥ ২২ ॥

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তাঁহারই প্রকাশে এই সব প্রকাশ পায়—এই কথায় সূর্য্যাদির জ্যোতিও তাঁহারই অধীন, স্বাধীন নয়, ইহা জানা যায়।

প্রারম্ভে ব্রহ্মকেই স্বয়ংজ্যোতি সর্ব্বাবভাসক বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনাই নাই। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের অবভাসক ব্রহ্মই।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

আর [অপি চ] স্মৃতি শাস্ত্রেও এই শ্রুতির অনুরূপ উক্তি আছে [স্মর্য্যতে], সে স্থলে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মকেই সর্ব্বাবভাসক বলা হইয়াছে। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, "সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি কিছুই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না...। সূর্য্যাদির যে জ্যোতি বা তেজ, তাহা পরমেশ্বরেরই জ্যোতি (গীঃ ১৫.৬-১২)।

শিষ্য। কঠ উপনিষদে (২.৪.১৩) আছে, "দেহের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আছেন। তিনি ধূমহীন জ্যোতির ন্যায়। তিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশান, শাসক, নিয়ন্তা। তিনি আজও আছেন, কালও আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান। (তুমি যাঁহাকে জানিতে চাও) ইনিই তিনি"। এই যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইনি কি জীবাত্মা, না পরমাত্মা ?

গুরু। শব্দাৎ এব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

এই যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ [প্রমিতঃ], ইনি পরমাত্মা। ঐ শ্রুতির স্বকীয় শব্দ হইতেই [শব্দাদেব] ইহা নিশ্চিত হয়। শ্রুতি এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ভূত ভবিষ্যৎ যাবতীয় পদার্থের ঈশান (নিয়ন্তা) বলিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ এরূপ নিয়ন্তা হইতে পারে না। নচিকেতা ব্রহ্মকেই জানিতে চাহিয়াছিলেন। যম এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে জানিতে চাও, ইনিই সেই।" সুতরাং অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ যে পরমাত্মা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্য। কিন্তু পরমাত্মা ত সর্ব্বব্যাপী অতি বৃহৎ, তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বলা যায় কিরূপে ?

গুরু। হৃদি-অপেক্ষয়া তু—

পরমাত্মার ওরূপ ক্ষুদ্র একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে [হৃদ্যপেক্ষয়া] বলা হইয়াছে। হৃদপদ্মস্থ ছিদ্র অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, সেই স্থানে পরমাত্মার বিশেষ অভিব্যক্তি, প্রকাশ হয়, এই জন্য তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু জীব ত নানা রকমের আছে, কেহ অতি ক্ষুদ্র, কেহ

অতি বৃহৎ; সকলের হৃদয় ত সমান নয়, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও নয়। কাজেই পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলি কি প্রকারে? মনুষ্যের হৃদয় না হয় সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কিন্তু মশক, পিপীলিকা, হস্তী প্রভৃতির হৃদয় ত আর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নয়।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা বটে। কিন্তু শ্রুতি মনুষ্যের হৃদয় লক্ষ্য করিয়াই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়াছেন, অন্য প্রাণীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই—

মনুষ্য-অধিকারাৎ ॥ ২৫ ॥

কারণ, শাস্ত্র মনুষ্যকেই অধিকার করে; উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে-মনুষ্যেরই অধিকার আছে, অন্য প্রাণীর নাই। সুতরাং মনুষ্যের হৃদয়-পরিমাণ অনুসারেই পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলা হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এস্থলে যখন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ দেখিতে পাই, এবং কোন কোন স্মৃতি শাস্ত্রেও যখন জীবাত্মাকেই স্পষ্টভাবে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে, তখন ত ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে জীবাত্মা বলিয়াই মনে হয়।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা ঠিক বটে। জীবাত্মাকেই বাস্তবিক অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বলা যায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাঁহাকেই ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব্ব পদার্থের নিয়ন্তাও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবাত্মার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। শ্রুতি আলোচনা করিলে দুই জাতীয় শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়। কোথাও শ্রুতিবাক্য পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করেন, কোথাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদন করেন। এস্থলেও উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায়। যথা, "প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অন্তরাত্মারূপে বিরাজ

করিতেছেন। সাধক ধৈর্য্য সহকারে মুঞ্জাতৃণ হইতে ঈশিকার (মাজের) ন্যায় পঞ্চকোষময় শরীর হইতে তাঁহাকে উদ্ধৃত করিবেন এবং তাঁহাকেই শুদ্ধ, অমৃত বলিয়া জানিবেন" (কঃ ২.৬.১৭)।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার; আর, শাস্ত্র ভিন্ন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, একথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। তাহা হইলে মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাণী যে দেবতা প্রভৃতি, তাঁহাদের কি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই?

গুরু। হ্যাঁ, শাস্ত্র মনুষ্যদিগের জন্যই বটে, অন্য প্রাণীর জন্য নহে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, অন্য কাহারও নহে —এমন কোন নিয়ম নাই।

তদুপরি অপি বাদরায়ণঃ, সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

বাদরায়ণ আচার্য্য [বাদরায়ণঃ] বলেন, তাহাদের অর্থাৎ মনুষ্যদের উপরে [তদুপরি] দেবতা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাঁহাদেরও [অপি] ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে; যেহেতু, যে সব কারণে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার হইতে পারে, সেই সব কারণ তাঁহাদেরও সম্ভব [সম্ভবাৎ]।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা, সামর্থ্য ইত্যাদি থাকিলেই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার হয়। দেবতাদের পদ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিও অনিত্য। সুতরাং নিত্যা-নিত্যবিবেকক্রমে সাধনচতুষ্টয় তাঁহাদেরও সম্ভব। তারপর বেদ, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ সর্ব্বত্রই তাঁহাদের শরীর, ইন্দ্রিয় থাকার কথা আছে। কাজেই সাধন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সামর্থ্যও তাঁহাদের আছে। দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী, এরূপ নিষেধ কোথাও নাই। সুতরাং দেবতারাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী।

শিষ্য। কিন্তু দেবতাদের ত উপনয়ন হয় না। উপনয়ন না হইলে কেহ শাস্ত্রপাঠেও অধিকারী হয় না। ব্রহ্মকে আবার শাস্ত্র ভিন্ন জানাও যায় না। সুতরাং উপনয়ন না হওয়ায় দেবতাদের ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার হইতে পারে না।

গুরু। না, দেবতাদের উপনয়ন না হইলেও তাঁহারা অনধিকারী নয়। কারণ, বেদাধ্যয়নের অধিকার পাইবার জন্যই উপনয়ন। কিন্তু বেদের অর্থ দেবতাদের স্বয়ং প্রতিভাত, অধ্যয়ন না করিলেও বেদ তাঁহাদের আপনা হইতেই পরিজ্ঞাত। আর শ্রুতিতেও ইন্দ্রাদি দেবতা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য একাধিক শত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন—এরূপ উক্তি আছে। সুতরাং দেবতা এবং ঋষিদের কর্ম্মকাণ্ডে (যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে) অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, এ কথা কিরূপে বলিবে ?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, দেবতাদের শরীর আছে। কিন্তু তাঁহাদের শরীর স্বীকার করিলে যে একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়। মনে করুন, এক সময়ে একহাজার লোকে বিভিন্ন দেশে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিতেছে। ইন্দ্র কিন্তু শরীরধারী এক জন। তিনি সশরীরে কিরূপে হাজার জায়গায় একসঙ্গে উপস্থিত হইয়া আহুতি গ্রহণ করিবেন ? সুতরাং দেবতাদের শরীর স্বীকার করিলে—

বিরোধঃ কর্ম্মণি ইতি চেৎ ?—

যজ্ঞাদি কার্য্যে [কর্ম্মণি] এক সময়ে এক শরীরধারী দেবতার বহু স্থানে উপস্থিত থাকা-রূপ বিরোধ, অসম্ভাবনা [বিরোধঃ] উপস্থিত হয়, একথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু।　ন, অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ ॥২৭॥

না, তাহা বলিতে পার না, অর্থাৎ দেবতাদের শরীর আছে, একথা বলিলেও কোন বিরোধ হয় না [ন]; যেহেতু, একই দেবতা একই সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন [অনেকপ্রতিপত্তেঃ], একথা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বত্রই দেখা যায় [দর্শনাৎ]।

দেবতাদের এমন ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা এক সময়ে বহুশরীর ধারণ করিতে পারেন। কাজেই এক সময়ে বহু যজ্ঞে উপস্থিত থাকা একই দেবতার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে অন্তর্ধান শক্তি বলে তাঁহারা অদৃশ্য থাকেন, এইমাত্র।

শিষ্য। আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম, এক সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন বলিয়া শরীর স্বীকার করিলেও যজ্ঞাদি কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু জৈমিনি মুনি তাঁহার পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য স্বতঃ সিদ্ধ। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শব্দ নিত্য অনাদি; শব্দের অর্থও নিত্য, অনাদি এবং অমুক শব্দের অমুক অর্থ—ইহা নিয়ত, চিরকালই এক শব্দের একই অর্থ; সুতরাং শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধও নিত্য, অনাদি। এবং সেই জন্য বৈদিক শব্দসমূহের অর্থবোধ আপনা হইতেই হয়, অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণের সাহায্য ব্যতীতই তাহাদের অর্থবোধ হয়। অতএব বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দেবতাদের যদি শরীর থাকে, তবে তাঁহাদের জন্মমৃত্যুও আছে, অর্থাৎ তাঁহারা অনিত্য, সাদি। অতএব যে সমস্ত বৈদিক শব্দের অর্থ ইন্দ্রাদি দেবতা, সেই সমস্ত শব্দও অনিত্য, সাদি,—দেবতাদের জন্মের পরেই ত সেই দেবতাবোধক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেবতার শরীর স্বীকার করিলে—

শব্দে ইতি চেৎ ?—

বৈদিক শব্দের সহিত [শব্দে] ত বিরোধ হয়, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়া যায়—একথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু। ন, অতঃ প্রভবাৎ—

না, শব্দের সহিতও বিরোধ হয় না [ন] ; যেহেতু, এই শব্দ হইতেই [অতঃ] দেবতা প্রভৃতি সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয় [প্রভবাৎ]। বৈদিক শব্দ হইতে দেবতা ও সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয় বলিয়া শব্দের প্রামাণ্যেরও কোন বাধা হয় না।

শিষ্য। আপনার একথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। দেবদত্তের পুত্র হইলে পরেই ত তাহার যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি নাম করা হয়। সেইরূপ ইন্দ্রাদির জন্ম হইলে পরেই তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং এই ইন্দ্রাদি শব্দ ত আদিমান্, অতএব অনিত্য। সুতরাং শব্দ হইতে ইন্দ্রাদির উৎপত্তি হয়, একথা বলিলেই বা কিরূপে শব্দবিরোধ দূর হয় ? আর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ব্রঃ সূঃ ১. ১. ১] ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্ম হইতেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও জগতের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এখানে বলিতেছেন, শব্দ হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়। একথার তাৎপর্য্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস ! শুন—মনে কর, আজ একটী গরু জন্মিল। ভাবিয়া দেখ, এস্থলে গো-ব্যক্তিরই (individual) জন্ম হইল, কিন্তু গোত্ব (type) অর্থাৎ যে সব ধর্ম্ম থাকিলে গরুকে গরু বলা যায়, সেই সকল সাধারণ ধর্ম্ম—উৎপন্ন হয় না, তাহা চিরকালই আছে। এই যে সাধারণ ধর্ম্মসমষ্টি, যাহা অন্যান্য সমস্ত প্রাণী হইতে গরুর বিশেষত্ব সম্পাদন করে,

তাহা এক একটি বিশেষ বিশেষ গরুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া উৎপন্ন হয় না। এই সাধারণ ধর্ম্মসমষ্টিকে ন্যায়ের ভাষায় **জাতি** বা **আকৃতি** বলে। আর, জাতি বা আকৃতি বিশিষ্ট এক একটী বিশেষ বিশেষ পদার্থকে সেই জাতীয় **ব্যক্তি** বলে। যখন একটী ব্যক্তির জন্ম হয়, তখন সেটী সেই জাতির নামেই পরিচিত হয়। সুতরাং দেখিতেছ, জাতির উৎপত্তি নাই, কেবল ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়। 'গরু' এই যে একটী শব্দ,ইহার অর্থ গো-জাতি, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট গরু নয়। সুতরাং ব্যক্তির উৎপত্তি হইলেও শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধের কোন ব্যাঘাত হয় না। সেইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দের আদি অর্থ ইন্দ্র-জাতি, কোন বিশেষ ইন্দ্র নয়। আর ইন্দ্রাদি শব্দ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, উহা এক একটা পদ বোধক (যেমন বড়লাট)। যে যখন ঐ পদ অধিকার করে, তখন তাহাকেই ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করা হয়, সুতরাং ইন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দেবতার জন্ম হইলেও বৈদিক শব্দের সাদিত্ব হয় না, ফলে তাহাদের প্রামাণ্যেরও কোন ব্যাঘাত হয় না।

তোমার দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে, ব্রহ্মকে যে ভাবে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, শব্দকে সেইরূপ কারণ বলা হয় না। ব্রহ্ম এই জগৎরূপে প্রতীয়মান হন বলিয়া তিনি এই জগতের উপাদান কারণ। আর শব্দ ব্যবহার সম্পাদক নিমিত্ত কারণমাত্র। জগতের সমস্ত পদার্থেরই এক একটা নাম আছে। ঐ নাম বা শব্দের দ্বারাই সেই সেই পদার্থ অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্মচৈতন্য আছেন বলিয়াই এই জগতের অভিব্যক্তি ; সেইরূপ নাম বা শব্দ আছে বলিয়াই পদার্থের ব্যবহার-যোগ্যতা। এইভাবে শব্দকেও জগতের কারণ বলা যাইতে পারে। যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ, সমস্তই শব্দপূর্ব্বক সৃষ্ট। প্রথমে শব্দ, পরে সেই

শব্দপ্রতিপাদ্য পদার্থের সৃষ্টি। আমরা প্রত্যক্ষও দেখিতে পাই যে, যখন কেহ কোন বস্তু প্রস্তুত করেন, তখন তিনি প্রথমে মনে মনে তাহার একটা আকৃতি (design) কল্পনা করেন ও একটা নাম ঠিক করিয়া লন, পরে সেই বস্তুটি প্রস্তুত করেন। সেইরূপ আমরা অনুমান করিতে পারি যে, জগৎস্রষ্টাও সৃষ্টির পূর্ব্বে এক একটী বস্তুর এক একটী নাম স্মরণ করিয়া সেই সেই বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য। কিন্তু শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হয়, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু আছে কি ?

গুরু। নিশ্চয়ই, জগৎ যে শব্দ হইতে সৃষ্ট, ইহা

প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা জানা যায়। শ্রুতির প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য। আর, অনুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক (যাহা একদিন প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কেবল তাহারই অনুমান হইতে পারে, যাহা কোনদিন প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার অনুমানও করা যায় না), স্মৃতিও সেইরূপ শ্রুতিমূলক, শ্রুতির অনুরূপ বা অনুপূরক (Complementary), সুতরাং স্মৃতি অনুমান বলিয়া গণ্য। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই বলেন যে, সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বক।

সুতরাং দেখিতেছ, জগতের সমস্ত বস্তুরই এক একটা জাতি বা আকৃতি আছে এবং সেই আকৃতি নিত্য, এবং সেই নিত্যজাতি-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি বৈদিক শব্দ হইতেই হয়।

অতঃ এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

আর [চ] এই জন্যই [অতএব] বেদের নিত্যত্ব। যেহেতু

দেবাদি আকৃতি নিত্য, এবং যেহেতু বৈদিক শব্দ সমূহ সেই আকৃতিরই বাচক, সেইহেতু বেদও নিত্য।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতি ও স্মৃতিতে দেখিতে পাই যে, মহা-প্রলয়ে সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুই থাকে না; পরে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি হয়। তাহা হইলে নাম, নামী ও নাম-কর্ত্তা এ সকলেরও বিলয় হয়। সুতরাং বেদের শব্দগুলি নিত্য, চিরস্থায়ী, একথা বলেন কিরূপে? কাজেই শব্দবিরোধ ত থাকিয়াই যাইতেছে?

গুরু। সমান-নামরূপত্বাৎ চ আবৃত্তৌ অপি অবিরোধঃ, দর্শনাৎ, স্মৃতেঃ চ ॥৩০॥

প্রলয়ের পরে আবার যখন সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিতেও [আবৃত্তৌ অপি] সৃষ্টপদার্থ সমূহের পূর্ব্বকল্পে যার যে নাম ও আকৃতি ছিল, সেইরূপ নাম ও আকৃতিই হয় বলিয়া [সমাননামরূপত্বাৎ] শব্দবিরোধও হয় না [অবিরোধঃ চ], একথা প্রত্যক্ষ শ্রুতি হইতে [দর্শনাৎ] ও [চ] স্মৃতি হইতে [স্মৃতেঃ] জানা যায়। সংসার যে অনাদি, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। একবার সৃষ্টি, একবার প্রলয়, আবার সৃষ্টি আবার প্রলয়—এইরূপ সৃষ্টির প্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সংসার যে অনাদি, একথা সূত্রকার "উপপদ্যতে ঽ অপি উপলভ্যতে চ" (ব্রঃ সূঃ ২.১.৩৬) এই সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই অনাদি সৃষ্টি প্রবাহে পর পর যে সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপই হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এ বিষয়ে প্রমাণ।

আবার দেখ, সুষুপ্তির সঙ্গে প্রলয়ের, এবং প্রবোধের (জাগরণের) সঙ্গে সৃষ্টির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেই জন্য সুষুপ্তিকে দৈনন্দিন প্রলয় ও প্রবোধকে দৈনন্দিন সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। শ্রুতি বলেন, "সুপ্ত পুরুষ যখন কিছুই দেখে না, স্বপ্নও দেখে না, এই সমস্ত তখন প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়, মন, সকলেই তখন স্ব স্ব বিষয়সহ প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। তারপর সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, জাগরিত হয়, তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়াদি নির্গত হইয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়" (কৌঃ ৩. ৩)। এ স্থলে একটি বিষয় মনে রাখিও :—এই দৈনন্দিন প্রলয়ে ইন্দ্রিয়াদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না, উহাদের আত্যন্তিক অভাব (total extinction) হয় না ; সকলই থাকে, তবে অব্যক্ত বীজরূপে, সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে সকলই বর্ত্তমান থাকে, পরে জাগরণ হইলে সেই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি আবার স্থূলাকার প্রাপ্ত হয় মাত্র। প্রলয়েও ঠিক এই অবস্থাই হয় ; একেবারে অভাব কোন বস্তুরই হয় না। সকলই বীজরূপে থাকে, সৃষ্টিকালে আবার ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় যাহাতে আবার সৃষ্টি হইতে পারে, এমন একটা শক্তি অবশ্যই থাকে, সেই শক্তির বিকাশই নূতন সৃষ্টি। তাহা না হইলে একেবারে কিছুই নাই, অথচ অকস্মাৎ কিছু-না হইতে একটা কিছু হইল—এরূপ অসম্ভব কল্পনা করিতে হয়। (ব্রঃ সূঃ ২. ২. ৩৬ দ্রষ্টব্য)। পরে এসম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাইবে।

শিষ্য। আপনি যে সুষুপ্তির দৃষ্টান্তে প্রলয়ের ব্যাখ্যা করিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সুষুপ্তিতে যে ব্যক্তি নিদ্রিত হয় কেবল তাহারই সমস্ত ব্যবহার লুপ্ত হয়, অন্য সকলের ক্রিয়াকলাপ

যেমন তেমনই চলিতে থাকে। আর সুষুপ্তিভঙ্গের পর যখন প্রবোধ হয়, তখন পূর্ব্বের সমস্ত বৃত্তান্তই স্মরণ হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সকলের ক্রিয়া কলাপই লুপ্ত হয়। আর পূর্ব্বজন্মের কথাই যখন কাহারও মনে থাকে না, তখন পূর্ব্বকল্পে (সৃষ্টিতে) যে সমস্ত ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা স্মরণ ত একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এ দৃষ্টান্তটী যেন ঠিক খাটিতেছে না।

গুরু। দেখ, মহাপ্রলয়ে সকলের ব্যবহার লুপ্ত হয় সত্য, কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পরম ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষগণের পূর্ব্ব কল্পের ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা সাধারণ মানুষ পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে না পারিলেও স্রষ্টার পূর্ব্বকল্পের কথা স্মরণ হওয়া অসম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তির তুলনা হইতে পারে না। সাধারণ মানুষ ত একটী বালুকা কণাও সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং মানুষের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত মনে থাকে না বলিয়া যে সৃষ্টিকর্ত্তারও থাকিবে না, এমন কথা হইতে পারে না। এমন শক্তিশালী মানুষও দেখা যায়, যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের কথা অবিকল বলিয়া দিতে পারেন। জ্ঞানের ও ক্ষমতার তার-তম্য ত প্রত্যক্ষই দেখা যায়। সুতরাং পরম ঐশ্বর্য্য (শক্তি) শালী হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জগৎ স্রষ্টারা যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তদনুরূপ সৃষ্টি করেন, এ আর আশ্চর্য্যই বা কি? শ্রুতি ও স্মৃতিতে এরূপ কথা যথেষ্টই আছে।

আরও দেখ, ধর্ম্মের (সুকর্ম্মের) ফল সুখ, এবং অধর্ম্মের (অপকর্ম্মের) ফল দুঃখ;—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং প্রাণী মাত্রেরই স্বভাবতঃ সুখের প্রতি অনুরাগ ও দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মই মানুষকে স্বভাবতঃ সুখ-

দুঃখের দিকে পরিচালিত করে। হিংস্র, প্রেমিক, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, মিথ্যাবাদী—এইরূপ প্রাণীদিগের মধ্যে চরিত্রগত একটা বৈষম্য দেখা যায়, ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে পূর্ব্ব সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না (ব্রঃ সূঃ ২. ১. ৩৪-৩৬ দ্রষ্টব্য)।

অতএব, যেহেতু পরসৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান, সেই হেতু প্রলয়কালেও জগতের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, বীজ বা শক্তিরূপে জগৎ থাকে। কাজেই তুমি যে শব্দ প্রামাণ্যের ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহাও হয় না। শ্রুতি, স্মৃতি, সর্ব্বত্রই পরসৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান বলিয়া জানা যায়।

শিষ্য। আচ্ছা, দেবতাদের শরীর স্বীকার করিলেও বেদের নিত্যতা নষ্ট হয় না, একথা বুঝিলাম। কিন্তু তথাপি তাঁহারাও যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, একথা এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। কারণ—

মধু-আদিষু অসম্ভবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ ॥৩১॥

জৈমিনি আচার্য্য বলেন [জৈমিনিঃ] দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই [অনধিকারম্], যেহেতু 'মধুবিদ্যা' প্রভৃতি দেবতাদের পক্ষে অসম্ভব [মধ্বাদিষসম্ভবাৎ]।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যকে মধুরূপে উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে **মধুবিদ্যা** বলে। মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা। এক্ষণে দেবতাদের বিদ্যায় অধিকার আছে, একথা বলিলে তাঁহাদের মধুবিদ্যাতেও অধিকার আছে, একথাও বলিতে হয়। কিন্তু সূর্য্য এক দেবতা, সে ত আর নিজেকেই মধুরূপে উপাসনা করিতে পারে

না। সুতরাং মধুবিদ্যায় সূর্য্যের অধিকার থাকিতে পারে না। এই দৃষ্টান্তে কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, দেবতাদের বিদ্যায় কোন অধিকার নাই। ইহা পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনির মত।

আর, দেবতারা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট চেতন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই।

জ্যোতিষি ভাবাৎ চ॥৩২॥

আর [চ] সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র ইত্যাদি যাহাদিগকে সাধারণতঃ দেবতা বলিয়া বলা হয়, তাহারা জড় জ্যোতিষ্ক-পিণ্ডরূপে অবস্থিত আছে বলিয়া [জ্যোতিষি ভাবাৎ] দেবতাদের বিদ্যায় অধিকার স্বীকার করা যায় না।

সূর্য্য প্রভৃতি বাস্তবিক জড় পদার্থ। কাজেই কোনরূপ উপাসনা করা বা জ্ঞানলাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাহাদের বিদ্যায় অধিকার থাকিতে পারে না। তবে বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে যে দেবতাদিগকে হস্তপদবিশিষ্ট চেতন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই, উহা গল্পমাত্র। প্রত্যক্ষ, অনুমান, কোন প্রমাণেই ওরূপ বর্ণনার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায় না। বেদের বর্ণনাও এক একটা যাগ যজ্ঞের স্তুতি বা প্রশংসার জন্যই করা হইয়াছে, বাস্তবিক ওরূপ দেবতা যে সত্য সত্যই আছে, একথা প্রতিপাদন করা ঐ বেদাংশের উদ্দেশ্য নয়, এবং সে বিষয়ে বেদের সেই অংশের প্রামাণ্যও নাই। জৈমিনি আচার্য্য যখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন দেবতাদের বিদ্যায় অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয়।

গুরু। বৎস! এ বিষয়ে আচার্য্য বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত শুনিলে তোমার সকল সন্দেহের নিরাস হইবে।

ভাবং তু বাদরায়ণঃ, অস্তি হি ॥৩৩॥

কিন্তু [তু] আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন [বাদরায়ণঃ] দেবতাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে [ভাবম্]; যেহেতু [হি], অধিকার যে সব কারণে হইতে পারে, তাহা দেবতাদের আছে [অস্তি]।

দেবতাদের শরীর আছে, তাঁহারা চেতন, শাস্ত্রার্থ তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহারাও বিদ্যায় অধিকারী। বিশেষ শ্রুতিতে দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যালাভের কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

মধুবিদ্যায় সূর্য্যের অধিকার নাই বলিয়া যে অন্যবিদ্যায়ও তাঁহার অধিকার থাকিবে না, এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। ব্রাহ্মণের রাজসূয়যজ্ঞে অধিকার নাই, সেই জন্য কোন যজ্ঞেই তাঁহার অধিকার নাই—একথা ত জৈমিনিও বলেন না।

আর, দেবতাদের শরীরাদির বর্ণনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও শ্রুতির উক্তি উড়াইয়া দিবে কিরূপে? শ্রুতির এক অংশ প্রামাণ্য, অন্য অংশ অপ্রামাণ্য—এরূপ সুবিধামত ব্যাখ্যা করিলে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ শ্রুতির ঐ বর্ণনা যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী হইত, তবে না হয় প্রশংসার্থ বা ওরূপ একটা কিছু বলিয়া সে বর্ণনা উপেক্ষা করা যাইত। কিন্তু ঐ বর্ণনা ত কোন প্রমাণের বিরুদ্ধ নয়। প্রত্যক্ষ যাহা না দেখিবে, তাহাই নাই, একথা ত বলিতে পার না। সুতরাং বেদাদিতে যখন দেবতাদের শরীর ও চেতনত্বের বর্ণনা আছে, এবং সেই বর্ণনা যখন একটা অসম্ভব কিছু নয়, তখন তাঁহাদের বিদ্যায় অধিকার থাকিতে বাধা কি?

আর, দেবতাদের শরীরাদি আছে, একথা প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে

পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিদেরও যে প্রত্যক্ষ হয় নাই, এ কথা বলিবে কিরূপে? ঋষিরা যে দেবতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই আলাপ ব্যবহার করিতেন, তাহা ত বহু স্মৃতিতেই দেখিতে পাই। আমরা আজকাল দেবতা দেখিতে পাই না বলিয়া পূর্ব্বেও কেহ দেখে নাই—এরূপ বলিলে ইহাও বলিতে হয় যে, এখন যেমন সার্ব্বভৌম রাজা নাই, তখনও ছিল না, কোন কালেই ছিল না; ফলে রাজসূয়যজ্ঞের বিধানও শাস্ত্রে অনর্থক করা হইয়াছে, অতএব ঐ শাস্ত্র মিথ্যা। এইভাবে সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা হইয়া পড়ে, কারণ শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ত আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

যোগ প্রভাবেও দেবতা সাক্ষাৎকরা যায়। যোগশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে দেবতা প্রত্যক্ষ হয়।

সুতরাং দেবতাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।

শিষ্য। দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকার যে সমস্ত কারণ বলিলেন, তাহাত শূদ্রেরও আছে। তবে কি শূদ্রও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী?

ছান্দোগ্য উপনিষদের সম্বর্গবিদ্যা প্রকরণে শূদ্রেরও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা আছে। জানশ্রুতি নামে একরাজা গ্রীষ্মকালে একদিন ছাতের উপর শুইয়া ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ঋষি হংসরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছিলেন। পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে ডাকিয়া বলিল, "ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতেছ না, এই রাজার তেজ স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রসৃত হইতেছে, সাবধান, ইহাকে লঙ্ঘন করিও না, তুমি ভস্ম হইয়া যাইবে।" একথা শুনিয়া ভল্লাক্ষ বলিল,

"তুমি ত ভারি ভয় দেখাইতেছ। এ কি মহাত্মা রৈক, যে এর অবমাননা করিলে কোন ভয়ের আশঙ্কা আছে? এর যখন বিদ্যা নাই, তখন ত এ অতি হেয়।" এ কথা শুনিয়া জানশ্রুতির মনে ধিক্কার জন্মিল। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া রৈক্কের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। রৈক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে মনে হয়, জানশ্রুতি শূদ্র ; এবং তিনি যখন রৈক ঋষির নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, রৈকও তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে— একথা স্বীকার করিতে হয়।

উত্তর — না, শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই। শূদ্রের উপনয়ন হয় না, উপনয়ন না হইলে বেদ পাঠ করিবার অধিকার হয় না, বেদ পাঠ না করিলে তাহার অর্থও জানা যায় না, ফলে বেদোক্ত উপদেশ পালন করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। শূদ্র মোক্ষ কামনা করিতে পারে সত্য, এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যও আছে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রলভ্য। সেই শাস্ত্রে যখন শূদ্রের অধিকার নাই, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার নাই। শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

সম্বর্গবিদ্যায় যে শূদ্র শব্দের উল্লেখ আছে, বাস্তবিক তাহার অর্থ জাতি-শূদ্র নহে ;—

শুক্-অস্য তৎ-অনাদর-শ্রবণাৎ তৎ-আদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥৩৪॥

যেহেতু [হি], ঐ 'শূদ্র' শব্দ দ্বারা সূচনা করা হইয়াছে [সূচ্যতে] যে, সেই হংসরূপী ঋষির অনাদর বাক্য শ্রবণ করিয়া [তদনাদরশ্রবণাৎ]

এই জানশ্রুতির [অস্য] শোক, খেদ [শুক্] হইয়াছিল, এবং যেহেতু সেই শোকে তিনি রৈক্কের নিকট গমন করিয়াছিলেন [তদাদ্রবণাৎ]।

হংসরূপী ঋষি যখন জানশ্রুতিকে বিদ্যাহীন বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতির বড় শোক (খেদ) হইল। যখন তিনি সেই শোকে আকুল হইয়া রৈক্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রৈক্ক ধ্যানবলে বুঝিতে পারিলেন যে, জানশ্রুতি নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। তাই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "অরে শূদ্র—অর্থাৎ হে শোকাভিভূত জানশ্রুতি"—ইত্যাদি। স্পষ্টভাবেই যখন জাতিশূদ্রের বেদে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন রৈক্কোক্ত শূদ্র শব্দের এইরূপ যৌগিক (etemological) অর্থ ছাড়া প্রসিদ্ধ জাতিশূদ্র অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—শুচ্-দ্রু+অ, শুচা (শোকের জন্য) দুদ্রুবে (গমন করিয়াছিল), অর্থাৎ শোকে আকুল হইয়া গমন করে যে, সে শূদ্র। এই অর্থই এস্থলে সমীচীন।

জানশ্রুতি যে জাতি-শূদ্র নয়, তাহার অন্য কারণ এই যে,

ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ চ, উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥৩৫॥

পরবর্ত্তী বাক্যে [উত্তরত্র] চিত্ররথ বংশীয় এক ক্ষত্রিয়ের সহিত [চৈত্ররথেন] এক সঙ্গে উক্ত হওয়া রূপ লিঙ্গ, চিহ্ন, ইঙ্গিত থাকায় [লিঙ্গাৎ] জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায় [ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ]।

পরবর্ত্তী বাক্যে ক্ষত্রিয় চৈত্ররথির সহিত জানশ্রুতির এক সঙ্গে ভোজন ও ভিক্ষার উল্লেখ আছে। উভয়ে এক জাতীয় না হইলে এক সঙ্গে

ভোজন হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। সুতরাং শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

আর, যে যে স্থলে বিদ্যার উপদেশ আছে, সেই সেই স্থলেই

সংস্কার-পরামর্শাৎ তৎ-অভাব-অভিলাপাৎ চ ॥৩৬॥

উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারের উল্লেখ আছে এইজন্য [সংস্কারপরামর্শাৎ] এবং [চ] শূদ্রের সেই সমস্ত সংস্কার নাই, ইহাও উক্ত হইয়াছে, এইজন্য [তদভাবাভিলাপাৎ] শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

উপনয়ন ব্যতীত যখন বিদ্যায় অধিকার জন্মে না, এবং শূদ্রের উপনয়ন যখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার বিদ্যাধিকার নাই—ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

তদভাবে-নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

আর [চ] শূদ্রত্বের অভাব, অর্থাৎ শূদ্র নয় একথা [তদভাব-] নির্দ্ধারিত, নিশ্চিত হইলে পরেই [নির্দ্ধারণে] বিদ্যাদানের প্রবৃত্তি দেখিতে পাই বলিয়া [প্রবৃত্তেঃ] বলিতে হয়, শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

জবালার পুত্র সত্যকাম মাতাকর্ত্তৃক গুরু সমীপে গমনের জন্য আদিষ্ট হইয়া যখন মাতার নিকট নিজের গোত্র কি জানিতে চাহিল, তখন জবালা বলিলেন, "বৎস! আমি গুরুজনের সেবায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার গোত্র কি তাহা জানিবারও আমার অবসর হয় নাই। তুমি যাও, যাইয়া বল যে, তোমার নাম সত্যকাম, এবং তুমি জবালার পুত্র।" সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিল। গৌতম তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক সরলভাবে বলিল, "আমি আমার গোত্র জানি না, মাও জানেন না; তিনি বলিলেন, তুমি বলিও, আমি জাবাল (জবালার পুত্র) এবং আমার নাম সত্যকাম।" এই কথা শুনিয়া ঋষি ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই বালক শূদ্র নয়, কারণ শূদ্র কখনও এরূপ নির্ভীক সরলতার সহিত এরূপ সত্য বলিতে পারে না। সত্যকাম যে শূদ্র নয়, এ কথা নিশ্চয় করিয়াই গৌতম তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

শ্রবণ-অধ্যয়ন-অর্থ-প্রতিষেধাৎ স্মৃতেঃ চ অস্য ॥ ৩৮ ॥

স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [স্মৃতেশ্চ] জানা যায় যে শূদ্রের [অস্য] বেদশ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন, এবং তাহার অর্থবোধ ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, সুতরাং [শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ] শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

শিষ্য। কিন্তু বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্র হইলেও ত তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। একথা ত শাস্ত্রেই আছে।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা আছে সত্য। তাঁহাদের যে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তবে শ্রুতি স্মৃতি হইতে যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই, তখন অনুমান করিতে হইবে যে, বিদুর প্রভৃতি এই জন্মে কোন বিশেষ কর্ম্মফলে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই তাঁহারা দ্বিজ ছিলেন। সেই জন্মের সংস্কারের ফল তাঁহারা এই জন্মে লাভ করিয়াছেন। আর, শ্রুতি, স্মৃতি শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—এই কথাই বলেন। অতএব ইহাও নিশ্চয় যে, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও পুরাণাদি শাস্ত্র অবলম্বনে জ্ঞান লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। সে অধিকার হইতে

তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার কোন হেতু নাই। একথা শাস্ত্রেও আছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শূদ্র বেদ অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, কিন্তু পুরাণাদির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক।

শিষ্য। কঠোপনিষদে (২.৬.২) আছে, "এই যাহা কিছু জাগতিক পদার্থ, সমস্তই প্রাণে এজত (কম্পিত, স্পন্দিত, চলনশীল) হইতেছে।" এস্থলে যে 'এজ্' ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ কম্পন, চলন, গতি, চেষ্টা (movement)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সমস্ত জগৎ এক প্রাণশক্তির প্রভাবে কম্পিত হইতেছে, চলিতেছে, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। এই প্রাণ কি বায়ুর বিকার-বিশেষ, না অন্য কিছু?

গুরু। না, এস্থলে প্রাণ বায়ুর বিকার নয়, পরন্তু পরমব্রহ্ম।

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

কম্পনশব্দের তাৎপর্য্য হইতেই এ অর্থ নিশ্চিত হয়। পূর্ব্ব ও পর বাক্যে ব্রহ্মের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। মাঝখানে সহসা বায়ুর আলোচনা হইতেছে, এরূপ কল্পনা সঙ্গত নয়। পরমাত্মাকে প্রাণশব্দের দ্বারা বহুস্থলে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। 'এজন' বা কম্পন শব্দের অর্থ জীবের চেষ্টা, গতি। সেই গতির এক মাত্র প্রবর্ত্তক বস্তুতঃ পরমাত্মা। কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে; শ্রুতি বলেন, "জীব প্রাণের দ্বারা জীবিত থাকে না, অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না, ঐ প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুবিকার যাহার আশ্রিত, যাহার অধীন, তাঁহারই দ্বারা জীবিত থাকে। তিনিই জীবের ও জীবনের কারণ।"

(কঃ ২.৫.৫)। সুতরাং যে প্রাণের প্রভাবে সমস্ত জগৎ চেষ্টমান, ক্রিয়াশীল, সেই প্রাণ পরমাত্মাই।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৮.১২.৩) কথিত আছে, "এই যে সম্প্রসাদ (নিদ্রিত পুরুষ), ইনি শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং আপন স্বরূপে অবস্থান করেন।" এই জ্যোতিঃ কে ?

গুরু। জ্যোতিঃ দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

উক্ত জ্যোতিঃ পরমাত্মা ; যেহেতু, ঐ শ্রুতিতে পরমাত্মার প্রসঙ্গই দেখা যায় [দর্শনাৎ]। পূর্ব্বাপর বাক্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই ঐ জ্যোতিঃ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। (ব্রঃ সূঃ ১.৩.১৮-২০ এবং ১.১.২৪ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। ছান্দোগ্যে (৮.১৪.১) কথিত আছে, "আকাশ নাম ও রূপের নির্ব্বাহক" ইত্যাদি। এ স্থলে আকাশ শব্দের ব্রহ্ম অর্থ নিশ্চায়ক স্পষ্ট কোন কথা নাই (ব্রঃ সূঃ ১.১.২২ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আকাশে (space) অবস্থিত হইয়াই যখন সমস্ত পদার্থ নাম ও রূপ (আকৃতি, form) প্রাপ্ত হয়, তখন এই বাহ্য আকাশই ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না,

আকাশঃ, অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

ঐ আকাশ শব্দে [আকাশঃ] ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে ; কারণ, ঐ শ্রুতিতেই ভূতাকাশকে নামরূপের নির্ব্বাহক হইতে অপর পদার্থ

রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, এবং ঐ নির্ব্বাহককে 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'অমৃত' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে [অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ]।

শিষ্য। বৃহদারণ্যকে (৪.৪.২২) আছে, রাজর্ষি জনক প্রশ্ন করিতেছেন, "দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে যে 'আমি' বা 'আত্মা' বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যে সত্যিকারের 'আমি' বা 'আত্মা' কোন্‌টা ?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন, "ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ—" ইত্যাদি ক্রমে আত্মবিষয়ক বহু কথা ঐ শ্রুতিতে আছে। এই সমস্ত প্রশ্নোত্তর কি জীবাত্মা সম্বন্ধে, না পরমাত্মা সম্বন্ধে ? পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা ত জীবাত্মা সম্বন্ধেই যেন ঐ সব প্রশ্নোত্তর করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, ও স্থলে জীবাত্মা প্রতিপাদিত হয় নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাতে জীবাত্মার বর্ণনা করিয়া সে যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—এই কথা প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য, অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য ; কারণ

সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যোঃ ভেদেন ॥ ৪২ ॥

সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহত্যাগ—এই দুই অবস্থাতে [সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ] জীব হইতে পরমেশ্বরকে স্পষ্টভাবে পৃথক্ করিয়া [ভেদেন] নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুষুপ্তিবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন, "এই পুরুষ (অর্থাৎ সুপ্ত জীব ; প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভূত হইয়া কি বাহ্য, কি আভ্যন্তর, কোন কিছুই জানে

না (বৃঃ ৪.৩.২১)। এস্থলে পুরুষ বলিতে জীবকেই বুঝাইতেছে, কারণ সে-ই জ্ঞাতা, এবং যে বাহ্যাভ্যন্তর জানে, তাহারই সেই জ্ঞানের নিষেধ করা সম্ভব। (মাথা নাই—মাথা ব্যথা—অসম্ভব)। আর, প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর ; কারণ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। আবার, এইরূপ উৎক্রান্তিতেও জীব পরমাত্মার সহিত অনুগত হইয়া দেহত্যাগ করে, এইরূপ উক্তি আছে। এই দুই অবস্থাতেই জীব যে পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে, পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং পরমাত্মাই ওস্থলে মুখ্য প্রতিপাদ্য। তবে জীব সম্বন্ধে এই যে বিস্তৃত বর্ণনা, তাহা জীবের জীবত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু বিভিন্ন অবস্থাতেও যে জীব স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, ইহা প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মোট কথা, জীবকে যদি জীব বলিয়াই মনে কর, তবে সে নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, আর জীবের সত্যিকারের স্বরূপ যদি জানিতে চাও, তবে তাহা পরমাত্মারই স্বরূপ—এই তথ্যই ঐ শ্রুতিতে বুঝান হইয়াছে।

পতি-আদি-শব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

আর, ঐ শ্রুতিতে, 'পতি,' 'অধিপতি,' 'ঈশান' প্রভৃতি শব্দ আত্মার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত শব্দ হইতেও [পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ] বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য। এ সমস্ত বিশেষণ পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়।

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে (ব্রঃ সূঃ ১.১.৫) বলিয়াছেন যে, সাংখ্যোক্ত প্রধান কোন শ্রুতিতে উল্লিখিত হয় নাই, অতএব সেই প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু—

আনুমানিকম্ অপি একেষাম্ ইতি চেৎ ?---

কোন কোন শ্রুতিতে [একেষাম্] অনুমান-প্রমাণ-প্রয়োগে-নিরূপিত প্রধানও [আনুমানিকমপি] উল্লিখিত হইয়াছে, এ কথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

প্রধান যদিও মুখ্যতঃ অনুমানের বলেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথাপি সেই প্রধান-বোধক কোন কথাই কোন শ্রুতিতে নাই, এমন ত নয়। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, "মহতের পর (উৎকৃষ্টতর) অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পর-পুরুষ" (কঃ ১.৩.১১)। এই শ্রুতিতে সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত মহৎ, অব্যক্ত (যাহার অপর নাম প্রধান) ও পুরুষ, এই তিনটি পদার্থ সাংখ্যোক্ত ক্রম (order) অনুসারেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যের প্রধান যে একেবারেই শ্রুতি-বহির্ভূত, তাহা বলেন কিরূপে ?

গুরু। [illegible]---

না [ন] কঠশ্রুতিতে উক্ত অব্যক্ত শব্দে যে সাংখ্যের কল্পিত প্রধানকেই বুঝিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। অব্যক্ত অর্থ যাহা 'ব্যক্ত' বা 'প্রকট' নয়, অতি সূক্ষ্ম

দুর্জ্ঞেয় কোন পদার্থ। এই একটি মাত্র শব্দ দেখিয়াই যে তাহাকে সাংখ্যের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কি হেতু আছে? সাংখ্যবাদীরা অব্যক্ত বা প্রধানকে 'স্বাধীন', 'ত্রিগুণ', 'অচেতন', জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু শ্রুতিতে 'অব্যক্ত' এই একটি শব্দ আছে বলিয়া তাহাকে স্বাধীন, ত্রিগুণ, অচেতন ও কারণরূপে মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন যুক্তিই নাই। এক রকমের ক্রম (order) এই শ্রুতিতে আছে সত্য, কিন্তু কেবল ক্রম দেখিয়া অব্যক্তের ওরূপ বিশেষ বিশেষ গুণ স্বীকার করাও দুঃসাহসমাত্র। গোশালায় অশ্ব দেখিয়া সেই অশ্বকে গরু বলিয়া মনে করা নির্ব্বুদ্ধিতা বই আর কি হইতে পারে?

ঐ শ্রুতির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে 'অব্যক্ত' শব্দে প্রধান বুঝায় না ;—

শরীররূপক-বিন্যস্ত-গৃহীতেঃ —

যেহেতু, এস্থলে যে একটি রূপক (allegory) কল্পনা করা হইয়াছে, সেই রূপকের মধ্যে বিন্যস্ত (উক্ত) যে শরীর, তাহাই অব্যক্ত শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

দর্শয়তি চ ॥১॥

আর, শ্রুতিও রূপকটি বিশ্লেষ করিয়া, স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন ; সুতরাং অব্যক্ত অর্থ যে 'শরীর,' সে বিষয়ে সন্দেহ করিবারও কিছু নাই।

কঠশ্রুতির রূপকটি এই :—

"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, এবং শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহকে ভ্রমণের

পথ বলিয়া জানিবে" (কঃ ১.৩.৩-৪)। ইন্দ্রিয়াদি সুপরিচালিত হইলে জীব ঐ ভাবে গমন করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে পৌছিতে পারে। সেই পরম পদ কি, তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—

"ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ (বিষয়), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা (অর্থাৎ মূল বুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি বুদ্ধি—যাহা হইতে অন্য বুদ্ধির উদ্ভব), সেই মহতের পরে অব্যক্ত (অনাদি কর্ম্মবীজ বা কর্ম্মসংস্কার), অব্যক্তের পরে পরম পুরুষ (চিৎসত্তা) ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তিনিই পথের শেষ সীমা, তাহাই পরম পদ" (কঃ ১.৩.১০-১১)।

পূর্ব্বোক্ত রূপকে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে ঐ রূপকের বিশ্লেষণে সেই সমস্ত বিষয়ই কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; না হইলে শ্রুতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না। রূপকে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই পরবর্ত্তী বাক্যে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে :—বিষয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণের কোন কার্য্যই হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ। মনের সাহায্য ব্যতীত আবার বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বিষয় অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। মন আবার বুদ্ধির সাহায্যেই বিষয়গুলিকে ভোক্তার নিকট উপস্থাপিত করে, অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহান্ আত্মা বলিয়া কথিত ; সেই বুদ্ধিই আমাদের বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল, সুতরাং সাধারণ জীবের বুদ্ধি হইতে সেই মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী শ্লোকের পরম পুরুষ ও পূর্ব্ব শ্লোকের রথী আত্মা একই ; বস্তুতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন ভেদ নাই, এরূপ ইঙ্গিতও এস্থলে পাওয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে

যে, পূর্ব্বশ্লোকে উল্লিখিত সমস্তই পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে,কেবল **শরীর** নাই, তৎপরিবর্ত্তে **অব্যক্ত** শব্দ আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'অব্যক্ত' শব্দে শরীরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ ত যাহা ব্যক্ত নয়, অতি সূক্ষ্ম; পক্ষান্তরে শরীর ত অতি স্থূল, বিশেষ ভাবেই ব্যক্ত; সেই শরীরকে অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম কিরূপে বলা যায়?

গুরু। শরীরকেও

সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ ॥২॥

সূক্ষ্ম, অব্যক্ত [সূক্ষ্মম্] বলা যায়, যেহেতু শরীরেও 'অব্যক্ত' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে [তদর্হত্বাৎ]।

যদিও এই স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা যায় না, তথাপি এই শরীর যে সমস্ত উপাদানে গঠিত, সেই সমস্ত ভূত-সূক্ষ্ম অবশ্য অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। উপাদানবোধক শব্দ শ্রুতিতে অনেক স্থলে সেই উপাদানে গঠিত পদার্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং **কারণ শরীরকে** লক্ষ্য করিয়াই আলোচ্য শ্রুতিতে 'অব্যক্ত' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে না, বরং তাহা হইলেই শ্রুতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

আর, এই যে অব্যক্ত, ইহা সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থা। সেই অবস্থাকে শ্রুতি অব্যাকৃত বা অব্যক্ত বলেন। অর্থাৎ এই স্থূল নাম-রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল বীজ বা শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাহাকে 'অব্যক্ত' বলা হয়।

কঠশ্রুতির প্রথম মন্ত্রে রথরূপক কল্পনা করিয়া জীবের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রে সেই জীবের যথার্থ স্বরূপ কি,

তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জীবের সাধারণ বুদ্ধির মূলে হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি বুদ্ধি, তাহাও আবার বীজশক্তি বা অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত, অব্যক্ত আবার পরমাত্মার অধীন। সুতরাং রথরূপক কল্পনা দেখিয়া এই অব্যক্তকে আমরা শরীরেরই বীজাবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না।

শিষ্য। কিন্তু জগতের বীজাবস্থাকে যদি অব্যক্ত বলেন, তবে ত প্রকারান্তরে প্রধানবাদেই স্বীকার করা হইল, কারণ, প্রধানবাদীরাও জগতের বীজাবস্থাকেই প্রধান বলেন।

গুরু। না, তাঁহারা যেমন ঐ বীজশক্তিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন একটা পদার্থ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাহা করি না। আমরা বলি, সেই বীজশক্তিটি পরমেশ্বরের একান্ত অধীন। আর, এরূপ একটা বীজশক্তির সার্থকতা তখনই হয়, যখন ইহাকে পরমেশ্বরের অধীন শক্তিরূপে স্বীকার করা হয়। স্বতন্ত্র, স্বাধীন এরূপ একটা সত্তা কল্পনা করিবার কোনই সার্থকতা নাই। (পরে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হইবে)।

তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ ॥৩॥

পরমেশ্বরের অধীন বলিয়াই [তদধীনত্বাৎ] এই বীজশক্তি বা অব্যক্ত সার্থক [অর্থবৎ]। পরমেশ্বরের অধীনরূপে এই অব্যক্তকে স্বীকার করিলেই তাহার একটা সার্থকতা হয়। স্বয়ং পরমেশ্বর শক্তিরহিত হইয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি সৃষ্টিকর্তা। পরমেশ্বরকে স্রষ্টা বলিলে তাঁহার অধীনে এরূপ একটা

শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করাই ইহার সার্থকতা। পরমেশ্বর এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন, নতুবা তাঁহার সৃষ্টি করাই সম্ভব হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, পরমেশ্বরের অধীন এই শক্তির প্রভাবেই যখন সৃষ্টি হয়, তখন যতকাল সেই শক্তি বর্ত্তমান থাকে, ততকাল সৃষ্টিও থাকে, ফলে সেই শক্তি নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে কাহারও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই, এবং মুক্ত ব্যক্তিরও পরমেশ্বরের সেই শক্তির প্রভাবে পুনরায় জন্ম হইতে পারে। পক্ষান্তরে সেই শক্তির যদি নাশ হয়, তবে এককালে সমস্ত সৃষ্টিও নাশ পায়। কিন্তু ইহাত একান্ত অশ্রদ্ধেয়। কাজেই এরূপ শক্তি স্বীকার করিলে সৃষ্টিরহস্য যে জটিল হইয়া দাঁড়ায়।

গুরু। বৎস, শুন, প্রধানবাদীরা যেমন বলেন যে, প্রধান বা ঐ বীজশক্তি একটিমাত্র পদার্থ, আমরা তাহা বলি না। ঐ বীজশক্তি প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র, পৃথক্ পৃথক্। এই বীজশক্তি বাস্তবিক অবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকের স্ব স্ব অনাদি অবিদ্যা অনুসারে পরমেশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করেন। বিদ্যা বা জ্ঞান হইলে তাহার স্বকীয় অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহার জন্মগ্রহণ করিবার কারণের অভাব হওয়ায় সে চিরতরে মুক্ত হইয়াই যায়। অপরের আপন আপন অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকায় সংসারও চলিতে থাকে। যাহার যখন জ্ঞান হয়, সেই তখন মুক্ত হয়। সুতরাং এই বীজশক্তি বা অবিদ্যা অনাদিকাল হইতেই প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মুক্ত পুরুষের পুনর্জ্জন্ম বা এককালে সমস্ত লয়—এরূপ কোন দোষ হয় না। মনে রাখিও, এই অবিদ্যা প্রথমে কোথা হইতে আসিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে তাহার কোন আদিই

পাওয়া যায় না, অথচ তাহার প্রভাবেই যে সৃষ্টি হয়, একথাও সত্য। [এ বিষয়টী পরে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে]।

শিষ্য। আচ্ছা, অবিদ্যা বা অনাদি বীজশক্তির প্রভাবেই যখন সৃষ্টি হয়, তখন আবার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া কাহাকেও কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?

গুরু। অবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টি হইলেও সে স্বয়ং স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না, কারণ সে অচেতন। কোন কিছু করিতে হইলে অচেতনের সাহায্য প্রয়োজন হইলেও সে স্বয়ং চেতননিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। অজ্ঞানের প্রভাবেই একগাছি দড়িকে সাপ বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু দড়ি না থাকিলে শুধু অজ্ঞানে সর্পভ্রম হইতে পারে না। দড়িকে আশ্রয় করিয়াই সর্পভ্রম হয়। সেইরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়াই অবিদ্যা এই জগৎভ্রম বা সৃষ্টি সম্পন্ন করে। বস্তুবিশেষকে আশ্রয় না করিয়া অজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিতেই পারে না, সুতরাং অজ্ঞান সেই বস্তুর একান্ত অধীন, একান্ত আশ্রিত; উহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করাও যায় না, করিয়াও কোন ফল নাই। অবিদ্যা পরমেশ্বরের একান্ত অধীন হইয়াই জগৎভ্রম উৎপাদন করে, ইহাই উহার একমাত্র কাজ। পরমেশ্বরের অধীন হইয়া জগৎসৃষ্টিতে সাহায্য করা ছাড়া অবিদ্যার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজনই নাই; এবং পরমেশ্বরের অধীন হইলেই সৃষ্টিতে সাহায্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব। স্বতন্ত্র, স্বাধীন একটা অবিদ্যা বা বীজশক্তি স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

[প্রসঙ্গতঃ মনে রাখিতে পার, অজ্ঞান রজ্জুর একান্ত অধীন হইলেও, তাহারই আশ্রিত হইলেও, তাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব নয়। অজ্ঞান রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করিলেও রজ্জুর স্বরূপের কোন

ব্যতিক্রম করিতে পারে না। রজ্জুর যাহা রজ্জুত্ব, তাহা ভ্রমের পূর্ব্বে, পরে এবং ভ্রমাবস্থায়ও একইরূপ থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর অবিদ্যার আশ্রয় হইলেও তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপের কোন বিচ্যুতি করিতে পারে না]।

আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে এই যে 'অব্যক্ত' শব্দটী আছে, ইহাকে কোন শ্রুতিতে 'আকাশ', কোন শ্রুতিতে 'অক্ষর', কোথাও 'মায়া' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অতএব স্থির হইল, বীজশক্তি বা কারণশরীরকে লক্ষ্য করিয়াই আলোচ্য শ্রুতিতে 'মহতের পরে অব্যক্ত'—এই উক্তি করা হইয়াছে।

আবার, সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রকৃতি বা প্রধান যে পুরুষ হইতে একেবারে পৃথক্, স্বতন্ত্র—ইহা জানিলেই মুক্তি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতির জ্ঞান না হইলে তাহা হইতে পুরুষের পার্থক্যের জ্ঞান হইতে পারে না ; কাজেই সাংখ্য মতে প্রকৃতিও জ্ঞেয়, তাহাকেও জানিতে হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে যে 'অব্যক্ত' শব্দ আছে, তাহার

জ্ঞেয়ত্ব-অবচনাৎচ ॥৪॥

জ্ঞেয়ত্ব বলা হয় নাই, এই জন্যও [জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎচ] এই অব্যক্তকে আমরা সাংখ্যের প্রধান বলিতে পারি না।

আলোচ্য শ্রুতির অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এমন কথা ঐ শ্রুতিতে নাই, অথচ সাংখ্যের প্রধান জ্ঞেয় ; সুতরাং এই অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রধান বলা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যে বলিলেন, অব্যক্তকে জানিবার উপদেশ ঐ শ্রুতিতে করা হয় নাই, তাহা ত নয়।

বদতি ইতি চেৎ ?

ঐ শ্রুতিতেই অব্যক্তকে জানিতে হইবে, একথা বলা হইয়াছে [বদতি], একথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

“যাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, মহত্তের পর, ধ্রুব—তাহাকে জানিয়া মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হয়” [কঃ ২. ৩. ১৫]—শ্রুতির এই অংশে সাংখ্যেরা মহত্তের পর শব্দাদিবিহীন প্রধানের যেরূপ বর্ণনা করেন, সেইরূপ বর্ণনাই আছে এবং তাহাকে জানিবার উপদেশও আছে। সুতরাং এই শব্দাদিহীন বস্তু [illegible] প্রধান বলিয়াই বোধ হয়।

[illegible] ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

না, ঐ স্থলে অব্যক্তকে জানিতে বলা হয় নাই [ন], যেহেতু [হি] পরমেশ্বরই [প্রাজ্ঞঃ] জ্ঞাতব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। যেহেতু প্রাজ্ঞ বা পরমেশ্বরই ঐ শ্রুতির আলোচ্য বিষয়, ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু [প্রকরণাৎ]।

“পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, সে-ই শেষ সীমা, সে-ই পরম প্রাপ্য।”—ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, পরম পুরুষকে প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য। তিনি অতি দুর্জ্ঞেয়, সেইজন্য তাঁহাকে শব্দাদিবিহীন বলা হইয়াছে, এবং তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর হাত এড়ান যায়। নতুবা শুধু অব্যক্ত বা প্রধানকে জানিলেই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ হয়, একথা সাংখ্যেরাও বলেন না। সুতরাং এই শ্রুতিতে প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

অতএব, শ্রুতিউক্ত অব্যক্ত যে সাংখ্য কল্পিত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে, [illegible] এই [illegible]

ত্রয়াণাম্ এব চ এবম্ উপন্যাসঃ প্রশ্নঃ চ ॥ ৬ ॥

তিনটী বিষয়েরই (অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা) [ত্রয়াণাম্] এইরূপ [এবম্] প্রশ্ন [প্রশ্নঃ] এবং [চ] প্রত্যুত্তর [উপন্যাসঃ] ঐ শ্রুতিতে আছে।

নচিকেতা মৃত্যুকে তিনটী বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। মৃত্যুও তিনটীই উত্তর করিলেন। সে তিনটী বিষয় (১) অগ্নি, (২) জীব ও (৩) পরমাত্মা। আলোচ্য শ্রুতির সর্ব্বত্রই এই তিনটী বিষয় সম্বন্ধেই প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই। প্রধান সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও নাই, উত্তরও নাই। সুতরাং এস্থলে একটা 'অব্যক্ত' শব্দ দেখিয়া তাহাই সাংখ্যোক্ত প্রধান ; এরূপ বলা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

শিষ্য। নচিকেতা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি-না, জানিতে চাহিলেন। পরে আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত এক আত্মা সম্বন্ধে তিনি যে শুনিয়াছিলেন, সেই বিষয়ের বিশেষ তথ্য জানিতে চাহিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বপ্রশ্নের যে আত্মা, সে কি পরবর্ত্তী প্রশ্নের আত্মা হইতে স্বতন্ত্র একজন, না উভয় প্রশ্নেই একই আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে ? যদি একই আত্মার সম্বন্ধেই প্রশ্ন হইয়া থাকে, তবে মোটের উপর প্রশ্ন হয় দুইটী, তিনটী নয়। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন আত্মা সম্বন্ধেই দুইটী পৃথক্ প্রশ্ন হয়, তবে বলিতে হয়, নচিকেতা মোটের উপর চারিটী বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক বরে পিতার মানসিক সুস্থতা, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে জীববিদ্যা, এবং চতুর্থ বরে, পরমাত্ম-বিদ্যা। অথচ যম তাঁহাকে তিনটী মাত্র বর দিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং বরদানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীতও যখন প্রশ্ন করায় দোষ হইল না, তখন প্রশ্ন না থাকিলেও প্রধানের বর্ণনা হইতেই বা দোষ হইবে কেন ?

গুরু। না, আত্মা সম্বন্ধে দুইটী পৃথক্ প্রশ্ন করা হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পার না। "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত, তাহা আমাকে বলুন"—এই বাক্যে কোন নূতন প্রশ্নের অবতারণা করা হয় নাই। সুতরাং বর প্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্ন হইল, এরূপ কোন দোষ হয় না।

শিষ্য। "যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, তাহা বলুন—'এই বাক্যে ত নূতন প্রশ্নই করা হইয়াছে। কারণ, মৃত্যুর পর জীব থাকে কি-না, এটী জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন। জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যের অধীন ; সুতরাং যাহা ধর্ম্মাদির অতীত তাহা অবশ্য জীব হইতে পারে না। আবার পূর্ব্ব বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আত্মা থাকে কি-না, আর পরবাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ধর্ম্মাদির অতীত বস্তু কি। এই দুই প্রশ্ন এক হয় কিরূপে ?

গুরু। না, এই দুই বাক্যে শব্দগত একটু বৈষম্য থাকিলেও জিজ্ঞাস্য একই। জীব ও প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মা বস্তুতঃ একই। তাহার সম্বন্ধেই বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হইয়াছে মাত্র। দেখ, ধর্ম্মাদির অতীত বস্তু কি—এ প্রশ্নের উত্তরে যম বলিলেন, "জ্ঞানী জন্মমৃত্যু বর্জ্জিত……" ইত্যাদি [কঃ ১.২.১৮]। জীবের সহিত শরীরের সম্বন্ধ থাকায় তাহার জন্ম মৃত্যু আছে, কিন্তু প্রাজ্ঞের তাহা নাই। শরীরের সহিত সম্বন্ধও বাস্তবিক নহে, অজ্ঞানকল্পিত মাত্র, সুতরাং জীবের জন্মমৃত্যুও যথার্থ নহে, কাল্পনিক। বস্তুতঃ জীবের শরীর নাই। যাহাকে শরীরী জীব বলিয়া মনে হয়, সে প্রকৃতপক্ষে প্রাজ্ঞ। শরীরের প্রতি জীবের যে একটা অজ্ঞানকৃত অভিমান আছে [আমি শরীরী এইরূপভাব] তাহা ত্যাগ হইলেই প্রাজ্ঞত্ব লাভ হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য, এবং যমও এই তথ্যই নচিকেতাকে বুঝাইলেন। সুতরাং পূর্ব্ব ও পর উভয় বাক্যে বস্তুতঃ একই বিষয়ের প্রশ্ন ও সমাধান করা হইয়াছে, ইহা স্থির।

তবে পূর্ব্ববাক্যে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব এবং পরবর্ত্তী বাক্যে সে যে সংসারী নয়, ইহাই জিজ্ঞাসিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। যতকাল অবিদ্যার নাশ না হয়, ততকালই জীবত্ব ও ততকালই পাপপুণ্যের অধিকার। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে জীবের সতিকারের স্বরূপই প্রকাশ পায়। আবার অবিদ্যা অবস্থাতেও কিন্তু স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না, সে যাহা তাহাই থাকে। সর্পভ্রমকালে রজ্জু রজ্জুই থাকে। সেইরূপ অবিদ্যা অবস্থাতেও আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

শিষ্য। তবে যে স্থত্রে বলা হইল, তিনটী প্রশ্ন ও তিনটী উত্তর, অথচ আপনি বলিলেন, দুইটী প্রশ্ন—[একটী অগ্নি বিষয়ক ও অপরটি আত্মাবিষয়ক] ?

গুরু। অবিদ্যা অবস্থাতে জীব ও প্রাজ্ঞ এক নহে। যদিও স্বরূপতঃ উভয়েই এক, অভিন্ন, তথাপি অবিদ্যার সম্পর্কে দেখিলে জীব ও প্রাজ্ঞ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। এই কল্পিত ভাব বা ভেদ মানিয়া লইয়াই স্থত্রকার তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছেন।

অতএব যখন উদাহৃত শ্রুতিতে অগ্নি, জীব ও প্রাজ্ঞ এই তিনেরই আলোচনা করা হইয়াছে, প্রধান সম্বন্ধে যখন কোন প্রশ্ন বা প্রতিবচন নাই, তখন অব্যক্তকে প্রধান বলিতে পারি না।

মহৎ-বৎ চ ॥ ৭ ॥

আর [চ] 'মহৎ' শব্দের ন্যায় [মহদ্বৎ] এই 'অব্যক্ত' শব্দ সাংখ্যের কোন তত্ত্ববোধক নয়।

সাংখ্যেরা যে অর্থে 'মহৎ' শব্দ ব্যবহার করেন, শ্রুতিতে উহা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রুতিতে বহুস্থলে 'মহৎ' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাকে আত্মা, পুরুষ প্রভৃতি বিশেষণে

বিশেষিত করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের মহৎ অর্থ একটি তত্ত্ব বিশেষ (principle অথবা category) অর্থাৎ মহাবুদ্ধি। কিন্তু ঠিক এই অর্থে 'মহৎ' শব্দ শ্রুতিতে ব্যবহৃত হয় নাই। 'মহৎ' শব্দ শ্রুতিতে থাকিলেও যেমন তাহার অর্থ সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব নয়, সেইরূপ 'অব্যক্ত' শব্দও সাংখ্যের প্রধানবোধক নয়। সুতরাং আনুমানিক প্রধানবাদ শ্রুতিসিদ্ধ নয়।

শিষ্য। 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ প্রধান না হইলেই যে প্রধানবাদ শ্রুতির অনুমোদিত নয়, একথা বলা যায় কিরূপে? কারণ, অন্য বেদমন্ত্রে প্রধান প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই ত মনে হয়। যেমন অজামন্ত্র। মন্ত্রটী এই, "কোন কোন অজ [সংসারী আত্মা] লোহিত, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণবিশিষ্টা এবং আপনার অনুরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী অজার [মূল প্রকৃতির] প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাতেই মজিয়া থাকে। অপর কোন কোন অজ [মুক্ত আত্মা] তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে" [শ্বে ৪.৫]। এই মন্ত্রে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের নির্দেশ করা হইয়াছে। যে জন্মে না, সেই অ-জা, সুতরাং আদি কারণ প্রধানই এই শব্দের লক্ষ্য। ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ প্রধান ত্রিগুণবিশিষ্ট এই বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিতেছে। অ-জ অর্থাৎ বস্তুতঃ জন্মরহিত আত্মা অজ্ঞানবশতঃ সেই অজাকে অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে আপনার মনে করিয়া তাহাতেই অনুরক্ত হয় এবং সংসার দুঃখ ভোগ করে। আবার অন্য আত্মা বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে অর্থাৎ প্রকৃতির কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করে এবং পরমানন্দ অনুভব করে। এ-ত সাংখ্যের প্রধানের কথাই বলা হইয়াছে। তবে প্রধান শাস্ত্রমূলক নয়, এ কথা বলেন কিরূপে?

গুরু। বৎস! তুমি ঐ মন্ত্রটী যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করিলে তাহাতে আপাততঃ বেশ মনে হয় যে, ঐ মন্ত্রটী প্রধানকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু তোমার ব্যাখ্যার মস্ত বড় একটা দোষ তুমি লক্ষ্য করিতে পার নাই। তুমি ঐ মন্ত্রটীর পূর্ব্বে বা পরে কি আছে, তাহার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া শুধু ঐ মন্ত্রটীরই স্বাধীনভাবে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করিয়াছ। পূর্ব্বাপর না দেখিয়া যে কোন মন্ত্রের যে কোন অভিপ্রেত অর্থ দাঁড় করান তেমন কষ্টকর নয়। ঐ অজা মন্ত্রই ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রকমে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যদি ঐ মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ উপেক্ষা করা হয়। এইরূপ এক একটা বিচ্ছিন্ন মন্ত্রের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বিশেষ কারণ থাকিলেই স্বীকার করা যায়। ঐ অজা মন্ত্রে, কিম্বা উহার পূর্ব্বে বা পরে যদি এমন কিছু নিশ্চায়ক থাকে, তবেই উহার তদনুযায়ী একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয়। না হইলে যে কোন মন্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করান চতুর লোকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য নয়। কিন্তু এই অজা মন্ত্রে

চমসবৎ অবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

কোন বিশেষ না থাকায় [অবিশেষাৎ], অর্থাৎ প্রধানই ঐ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য, এরূপ স্বীকার করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকায় তোমার প্রদর্শিত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ মন্ত্রে এমন কোন শব্দ বা বাক্য নাই, যাহার বলে ঐ মন্ত্রের প্রধান-প্রতিপাদকরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যাই স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। একটী বৈদিক মন্ত্রে আছে, "চমস অধোদিকে গভীর, উর্দ্ধদিকে উচ্চ" [বৃঃ ২.২.৩]। এক্ষণে যে 'চমস' কি, তাহা জানে না, সে শুধু 'অধো গভীর ও উর্দ্ধ উচ্চ', এই বাক্য দেখিয়া

একটী কলসীকেও চমস বলিয়া স্থির করিতে পারে। শুধু এই বিচ্ছিন্ন বাক্যটি দ্বারা তাহার চমসের জ্ঞান হয় না। 'অধো গভীর, উর্দ্ধ উচ্চ', এই কথায় যে এস্থলে চামচই (spoon) বুঝাইতেছে, কলসী বা বাটী বুঝাইতেছে না, তাহা নির্ণয় হয় না। তাহা নির্ণয় করিতে ঐ বাক্যের পূর্ব্বাপর উক্তির সাহায্য দরকার। এই চমসের ন্যায় [চমসবৎ] অজামন্ত্রে যে প্রধানেরই বর্ণনা করা হইয়াছে, ছাগী কিম্বা অন্য কিছুর বর্ণনা হয় নাই, তাহা কেবল ঐ একটিমাত্র মন্ত্রের দ্বারা স্থির করা যায় না। ঐ মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে পূর্ব্ব ও পর মন্ত্রের অর্থ কি, তাহার সহিত এই মন্ত্রের কিছু সম্বন্ধ আছে কি-না, এই ভাবের মন্ত্র অন্য শ্রুতিতে পাওয়া যায় কি-না, পাওয়া গেলে সে স্থলেই বা তাহার কিরূপ অর্থ ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিয়া শুধু একটী বিচ্ছিন্ন মন্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে এই অজামন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অর্থ কি এবং কোন্ বাক্যের সাহায্যে সেই অর্থ নির্দ্ধারিত করা যায়?

গুরু। বৎস! শুন, মন্ত্রের অজা অর্থ প্রধান নয়,

জ্যোতিঃ-উপক্রমা তু—

কিন্তু [তু] জ্যোতিঃ প্রভৃতিই [জ্যোতিরূপক্রমা] অজা শব্দে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজ, অপ্ (জল) ও অন্ন (পৃথিবী)—বিশ্বের এই যে তিনটী উপাদান, ভূতসূক্ষ্ম, ইহাই অজা।

তথা হি অধীয়তে একে ॥ ৯ ॥

যেহেতু [হি] কোন কোন শ্রুতি [একে] ঐরূপ [তথা] পাঠ করেন [অধীয়তে]।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৬.২.৪) পাঠ আছে যে, পরমেশ্বর হইতে তেজ, অপ্ [জল] ও অন্নের [মৃত্তিকার] উৎপত্তি হয়; এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। এই শ্রুতির সাহায্যে আমরা নিশ্চয় করিতে পারি যে, আমাদের সন্দিগ্ধ অজামন্ত্রেরও প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ তেজ, অপ্ ও অন্নরূপ সমস্ত পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা। অজামন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, অজা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্টা। ছান্দোগ্যেও ভূতসূক্ষ্মকে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ-বিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং অজা যে ভূতসূক্ষ্ম, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। লোহিত প্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষেই প্রযুক্ত হয়, তাহাদের অর্থ রজঃ প্রভৃতি গুণ বলিলে একটা গৌণ অর্থের কল্পনা করিতে হয়। তারপর অজা মন্ত্রের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী মন্ত্রে পরমেশ্বরের সৃষ্টি শক্তির বিষয়ই আলোচিত দেখিতে পাই। কাজেই মাঝখানে হঠাৎ একটা মন্ত্রে সাংখ্য-কল্পিত প্রধান উপদিষ্ট হইয়াছে, এরূপ কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চিত হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে আদি অবস্থা, বীজশক্তি, পরমেশ্বরের অধীন সৃষ্টিশক্তি, তাহাই অজারূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন তেজ প্রভৃতির লোহিত প্রভৃতি তিনটিরূপ তাহারই রূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু তেজঃ প্রভৃতি ত পরমেশ্বর হইতে জাত, সুতরাং তাহাদিগকে অ-জা [যে জন্মে না] বলা যায় কিরূপে?

প্রশ্ন : ভূতসূক্ষ্ম পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাকে অজা বলায়

কল্পনা-উপদেশাৎ চ মধু-আদিবৎ অবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

কোন বিরোধ হয় না [অবিরোধঃ], যেহেতু ঐ ভূতসূক্ষ্মকে একটা অজা [ছাগী] রূপে কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র [কল্পনোপদেশাৎ]। সূর্য্যাদি বস্তুতঃ মধু প্রভৃতি না হইলেও উপাসনার জন্য যেমন তাহাদিগকে মধু প্রভৃতি রূপে কল্পনা করা হয়, সেইরূপ [মধ্বাদিবৎ]।

শ্রুতিতে অজা শব্দে যে জন্মরহিত কোন কিছুকে, কিম্বা একটা ছাগীকেই বুঝাইতেছে, এমন নয়। উহা একপ্রকার উপমামাত্র। যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্টা একটি ছাগী বহু সন্তান প্রসব করে, ঐ সন্তানগুলিও যেমন ছাগীর মতই বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট হয়, কোন ছাগ যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, কোন ছাগ বা যেমন তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজ, অপ্, ও অন্নরূপা, ত্রিবর্ণবিশিষ্টা ভূতপ্রকৃতি আত্মসদৃশ এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করে, অজ্ঞানী জীব তাহাতে আসক্ত হয়, জ্ঞানী তাহাকে পরিহার করে। ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং ইহাতে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মক স্বতন্ত্র প্রধানের কোনই স্থান নাই।

সূর্য্য মধু না হইলেও উপাসনার জন্য তাহাকে মধুরূপে কল্পনা করিবার ব্যবস্থা শ্রুতিতে আছে। এইরূপ, বাক্যকে ধেনুরূপে, স্বর্গকে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হয়। এস্থলেও ভূতসূক্ষ্মকে অজারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। প্রধান এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য নয়।

শিষ্য। এই শ্রুতিতে যে বলা হইল, এক জীব ভোগ করে, অপর জীব ত্যাগ করে ; তবে কি জীব বহু ?

গুরু। না, জীব বহু কি এক—ইহা দেখান ওস্থলে শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। জীবের বন্ধ ও মোক্ষ কি, তাহাই ওস্থলে উক্ত হইয়াছে। সংসারে আসক্তিই বন্ধ, উহার ত্যাগই মোক্ষ। অবশ্য অজ্ঞান দশায় জীব বহু বই কি। কিন্তু জ্ঞানদশায় জীব একই এবং সেও ব্রহ্মই।

শিষ্য। আচ্ছা, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে প্রধান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, স্বীকার করিলাম। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে দেখিতে পাই যে, ২৫টি তত্ত্বের বিষয় বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনেও ২৫টি তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, এই বৈদিক মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। শ্রুতিতে যাহা অস্পষ্ট-ভাবে আছে, স্মৃতি (সাংখ্যদর্শন) তাহাই স্পষ্ট ও বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শন শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কেবল কোন ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনাপ্রসূত—অতএব অশ্রদ্ধেয়, একথা বলি কিরূপে ?

মন্ত্রটি এই :—"যাহাতে পাঁচ পাঁচজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সে-ই আত্মা, ব্রহ্ম, অমৃত, তাঁহাকে জানিয়া অমর হও" (বৃ.৪.৪.১৭)। এই মন্ত্রে পাচ পাচ এই কথাতে ২৫ তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। আর সাংখ্যের নির্দ্ধারিত তত্ত্বও পচিশটি। যথা—অবিকৃত মূল প্রকৃতি (১), প্রকৃতির বিকার—মহৎ, অহঙ্কার, এবং মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ ; এই পঞ্চ তন্মাত্র (৭), পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় (১৬) এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির অতীত পুরুষ (১)=২৫। সাংখ্যদর্শনে এই যে পচিশটি তত্ত্বের সংগ্রহ করা হইয়াছে, ইহার মূল পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্র। সুতরাং সাংখ্যদর্শন শ্রুতিমূলক নয়, একথা বলা সঙ্গত নয়।

গুরু। ন সংখ্যা-উপসংগ্রহাৎ অপি, নানাভাবাৎ অতিরেকাৎ চ ॥ ১১ ॥

তোমার উদাহৃত মন্ত্রে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এইরূপ সাংখ্যকল্পিত পঁচিশ সংখ্যক তত্ত্বের সংগ্রহ বা সঙ্কলন করা হইয়াছে, একথা বলিলেও [সংখ্যোপসংগ্রহাদপি] সাংখ্যদর্শন যে শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সিদ্ধ হয় না [ন]; যেহেতু সাংখ্যের তত্ত্বগুলি নানা রকমের, পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের [নানাভাবৎ] এবং [চ] ঐ মন্ত্রে বস্তুতঃ পঁচিশের অধিক সংখ্যাই দেখা যায় [অতিরেকাৎ]।

সাংখ্যদর্শনের পঁচিশটি তত্ত্ব নানা রকমের। উহাদের পাঁচ পাঁচটির এমন কোন সাধারণ গুণ নাই, যাহাতে পাঁচ পাঁচটি করিয়া এক একটী ভাগ (group) করা যাইতে পারে। অথচ শ্রুতিতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমানধর্ম্মবিশিষ্ট পাঁচটী বস্তুরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর ভাষার দিক দিয়া দেখিলেও 'পঞ্চ পঞ্চজন' এই কথায় ২৫ জনের বোধ হয় না। 'পঞ্চজন' একটি সমাসবদ্ধ পদ; যেমন সপ্তর্ষি। বিশেষ কারণেই ঋষিদিগের মধ্যে সাতজনকে 'সপ্তর্ষি' এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সপ্তর্ষি বলিতে কেবল নির্দ্দিষ্ট ঋষিসপ্তককেই বুঝায়। সুতরাং সপ্ত সপ্তর্ষি বলিতে যেমন উনপঞ্চাশ জন ঋষিকে বুঝায় না, পরন্তু 'সপ্তর্ষি' এই বিশিষ্ট আখ্যা সাতজনেরই, এই অর্থই প্রতীত হয়, সেইরূপ পঞ্চ পঞ্চজন বলিতে ২৫ জন বুঝায় না, প্রত্যুত পাঁচ জনেরই প্রতীতি হয়। * সুতরাং 'পঞ্চ পঞ্চজন' এই কথায় সাংখ্যোক্ত পঁচিশ তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না।

---

* বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভাষার সূক্ষ্ম বিচার মূল শাঙ্কর ভাষ্যে দেখিবেন।

আরও দেখ, ঐ মন্ত্রে আছে, "যাহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত।" এক্ষণে পঞ্চ পঞ্চজন ছাড়া আকাশ (১) এবং তাহারা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মা (২) বলিয়া আরও দুইটি বস্তুরও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং পাঁচ পাঁচজন এই অংশের অর্থ পঁচিশ ধরিলে বলিতে হয়, ঐ মন্ত্রে মোট ২৭ সাতাইশটি বস্তুরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আকাশ ও আত্মা সাংখ্যমতে পঁচিশ তত্ত্বেরই অন্তর্গত। সুতরাং ঐ মন্ত্রে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, একথা বল কিরূপে?

শিষ্য। তাহা হইলে ঐ পাঁচজন বলিতে কি বুঝায়?

গুরু। **প্রাণাদয়ঃ বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥**

ঐ পঞ্চজন মন্ত্রের পরবর্ত্তী বাক্য হইতে [বাক্যশেষাৎ] জানা যায় যে, ঐ পঞ্চজন প্রাণ প্রভৃতি [প্রাণাদয়ঃ] অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রে প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন ও মন এই পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে। পঞ্চজন মন্ত্রে পঞ্চজন শব্দের যখন কোন প্রসিদ্ধ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন পরের মন্ত্রের প্রাণ প্রভৃতিই এই মন্ত্রে পঞ্চজন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই কথা বলাই সঙ্গত। কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষস – ইহারাই পঞ্চ জন। আবার কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ— ইহারাই পঞ্চজন। যাহা হউক, ঐ পঞ্চজন বলিতে যে সাংখ্যের কোন তত্ত্ব বুঝাইতেছে না, ইহা স্থির।

শিষ্য। আচ্ছা, পরবর্ত্তী মন্ত্রের একটি পাঠান্তর আছে, তাহাতে প্রাণাদির মধ্যে অন্নকে ধরা হয় নাই। সেই পাঠ অনুসারে প্রাণাদিকে পঞ্চজন বলা যায় কিরূপে?

গুরু। জ্যোতিষা একেষাম্ অসতি অন্নে ॥ ১৩ ॥

কাহারও কাহারও অর্থাৎ কাণ্বশাখীদের [একেষাম্] পাঠে প্রাণাদির মধ্যে অন্ন শব্দ না থাকিলেও [অসতি অন্নে] জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা [জ্যোতিষা] পাঁচসংখ্যার পূরণ হইতে পারে।

কণ্বশাখায় অন্ন শব্দ পঠিত হয় নাই, সুতরাং সেই পাঠ অনুসারে সেই শাখায় পঠিত প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও জ্যোতি—এই পাঁচটিই পঞ্চজন শব্দে গ্রহণ করা উচিত।

তবেই দেখিলে সাংখ্যের প্রধানাদি শ্রুতির কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই।

শিষ্য। সাংখ্যদর্শনের প্রধান কল্পিত, কোন শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ নাই ইহা বুঝিলাম। কিন্তু ব্রহ্মই যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদান্তের উদ্দেশ্য—এ বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। কারণ, এ বিষয়ে সমস্ত শ্রুতি একমত নয়। এক এক শ্রুতিতে এক এক রকম সৃষ্টির কথা দেখিতে পাই। কোন শ্রুতিতে, "আত্মা হইতে আকাশ হইল" [তৈঃ ২.১]—এইরূপ প্রথমে আকাশের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। কোন শ্রুতিতে, "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" [ছাঃ ৬.২.৩]—এইরূপ প্রথমে তেজের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। এইরূপে কোথাও প্রথমে প্রাণের সৃষ্টি, কোথাও বা একই সময়ে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট বস্তুর কোন্‌টি যে প্রথমে হইল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন শ্রুতিতে আবার অসৎ [অভাব, শূন্য অর্থাৎ কিছুই না] হইতে সৃষ্টি, কোন শ্রুতিতে সৎ হইতে সৃষ্টি, কোন শ্রুতিতে আপনা আপনি এই জগতের সৃষ্টি—এইরূপ বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাই। সুতরাং

বেদান্তের সাহায্যে জগতের বাস্তবিক কারণ যে কি, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সূত্র। কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্ট-উক্তেঃ ॥১৪॥

আকাশ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থের বিষয়ে [আকাশাদিষু] এক এক শ্রুতিতে এক এক রকমের সৃষ্টির কথা থাকিলেও (যেমন, কোথাও প্রথমে আকাশের সৃষ্টি, কোথাও তেজের ইত্যাদি) যাহা হইতে সেই আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি অর্থাৎ আকাশাদির যাহা কারণ, তাহার সম্বন্ধেও এক এক শ্রুতিতে এক এক রকমের মত, এরূপ বলা যায় না। যেহেতু, আদিকারণ সম্বন্ধে [কারণত্বেন] যেরূপ কারণ এক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ কারণই অন্যান্য শ্রুতিতেও উপদিষ্ট হইয়াছে [যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ]।

সৃষ্ট আকাশাদির পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও তাহাদের মূল কারণ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। এক শ্রুতিতে যেমন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে জগতের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও তাঁহাকেই কারণ বলা হইয়াছে। "যাহা কিছু সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন" [তৈঃ ২.৬]। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল একমাত্র সৎই ছিল, তিনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিলেন" [ছাঃ ৬.২.১]।—ইত্যাদি প্রায় সমস্ত শ্রুতিতেই একই জগৎকারণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবে দুই এক স্থলে যে মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাখ্যা করিব। মোট কথা, কারণ নির্দ্ধারণ ব্যাপারে সমস্ত শ্রুতিই একমত। সেই কারণ হইতে উৎপন্ন আকাশাদিরূপ কার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে আপাত-বিরোধ দেখা গেলেও কারণ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। কার্য্য

সম্বন্ধেও যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, তাহা "ন বিয়দশ্রুতেঃ" [ব্রঃ সূঃ ২.৩.১] – এই সূত্রে দেখান হইবে।

বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রতিপাদন করা শ্রুতির মোটেই উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সে বিষয়ে যদি কোন বিরোধ থাকেই, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। সৃষ্টি এরূপ, না ওরূপ—ইহা প্রতিপাদন করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সৃষ্টি জানিলে কোনরূপ পুরুষার্থ [ফল] লাভ হয়, একথা শ্রুতি কুত্রাপি বলেন না। বস্তুতঃ ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টির বর্ণনা। এ কথা শ্রুতিও বলেন, "হে সৌম্য! পৃথিবীরূপ শৃঙ্গের [কার্য্যের] দ্বারা [তাহার কারণ] জলের অনুসন্ধান কর, জল দ্বারা তেজের, তেজ দ্বারা তাহার মূল সতের অনুসন্ধান কর" [ছাঃ ৬.৮.৪]। আবার, "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রঃ সূঃ ২.১.১৪] এই সূত্র আলোচনা করিলে বুঝিবে যে, কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ দেখাইবার জন্যই সৃষ্টির বর্ণনা। সৃষ্টি বর্ণনার পৃথক্ কোন উদ্দেশ্য নাই। আর গুরুপরম্পরায়ও এ কথা জানা যায়। শাস্ত্রে যে মৃত্তিকা, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা নানা রকমে সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায়মাত্র। পরমার্থতঃ ভেদ বা সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই [মাঃ ৩.১৫]। শ্রুতিতে যাহা কিছু ফলের উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই ফল, সৃষ্টিজ্ঞানের কোন ফল আছে বলিয়া শ্রুতির কুত্রাপি উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, সৃষ্টি প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়, ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই আদি কারণস্বরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধে সমস্ত শ্রুতিই যখন একমত, তখন ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ সিদ্ধান্তে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যে সমস্ত স্থলে 'অসৎ' 'স্বভাব' ইত্যাদিকে আপাততঃ জগতের কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়, সে সমস্ত স্থলেও সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকেই

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

আকর্ষণ [টানিয়া আনা] করা হয় বলিয়া, কারণগত বিরোধও বাস্তবিক শ্রুতিতে নাই। পূর্ব্বাপর বাক্যালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মকেই জগৎ কারণ রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 'অসৎ' কিম্বা 'স্বভাব' ইত্যাদিকে নয়।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ 'অসৎ' ছিল, অর্থাৎ ছিল না" [তৈঃ ২-৭]—এই শ্রুতিবাক্যে আপাততঃ মনে হয়, 'অসৎ' অর্থাৎ 'কিছু না' হইতে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যে এই অসৎ-বাদের অসম্ভবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তবে হাঁা, এই জগৎকে আমরা যেরূপ আকৃতিবিশিষ্ট দেখিতেছি, সৃষ্টির পূর্ব্বে অবশ্য ইহার এরূপ আকৃতি ছিল না, কোন একটা বিশেষ নামও ছিল না—সুতরাং এই সৃষ্ট জগতের তুলনায় ইহার সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা একরূপ অসৎ বই কি? শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই 'জগৎ ছিলনা' এরূপ উক্তি করিয়াছেন। একেবারে ছিল না—ইহা বলাই যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তবে আর পরে 'তাহা সৎ [বিদ্যমান] ছিল' এরূপ কথা বলিতেন না। আর, জগৎ যে কোনও চেতন অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ হইয়া আপনাআপনিই সৃষ্ট হয়; ইহাও শ্রুতি বলেন না। যে স্থলে ওরূপ সৃষ্টির কথা আছে বলিয়া মনে হয়, সে স্থলেও পরবর্ত্তী বাক্য হইতে জানা যায় যে, অধ্যক্ষ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই জগৎ সৃষ্ট হয়।

সুতরাং ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

———

শিষ্য। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বালাকি ও অজাতশত্রুর কথোপকথন প্রসঙ্গে অজাতশত্রু বলিতেছেন, "হে বালাকি! যিনি এই সব পুরুষের কর্ত্তা, এইসব যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জান" [কৌঃ ৪.১৯]। এই যে কর্ত্তা বলিয়া যাঁহাকে বলা হইল, ইনি কে?

গুরু। ইনি ব্রহ্ম। বালাকি ও অজাতশত্রু ব্রহ্ম কি, তাহা নিরূপণ করিতে বিচারে প্রবৃত্ত হন। বালাকি প্রথমে সূর্য্য প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃপুরুষগণকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করায় অজাতশত্রু বলিলেন, "এ ত ঠিক নয়, প্রকৃত ব্রহ্ম যে কি, তাহা বলিতেছি"—এই বলিয়া তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কর্ত্তাকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সূর্য্যাদির অধিষ্ঠাতা পুরুষগণের কর্ত্তা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে কেবল ঐ সমস্ত পুরুষেরই কর্ত্তা, তাহা নহে; পরন্তু এই সমস্ত যাহা কিছু দেখা যায়, সবই তাঁহারই কর্ম—ইহাই আলোচ্য শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং ঐ শ্রুতিতে তাঁহার কর্ম্ম বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা

জগৎ-বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সমগ্র জগৎ বুঝায় বলিয়া তিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ নন। একমাত্র ব্রহ্মই সমগ্র জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

শিষ্য। কিন্তু আলোচ্য শ্রুতির শেষাংশ হইতে বুঝা যায় যে, যেন এই শ্রুতি জীব অথবা মুখ্য প্রাণশক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই 'কর্ত্তা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং

জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ?—

জীব কিংবা মুখ্যপ্রাণ বুঝা যায়, এমন সব কথা আছে বলিয়া

[জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ] আলোচ্য শ্রুতিতে কথিত কর্ত্তা ব্রহ্ম নন [ন], এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

গুরু। না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়, কারণ,

তৎ-ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭ ॥

তাহা অর্থাৎ তোমার ওরূপ আপত্তি [তৎ] পূর্ব্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে [ব্যাখ্যাতম্]। ১. ১. ৩১ সূত্রে ইহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

শ্রুতিটীর পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহাতে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তবে যে সঙ্গে সঙ্গে জীব এবং মুখ্যপ্রাণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ব্রহ্ম হইতে উহাদের অভিন্নত্ব দেখান।

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্, অপি চ এবম্ একে ॥ ১৮ ॥

আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে [জৈমিনিঃ], ঐ শ্রুতিতে জীবের উল্লেখ অন্য উদ্দেশ্যে [অন্যার্থম্], অর্থাৎ জীব প্রতিপাদন করার জন্য নয়, পরন্তু ব্রহ্মকে বুঝিবার সুবিধার জন্য। জীবের উল্লেখের যে ইহাই উদ্দেশ্য, তাহা শ্রুতির প্রশ্নোত্তর হইতে [প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্] জানা যায়। আর [অপিচ] কেহ কেহ [একে], অর্থাৎ যাঁহারা বাজসনেয়ী শাখা অনুসরণ করেন, তাঁহারা এইরূপই [এবম্] দেখাইয়াছেন।

রাজা অজাতশত্রু বালাকিকে হাতে কলমে ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গভীর নিদ্রায় অভিভূত একটী লোকের পাশে লইয়া যান। ঐ লোকটির শরীরে প্রাণশক্তির ক্রিয়া বেশ চলিতেছে, কিন্তু জীবোচিত কোন কার্য্য তাহাতে প্রকাশ নাই। অজাতশত্রু তাহাকে প্রহার

করিয়া জাগাইলেন, তখন সে আবার জীবের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে দেখাইলেন যে, জীব প্রাণ হইতে ভিন্ন। পরে বালাকিকে প্রশ্ন করিলেন, "এই লোকটী যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন কোন্ আশ্রয়ে ছিল, কোথায় ছিল, কোথা হইতেই বা আবার আসিল" [কৌঃ ৪.১৯]? এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জীবাতিরিক্ত বস্তুর বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আবার তিনি বলিলেন, "স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় মানুষ প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়......। জাগরণ কালে এই আত্মা হইতে আবার ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব হয়" [কৌঃ ৪ ২০]। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে সুষুপ্তি [স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা] কালে জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়, এবং পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সমস্ত জগৎ আবির্ভূত হয়। সুতরাং এই প্রশ্ন ও উত্তর হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্যই ঐ শ্রুতিতে জীব ও প্রাণের অবতারণা করা হইয়াছে। বাজসনেয়ী শাখায় একথা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে।

শিষ্য। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিতেছেন, "হে মৈত্রেয়ী! স্ত্রী যে পতিকে ভালবাসে, তাহা পতির সুখের জন্য নয়, কিন্তু আত্মার সুখের জন্যই স্ত্রী পতিকে ভালবাসে। এইরূপ যে যাহা কিছু ভালবাসে, তাহা সেই জিনিষের প্রীতির জন্য নয়, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই। সেই আত্মাকেই দেখ, তাঁহারই কথা শোন, তাঁহার সম্বন্ধেই চিন্তা কর, তাঁহারই ধ্যান কর। তাঁহাকে দেখিলে, শুনিলে, ভাবিলে, ধ্যান করিলে, জানিলে সবই জানা যায়" [বৃঃ ৪.৫.৬]। এই যে আত্মার জ্ঞানে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয় বলা হইল, এই আত্মা ত জীবাত্মা বলিয়াই মনে হয়, কারণ, তাহারই সুখের জন্য

সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়। এবং তাহাকে 'বিজ্ঞানাত্মা' ও 'জ্ঞাতা' বলাতে সে যে জীবাত্মা, ইহাই নিশ্চয় হয়।

গুরু। না, ঐ আত্মা জীবাত্মা নহে, কিন্তু পরমাত্মা,

বাক্য-অন্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

কারণ, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই বাক্যটী পরমাত্মা সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। মৈত্রেয়ী যখন যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে শুনিলেন যে, ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অমৃতের আশা করা যায় না, তখন তিনি যে বস্তু অমৃতত্ব প্রদান করিতে সমর্থ, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিলেন। সুতরাং এই আত্মা যে পরমাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কারণ, পরমাত্মার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানেই অমৃতত্ব [চির শান্তি] লাভের আশা নাই—একথা শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আত্মজ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানলাভও পরমাত্মা সম্বন্ধেই খাটে। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই দেখিতে, শুনিতে, ভাবিতে, ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে, জীবাত্মাকে নহে।

শিষ্য। কিন্তু 'লোকে যাহা কিছু ভালবাসে, তাহা সবই আত্মার সুখের জন্যই'—এই কথাতে ত স্পষ্ট ভাবেই জীবাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

গুরু। হাঁ, তাহা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার একটী উদ্দেশ্য আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য এমন একটী বস্তুর উপদেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেটীর জ্ঞান হইলে অন্যান্য সকল বস্তুর জ্ঞানই হইয়া যায়। সেই বস্তুটী যে পরমাত্মা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য

জীবাত্মার নির্দ্দেশ করিয়াই বলিলেন যে, তাহারই জ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, তাহা না হইলে "এক বস্তুর জ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান"—এই যে প্রতিজ্ঞা (Proposition) ইহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব শ্রুতির প্রারম্ভে এইরূপ জীবাত্মার নির্দ্দেশ

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ লিঙ্গম্ আশ্মরথ্যঃ ॥২০॥

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্য স্থাপনের [প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধেঃ] উপায় স্বরূপ সূচক [লিঙ্গম্]—ইহা আশ্মরথ্য নামক আচার্য্য [আশ্মরথ্যঃ] বলেন। দেখ, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র একটী বস্তু হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান যাহাতে সিদ্ধ হয়, সেই জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন, এবং এই উভয়ে বস্তুতঃ একই—এইটুকু দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির প্রারম্ভে জীবাত্মার উপদেশ করা হইয়াছে।

আবার,

উৎক্রমিষ্যতঃ এবংভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ॥২১॥

ঔড়ুলোমি নামক আচার্য্য [ঔড়ুলোমিঃ] বলেন যে [ইতি], জীব যখন দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি হইতে উত্থান করে অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে, তখন তাহার [উৎক্রমিষ্যতঃ] এইরূপ ভাব, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একত্ব, হয় বলিয়া [এবম্ভাবাৎ] শ্রুতির প্রারম্ভে জীবাত্মার উপদেশ করিয়া পরমাত্মার সহিত তাহার অভিন্নভাব সূচনা করা হইয়াছে।

অবস্থিতেঃ ইতি কাশকৃৎস্নঃ ॥২২॥

কাশকৃৎস্ন নামক আচার্য্য [কাশকৃৎস্নঃ] বলেন যে [ইতি], পরমাত্মাই জীবাত্মারূপেও অবস্থান করেন বলিয়া [অবস্থিতেঃ] প্রারম্ভে জীবাত্মার নির্দ্দেশ অসঙ্গত নয়।

কাশকৃৎস্নের মতে পরমেশ্বরের ও জীবের মধ্যে বাস্তবিক কোনই পার্থক্য নাই। একই পরমাত্মা উপাধিসংযোগে জীব, উপাধিশূন্য অবস্থায় পরমাত্মা। সুতরাং জীব স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম। আশ্বরথ্য যদিও বলেন যে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ ভাব আছে বলিয়া স্বীকার করেন। জীব কার্য্য, পরমেশ্বর কারণ। কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। কার্য্যের কারণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। এবং কারণের জ্ঞান হইলেই তাহার যাবতীয় কার্য্যের জ্ঞানও হইয়া যায়। আর ঔড়ুলোমির মতে জীব পরমেশ্বরের অবস্থা বিশেষ।

এই তিনটী মতের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুতি সম্মত ও যুক্তি-সঙ্গত। ইহার মতে জীব ও পরমাত্মার কোনই পার্থক্য নাই। জীব ব্রহ্মই, তবে যে তাহারা পৃথক্ বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল অজ্ঞান প্রভাবে। "তুমি সেই" ইত্যাদি শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিয়া জীব ও ব্রহ্মের একান্ত অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তখন আর জীব ও ব্রহ্ম দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় না। জীবের জীবত্ব মিথ্যা না হইয়া সত্য হইলে কোন কালেও তাহার বিনাশ হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য, তাহার বিনাশ অসম্ভব। সুতরাং জীবকে ব্রহ্মের বিকাররূপ একটী সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে কোন কালেই তাহার মোক্ষ সম্ভব

হয় না। জ্ঞানেই মোক্ষ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা কোন সত্য বস্তুর বিনাশ সাধিত হইতে পারে না। সহস্রবার মাটী মাটী এরূপ বিচার করিয়া একটী ঘট মৃত্তিকা নির্ম্মিত, ইহা স্থিরীকৃত হইলেও ঘটের বিনাশ কিন্তু হয় না। আবার, ঘট যখন মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, তখন ঘট বলিয়া কিছু থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্মের বিকার জীব যখন তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, তখন জীব বলিয়া কিছু থাকিবে কিরূপে? ফলে সাধনাদ্বারা জীব অমৃতস্বরূপ মোক্ষ-লাভ করে, একথাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং জীব বাস্তবিক পূর্ণব্রহ্মই, তাহার জীবত্ব অজ্ঞান কল্পিত, অতএব মিথ্যা। জীবের পূর্ণব্রহ্মত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ, অবিকৃতই থাকে, কেবল অজ্ঞান প্রভাবে বুঝা যায় না এই মাত্র। সেই অজ্ঞান তিরোহিত হইলে জীবের সত্যিকারের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রকট হয়,—ইহারই নাম মুক্তি। জীবের যে নাম ও আকার, তাহাও তাহার স্বকীয় নয়, উপাধির। বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি উদাহরণ দ্বারা যে জীবের উৎপত্তির বর্ণনা কোন কোন শ্রুতিতে করা হইয়াছে, তাহাও উপাধির সম্পর্কেই। বাস্তবিক জীবের উৎপত্তি, বিনাশ প্রভৃতি কিছুই হয় না। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে দেহাদি নিবন্ধন পরমাত্মা হইতে জীবের ভিন্নতা প্রতীয়মান হয় মাত্র। শ্রুতি বলেন, "এ সমস্তই আত্মা," (ছাঃ ৭.২৫.২)। "এ সমস্তই ব্রহ্ম" (মুঃ, ২.২.১১)। স্মৃতি বলেন, "হে ভারত, আমাকেই তুমি সমস্ত দেহের জীব বলিয়া জান" (গীঃ ১৩.২)। "পরমেশ্বর আমিই সর্ব্বভূতে বাস করিতেছি" (গীঃ ১৩.২৭), ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিতে জীব ও ব্রহ্মের একতা স্পষ্ট ভাবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই একত্ব জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, ইহাই মোক্ষদায়ক। জীব ও পরমেশ্বর এই দুইটী নামেই পৃথক্, বস্তু হিসাবে পৃথক্

নহে, একই। এই তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পরিবে।

শিষ্য। গুরুদেব, ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম কি রকম কারণ? একটি ঘটের উৎপত্তি ব্যাপারে প্রধানতঃ দুই রকমের কারণ দেখিতে পাই—এক কুম্ভকার, যে মৃত্তিকার দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে; অপর মৃত্তিকা, যাহার দ্বারা ঘট প্রস্তুত হয়। কুম্ভকারকে ঘটের নিমিত্ত কারণ (efficient cause) বলে; আর মৃত্তিকাকে তাহার প্রকৃতি বা উপাদান কারণ, (material cause) বলে। এখন প্রশ্ন এই যে—ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ, না উপাদান কারণ? আমার ত মনে হয়, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত কারণই, যেহেতু তিনি সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টি করেন, সৃষ্ট জগতের উপর তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব এবং তিনি সাবয়ব, অচেতন, অশুদ্ধ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট। এ সমস্ত কেবল নিমিত্ত কারণের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম কি কেবল নিমিত্ত কারণই?

গুরু। না বৎস! ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ ত বটেনই,

প্রকৃতিঃ চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্ত-অনুপরোধাৎ ॥২৩॥

উপরন্তু [চ] উপাদান কারণও [প্রকৃতিঃ] বটেন। যেহেতু ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেই এক বস্তুর জ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞা (proposition), এবং সেই প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সমস্ত দৃষ্টান্ত বা উদাহারণ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির কোনরূপ হানি বা অসামঞ্জস্য হয় না [প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ]।

এমন একটি বস্তু আছে, যাহা জানিলে আর আর যাবতীয় পদার্থই জানা হইয়া যায়। সেই বস্তুটী ব্রহ্ম, শ্রুতি ইহা বহু উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মকে যদি উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়; কার্য্য পদার্থ তাহার উপাদান কারণ হইতে পৃথক্ কিছুই নয়, সুতরাং উপাদানকে জানিলে তাহা হইতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থই জানা হইয়া যায়। কিন্তু নিমিত্ত কারণ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাকে জানিলেও তাহার কৃত কার্য্য জানা হয় না। অতএব শ্রুতির একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ সিদ্ধান্ত যাহাতে বজায় থাকে, সেই জন্য ব্রহ্মকে উপাদন কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অন্য কথায়, শ্রুতির একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার বলেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও বটেন। আবার শ্রুতির দৃষ্টান্ত গুলিও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। একটি দৃষ্টান্ত এই—"হে সৌম্য! একটী মাটীর ঢেলা কি পদার্থ, তাহা জানিলে মাটীর তৈয়ারী সমস্ত জিনিষই জ্ঞাত হইয়া যায়" ইত্যাদি (ছাঃ ৬.১.৪)। শ্রুতি এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুই বিদ্যমান ছিল। জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্ম ছাড়া আর কে নিমিত্ত কারণ হইবে? যদি অন্য কোন একজনকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্ম একাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই।

অভিধ্যা-উপদেশাৎ চ ॥ ২৪ ॥

আর [চ] ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টি করিলেন—এইরূপ উক্তি থাকায় [অভিধ্যোপদেশাৎ] ব্রহ্ম যে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় রকমেরই কারণ, তাহাও নিশ্চয় হয়।

শ্রুতি বলেন, "তিনি ইচ্ছা করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি বহু হইয়া জন্মিব।" এই যে সঙ্কল্প করিয়া জগৎ সৃষ্টি করা, ইহা নিমিত্ত কারণেরই হয়। আবার, 'আমিই বহু হইব' এই কথায় ব্রহ্মই যে উপাদান কারণও, তাহা স্থির হয়।

সাক্ষাৎ চ উভয়-আম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

আর [চ] স্বয়ং ব্রহ্মকেই [সাক্ষাৎ] কারণরূপে অবলম্বন করিয়া শ্রুতি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় এই দুই কার্য্যই হয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, এই জন্য [উভয়াম্নানাৎ] ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও বটেন।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে বিলীন হয়, তাহা সেই বস্তুর উপাদান। যেমন একটী ঘট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয় আবার মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যায়। কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে তাহা নিমিত্ত কারণও হইতে পারে; কিন্তু যাহাতে বিলীন হয়, তাহা উপাদান ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মেই সমস্ত লয় পায়।" সুতরাং ব্রহ্ম উপাদান কারণ।

আর,

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ !

'ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগৎরূপে পরিণত করিলেন' (তৈঃ ২.৭)

শ্রুতির এইরূপ স্পষ্ট উক্তি হইতেও স্থির হয় যে, ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই।

যোনিঃ চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

আর [চ] শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তিস্থান বা প্রকৃতি [যোনিঃ] বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে [গীয়তে]। অতএব তিনি যে উপাদান কারণও, যে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। কিন্তু একই বস্তু নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই হয়, এরূপ ত কোথাও দেখা যায় না।

গুরু। না, তাহা দেখা যায় না সত্য। কিন্তু জগতের আদি কারণ ব্রহ্ম যে কিরূপ, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিবার উপায় নাই। একমাত্র শাস্ত্রের সাহায্যেই যাহা কিছু জানা যায়। সুতরাং শাস্ত্র তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। শাস্ত্র যখন বলেন, ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদন উভয়ই, তখন তাহাই মানিতে হইবে। আর, নিমিত্ত ও উপাদান যখন আলো ও আঁধারের ন্যায় পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ নয়, তখন সচরাচর উহাদের একত্র সমাবেশ দেখা না গেলেও ব্রহ্মে থাকা একেবারে অসম্ভবও নয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

এস্থলে একটা কথা মনে রাখিও। এই যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হইল, ইহাতে এরূপ বুঝিও না যে, দুধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, বীজ যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও ঠিক সেইরূপ সত্য সত্যই জগদাকারে পরিণত হন। ব্রহ্ম নিত্য, নিরবয়ব বস্তু, তাঁহার কোন অংশ নাই, তিনি নিত্য নির্ব্বিকারী; সুতরাং কি সর্ব্বাংশে, কি একাংশে, তাঁহার কোনরূপ পরিণাম হইতেই পারে না।

তবে যে এই উপাদান, পরিণাম ইত্যাদি কথা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রজ্জু-সর্প-ভ্রমস্থলে সেই সর্পের উপাদান যেমন অজ্ঞানাচ্ছন্ন রজ্জুই, অপরিজ্ঞাতস্বরূপ রজ্জুই যেমন সর্পাকারে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান, ব্রহ্মই অজ্ঞানপ্রভাবে জগদাকারে প্রতিভাত হন। উপাদান শব্দের এইরূপ অর্থ করিলেই শ্রুতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। নতুবা শ্রুতির একস্থলে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্ম সত্য সত্যই বিকৃত হন, এরূপ অসঙ্গত কল্পনা করায় শ্রুতির তাৎপর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়।

লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, এযাবৎ প্রধানভাবে সাংখ্য দর্শনের জগৎ-কারণ বাদেরই নিরাস করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ দর্শন অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত। সুতরাং

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

এই সাংখ্যদর্শনের নিরাকরণের দ্বারাই [এতেন] অন্যান্য অণু-কারণ বাদ প্রভৃতিও [সর্ব্বে] নিরাকৃত হইল [ব্যাখ্যাতাঃ] বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে সমস্ত মতবাদও শ্রুতিবিরুদ্ধ। সাংখ্য মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাদের বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

'ব্যাখ্যাতাঃ' এই শব্দটী দুইবার বলায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইতেছে। অধ্যায়াদির সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য ওরূপ দ্বিরুক্তি পূর্ব্বকালের রীতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু তাহা হইলে

স্মৃতি-অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ?—

কপিল মুনি প্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং সেই দর্শনের মতাবলম্বী অন্যান্য শাস্ত্রের [স্মৃতি] কোনরূপ প্রসার বা কার্য্য না থাকায় [অনবকাশ-] সেই সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক—এইরূপ একটা দোষের সম্ভাবনা [দোষ-প্রসঙ্গঃ] হয়— এ'কথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

প্রত্যেক শাস্ত্রই প্রামাণ্য শাস্ত্র। তাহার একটা মানিব, একটা মানিব না, এরূপ হইতে পারে না। প্রত্যেক শাস্ত্রেরই একটা সার্থকতা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; না হইলে সুবিধা বুঝিয়া কোনটা মানা, কোনটা না মানায় প্রকৃত তথ্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে হয়; কেন-না, তাহাতে অচেতন প্রধানকেই জগতের কারণরূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের তত্ত্বাংশ ছাড়িয়া দিলেও তবু যাহা হউক ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে তাহাদের একটা সার্থকতা থাকে। কিন্তু সাংখ্যাদি শাস্ত্র কেবল তত্ত্বজ্ঞান বিষয়েই আলোচনা করিয়াছে; সেই বিষয়টাই যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহার সমস্তটাই নিরর্থক হইয়া পড়ে।

সুতরাং সাংখ্যাদি শাস্ত্রানুসারেই বেদান্তের (উপনিষদের) ব্যাখ্যা করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না বৎস! সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যাদি মতের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত

ন, অন্যস্মৃতি-অনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

নয় [ন]; কারণ, তাহা হইলে অন্যস্মৃতিরও নিরর্থকতা দোষ উপস্থিত হইতে পারে [অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ]।

সাংখ্যের অনুরূপ করিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যা করিলে মনু প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলে, তাহারা নিরর্থক হইয়া পড়ে। বাস্তবিক দেখিতে হইবে শ্রুতির তাৎপর্য্য কি। যে সমস্ত শাস্ত্র সেই তাৎপর্য্যের বিরোধী, তাহা অবশ্যই ত্যাজ্য। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে যেটি শ্রুতির অনুরূপ, সেইটাই মানিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ে শ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ ত নাই। সুতরাং সাংখ্য যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন তাহা নিরর্থক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করিলে চলিবে কেন?

আবার,

ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

সাংখ্যোক্ত মহৎ প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বের [ইতরেষাম্] শ্রুতিতে কিম্বা ব্যবহারক্ষেত্রে কোথাও অস্তিত্ব না পাওয়ায় [অনুপলব্ধেঃ] সাংখ্যমত একেবারেই অগ্রাহ্য।

সাংখ্যের প্রধান কোনরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া হয়ত শ্রুতিসম্মত

বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাংখ্যোক্ত মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব না শ্রুতিতে, না ব্যবহারক্ষেত্রে, কুত্রাপি দেখা যায়। সেগুলি নিছক কল্পনা। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যমত ত্যাজ্য।

শিষ্য। তাহা হইলে যোগশাস্ত্রও ত অবৈদিক বলিয়া পরিত্যাজ্য, তাহাতেও প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মহৎ প্রভৃতিরও কল্পনা করা হইয়াছে।

গুরু। হাঁ বৎস!

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

এই সাংখ্যের নিরাকরণ দ্বারা [এতেন] যোগশাস্ত্রও [যোগঃ] নিরাকৃত হইল [প্রত্যুক্তঃ]।

শিষ্য। কিন্তু যোগ ত আত্মজ্ঞান লাভের উপায়। তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কিরূপে?

গুরু। না, যোগশাস্ত্রই বল, আর সাংখ্যশাস্ত্রই বল, আমি কোনটাই একেবারে উড়াইয়া দিবার কথা বলিতেছি না। ঐ সব শাস্ত্রের যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ, তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর, যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নয়, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, সাংখ্য পরমাত্মাকে নির্গুণ বলেন, একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব। আবার যোগের ধ্যান ধারণা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহাও অবশ্য গ্রহণ করিব।

শিষ্য। আচ্ছা, এ যাবৎ আপনি কেবল শ্রুতি ও স্মৃতির দোহাই দিয়াই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিতর্ক যে একেবারেই নিরর্থক, একথা অন্য বিষয়ে সত্য হইলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নয়। ব্রহ্ম একমাত্র অনুভবের দ্বারা লাভ করা যায়। সেই অনুভূতি

যুক্তির সাহায্যে যতটা সুলভ হয়, শ্রুতির সাহায্যে ততটা হইতে পারে না। শ্রুতি মোটামুটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিজের অনুভূতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শ্রুতিতেই যুক্তির সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মই জগতের কারণ, এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রধান প্রভৃতি জগতের কারণ নয়—এ সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না যুক্তিদ্বারা অনুমোদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ নিঃসন্দেহে স্বীকার করি কিরূপে? যুক্তি প্রয়োগ করিলে কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায়

ন, বিলক্ষণত্বাৎ অস্য ; তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

না [ন], যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান জগতের [অস্য] স্বভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বিপরীত [বিলক্ষণত্বাৎ]; আর [চ] এই যে ব্রহ্ম ও জগতের পরস্পর বিসদৃশ বা বিপরীত ভাব, তাহা [তথাত্বম্] শ্রুতি হইতেই [শব্দাৎ] জানা যায়।

কারণটা যেরূপ, কার্য্যটাও সেইরূপ হয়। কারণ এক প্রকৃতির, আর কার্য্য অন্য প্রকৃতির—এরূপ হইতে পারে না। সোনা দিয়া কখনও পাথরের বাটী তৈয়ারী করা যায় না। মাটি দিয়া মাটির বাসনই তৈয়ারী হয়, সোনা দিয়া সোনার গহনাই হয়। ব্রহ্ম চেতন, শুদ্ধ; আর, জগৎ অচেতন, অশুদ্ধ। সেই ব্রহ্ম এরূপ জগতের কারণ হয় কিরূপে? জগতের বস্তুমাত্রের বিশ্লেষ করিলে দেখা যায়, জগৎটা সুখ, দুঃখ ও মোহময় একটা জড় পদার্থ (ব্রঃ সূঃ ২.২.১ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইহার কারণও অবশ্য সুখ (সত্ত্ব), দুঃখ (রজঃ) ও মোহ (তমঃ)ময় কোন অচেতন পদার্থই হইবে। তাহাকেই সাংখ্য শাস্ত্রে 'প্রধান' বলা হয়।

পক্ষান্তরে জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট, চির বিশুদ্ধ; চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে কিরূপে এই শোকদুঃখপূর্ণ জড় জগতের কারণ * বলিয়া স্বীকার করা যায়? জগৎটা যে জড়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, চেতন পুরুষ (মানুষ প্রভৃতি জীব) এই জগৎকে আপনার ভোগ্যরূপে ব্যবহার করে। একটী চেতন অন্য একটী চেতনের চেতনাংশের; কিম্বা একটী জড় অন্য একটী জড়ের জড়াংশের, কোনরূপ উপকার করে, এরূপ কোথাও দেখা যায় না। একটী জলন্ত প্রদীপ দ্বারা অন্য একটী জলন্ত প্রদীপ দেখিতে হয় না। ভৃত্য যে প্রভুর সেবা করে, সেও ভৃত্যের জড়াংশ (শরীর, বুদ্ধি প্রভৃতিই) প্রভুর কার্য্য করে, তাহার চেতনাংশ নয়। সুতরাং কার্য্য জগৎ যখন অচেতন, তখন তাহার কারণও অবশ্য অচেতন।

গুরু। কিন্তু আমি যদি বলি যে, জগতের কারণ যখন চেতন, তখন জগতের যাবতীয় পদার্থও চেতন?

শিষ্য। তাহা হইলে জগতের কোন পদার্থকে চেতন, আর কোন পদার্থকে অচেতন বলা হয় কেন?

গুরু। উহা একটা লৌকিক ব্যবহার মাত্র। বস্তুতঃ চৈতন্যই জগতের বিভিন্ন পদার্থের আকারে বিরাজ করিতেছে। যে স্থলে সেই চৈতন্য শক্তির বাহ্য স্ফূর্ত্তি (অভিব্যক্তি) হয়, সেই স্থলেই আমরা বলি বস্তুটা চেতন, আর যে স্থলে সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে, অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না, সেই স্থলেই বলি বস্তুটী জড়। চৈতন্যের ব্যক্ত (potent) ও অব্যক্ত (latent) অবস্থাভেদেই চেতন ও

---

* এস্থলে ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান কারণও বলা হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও।

অচেতন ভেদ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ চেতন ছাড়া জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ভাবিয়া দেখ, একটী ধূলিকণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুটীও এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা বিধৃত, সেই শক্তির-ই বিশেষ বিকাশ মাত্র। ইহাকে Force-ই বল, Energy-ই বল, প্রাণই বল, চৈতন্যই বল। বাস্তবিক চেতন ও জড়ের যে বিভাগ, তাহা লৌকিক। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ হইতে পারে না, এরূপ উক্তি যুক্তি সিদ্ধ নয়।

শিষ্য। না হয় মানিলাম, অচেতন বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, সুতরাং চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণ হইতে বাধা নাই। কিন্তু চিরশুদ্ধ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন ব্রহ্ম শোকদুঃখপূর্ণ কলুষিত জগতের কারণ হইবেন কিরূপে? আর, চেতন ও জড়ের যে বিভাগ, তাহাও লৌকিক বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন না। কারণ, শ্রুতি স্বয়ংই ঐ বিভাগ স্বীকার করিযাছেন (তৈঃ ২.৬)। তবে কোন কোন শ্রুতিতে দেখা যায় বটে যে, যে সমস্ত বস্তুকে আমরা অচেতন বলিয়াই জানি (যেমন, মৃত্তিকা, তেজ ইত্যাদি), তাহারাও চেতনের মত ব্যবহার করিতেছে। যেমন, "মৃত্তিকা বলিল" (শঃ ব্রাঃ ৬.১.৩.২)। "সেই তেজ সঙ্কল্প করিল" (ছাঃ ৬.২.৩)। কিন্তু এই রকমের শ্রুতির বলে জাগতিক পদার্থমাত্রকেই চেতন বলা যায় না। কারণ, "মৃত্তিকা বলিল" ইত্যাদি স্থলে

অভিমানি-ব্যপদেশঃ তু বিশেষ-অনুগতিভ্যাম্ ॥৫॥

মৃত্তিকাদির অভিমানী দেবতার নির্দ্দেশই [অভিমানিব্যপদেশঃ] করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যেহেতু এক শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে এই কথাই বলা হইয়াছে এবং প্রত্যেক পদার্থের ভিতরেই এক

একটী দেবতা অনুগত আছে, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ [বিশেষানুগতিভ্যাম্]।

পাছে লোকের সন্দেহ হয় যে, ইন্দ্রিয়াদিও চেতন পদার্থ, সেই জন্যই কৌষীতকী শ্রুতিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে সমস্ত স্থলে অচেতনকে চেতনের ন্যায় ব্যবহারবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, সে সমস্ত স্থলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত ব্যবহার তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিশেষেরই কার্য্য। দেবতা যে সর্ব্বত্রই অনুগত, তাহাও সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। সুতরাং জড় বলিয়া কিছু নাই, ইহা বলিতে পারেন না। ফলে জগতের বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

গুরু। আচ্ছা বৎস। তুমি ত কেবল যুক্তিবলেই প্রমাণ করিতে চাও যে, কার্য্য ও কারণ সর্ব্বদাই অনুরূপ হইবে। তুমি সচরাচর এইরূপ হইতে দেখিতে পাও, সেইজন্য অনুমান কর যে, অচেতন জগতের কারণও নিশ্চয়ই অচেতন হইবে। এই নিয়মের অন্যথা হইতেও

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

কিন্তু [তু] দেখা যায় [দৃশ্যতে]। যেমন চেতন মানুষ হইতে অচেতন কেশের উৎপত্তি, অচেতন গোবর হইতে গোবরে পোকার উৎপত্তি। যদিও বল যে, মানুষের অচেতন শরীরই কেশের কারণ এবং অচেতন গোময় পোকার অচেতন শরীরেরই কারণ, তথাপি দেখ, একস্থলে অচেতনকে আশ্রয় করিয়া চেতনের সৃষ্টি হইল, অন্যস্থলে হইল না। ফলে কার্য্য ও কারণের একটা বৈষম্য যেরূপেই হউক থাকিয়াই গেল। মানুষের দেহ অচেতন, কেশও অচেতন—মানি।

কিন্তু ঐ উভয় কি এক? রূপ বল, আকৃতি বল, প্রকৃতি বল, কত বিষয়ে যে উহাদের পার্থক্য, তাহা কি দেখিতেছ না? কার্য্য ও কারণ উভয়ে সর্ব্বাংশে ঠিক ঠিক একই রূপ হইবে, এ কথা বলিলে ত উভয়ই এক হইয়া যায়, দুইটী আর থাকে না, ফলে কার্য্য ও কারণ বলিয়া একটা কথাই হইতে পারে না। মোট কথা কার্য্য ও কারণের একটা তারতম্য না থাকিলে পরিণাম হয় কিরূপে? আর পৃথক্ পৃথক্ নামই বা দেওয়ার প্রয়োজন কি? তবে কারণের কিছু কিছু অংশ কার্য্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। মাটীর ডেলাটী ঘট হইল। এখন ঘটে মাটি থাকিল বটে; কিন্তু মাটির ডেলার আকৃতি, আর ঘটের আকৃতিও কি একরূপই থাকিবে? সেইরূপ, ব্রহ্মের "সত্তা" (অস্তিত্ব) জগতে স্পষ্টই অনুগত দেখা যায়। বস্তুটী 'আছে' এই যে বস্তুর লক্ষণ, ইহা ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত। আর, চৈতন্যও জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। সুতরাং চেতন ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আরও দেখ, ব্রহ্মকে জানিতে হইলে শ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণের উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করা চলে না। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়াও "ব্রহ্ম এইরূপ"—এমন অনুমান করা যায় না; কারণ, ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে এমন কোন নিশ্চায়ক চিহ্নও নাই। সুতরাং একমাত্র শ্রুতি ও শ্রুতির অনুসারিণী স্মৃতি হইতেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা পাওয়া যাইতে পারে। তবে শাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হইলেই যে ব্রহ্মকে জানা হইয়া গেল, এমন নয়। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে, স্বয়ং উপলব্ধি করিতে যুক্তি বা বিচারেরও বিশেষ প্রয়োজনীতা আছে, ইহা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। পুস্তকগত বিদ্যা নিজ জীবনে প্রকট ও প্রতিষ্ঠা করিতে সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনায় বিচারের স্থান অতীব উচ্চ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই বিচার শ্রুতির সিদ্ধান্তের অনুকূল হইলেই ঐ সিদ্ধান্ত সাধকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; নতুবা যত বড় বুদ্ধিমানই হও না কেন, আপনার বিচারশক্তিকে শ্রুতি নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন পথে পরিচালিত করিলে কখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না। একাদশ সূত্রে এই বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিব।

শিষ্য। আচ্ছা, চিরশুদ্ধ, নিত্যচেতন, রূপরসাদিবিহীন ব্রহ্মকে যদি অশুদ্ধ (নানা দোষযুক্ত), রূপরসাদিযুক্ত জগতের কারণ বলা হয়, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জগৎরূপ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, একেবারে নূতন একটা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে "কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি"ও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎরূপ কার্য্য

অসৎ ইতি চেৎ ?—

অস্তিত্ব বিহীন ছিল [অসৎ] অর্থাৎ ছিল না, এই কথা [ইতি] যদি [চেৎ] কেহ বলে ?

গুরু। **ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥**

না, তাহা বলা যায় না [ন] ; কারণ, তাদৃশ উক্তি একটা নিরর্থক নিষেধমাত্র [প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ]। "অসৎ—সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববান্ নহে", উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ উক্তি একটা কথার কথা মাত্র! উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না, এরূপ

উক্তির কোন অর্থ নাই। কার্য্য জিনিষটা কার্য্যাবস্থায়ও যেমন কারণ-রূপেই বিদ্যমান থাকে, কার্য্যাবস্থার পূর্ব্বেও তেমন কারণরূপেই তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে। কার্য্য কারণকে ছাড়িয়া স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে কোন কালেই থাকিতে পারে না—কি উৎপত্তির পূর্ব্বে, কি পরে। কিন্তু কারণরূপে কার্য্যটি উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন থাকে, পরেও তেমনই থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে। (ব্রঃ সূঃ ২. ১. ১৪ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। আচ্ছা, এই জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে প্রলয়কালে আবার তাঁহাতেই মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। এক্ষণে কোনরূপ স্বাদবিহীন এক গ্লাস জলের সহিত যদি এক চামচ লবণ মিশিয়া যায়, তবে সেই জলেও লবণাক্ত স্বাদ হয়। সেইরূপ প্রলয়কালে জগতের অচেতনত্ব প্রভৃতি দোষও ব্রহ্মকে দূষিত করিয়া দিবে। সুতরাং শুদ্ধ (সর্ব্ববিধ দোষ বা মালিন্য রহিত) ব্রহ্মকে যদি অশুদ্ধ (নানা দোষ পূর্ণ) জগতের কারণ বলি, তবে

অপীতৌ তদ্বৎ-প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

প্রলয়ে [অপীতৌ] ব্রহ্মও কার্য্যের অর্থাৎ জগতের মত [তদ্বৎ] হইয়া যায়, এইজন্য [প্রসঙ্গাৎ] ব্রহ্মকারণবাদ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না [অসমঞ্জসম্]। অর্থাৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্ম জগতের যাবতীয় দোষে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় তাঁহার আর ব্রহ্মত্ব থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায় না।

গুরু। ন তু, দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

না, একথা বলিতে পার না [ন তু]; যেহেতু, কার্য্য কারণের সহিত লীন হইয়া গেলেও কার্য্যের ধর্ম্ম বা গুণ কারণে স্পৃষ্ট হয় না,

এমন দৃষ্টান্তও আছে [দৃষ্টান্তভাবাৎ]। যেমন, মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী শরা। শরাটী ভাঙ্গিয়া আবার মাটি হইল। কিন্তু সেই মাটিতে কি শরার আকৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়? সোনা দিয়া তৈয়ারী একগাছি বালা ভাঙ্গিয়া গলাইয়া আবার যখন সোনায় পরিণত করা হয়, তখনও কি তাহা দেখিতে বালার মত থাকে, না তাহা হাতে পরা যায়? বরং কার্য্য কারণে লয় হইলে কার্য্যের ধর্ম্ম কারণকে বিকৃত করে, এরূপ দৃষ্টান্তই কোথাও পাওয়া যায় না। জল লবণের কারণ নয়, সুতরাং সে দৃষ্টান্ত নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আর, কার্য্য যখন কারণে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন যদি কার্য্যের যাবতীয় ধর্ম্ম বা গুণ ঠিক ঠিক বজায়ই থাকে, তবে সে আবার কেমন লয়? আমরা কার্য্য ও কারণের বস্তুতঃ অভিন্নত্ব, একত্ব স্বীকার করিলেও একথাও বলি যে, কার্য্যের স্বরূপ কারণ, কারণের স্ব-রূপ কার্য্য নয়। [এ বিষয় ব্রঃ সূঃ ২.১.১৪ সূত্রে বিশদ হইবে]। সুতরাং কার্য্যের ধর্ম্ম কারণকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি পারে বল, তবে লয়কালে কেন, এখনও সেই দোষ হইতে পারে; কেন-না, কারণই কার্য্য হইয়াছে, কার্য্যের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; ফলে কার্য্যের দোষগুণ সবই কারণেরও দোষগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহাকে আমরা কার্য্য বলি, বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে অজ্ঞানকল্পিত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং তাহা মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, তাহা কোনকালেই সত্য বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। একজন যাদুকর দেখাইল যে, সে যেন আপনার গলা কাটিয়া ফেলিতেছে। সকলেই দেখিল, সে গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে। সত্য সত্যই কি তাহার গলা দুখণ্ড হইয়া যায়? তবে দর্শকদের এমন একটা ভ্রম হয় যে, তাহারা মনে করে,

যাদুকর সত্য সত্যই আপন গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু ঐ খেলা দেখাইবার সময়, উহার পূর্ব্বে এবং পরে যাদুকর একভাবেই থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মও সংসারের ইন্দ্রজালে কোনকালেই বিকৃত হন না।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রলয়কালে জগতের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধিত হয় কোন্ নিয়মে?

গুরু। স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময়, কিম্বা সমাধির অবস্থায় এটা, ওটা, সেটা ইত্যাকার কোন প্রভেদ থাকে কি?

শিষ্য। না।

গুরু। কিন্তু আবার জাগ্রত হইলে, কিম্বা সমাধিভঙ্গে সেরূপ প্রভেদ আসে কোথা হইতে?

শিষ্য। নিশ্চয়ই অজ্ঞানের বীজ থাকিয়া যায় বলিয়াই পুনরায় ওরূপ ভেদ অনুভূত হয়।

গুরু। তাহা হইলে এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অনুমান করিতে পারি যে, প্রলয়কালেও অজ্ঞানবীজ থাকে, অর্থাৎ প্রলয়কালেও পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে এমন বীজশক্তি নিশ্চয়ই বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই বীজশক্তির বহিরুন্মেষই পুনঃসৃষ্টি। সুতরাং যাঁহারা একবার মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞানবীজ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদেরও আর পুনরায় উৎপত্তি হয় না। যাহা হউক, এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে। অতএব ব্রহ্মই যে বাস্তবিক জগৎকারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মকে জগৎকারণ না বলিয়া প্রধানকে যদি কারণ বল, তবে

স্বপক্ষদোষাৎ চ ॥ ১০ ॥

তোমার এই আপন পক্ষেও যথেষ্ট দোষ দেখান যাইতে পারে।

প্রধানেরও (সাংখ্যমতেই) রূপ, রস ইত্যাদি কিছুই নাই, অথচ তাহা হইতে উৎপন্ন জগতে এই সমস্ত পূর্ণমাত্রায়ই আছে। সুতরাং ব্রহ্মকারণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছিলে, প্রধানকারণ পক্ষেও সেই সমস্ত দোষই দেখান যাইতে পারে। এই সব তথাকথিত দোষ উভয় পক্ষেই সমান। তবে ব্রহ্মকারণ পক্ষে এই সব দোষ পরিহার করা চলে এবং উহা শ্রুতিসিদ্ধ, প্রধানকারণ পক্ষে সেরূপ নয়—এই বিশেষ।

তারপর জগতের মূল কারণ নির্ণয় ব্যাপারে একমাত্র স্বাধীন তর্ক যুক্তির উপরেই একান্ত নির্ভর করা চলে না। মানুষের তর্কশক্তি নিতান্তই অব্যবস্থিত, দুইজন মানুষ স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া কদাপি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ বিচার বলে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অসম্ভব। শাস্ত্রাদির অবলম্বন ব্যতীত কেবল যুক্তির সাহায্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি যতটা তীক্ষ্ণ, সে ততখানি পর্যন্তই পৌঁছিতে পারে। এ ত অহরহই দেখা যায় যে, একজন পণ্ডিত অতি যত্নে একটী তর্কের প্রতিষ্ঠা করিলেন, অপর একজন অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিলেন। আবার তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ তৃতীয় পণ্ডিত তাঁহার খণ্ডনেরও খণ্ডন করিয়া এক অভিনব মত স্থাপন করিলেন। মানববুদ্ধি অতি বিচিত্র—কেবল তাহার সাহায্যে একটা স্থির সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হউক, তাহাকে যুক্তির পথে এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছাইতে হয়, যখন সমস্ত যুক্তিতর্ক একেবারে এলোমেলো হইয়া যায়, তখন আর থৈ পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তখন সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতেই

সেই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। নতুবা স্বাধীন যুক্তিতর্ক কোন কালেই কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে না।

শিষ্য　কিন্তু

তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি অন্যথা অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ ?—

তর্কযুক্তি সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত, স্থির, একরূপ না হইলেও [তর্কা-প্রতিষ্ঠানাদপি] কোন প্রকারের যুক্তিই যে সুস্থিত নয়, এমন ত বলা যায় না ; সুতরাং 'তর্কযুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত' এরূপ [অন্যথা] অনুমানও করিতে পারা যায় [অনুমেয়ম্], ইহা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

'তর্ক বা যুক্তি সুস্থিত নয়'—এই সিদ্ধান্ত তর্কের সাহায্যেই করা হয় ; সুতরাং কোন প্রকারের যুক্তিই যে সুস্থিত নয়, এরূপ একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতএব কপিল প্রভৃতি মহর্ষি যুক্তির বলে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা শ্রুতির অনুযায়ী না হইলেও স্বীকার করা যাইতে পারে।

গুরু। হাঁা

এবম্ অপি অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

এরূপ বলিলেও [এবমপি] তর্কের যে দোষের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই [অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ]।

হইতে পারে, কোন কোন তর্ক বা যুক্তি সুস্থিত, এবং তাহার সাহায্যে লব্ধ সিদ্ধান্তও সত্য, তথাপি আমাদের আলোচ্য বিষয়ে (জগতের মূল কারণ বিষয়ে) তর্ক কিছুতেই একটা স্থির অবিচলিত সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ে কি

প্রত্যক্ষ, কি অনুমান কোন প্রমাণেরই প্রসার নাই। আমরা যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করি, অনুমান বলে সেইরূপ একটা কিছু, কিম্বা সেইরূপ দুটা পাঁচটা জুড়িয়া একটা কিছু কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই কল্পনাটা সত্য কি মিথ্যা, তাহা পরীক্ষা করিবার একমাত্র মাপ কাঠী শাস্ত্র। যে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে ওরূপ কল্পনা করিয়াছি, তাহা কখনও উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না।

আরও দেখ, যথার্থ জ্ঞানে মুক্তি হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যথার্থ বা সম্যক জ্ঞান যাহা, তাহা কখনও নানা প্রকারের হয় না, চিরকাল একইরূপ থাকে। একটা বিষয়ে আমার একরূপ জ্ঞান হইল, তোমার একরূপ হইল, অন্যের অন্যরূপ হইল,—এরূপ জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলা যায় না। সম্যক্ জ্ঞান তোমার আমার উপর নির্ভর করে না; উহা যে বস্তুটীর জ্ঞান, তাহারই একান্ত অধীন। সুতরাং তোমার আমার পরিবর্ত্তনে ঐ জ্ঞানের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে বস্তুটী চিরকাল একইরূপে অবস্থান করে, তাহাই সত্য; এবং তৎসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানও চিরকালই একই প্রকার; তোমার আমার বুঝিবার পার্থক্যে ঐ জ্ঞান আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ হইতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিশক্তি বিচিত্র, শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইয়া কেবল সেই বুদ্ধির সাহায্যে যে রকম যুক্তিই অবলম্বন করা যাক, তাহা পৃথক্ পৃথক্ হইবেই, ফলে তল্লব্ধ জ্ঞানও বিভিন্ন হইবে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলা যায় না। অতএব শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইয়া কেবল তর্কের সাহয্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা দ্বারা কখনও মুক্তি লাভ হইতে পারে না।

সাংখ্যমত শ্রুতির মতের প্রায় অনুরূপ, সুযুক্তিপূর্ণ এবং

বেদমতানুসারী কোন কোন ঋষি উহার কোন কোন অংশ গ্রহণও করিয়াছেন। তথাপি পূর্ব্বোক্ত কারণে সাংখ্যমত অগ্রাহ্য। সুতরাং

এতেন শিষ্ট-অপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২॥

এই সাংখ্যমতের খণ্ডন দ্বারা [এতেন] মনু প্রভৃতি বেদমতাবলম্বী ঋষি যে সমস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের কোন অংশও গ্রহণ করেন নাই, সেই সমস্ত মতও [শিষ্টাপরিগ্রহাঃ অপি] নিরাকৃত, নিরস্ত হইল [ব্যাখ্যাতাঃ] বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সকলেই ত দেখিতে পাই, সংসারের কতক পদার্থ ভোগ করে, আর কতক ভুক্ত হয়। যেমন চেতন, শরীরধারী রাম ভোক্তা (উপভোগকারী), আর মাল্য, চন্দন, অন্ন ইত্যাদি তাঁহার ভোগ্য। এই উপভোক্তা ও ভোগ্য বস্তুর বিভাগ ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ভোক্তা ও ভোগ্য এই উভয়ই যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়, তবে এই প্রসিদ্ধ বিভাগের যে লোপ হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে

ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ ?

ভোগ্যও ভোক্তা হইয়া যায় বলিয়া [ভোক্ত্রাপত্তেঃ] প্রসিদ্ধ বিভাগের লোপ হয় [অবিভাগঃ], যদি [চেৎ] এরূপ বলি ?

গুরু। না, ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলেও এইরূপ বিভাগ

স্যাৎ লোকবৎ ॥ ১৩॥

থাকিতে পারে [স্যাৎ], যেমন ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায় [লোকবৎ]।

দেখ, সমুদ্রের ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ সমস্তই এক জল, এবং উহারা সমুদ্র হইতে অভিন্নও বটে। কিন্তু তথাপি ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ ইহাদের পরস্পরের বিভাগ বা পার্থক্য লোপ পায় না। এই সাধারণ দৃষ্টান্তানুসারে আমরা বলিতে পারি যে, ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তা ভোগ্য হইয়া যায় না, কিম্বা ভোগ্যও ভোক্তা হইয়া যায় না।

বস্তুতঃ এই যে লৌকিক বিভাগ, এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য, এ কেবল উপাধি নিবন্ধন। একই মহাশূন্য যেমন ঘটের মধ্যের শূন্যতা, গৃহের মধ্যের শূন্যতা, প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত, ও পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। ব্যবহার ক্ষেত্রে এরূপ বিভাগ অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু পরমার্থতঃ ওরূপ কোন বিভাগই নাই।

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতিতে যে 'আরম্ভণ' প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা হইতেই [আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ] কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব [তদনন্যত্বম্] সিদ্ধ হয়।

আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পদার্থের সমষ্টি এই যে জগৎ ইহাই হইল **কার্য্য**, এবং পরব্রহ্ম ইহার **কারণ**। শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই কারণ হইতে কার্য্যের পরমার্থতঃ কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই। ভেদ নাই বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য কারণকে ছাড়িয়া স্বয়ং স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতেই পারে না। শ্রুতিতে (ছাঃ ৬.১) দেখিতে পাই, উদ্দালক ঋষি পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝাইতেছেন, কিরূপে

একটী মাত্র বস্তুর জ্ঞানেই অপর বস্তুর জ্ঞান হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে স্থলে বলা হইয়াছে, যেমন একটী মাটির ডেলা যে কি পদার্থ, তাহা সম্যক্ জানিতে পারিলে মাটির তৈয়ারী যত কিছু জিনিষ সবই জানা হইয়া যায়; কারণ, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত জিনিষ একমাত্র মাটিরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র, মাটিই উহাদের স্বরূপ। মাটিকে বাদ দিয়া উহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদি এক মাটিরই বিভিন্ন অবস্থা, এক মাটিই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয় মাত্র। সুতরাং বাস্তবিক দেখিতে গেলে মাটিই সত্য, আর মাটির তৈয়ারী যাবতীয় পদার্থই নাম মাত্রে বর্ত্তমান। ঘট, শরা কলসী ইত্যাদি পদার্থগুলি কেবল বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়, বস্তুতঃ উহারা মাটিই। সুতরাং ঘট, শরা প্রভৃতি এক মাটিরই বিভিন্ন নামের অবস্থাগুলি অ-স্থির বলিয়া মিথ্যা, এবং উহাদের কারণ মাটিই সত্য। এইরূপ কার্য্য কারণের বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দালক বুঝাইলেন যে, পরমার্থতঃ ব্রহ্মই (মূল কারণ) সত্য, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই একই রূপে বর্ত্তমান বস্তু; এবং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জগৎরূপ কার্য্য স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে থাকিতেই পারে না। শ্রুতির "আরম্ভণ" [কার্য্য কেবল নাম দ্বারাই আরব্ধ অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য হয়] প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কার্য্য কখনও কারণকে ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে না; অপর কথায়, **কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ এক, অভিন্ন।** স্মরণ রাখিও, কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও **কার্য্যের স্বরূপ কারণ, কিন্তু কারণের স্বরূপ কার্য্য নয়।**

আরও দেখ, শ্রুতি বলেন, "যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ব্রহ্ম"

(বৃঃ ২.৪.৬), "এ সমস্তই ব্রহ্ম" (মুঃ ২.২.১১) ইত্যাদি। এই প্রকার বহু শ্রুতি বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কারণ হইতে কার্য্যের কোন পৃথক্ স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। যদি কারণ একটা বস্তু, কার্য্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র আর একটা বস্তু হয়, তবে কখনও এক বস্তুর জ্ঞানে সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। উদ্দালকও শ্বেতকেতুকে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন যে, কার্য্যের যখন কারণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, এবং কার্য্যের স্বরূপ যখন কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন একমাত্র কারণকে জানিলেই বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র কার্য্যবর্গই জ্ঞাত হইয়াছে। এইরূপ হইলেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়, অন্যথা নয়। সুতরাং গৃহের মধ্যের শূন্য যেমন বাহিরের মহাশূন্য হইতে পৃথক্ নয়* অথবা মরীচিকার জল যেমন মরুভূমি হইতে পৃথক্ নয়†, সেইরূপ ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি বহুভাগে বিভক্ত এই যে জগৎ, তাহাও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নয়। **সত্য পদার্থ তাহাকেই বলা যায়, যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বঅবস্থায়, সর্ব্বত্র একইরূপে অবস্থান করে; আর যাহা কখনও আছে, কখনও নাই—তাহাই মিথ্যা।** এই ভাবে দেখিলে কারণই বাস্তবিক সত্য, কার্য্য মিথ্যা; ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। বৎস! মিথ্যা বলিতে এরূপ মনে করিও না যে "নাই"। এক অবিকৃত রূপে না থাকাকেই মিথ্যা বলা হয়। জগৎকে মিথ্যা বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ইহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যদি কেহ মনে করে যে, জগৎটা একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ (সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বথা

---

* পরিণামানুরূপ দৃষ্টান্ত।

† বিবর্ত্তানুরূপ দৃষ্টান্ত।

একইরূপে বর্ত্তমান,), তবে তাহা ভুল হইবে। এবিষয়ে ক্রমে বিশদভাবে আলোচনা করিব। সুতরাং দেখা গেল, এক অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, এবং সেই অখণ্ড নির্ব্বিকার ব্রহ্মে পরিকল্পিত ভোক্তা ভোগ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি কার্য্যরূপ এই যে জগৎ, তাহা বস্তুতঃ মিথ্যা।

শিষ্য। কিন্তু নিত্য একইরূপে অবস্থিত কারণ যেমন সত্য, তেমন নানারূপে অবস্থিত সেই কারণের কার্য্যকেও ত আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি ; ব্রহ্মকে যদি বিবিধশক্তিসম্পন্ন এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করি, তবে তাঁহার একত্বও যেমন সত্য, সেইরূপ তাঁহার বহু-রূপত্বও (নানাত্ব) সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা থাকে না। 'একটা গাছ'—এইভাবে যেমন তাহার একত্ব সত্য, সেইরূপ আবার গাছের শাখা, পল্লব, শিকড়, কাণ্ড,—এইভাবে তাহার নানারূপত্বও সত্য। সমুদ্ররূপে যেমন একত্ব ; ফেন, বুদ্‌বুদ্, তরঙ্গ ইত্যাদি রূপে বহুত্ব। মাটিরূপে যেমন একত্ব ; ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদিরূপে বহুত্ব। সুতরাং একত্বও যেমন সত্য, বহুত্বও তেমন সত্য। এইরূপ স্বীকার করিলে একত্বকে লইয়া মোক্ষ, বহুত্বকে লইয়া বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয় ; অর্থাৎ একত্বের জ্ঞানে মোক্ষ, এবং বহুত্বের জ্ঞানে সংসার। এই একত্ব ও নানাত্ব—এই উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই শ্রুতিতে যে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হয়।

গুরু। না, বৎস, তাহা হয় না। শ্রুতিতে মৃত্তিকাকেই কেবল সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (ছাঃ ৬.১.১); মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য ঘট, শরা ইত্যাদিকে কথার কথা বলিয়া মিথ্যাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং পরমকারণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি স্পষ্টই

বলিয়াছেন যে, জীব ও জগৎ সেই ব্রহ্মই। সুতরাং জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপেই সত্য, জীবাদিরূপে সত্য নয়। আর, শ্রুতিতে যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন কিছু বুঝা যায় না যে, জীব একটা কিছু আছে, সাধনাদির দ্বারা সে ব্রহ্মরূপ একটা নূতন কিছু হয়। পরন্তু জীব স্বভাবতঃই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাকে যত্ন করিয়া ব্রহ্ম হইতে হয় না, সে চিরকাল ব্রহ্মরূপেই বর্তমান; কেবল অজ্ঞান প্রভাবে এই তথ্যটি আমাদের অজ্ঞাত বলিয়াই জীবকে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া না ধরিয়া জীবরূপে ধরিলে অবশ্যই ভ্রম হইবে। রজ্জুসর্পভ্রম স্থলে যেমন অনুভূত বস্তুটীকে রজ্জু বলিয়া বুঝিলেই সর্পজ্ঞান চলিয়া যায় এবং সর্পজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভয়, কম্প প্রভৃতিও যেমন সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ জীবকে যখন ব্রহ্মরূপে ধরা যায়, তখন জীবজ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবোচিত সকল ব্যবহারও লুপ্ত হইয়া যায়। তখন একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিতি করে। সুতরাং এক ব্রহ্মের বহুরূপত্ব আর সত্য হয় কিরূপে? শ্রুতি বলেন, "যখন সমস্তই আত্মস্বরূপে পর্যবসিত হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখে" (বৃঃ ৪.৫.১৫)? এইরূপ বহু শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া চিনিয়াছেন, তাঁহার যাবতীয় ব্যবহারই লোপ পাইয়াছে।

অপরঞ্চ, একত্ব ও নানাত্ব—এই উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, 'জ্ঞান মোক্ষের কারণ'—একথাও বলা যায় না। যেহেতু, একত্বের জ্ঞানও সত্য, নানাত্বের জ্ঞানও সত্য; কাজেই একত্বের জ্ঞান হইলেও নানাত্বের জ্ঞান অব্যাহতই থাকে। জ্ঞান দ্বারা কোন সত্য বস্তুর লোপ করা যায় না। রজ্জু ও সর্প—উভয়ই যদি সত্য হয়, তবে রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের জ্ঞান তিরোহিত হয় না। সেইরূপ

নানাত্ব যদি সত্য হয়, তবে একত্বের জ্ঞানে সেই নানাত্বের লোপ হয় না, ফলে জাগতিক ব্যবহার পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে, বন্ধনের আর বিরাম হয় না। কাহারও জ্ঞান হইল, এই কথায় যদি এরূপ বল যে, পূর্ব্বে তাহার কেবল নানাত্বেরই জ্ঞান ছিল, এখন একত্বের জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেই বা তাহার কি লাভ হইবে? তাহার একত্বের জ্ঞানে যখন তাহার নানাত্বের জ্ঞান বিনিষ্ট হইল না, তখন ত তাহাকে বন্ধনের মধ্যেই থাকিতে হইবে। নানাত্ব যদি বাস্তবিক মিথ্যা হয় এবং সে সম্বন্ধে কাহারও সত্যত্ব বুদ্ধি থাকে, তবেই একত্বের জ্ঞানে সেই সত্যত্ব বুদ্ধি বিনষ্ট হইতে পারে, এবং ফলে তাহার বন্ধনেরও বিরাম হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, একত্ব বা অভেদই যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে নানাত্ব বা ভেদ নিশ্চয়ই মিথ্যা। সুতরাং সেই ভেদ সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যক্ষাদি হয়, তাহাও মিথ্যা; শাস্ত্রের বিধিনিষেধও ভেদ স্বীকার করিয়াই করা হইয়াছে, সুতরাং তাহাও মিথ্যা; এমন কি মোক্ষশাস্ত্রও ভেদসাপেক্ষ (গুরু, শিষ্য, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ইত্যাদি অবলম্বনে কথিত), সুতরাং তাহাও মিথ্যা। অতএব শ্রুতি যে বলেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্য সব মিথ্যা—এই উক্তিও মিথ্যা।

গুরু। না, এমন কথা বলিতে পার না। যতক্ষণ আমি ব্রহ্মই, এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ সমস্ত ব্যবহারই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা নাই। দেখ, লোকে যতক্ষণ স্বপ্ন দেখে, ততক্ষণ স্বপ্নে অনুভূত সমস্ত ঘটনাই তাহার সত্য বলিয়া মনে হয়, কেবল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেই উহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ জীব যতদিন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারে, ততদিন সে জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকেই সত্য বলিয়া

গ্রহণ করে, এবং তদনুরূপ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি ব্যবহারও করে। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ বৈদিক, লৌকিক সমস্ত ব্যবহারই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাকেই জগতের **ব্যবহারিক সত্যত্ব** বলা হয়।

শিষ্য। কিন্তু বেদান্তাদি মোক্ষবিষয়ক শাস্ত্র ভেদাশ্রিত বলিয়া তাহা অবশ্য বস্তুতঃ মিথ্যা, সেই মিথ্যা উপদেশ দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ সত্য জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? রজ্জুতে যখন সর্পভ্রান্তি হয়, তখন সেই সর্পে দংশন করিলে ত কেহ মরে না, মরীচিকার জলে ত স্নান বা তৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না।

গুরু। রজ্জু-সর্পে দংশন করিলে মরিতে না পারে, কিন্তু একটা ত্রাস, গাত্রকম্প ইত্যাদি ত হয়। স্বপ্নে জল নাই, অথচ স্নান করিলাম, পিপাসা নিবৃত্তি করিলাম, এরূপ ত মনে হয়।

শিষ্য। তাহা হইলেও ঐ স্নান, কি পিপাসাশান্তি ত আর বাস্তবিক হয় না, উহাও ত মিথ্যা।

গুরু। হঁ্যা, ঐ সব কার্য্য না হয় মিথ্যাই হইল, কিন্তু উহার জ্ঞানটা ত আর মিথ্যা নয়। স্বপ্নে স্নান করিয়াছিলাম, জাগরিত হইয়া দেখিলাম কাপড় শুষ্কই আছে, সুতরাং সত্য সত্য স্নান করি নাই। কিন্তু 'স্নান করিয়াছিলাম'—এরূপ একটা জ্ঞান যে হইয়াছিল, তাহাত আর মিথ্যা নয়। স্বপ্নে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গমের ফলে সময়ে এমন একটা মানসিক বিকার সত্যই উৎপন্ন হয়, যাহাতে বীর্য্যপাতও হইতে পারে। সুতরাং মিথ্যা কিছু দ্বারা যে সত্য কোন কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না, এ কথা বলিতে পার না। অতএব মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইতে বাধা নাই।

আর, যখন 'সমস্তই আমি, আমা ছাড়া আর কিছুই নাই'—এরূপ জ্ঞান হয়, তখন জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। ইহাই চরম জ্ঞান। সুতরাং আত্মা ব্যতীত অপর কিছুর প্রতীতি না থাকায়, কি লৌকিক, কি বৈদিক কোনরূপ কার্য্যই সম্ভব হয় না; ফলে একত্বের জ্ঞানে মোক্ষ, আর বহুত্বের জ্ঞানে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার—এমন কোন সিদ্ধান্ত করাও সমীচীন হয় না।

শিষ্য। তবে 'আমিই সব'—এরূপ জ্ঞান হওয়ায় লাভ কি?

গুরু। লাভ এই যে, এতকাল জগৎকে শুধু জগৎ বলিয়া যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা দূরীকৃত হইয়া যায়। এই অজ্ঞানের নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, এবং ইহারই নাম মুক্তি বা স্বরূপপ্রাপ্তি।

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে একাত্মজ্ঞান, ইহা যে ভ্রান্তি নয়, তাহা বুঝি কিরূপে?

গুরু। 'এটা ভ্রম'—ইহা নিরূপণ তখনই হয়, যখন ঐ ভ্রমের বিপরীত একটা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু-সর্প স্থলে সর্পের জ্ঞান বিষয়ে রজ্জুর জ্ঞান। যদি কোন কালে রজ্জুজ্ঞান না হয়, তবে সর্পজ্ঞানকে মিথ্যা বলা যায় না। আত্মার একত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহার বাধক দ্বিতীয় জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, যাহার 'আত্মাই সব'—এরূপ একত্বের জ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিকট দ্বিতীয় বস্তু থাকিলে ত তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হইবে। সুতরাং আত্মার একত্বের জ্ঞান সম্বন্ধে কোন আশঙ্কার উদয় হওয়ারই সম্ভাবনা নাই। অতএব এই চরম জ্ঞান অভ্রান্ত।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিতে কারণের সত্যতা বুঝাইতে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। মৃত্তিকা বিকৃত হইয়া ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদি 'কার্য্য'রূপে পরিণত হয়। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, ব্রহ্মও ঐরূপ বিকৃত হইয়া জগদাকারে পরিণত হয়।

গুরু। না বৎস! দৃষ্টান্তের সর্ব্বাংশের সহিত, যাহার সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহার মিল দেখাইতে যাওয়া মস্ত ভুল। শ্রুতি ঐ দৃষ্টান্তে শুধু এইটুকুই বুঝাইতে চান যে, ঘট, শরা প্রভৃতির যেমন মাটিকে বাদ দিয়া অস্তিত্বই সম্ভব হয় না, এবং একমাত্র মাটির জ্ঞানেই যেমন মাটির তৈয়ারী যাবতীয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞাত হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মকে বাদ দিয়া, জগতের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই এবং ব্রহ্মকে জানিলেই বস্তুতঃ জগৎ জানা হইয়া যায়। ইহার অধিক সাদৃশ্য দেখান শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। দৃষ্টান্ত ও যাহার সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এই উভয় সর্ব্বাংশেই সমান, একথা বলিলে ত ইহাও বলিতে হয় যে, ব্রহ্ম মাটির ডেলার মত শক্ত, গোল ইত্যাদি। শ্রুতি হইতে স্পষ্টই জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম কূটস্থ*, নির্ব্বিকার; তাহাতে কোন প্রকার বিকার বা পরিণামই হয় না। শ্রুতি বলেন, "এই আত্মা (ব্রহ্ম) জরারহিত, মরণরহিত, স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন" (বৃঃ ৪.৪.২৫) ইত্যাদি। যে শ্রুতি ব্রহ্মকে একবার সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ারহিত, নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বিকারী বা পরিণামধর্ম্মশীল বলিয়া বুঝাইতে যাইবেন, ইহা কখনও সম্ভব হয় না।

শিষ্য। কেন, একটা লোক যেমন নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে চলিতেও পারে, ব্রহ্মও সেইরূপ কখনও নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিয়া কখনও বা আবার বিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন।

* কূট—নেহাই (anvil)। নেহাইতে পিটাইয়া স্বর্ণাদির যেমন নানাবিধ আকৃতি প্রদান করা হয়, অথচ নেহাই যেমন নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ কূটস্থ বলিতে নির্ব্বিকার ত্রিকালস্থায়ী সত্তা বুঝায়, উহাকে আশ্রয় করিয়াই দৃশ্যবর্গ আত্মপ্রকাশ করে।

গুরু। না, তাহা হইতে পারে না। দেখ, আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাবের অনুসন্ধান করিতেছি। শ্রুতি পর্য্যালোচনায় বুঝা যায়, নির্ব্বিকার হইয়া থাকাই ব্রহ্মের স্বভাব। যাহার যাহা স্বভাব, তাহার বিরুদ্ধ ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আগন্তুক ধর্ম্মেরই পরিবর্ত্তন বা বিকার সম্ভব হয়, স্বভাবের বিকৃতি হইতেই পারে না। স্বভাব বা স্বরূপের বিকৃতি বস্তুটি একেবারে ধ্বংস না হইলে হয় না। এক সময়ে চলা ও অন্য সময়ে নিশ্চল হইয়া থাকা—এরূপ বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করা একটা লোকের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কারণ উহা তাহার স্বভাব বা স্বরূপ নয়। চলা কিম্বা নিশ্চল হইয়া থাকাই যদি তাহার স্বভাব হইত, তবে সে কিছুতেই বিভিন্ন সময়েও ওরূপ বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিতে পারিত না। নির্ব্বিকারিত্ব বা পরিণামরাহিত্যই যে ব্রহ্মের স্বভাব, ইহা সহস্র শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হয়, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। (ব্রঃ সূঃ ২.১.২৭ দ্রষ্টব্য)।

তারপর, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত (কূটস্থ) ব্রহ্মের জ্ঞানেই মুক্তি হয়। পরিণাম বা বিকারের জ্ঞানে কোন ফল লাভ হয়, এমন কথা শ্রুতি কুত্রাপি বলেন না। তবে শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হয়, এরূপ বলা হইয়াছে, তাহা শুধু ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিবার জন্য; না হইলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি জানিয়া কোন স্বতন্ত্র ফল পাওয়া যায়, এমন কথা শ্রুতি বলেন না। যেমন, রজ্জুসর্প-ভ্রমস্থলে সেই ভ্রম দূর করিয়া যথার্থ রজ্জুর জ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্যই কেহ বলে,— এই রজ্জুই তোমার সর্প হইয়াছিল, ভ্রমাবস্থাতেও সর্প ঐ রজ্জুতেই অবস্থিত ছিল, এখন আবার ঐ রজ্জুতেই লয় পাইয়াছে। ঐ কল্পিত

সর্প কি করিয়া কোথা হইতে হইল, ইহা বুঝাইয়া যেমন দড়িকে চিনাইয়া দেওয়া হয়, বাস্তবিক যেমন রজ্জু সর্পরূপে পরিণত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মও বস্তুতঃ জগদাকারে পরিণত না হইলেও সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই এই জগতের কল্পনা সম্ভব হয়—শ্রুতি এইরূপ বলিয়া জগদ্‌ভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্মকে চিনাইয়া দেন। সুতরাং ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণামই স্বীকার করা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, একমাত্র নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যদি সত্য হয়, দ্বিতীয় কোন বস্তুই যদি না থাকে, তবে "ব্রহ্মসূত্রে" ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়—এই কথা প্রমাণ করিতে এত প্রয়াস করা হইয়াছে কেন? জগৎ যদি নাই-ই, তবে তাহার উৎপত্তি প্রভৃতির আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন? মাথাই নাই, অথচ মাথাব্যথা কেন হইল, কেমন করিয়া হইল, এইরূপ আলোচনা ত নিছক পাগলামি।

গুরু। বেশ কথা বলিয়াছ। তবে, যে বস্তু বাস্তবিক নাই, তাহাও সময়ে সময়ে আছে বলিয়া ভ্রম হয়। যেমন রজ্জুসর্পস্থলে প্রকৃতপক্ষে সর্প না থাকিলেও যেন আছে বলিয়াই মনে হয়। সেই কল্পিত সর্প কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার আলোচনা অবশ্য নিরর্থক বলিতে পার না। ঐ রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই অজ্ঞানশক্তির সহায়তায় ঐ সর্পের উৎপত্তি হয়, একটা গরুকে অবলম্বন করিয়া হয় না, এরূপ বিচার যেমন প্রয়োজনীয়; সেইরূপ এই কল্পিত জগৎ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই হয়, অচেতন প্রধানাদিকে অবলম্বন করিয়া হয় না—ইত্যাকার বিচারেরও প্রয়োজন আছে। সর্পের উৎপত্তির বিচার যেমন রজ্জুকে চিনাইয়া সর্পভ্রান্তি দূর করে, সেইরূপ জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির বিচারও ব্রহ্মকে চিনাইবার জন্যই।

ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে একান্ত নির্ব্বিকার, কূটস্থ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। তাঁহাতে কোনরূপ বিকারই সম্ভব হয় না। একথা শ্রুতি, যুক্তি ও সাধকের অনুভব সিদ্ধ। তথাপি ব্রহ্মাতিরিক্ত এই যে জগৎ বলিয়া একটা কিছুর অনুভব হয়, ইহার অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ না জানাই এই জগদ্‌ভ্রমের কারণ। ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিলে যখন এই ভ্রম থাকে না, তখন এই অজ্ঞানতাই ঐ ভ্রমের কারণ। এই অজ্ঞানের স্বরূপ কি, কোথায় থাকে, কোথা হইতে আসে, এ সমস্ত বিশেষ ভাবে বিচার করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে গোড়ায় আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে বুঝিতে পারিবে যে, ঐ অজ্ঞানের কোন মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; উহা যে কেন হয়, কোথা হইতে আসে, কিছুই বুঝা যায় না। অথচ উহার অস্তিত্বও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উহার সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, উহা যে একেবারেই নাই, এমনও নয়, আবার একটা কিছু সত্যিকারের পদার্থও নয়, কারণ জ্ঞান হইলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞান এমন একটা কিছু, যাহার প্রভাবে নির্ব্বিকার ব্রহ্মকেও বিকৃত করিয়া দেখায়। এই শক্তির সহিত একীভূত করিয়া যখন ব্রহ্মকে দেখি, তখন তিনি ঈশ্বর, তখনই তাহাকে জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া বলি। বাস্তবিক এই শক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া যখন ব্রহ্মকে দেখি, তখন সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ইত্যাদি কোন কথাই তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তখন তিনি **কেবল**, অদ্বৈত, নির্গুণ।

এই শক্তিই যাবতীয় নাম ও রূপের (form) বীজ। ইহাকে শাস্ত্র **মায়া, প্রকৃতি, অব্যাকৃত** ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। এই মায়াশক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব। যতদিন এই মায়াশক্তির

প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ততদিন ঈশ্বরও সত্য, জগৎও সত্য, এবং তিনিই ইহার স্রষ্টা, মালিক, শাসক, প্রভু। কিন্তু মায়ার অপগমে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরও থাকেন না, তাঁহার প্রভুত্বও লোপ পায়। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই দুইটী অবস্থাই শ্রুতি এবং স্মৃতি দেখাইয়াছেন :—

পারমার্থিক অবস্থা বুঝাইতে শ্রুতি বলেন, "যখন এই সমুদায়ই জ্ঞানীর আত্মা হয়, তখন কে কাহাকে দেখে…" (বৃঃ ৪.৫.১৫)। "সে-ই ভূমা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম), যেখানে অন্য কিছু দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার থাকে না" (ছাঃ ৭.২৪.১)।

আবার ব্যবহারিক অবস্থা বুঝাইতে শ্রুতি বলেন, "ইনিই সকলের প্রভু, ইনিই সকলের মালিক" (বৃঃ ৪.৪.২২) ইত্যাদি।

গীতায়ও পরমার্থ দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে—

"প্রভু কাহারও কর্তৃত্ব, কি কর্ম্ম, কি কর্ম্মফল কিছুই সৃষ্টি করেন না। প্রকৃতিই সব করে। তিনি কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান তিরোহিত হয় বলিয়া জীবের মোহ উপস্থিত হয়" (গীঃ ৫.১৪,১৫)।

আবার, ব্যবহার দৃষ্টিতে গীতা বলেন, "হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে থাকিয়া মায়ার সাহায্যে তাহাদিগকে যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করেন" [গীঃ ১৮.৬১]।

সূত্রকার ব্যাসও পরমার্থ দৃষ্টিতে এই সূত্রে বলিলেন যে, কারণ হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র কার্য্য বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু ব্যবহার অবস্থায় তিনিও ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করেন—এ কথা ১৩ সূত্রে বেশ বুঝা যায়। ঐ সূত্রে তিনি যে সমুদ্র ও ফেনাদির দৃষ্টান্তের সূচনা করিয়াছেন, তাহাতেই এ কথা বুঝা যায়।

যাহা হউক, এখন যে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাই

পুনরায় আরম্ভ করা যাউক। কার্য্য যে কারণ হইতে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নয়, এ কথা একরূপ স্থির হইল। এ সম্বন্ধে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছি—

ভাবে চ উপলব্ধেঃ ॥১৫॥

কারণের অস্তিত্বে অর্থাৎ কারণ যদি থাকে [ভাবে] তবেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়, এইজন্যও [উপলব্ধেঃ চ] বলিতে হইবে যে, কার্য্য কারণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নয়। মাটি থাকিলেই ঘটের উপলব্ধি হয়; মাটি নাই, অথচ ঘট আছে -এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কার্য্য কারণ ছাড়া স্বতন্ত্র কিছু নয়।

আর দেখ,

সত্ত্বাৎ চ অবরস্য ॥১৬॥

উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের-পরে-উৎপন্ন কার্য্যের [অবরস্য] (কারণরূপে) বর্ত্তমানতা থাকে, এই জন্যও [সত্ত্বাৎ চ] কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন।

শ্রুতি বলেন, "এই সব অগ্রে সৎ-ই ছিল" (ছাঃ ৬.২.১)—অর্থাৎ এই যে কার্য্য জগৎ, ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ (ব্রহ্ম) রূপেই বর্ত্তমান ছিল। কার্য্য বস্তু যদি নির্দ্দিষ্টরূপে কারণ স্বরূপে বর্ত্তমান না থাকে, তবে বালুকা হইতেও তৈল উৎপন্ন হইতে বাধা নাই। তিলই তৈলের স্বরূপ, বালুকা নহে—এই জন্যই তিল হইতেই তৈল হয়, বালুকা হইতে হয় না। ফলে কার্য্য-বস্তু কারণ হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিতে ত উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য—

অসৎ-ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ?—

অসৎ ছিল, অর্থাৎ ছিল না—এইরূপ উপদেশও রহিয়াছে, সুতরাং [অসদ্ব্যপদেশাৎ] আপনার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক নয় [ন], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

"এ সকল অগ্রে **অসৎ** ছিল" (ছাঃ ৩.১৯.১)—এই শ্রুতি-বাক্যের বিরুদ্ধে আপনার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কিরূপে ?

গুরু। তুমি যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছ, তাহা সত্ত্বেও আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে

ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।। ১৭ ।।

না [ন]; কারণ, ঐ শ্রুতির শেষ অংশ হইতে [বাক্যশেষাৎ] জানা যায় যে, উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যটী কার্য্যের অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া [ধর্ম্মান্তরেণ] বলা হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্রুত্যংশ হইতে মনে হইতে পারে বটে যে, শ্রুতি যেন উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না—এরূপ অভিমতই প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু একটু পরেই আবার শ্রুতি বলিয়াছেন, "উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল।" সুতরাং তোমার উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য্য ইহা নয় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য একেবারেই ছিল না। তবে এখন (অর্থাৎ উৎপত্তির পরে) যেমন বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন আকারে বিভক্ত দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সেরূপ ছিল না—এইটুকুই 'অসৎ ছিল' এই উক্তির তাৎপর্য্য। নাম-রূপ বিহীন অবস্থায় যাহা থাকে, তাহা আমাদের নিকট একরূপ নাই-ই। সুতরাং তোমার উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে 'কারণ

হইতে কার্য্য অভিন্ন'—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকে না।

আর,

যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ ॥ ১৮ ॥

যুক্তি প্রয়োগে [যুক্তেঃ] এবং [চ] অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতে [শব্দান্তরাৎ] সিদ্ধান্ত হয় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অবশ্যই থাকে, এবং কারণ হইতে উহা পৃথক্ একটা কিছুও নয়।

দেখা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই একটা নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। একটা মাটির ডেলা হইতে কখনও দধি জন্মে না, দুধ হইতে কখনও ঘট হয় না। কেন এমন হয়?—নিশ্চয়ই দুধে এমন একটা কিছু আছে, যাহার ফলে দুধ হইতেই দধি হয়, মাটি হইতে হয় না। যদি দুধে দধি জন্মাইবার একটা বিশেষ শক্তি না থাকিত, তবে মাটি হইতেও দধি হইবার কোন বাধা ছিল না। এই যে বিশেষ শক্তি, ইহারই অপর নাম দধির অব্যক্ত অবস্থা; অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, দধি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত আকারে (অর্থাৎ ঠিক দধির আকারে না হইলেও বস্তুতঃ দধিই) দুধে বর্ত্তমান ছিল। না হইলে দধি একটা নূতন কিছু উৎপন্ন হইল এমন হইলে, যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে কোনই বাধা থাকিতে পারে না। এক একটা সুনির্দ্দিষ্ট কারণকে আশ্রয় করিয়াই যখন কার্য্য পদার্থের আত্মপ্রকাশ হয়, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই কারণ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে, এবং উৎপত্তি ব্যাপারে অব্যক্ত অবস্থার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই হয় না; ফলে কারণই (অব্যক্ত অবস্থা) কার্য্যাকারে প্রকাশ পায় মাত্র, নূতন বস্তু উৎপন্ন হয় না। আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য

থাকে না, কোনও আকারে থাকে না,পরে একটা নূতন কিছু হয়—এরূপ হইতেই পারে না। যাহা একেবারেই নাই, তাহা হয় কিরূপে? উৎপত্তি একটা ক্রিয়া, ইহার একটা কর্ত্তা থাকিবে। মনে কর, বলা হইল, 'একটা ঘটের উৎপত্তি হইল'। এখন ইহার কর্ত্তা কে? ঘট যখন স্বয়ংই নাই, তখন সেকিছু আর উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারে না। অন্যেই বা ইহার কর্ত্তা হয় কিরূপে? যাহা নাই, তাহার সঙ্গে যাহা আছে, তাহার কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। 'কিছুনা' হইতে 'কিছুর' উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং কার্য্য একটা নূতন কিছু, এমন কথা হইতেই পারে না।

অবার দেখ, একটা গরু ও একটা মহিষের যেরূপ পরস্পর পার্থক্য, কার্য্য ও কারণের মধ্যে কিন্তু সেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ (in essence) উভয়ে এক বলিয়াই এরূপ হয়।

শিষ্য। আচ্ছা কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে, তবে আর তাহার 'উৎপত্তি' কি?

গুরু। হাঁ, কার্য্য থাকে নিশ্চয়ই, তবে ঠিক কার্য্যের 'আকারে' থাকে না। কার্য্যের আকারে পরিণতিই উৎপত্তি, এবং উহার জন্যই যত চেষ্টা, যত আয়োজন, নূতন কিছু উৎপাদনের জন্য নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, কার্য্যের-স্বরূপ বা বস্তু (essence) উৎপত্তির পূর্ব্বেও থাকে—একথা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু কার্য্যের 'আকার'টা ত আর থাকে না। ঘট মৃত্তিকারূপে উৎপত্তির পূর্ব্বেও থাকে, কিন্তু ঘটের আকৃতি ত থাকে না। ঐ আকৃতি তাহা হইলে নূতন একটা কিছু; সুতরাং উৎপত্তিতে নূতন কিছু হয় না, একথা বলেন কিরূপে?

গুরু। হ্যাঁ, মৃত্তিকা সম্বন্ধে আকৃতিবিশেষকে নূতন কিছু বলিতে পার বটে, কিন্তু আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐ আগন্তুক আকৃতি-বিশেষও বস্তুর স্বরূপের কোন বিকৃতি ঘটাইতে পারে না। ঘটের স্বরূপ যাহা (অর্থাৎ মৃত্তিকা), তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বদাই একই রূপে বর্ত্তমান থাকে। আগন্তুক আকৃতিবিশেষ দ্বারা বস্তুর স্বরূপের কোন বিকৃতি হয় না। সুতরাং কার্য্য ও কারণ বস্তুতত্ত্ব অভিন্নই। আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকৃতিবিশেষও একটা আকস্মিক নূতন কিছু নয়; উহারও অবশ্য একটা কারণ আছে, যাহার জন্য অভিপ্রেত আকৃতি বিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য আকৃতি হয় না। বিশেষ বিশেষ আকৃতির জন্য বিশেষ বিশেষ প্রণালীই নির্দ্ধারিত হয়। আকৃতি যদি নূতন আকস্মিক একটা কিছু হইত, তবে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিত না। ইট তৈয়ারী করিবার ছাঁচে একটা মাটির ডেলা ঢালিয়া আর কিছু একটা ঘট তৈয়ারী করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক উৎপন্ন পদার্থেরই (আকৃতিরও) একটা সুনির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। কারণের এইরূপ নির্দ্দিষ্টতা আছে বলিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কার্য্য নিশ্চয়ই উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। অভাব কখনও কিছুর কারণ হইতে পারে না।

শিষ্য। কেন, একজনের অর্থ নাই, সেই জন্য সে দুঃখিত। এস্থলে অর্থের অভাবই তাহার দুঃখের কারণ।

গুরু। না অর্থের অভাব তাহার দুঃখের কারণ নয়, ঐ অভাবের বোধই তাহার দুঃখের কারণ। তাহার যদি অর্থাভাব সত্ত্বেও সেই বোধ না থাকে, তবে তাহার দুঃখ হয় না। অর্থ নাই, ইহা অসৎ পদার্থ

হইলেও, অর্থ নাই এইরূপ যে বোধ, তাহা অবশ্যই সৎ পদার্থ। সুতরাং অসৎ হইতে সৎ, অর্থাৎ কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি কদাচ হয় না, এবং ওরূপ উৎপত্তি কল্পনারও অতীত। সুতরাং কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর উৎপত্তিতে কেবল আকারেরই পার্থক্য সম্পাদিত হয়, বস্তুর কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে না। আকারের পরিবর্ত্তনে যে বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। চূর্ণ, কর্দ্দম, খাপড়া, ঘট ইত্যাদি বহু আকারের মধ্যেও মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্ব অবিকৃতই থাকে। আমি হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে একজন, আর হাত-পা ছুড়িয়া ছুটা ছুটি করিলে আর একজন হইয়া যাইব—এমন কথা বলিতে পার না। এক ব্যক্তির বাল্য বয়সের ও বৃদ্ধ বয়সের দুইখানা ফটো একেবারেই বিভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ব্যক্তিত্ব একই, একথা সকলেই স্বীকার করিবে। বাল্যকালের শরীর, মন, সকলই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইলেও ব্যক্তির স্বরূপের কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং আকারের পরিবর্ত্তন হইলেই যে বস্তুও ভিন্ন হইয়া যায়—এমন নহে। দেখ, বটবৃক্ষ বটবীজে অতি সূক্ষ্মরূপে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, পরে সজাতীয় পরমাণুর সংযোগে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তখনই বলি বটবৃক্ষের জন্ম বা উৎপত্তি হইল। আবার ঐ পরমাণুর ক্ষয় হইতে হইতে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে তখন আর উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং তখন বলি, 'গাছটা লয় পাইয়াছে।' বস্তুতঃ তখনও কিন্তু উহার আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, আকারের পরিবর্ত্তনে—এমন কি জন্ম ও মৃত্যুতেও—বস্তুর কোন

ভিন্নতা সম্পাদিত হয় না। ফলে কার্য্য বস্তুতঃ কারণ হইতে ভিন্ন নয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তারপর কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে এবং কারণ হইতে পৃথক্ একটা কিছু নয়, এ বিষয়ে স্পষ্ট শ্রুতিও আছে। যেমন, "হে সৌম্য ! এ সকল (কার্য্য সমূহ) অগ্রে (উৎপত্তির পূর্ব্বে) সৎ-ই (কারণ হইতে অপৃথক্‌ভাবে বিদ্যমানই) ছিল" (ছাঃ ৬.২.১) ইত্যাদি।

কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি

পটবৎ চ ॥ ১৯ ॥

একখানা কাপড়ের মতও [পটবৎ চ] মনে করা যাইতে পারে। একখানা কাপড় যদি গুটান থাকে, তবে স্পষ্ট বুঝা যায় না, এখানা কাপড়, কি অন্য বস্তু। কিন্তু প্রসারিত করিলে ঠিকই বুঝা যায় যে, কাপড়ই বটে। এইরূপ কারণই কার্য্যের আকৃতি ধারণ করে, কার্য্য একটা কিছু নূতন সামগ্রী নয়।

অথবা

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

যেমন প্রাণ প্রভৃতি [প্রাণাদি]। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান—এই পাঁচটী একই প্রাণবায়ুর ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম। যখন প্রাণায়াম দ্বারা এই পাঁচ প্রকারের ক্রিয়া রুদ্ধ করা হয়, তখন শুধু জীবন ধারণ কার্য্যই সাধিত হয়, শরীর আর নড়ে চড়ে না। আবার অন্য সময়ে জীবনী শক্তির কার্য্য ছাড়া অন্য কার্য্যও সম্পাদিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাণশক্তি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ক্রিয়া

সম্পাদন করিলেও বস্তুতঃ এক। অতএব কার্য্যের একটা নূতন আকার হইল বলিয়াই যে তাহা কারণাতিরিক্ত একটু নূতন কিছু, এমন বলা যায় না; বস্তুতঃ কার্য্য কারণেরই রূপান্তর এবং উহা হইতে অভিন্ন।

সুতরাং এই জগৎ বস্তুতঃ পরমকারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শিষ্য। আচ্ছা; চেতন ব্রহ্মই যদি জগতের কারণ হন, তবে কিন্তু অনেক দোষ হয়। শ্রুতি বলেন, "হে শ্বেতকেতু! জগতের যিনি আদি কারণ তিনি আত্মা, তুমি তাহাই" (ছাঃ ৬.৮.৭)। আবার, "তিনি সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্টপদার্থে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইলেন" (তৈঃ ২.৬)। ঈদৃশ শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ংই জীব হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রুতিতে—

ইতরব্যপদেশাৎ হিত-অকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

একজনকে অপর বলিয়া অর্থাৎ স্রষ্টাকেই জীবরূপে বা জীবকেই স্রষ্টারূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অতএব [ইতরব্যপদেশাৎ] কর্ত্তা স্বয়ং নিজের হিত করেন না প্রভৃতি অসম্ভব ও দুষ্ট কল্পনা আসিয়া পড়ে [হিতাকরণাদি-দোষপ্রসক্তিঃ]।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, জীব স্রষ্টা হইতে ভিন্ন নয়। ফলে জীবই স্বয়ং সৃষ্টি করে, একথা বলিতেও বাধা থাকে না। তাহাই যদি হয়, তবে জীব যখন স্বয়ং কর্ত্তা, তখন সে কেন নিজের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি সৃষ্টি করিবে? করিলেই বা আবার আপনার কর্তৃত্ব ভুলিয়া যাইবার কি কারণ আছে?

আর, ইচ্ছা করিলেই বা সে কেন নিজের সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ করিতে পারে না? এই জন্য মনে হয়, কোন চেতনকে এই জগতের স্রষ্টা না বলাই ভাল।

গুরু। হ্যাঁ, শ্রুতি যদি জীবকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতেন, তবে অবশ্য 'আপনি আপনার অকল্যাণ সাধন করা' প্রভৃতি দোষ হইত। কিন্তু শ্রুতি-কথিত জগৎস্রষ্টার জীব হইতে এমন কিছু বিশেষ আছে, যাহাতে উক্ত দোষ হইতে পারে না। তাই সূত্রকার বলেন,

অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২২॥

জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [অধিকম্] যাহা, তাহাই জগতের স্রষ্টা ; যেহেতু, জীব হইতে সেই স্রষ্টা যে পৃথক্, একথা শ্রুতি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন [ভেদনির্দ্দেশাৎ]। জগতের স্রষ্টা যিনি, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি অবশ্য জীব নন। তাঁহার পক্ষে সৃষ্টি কার্য্যে তোমার উল্লিখিত দোষ হইতে পারে না। তাঁহার হিত বা অহিত কিছুই নাই ; কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত ও নিত্যতৃপ্ত। তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তি অব্যাহত। কিন্তু জীবের হিতাহিত অবশ্যই আছে, এবং তাহার জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ। সে যদি জগৎস্রষ্টা হয়, তবে অবশ্য তোমার কথিত দোষ আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাকে ত জগতের স্রষ্টা বলা হয় নাই। শ্রুতি অতি স্পষ্ট ভাবেই জীব হইতে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের পার্থক্য ও আধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। "জীব ব্রহ্মকে দেখিবে, শুনিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে" [বৃঃ ২.৪.৫] ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে জীব একজন এবং পরমেশ্বর আর একজন—এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

শিষ্য। কিন্তু "তুমিই সেই" ইত্যাদি বহু শ্রুতিই ত আবার

জীব ও পরমেশ্বরের একত্ব নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং শ্রুতি একবার বলেন, 'জীব ও ব্রহ্ম এক,' আবার বলেন, 'জীব ও ব্রহ্ম এক নয়, ভিন্ন'। এরূপ বিরুদ্ধ উক্তির তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। কেন, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, যেমন একই মহাশূন্য, গৃহের মধ্যের শূন্য, ঘটের মধ্যের শূন্য ইত্যাদি ভাবে বহু, আবার মহাশূন্যরূপে এক; সেইরূপ বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক হইয়াও উপাধির বিভিন্নতায় বহুরূপেও প্রতীয়মান হইতে পারেন। "তিনি সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন" এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, পরমকারণই জীব, জগৎ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্য পদার্থের আকারে প্রতীয়মান হন, তাঁহার সত্তায়ই জীব ও জগতের সত্তা, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইহাদের কোন অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। একই পরমকারণ জীব ও জগৎরূপ উপাধির সম্পর্কে বহুরূপে প্রতীয়মান হন। জীবকে যখন জীবরূপেই গ্রহণ কর, তখন সে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; কারণ, ব্রহ্ম উপাধি বর্জ্জিত, আর জীব উপাধি বিশিষ্ট। আর শ্রুতি যখন বলেন, "তুমিই সেই", তখন জীবের জীবত্বও থাকে না, কিম্বা ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বও থাকে না। অর্থাৎ জীব, সৃষ্টি ইত্যাদি কোন কথাই তখন আর উঠিতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের একত্বের, অভিন্নত্বের জ্ঞান হইলে তুমি, আমি, এটা, সেটা ইত্যাকার যাবতীয় ভেদই লুপ্ত হইয়া যায়। ভেদব্যবহার শুধু কল্পনা, ভ্রম। তত্ত্বজ্ঞান [একত্বজ্ঞান] ঐ ভ্রম দূর করিয়া দেয়। কাজেই তখন আর সৃষ্টিই বা কি, অহিত করণই বা কি ? অজ্ঞান হইতেই নাম ও রূপের আবির্ভাব হয়, উহারই নাম উপাধি। ঐ উপাধি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই হিত, অহিত, করা, না-করা ইত্যাদি সংসারভ্রম জন্মে। 'আমি জন্মিলাম, রুগ্ন হইলাম, মরিলাম'—ইত্যাকার ধারণা যেমন ভ্রমাত্মক, পরমার্থতঃ

যেমন সত্যিকারের আমি যাহা, তাহার কোন বিকারই হয় না, সেইরূপ এই সংসারও পারমার্থিক দৃষ্টিতে একটা প্রকাণ্ড ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যতক্ষণ পরমার্থ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভেদব্যবহার অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। জীব ভেদ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই উপলব্ধি করে না, বা করিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ ভেদজ্ঞানাভিভূত জীবকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মই জীবের অন্বেষণীয়"—ইত্যাদি। এইরূপ ভেদমূলক উপদেশ ছাড়া ভেদজ্ঞান জর্জ্জরিত জীবকে পরমার্থের দিকে ফিরাইবার অন্য কোন উপায় নাই। সে যে ভেদ ছাড়া অন্য কিছু ধরিতেই পারে না। সুতরাং এই ভাবে দেখিলে ব্রহ্ম অবশ্যই জীব হইতে অধিক (ভিন্ন), এবং তাঁহার পক্ষে হিত-না-করা প্রভৃতি দোষেরও অবসর নাই।

আবার দেখ, ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক হইয়াও জীব, জগৎ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

অতএব,

অশ্মাদিবৎ চ তৎ-অনুপপত্তিঃ ॥২৩॥

প্রস্তরাদির দৃষ্টান্তেও [অশ্মাদিবৎ চ] তোমার উল্লিখিত দোষের অযৌক্তিকতা সিদ্ধ হয় [তদনুপপত্তিঃ]। প্রত্যেক জাতীয় প্রস্তরই যেমন মৃত্তিকারই বিভিন্ন রূপ, একই অন্ন যেমন রক্ত, লোম, মাংস, মল প্রভৃতিরূপে পরিণত, সেইরূপ একই ব্রহ্ম জীব ও জগৎভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও নিজের অহিতকরণাদি দোষ তাঁহার হয় না; কারণ এই বহুরূপত্ব অজ্ঞানেই প্রতীত হয়, বস্তুতঃ বহুত্ব বলিয়া কিছুই নাই। যত কিছু ভেদব্যবহার, সবই নামমাত্র, কথার কথা—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। সুতরাং স্বপ্নে যেমন নানা

বৈচিত্র্য অনুভূত হয়, দৃশ্য জগতেও সেইরূপ হইলে বস্তুর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। অতএব দেখিলে, যতক্ষণ জীবকে কেবল জীবরূপেই গ্রহণ করা হয়, ততক্ষণ সে নিজের অহিতাদি করে; এবং তখন সে সৃষ্টিকর্ত্তাও নয়, তাহার শক্তিও অপ্রতিহত নয়, ফলে ইচ্ছা করিলেও তাহার নিষ্কৃতি অনায়াসসাধ্য হয় না। পক্ষান্তরে যখন জীবকে ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ কর, তখন তাহার হিতাহিতও কিছুই থাকে না। অতএব চেতন ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু এক অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা—এ কথা যেন এখনও ঠিক মনে লাগিতেছে না। কুম্ভকার যখন ঘট নির্ম্মাণ করে, তখন সে মাটি, দণ্ড, চক্র ইত্যাদি নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যেই ঘট তৈয়ারী করে; কুম্ভকার একেলা, এই সমস্ত উপকরণের সাহায্য না লইয়া আর কিছু একটা ঘট তৈয়ারী করিতে পারে না। এইরূপ, যে কেহই কোন কিছু করে, তাহাকেই অন্য বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ব্রহ্ম কিন্তু এক, অদ্বিতীয়, তাঁহার নিকট অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই নাই, সুতরাং তিনি যদি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হন, তবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে এমন কিছুই না থাকায় তাঁহাকে একেলাই সব করিতে ও সব উপকরণ হইতে হয়। কিন্তু এ'ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, এরূপ হইতে ত কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ?—

প্রত্যেক কর্ত্তাকেই নানারূপ সাহায্যকারী উপকরণ সংগ্রহ করিতে

দেখা যায় বলিয়া [উপসংহারদর্শনাৎ] একক ব্রহ্ম জগতের স্বষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না [ন], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু। 　　ন, 　　ক্ষীরবৎ হি ॥২৪॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; কারণ [হি], দুধ যেমন অন্যের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ংই দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ [ক্ষীরবৎ] ব্রহ্মও অন্যের সাহায্য ব্যতীত এই জগদাকারে প্রতিভাত হইতে পারেন।

শিষ্য। কিন্তু দুধ যে দধি হয়, তাহাতেও উষ্ণতা প্রভৃতি বাহ্য-সাধনের প্রয়োজন দেখা যায়।

গুরু। না, উষ্ণতা প্রভৃতি বাস্তবিক দধি জন্মায় না, তবে গরম জায়গায় দুধ রাখিলে একটু তাড়াতাড়ি দধি জমে বটে ; কিন্তু দুধে যদি দধি হইবার শক্তি না থাকে, তবে কি উষ্ণাদির দ্বারা জোর করিয়া উহাকে দধি করা যায় ? তাহা হইলেত বায়ুর দ্বারাও দধি তৈয়ারী করা যাইত। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, দুধ স্বয়ংই দধি হয়, তবে বাহ্যসাধনে তাহার পূর্ণতা সাধিত হয় মাত্র। সেইরূপ ব্রহ্মও জগদাকারে প্রতিভাত হন, তাঁহার কোন বাহ্যসাধনের বা উপকরণের আবশ্যক করে না। ব্রহ্ম হইলেন পরিপূর্ণশক্তিক, তাঁহার কার্য্যের পূর্ণতাবিধানের জন্য অন্য কিছুর সাহায্য কল্পনা করা নিরর্থক। স্বতরাং ব্রহ্ম স্বয়ংই একক অন্য কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেই—এই জগৎ স্বষ্টি করেন।

শিষ্য। আপনি যে দুধের দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহা অচেতন, স্বতরাং সে না হয় স্বয়ং দধিরূপে পরিণত হইল। কিন্তু চেতন (যেমন কুম্ভকার) কাহাকেও ত অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছু উৎপাদন করিতে দেখা যায় না।

গুরু। কেন,

দেবাদিবৎ অপি লোকে ॥২৫॥

সংসারে [লোকে] দেবতা প্রভৃতি যেমন, তেমনও ত [দেবাদিবদপি] একক চেতনকে সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। দেবতারা, পিতৃপুরুষগণ, ঋষিরা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কোন কিছুর সাহায্য না লইয়াই ত অনেক অনেক বস্তু উৎপাদন করেন। সামান্য কুম্ভকার চক্রাদির সাহায্য ব্যতীত ঘট উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া যে কেহই পারিবে না, এমন কি নিয়ম আছে? সংসারে ত অহরহই দেখিতে পাও, একজনে যাহা অতি কষ্টেও না পারে, অন্যে তাহা অনায়াসেই সম্পাদন করে। শক্তির তারতম্য ত প্রত্যক্ষই দেখা যায়। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম যে অন্যের সাহায্য ব্যতীতই স্বয়ং এই জগৎ প্রকাশ করেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি, আর অসম্ভবই বা কি?

তারপর বাস্তবিক বলিতে গেলে ব্রহ্মকে জগতের **স্রষ্টা** না বলিয়া **কারণ** বা **আধার** বলাই সঙ্গত। রজ্জুসর্পস্থলে যেমন রজ্জুই সর্প-প্রতীতির আধার, এই জগৎপ্রতীতির আধারও সেইরূপ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে, এই ভাবেই ব্রহ্মকে জগতের **কারণ** বলা সঙ্গত। রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই যেমন সর্পের উৎপত্তি, রজ্জুতেই যেমন উহার স্থিতি এবং ভ্রমাপগমে যেমন রজ্জুতেই উহার বিলয়, এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ও সেইরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই। আবার, অজ্ঞান-উপহিত রজ্জুই যেমন সর্পের কারণ, সেইরূপ মায়া বা অজ্ঞান উপহিত ব্রহ্মই জগতের কারণ। অজ্ঞান না থাকিলে যেমন রজ্জু স্ব-স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে আর সর্পভ্রম হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির ভিতর দিয়া দেখিলেই ব্রহ্ম জগতের কারণ, নতুবা তিনি '**কেবল**', '**একমেবাদ্বিতীয়ম্**'- তখন জগৎও থাকে না, ফলে উহার কারণ অনুসন্ধানও নিরর্থক হয়। সুতরাং দেখিতেছ, **জগৎসৃষ্টি**

ব্যাপারে ব্রহ্ম একান্ত নিঃসহায়ও নন ; অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই তাঁহার সহায়, তাহারই প্রভাবে সৃষ্টি ; তাহার অভাবে সৃষ্টি বলিয়া কিছুই থাকে না। অবশ্য এই মায়াশক্তিও তাঁহারই নিজস্ব, সাংখ্যের কল্পিত 'প্রধানের' মত একটা স্বতন্ত্র কিছু নয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই যুক্তিসিদ্ধ। শক্তিকে ছাড়িয়া শক্তিমানের কিম্বা শক্তিমানকে ছাড়িয়া শক্তির অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। **মায়াশক্তিতে শক্তিমান ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা**, নিঃশক্তিক বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম নয়। যখন সৃষ্ট্যাদির কথা হয়, তখন **মায়াশক্তি উপহিত** ব্রহ্মের কথাই হয়, নিরুপাধিক বা নির্গুণ ব্রহ্মের কথা হয় না। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বস্তুতঃ সর্ব্ববিধ বিচারেরই অতীত। তাদৃশ ব্রহ্ম জ্ঞানেরই অগোচর, তাঁহকে জানা যায় না। তিনি কোন প্রকার আলোচনা বা জ্ঞানের **বিষয়ই** হইতে পারেন না। তাঁহাকে জানার অর্থ—তাঁহাই **হওয়া**। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য—জানার যোগ্য—তাহাই সোপাধিক। নিরুপাধিকের জ্ঞান অসম্ভব। নিরুপাধিক ব্রহ্ম একটা কিছু পদার্থ, তুমি তাহাকে জানিলে—এ হইতেই পারে না। সমস্ত জ্ঞানের যিনি জ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার জানিবে কে ? জ্ঞাতা চিরকাল জ্ঞাতাই থাকে, সে কখনও জ্ঞেয় হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মকে যিনি জ্ঞানের বিষয় বলেন, তিনি বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ জানেন না।" "ব্রহ্মকে যে সত্য সত্যই জানে, সে ব্রহ্মই হয়" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ **ব্রহ্ম হওয়া** ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।* "যখন সমস্ত আত্মা বা

---

* ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ—ইত্যাদি কথার অর্থও এই যে, ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের বিষয় হন না। আমি আমাকে জানিলাম ইত্যাদি কথার কোন অর্থই নাই, তবে উহার তাৎপর্য্য এইমাত্র যে, আমি সত্যিকারের যাহা তাহাই হইলাম বা আছি, আমার সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ইত্যাদি সমস্ত কথাই লোপ পাইল। পরিপূর্ণাদ্বৈতে পর্য্যবসানই আত্মজ্ঞানের অর্থ।

ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে জানে ?" যখন দ্বিতীয় কিছুর অস্তিত্বই অনুভূত হয় না, তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ইত্যাদি কথাও লোপ পায়—একমাত্র অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশিত থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টি প্রভৃতি কোন কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যখনই সৃষ্ট্যাদির কথা হয়, তখনই মায়া বা অজ্ঞান উপহিত ব্রহ্মের কথাই হয়—এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিও। সুতরাং ব্রহ্ম কুম্ভকারাদির ন্যায় উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াও স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন।

শিষ্য। আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, এক অদ্বিতীয়, বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষ, চেতন ব্রহ্মই এই জগৎরূপে পরিণত হন। কিন্তু বহুশ্রুতি-বাক্যই স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে **নিরবয়ব** অর্থাৎ অংশরহিত বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যখন কতকগুলি অবয়ব বা অংশের সমষ্টি নহেন, তিনি যখন অখণ্ড, পূর্ণ, অতএব অবিভাজ্য, তখন তিনি যদি এই জগৎরূপে পরিণত হন, তবে তাঁহার সবটাই পরিণত হইবে। যেহেতু তাঁহাকে ভাগ করা যায় না, সেইহেতু তাঁহার এক ভাগ জগদাকারে পরিণত হয়, আর এক ভাগ অবিকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে—এরূপ হইতে পারে না। তাহা হইলে ফল এই দাঁড়ায় যে, ব্রহ্ম পদার্থই জগৎ হইয়াছে, জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম বলিয়া আর কোন বস্তু নাই। সুতরাং "ব্রহ্মকে জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতির উপদেশও নিরর্থক, কেন না জগৎছাড়া ব্রহ্ম বলিয়া ত আর কিছু নাই, আর জগৎ ত সকলেই জানে। অতএব আপনারা ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে,

কৃৎস্নপ্রসক্তি :—

ব্রহ্মের সবটাই জগৎরূপে পরিণত হইয়া যায়, আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—এইরূপ একটা দোষ আসিয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে আবার, এই দোষ পরিহার উদ্দেশ্যে যদি বলি যে, ব্রহ্ম সাবয়ব অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের সমষ্টি, অতএব নানাভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য, তবে

নিরবয়বত্ব-শব্দ-কোপঃ বা ॥২৬॥

যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য [শব্দ] ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলেন, সেগুলি [নিরবয়বত্ব-শব্দ] ব্যর্থ [কোপঃ] হইয়া যায়। এবং ব্রহ্ম সাবয়ব অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের সমষ্টি হইলে তাঁহার বিনাশও অনিবার্য। সাবয়ব কোন পদার্থই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্মকে সাবয়ব বলা যায় না। তিনি নিরবয়বই। তাহা হইলেও তাঁহার সবটাই জগদাকারে পরিণত হইয়া যায় না,—

শ্রুতেঃ তু—

যেহেতু, শ্রুতিই সে কথা বলেন। শ্রুতি যেমন বলেন যে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, সেইরূপ আবার জগৎ ব্যতীতও ব্রহ্ম থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইলেও তিনি জগতেই শেষ হইয়া যান না—একথাও শ্রুতি বলেন। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণও বটেন, আবার জগৎ-অতিরিক্ত অবিকৃতও বটেন—ইহাই শ্রুতির মত, এবং এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই ;

শব্দ-মূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

কারণ, ব্রহ্ম শব্দমূলক, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি, তাহা জানিবার এক মাত্র উপায় শ্রুতি। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি কোন প্রমাণেই তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। শ্রুতি

তাঁহাকে যেরূপ বলেন, তাঁহাকে সেইরূপ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। শ্রুতি যখন বলেন যে, ব্রহ্ম জগদাকারে প্রতিভাত হইলেও অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন, অথচ তাঁহার কোন অংশ নাই, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখ, কেবল যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানুষ কতটুকু জানিতে পারে? কয়টা 'কেন'র উত্তর মানুষ দিতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের প্রায় সকল কাজই মানিয়া নেওয়ার উপর চলিতেছে, যুক্তি অবলম্বনে আমরা কয়টা কাজ করি? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, করিতেই পারি না। বায়ু না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না; কিন্তু কেন পারে না, ইহার কি কোন যুক্তি আছে? আহার করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, কিন্তু কেন হয়? এইরূপ যে-কোন বিষয় সম্বন্ধেই ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে, প্রত্যেক পদার্থেরই একটা অচিন্তনীয় শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ করিয়া একটী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারেন, ঐ পদার্থটীর দ্বারা এমন এমন কাজ হইতে পারে—ইত্যাদি বহু কথাই বলিতে পারেন; কিন্তু ঐ পদার্থটী স্বয়ং যে কি তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। এক ফোটা জল কি, না, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটী মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া জল হয়। ইহার অধিক বলিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। কিন্তু এ শুধু শব্দের প্রতি শব্দই দেওয়া হয় মাত্র, শব্দের অর্থ, অর্থাৎ জলবিন্দু স্বরূপতঃ কি, তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। সামান্য সামান্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত পদার্থের স্বরূপ বুঝিবার শক্তিই মানুষের নাই, অচিন্ত্যমহিম ব্রহ্মের স্বরূপ বুদ্ধির সাহায্যে কি করিয়া জানা যাইবে? সুতরাং তর্ক দ্বারা শ্রুতির উক্তিকে খণ্ডন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে একই

বস্তু বিরুদ্ধ রকমের কার্য্য উৎপাদন করে, ইহা ত অহরহই দেখিতেছ। সুতরাং ব্রহ্মও নিরবয়ব ও অবিকৃত থাকিয়াই জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা ত একেবারে অসম্ভবও নয়। এই জন্যই পুনঃ পুনঃ বলি যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে, একমাত্র শ্রুতিই অবলম্বনীয়।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিও যদি একান্ত বিরুদ্ধ কথা বলেন, তবে তাহাই বা স্বীকার করি কি করিয়া? ব্রহ্ম যদি জগৎ আকারে পরিণত হন, এবং তাঁহার যদি কোন অংশ (অবয়ব) না থাকে, তবে তাঁহার সবটাই এই জগতে শেষ হইয়া যায়, একথা অবশ্য বলা উচিত। আর, ব্রহ্ম জগদাকারে—পরিণতও হন, আবার জগতের অতীতরূপেও বর্ত্তমান থাকেন—ইহা বলিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অংশের সমষ্টি বলিতে হয়। নিরবয়ব ব্রহ্ম পরিণতও হন, আবার স্বস্বরূপেও অবস্থান করেন—ইহা হইতেই পারে না। যদি কেহ বলে যে, অগ্নির উত্তাপ আছেও এবং নাইও—তবে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করি? আর বিশ্বাস করিয়াই বা ফল কি? ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তিতে অগ্নি সম্বন্ধে কোনরূপ সত্য ধারণাই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রুতি যদি এইরূপ বিরুদ্ধ কথাই বলেন, তবে সেই শ্রুতির সাহায্যে ব্রহ্মের কোন যথার্থ জ্ঞান হওয়ারই ত সম্ভাবনা দেখি না। শ্রুতি একবার বলেন, ব্রহ্ম নিরবয়ব, আবার বলেন, সাবয়ব—ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। শ্রুতি যাহা বলেন, তাহা সত্য—অতএব ব্রহ্ম সাবয়বও বটেন, নিরবয়বও বটেন—এইভাবে যদি শ্রুতির বিচার কর, তবে শুধু একটা গোজামিল দেওয়াই হইবে। তাহাতে যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণীত হইবে না। অবশ্য শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে

হইবে, শ্রুতি সত্য সত্য কি বলেন। এরূপ বিরুদ্ধ উক্তি করিবার তাৎপর্য্য কি? যথার্থই কি শ্রুতি একটা গোঁজামিল দিয়া রাখিয়াছেন? ঐ আপাতবিরোধের কি কোন মীমাংসাই হয় না?—এই সব বিষয় ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক *। 'ব্রহ্ম নিরবয়ব, অথচ জগৎরূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত অবস্থায় থাকেন'—শ্রুতির এই উক্তি যদি অর্থহীন না হয়, ইহা যদি অভ্রান্তই হয়, তবে দেখিতে হইবে, শ্রুতি কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ অর্থে ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন।

দেখ, একটী বস্তু অবিকৃত (যাহা তাহাই) থাকিয়া বিভিন্ন আকারে তখনই প্রতীয়মান হইতে পারে, যখন এই বিভিন্ন আকার-গুলি বাস্তবিক জন্মে না, তবে সময়ে অনুভূত হয় মাত্র। যেমন, একগাছি দড়ি দড়িরূপে অবিকৃত থাকিয়াও সর্প বা যষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। এইরূপ প্রতিভাত হওয়া ছাড়া, দড়ি যদি সত্য সত্যই সাপ হইয়া যায়, তবে আর তাহা অবিকৃত থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ (রজ্জুতে সর্পের ন্যায়) প্রতিভাত হয় মাত্র, যদি এইরূপই ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণামের অর্থ না বলি, তবে আর ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিতে পারেন না। ইহা ছাড়া পরিণামের অন্য অর্থ স্বীকার করিলেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং 'ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন'—এই কথার অর্থ এই যে, অজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকেই জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়; না হইলে ব্রহ্ম সত্য সত্যই জগৎ হইয়া যান, এরূপ বলিলে তাঁহার অংশ আছে, একথা স্বীকার করিতে হয়, ফলে তিনি বিনাশশীল হইয়া পড়েন। কাজেই শ্রুতির ঐ বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও

* ব্রঃ সূঃ ২।১।২৬-২৭ দ্রষ্টব্য।

কল্পিত নামরূপাত্মক ভেদ আছে। এই অজ্ঞানপ্রসূত কল্পিত ভেদ (অবয়ব, অংশ) দ্বারা ব্রহ্মকে পরিণামী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু **পরমার্থতঃ** তিনি সর্ব্বকালে একইরূপে অবস্থান করিতেছেন। **বস্তুতঃ** তাঁহার কোন পরিণামই হয় না। চোখের দোষে এক চন্দ্রকে দুই বলিয়া দেখা গেলেও চন্দ্র যেমন বস্তুতঃ দুই হইয়া যায় না—এও সেইরূপ। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যত কিছু **নাম রূপ** সবই **কথার কথা মাত্র** (বাচারম্ভণম্), অতএব মিথ্যা। সুতরাং শ্রুতি স্বয়ংই ব্রহ্মের সাবয়বত্ব নিরাস করিয়া নিরবয়বত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

আরও দেখ, শ্রুতির প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে এমন জ্ঞানের উপদেশ করা, যাহা মানুষ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লাভ করিতে পারে না। ইহাতেই শ্রুতির শ্রুতিত্ব। ব্রহ্মের পরিণাম প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ পরিণাম সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জানে। পরিণাম জানিয়া বিশেষ কোন ফল হয়, এ কথা শ্রুতিও কুত্রাপি বলেন না। তবে যে শ্রুতি পরিণামের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল সর্ব্ব পরিণামের অতীত নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিবার জন্য, তাহাতেই মানুষের চরম পুরুষার্থ। (ব্রঃ সূঃ ২. ১. ১৪ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিলে কোন দোষই হইতে পারে না।

আর, ব্রহ্ম যাহা তাহাই থাকেন, অথচ তাঁহাতেই বিচিত্র সৃষ্টি সম্পন্ন হয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহ কেন করিতেছ ?

আত্মনি চ এবং বিচিত্রাঃ চ হি ॥২৮॥

স্বপ্নদ্রষ্টা জীবাত্মাতেও [আত্মনি চ] ত এইরূপ [এবম্] নানা-রকমের সৃষ্টি [বিচিত্রাঃ] দেখা যায়।

শ্রুতি বলেন, 'স্বপ্নকালে বাস্তবিক রথও থাকে না, অশ্বও থাকে না, রাস্তাও থাকে না, অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা যাহা তাহাই থাকিয়া স্বয়ংই এই সমস্ত সৃষ্টি করেন' (বৃঃ ৪. ৩. ১০)। দেখিয়াও থাকিবে যে, একজন যাদুকর দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আবার হয়ত একটা জন্তুর আকারে আবির্ভূত হইল, অথচ যাদুকর কিন্তু যাহা তাহাই থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম যাহা তাহা থাকিয়াও বিচিত্র সৃষ্টি সম্পাদন করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বা অসম্ভাবনার কি আছে ?

তারপর, বেদান্তের বিরুদ্ধমত যাহাদের তাহাদের

স্বপক্ষদোষাৎ চ ॥ ২৯ ॥

নিজেদের পক্ষেও উক্ত দোষগুলি অনিবার্য্য বলিয়া তাহাদের মতই অগ্রাহ্য। নিরবয়ব, শব্দাদিহীন প্রধান, পরমাণু প্রভৃতি যাহাকেই জগতের কারণ বল না কেন, চতুর্থ সূত্র হইতে এযাবৎ যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সব গুলিই উহাদের উপর আরোপ করা যাইতে পারে, অথচ তাহার আর খণ্ডন করা যায় না। ইহা বিস্তৃতভাবে পরে দেখাইব। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে এ সব দোষ হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় বুঝিলে ? সুতরাং ব্রহ্মই জগতের কারণ, অন্য কিছু নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, একক ব্রহ্ম যদি এই বিচিত্র বিশ্বের কারণ হন, তবে তাঁহার বিচিত্র রকমের শক্তি অবশ্য থাকা উচিত।

গুরু। অবশ্যই আছে। ব্রহ্ম

সর্ব্বোপেতা চ তৎ-দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বশক্তিযুক্ত[সর্ব্বোপেতা] ; যেহেতু, শ্রুতি ব্রহ্মকে সেইরূপই দেখাইয়াছেন [তদ্দর্শনাৎ]। শ্রুতি বলেন, "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস,

সর্ব্বব্যাপী, ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, নিষ্কাম, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প"(ছাঃ ৩. ১৪. ৪)। "তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১. ১. ৯)। ইত্যাদি।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্ম না হয় সর্ব্বশক্তিমান হইলেন, কিন্তু

বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ ?

তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় [করণ] না থাকায়, তিনি শক্তি থাকা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন না, এরূপ যদি বলি ?

গুরু। কেন,

তদুক্তম্॥ ৩১ ॥

একথার উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়াছি; ব্রহ্ম যে কি পদার্থ, তাহা কি কোন যুক্তি তর্ক দ্বারা জানা যায় ? একমাত্র শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সুতরাং শ্রুতি যখন বলেন যে, "ব্রহ্মের হস্ত নাই, পদ নাই, অথচ তিনি গ্রহণও করেন, গমনও করেন ; চক্ষু নাই, অথচ দেখেন ; কর্ণ নাই, অথচ শোনেন" (শ্বেঃ ৩.১৯), তখন ব্রহ্মের কোন ইন্দ্রিয় বা উপকরণ না থাকিলেও শুধু সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই সব করিতে পারেন—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে পার। আর, এ ত এমন কিছু অসম্ভবও নয়। একজনের শক্তি সামর্থ্য যেমন, আর একজনের তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকিতে ত সচরাচরই দেখা যায়। আমি তুমি যাহা না পারি, অন্যেও যে তাহা পারিবে না—এমন ত বলিতে পার না। সুতরাং ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও তিনি যে সবই করিতে পারেন—ইহা একেবারে অসম্ভবও নয়।

শিষ্য। আচ্ছা দেখুন, নিতান্ত মূর্খও বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু করে না। ব্রহ্ম হইলেন আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই, তিনি পূর্ণ (perfect)। সুতরাং তিনি কেন সৃষ্টি করিতে যাইবেন ? আর, পাগলে যেমন বিনাপ্রয়োজনে অনেক কিছু করে, ব্রহ্মের সৃষ্টি-

ক্রিয়াও যদি তেমন কিছু হয়, তবে তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, একথাও বলা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম পূর্ণকাম বলিয়া সৃষ্টি করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অতএব তিনি জগৎকারণ হইতে পারেন

ন, প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥৩২॥

না [ন]; যেহেতু প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা-না-একটা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকিবে [প্রয়োজনবত্ত্বাৎ]।

শুরু কেন, এই সৃষ্টিব্যাপারটা

লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সাধারণ লৌকিক খেলা ধুলার মত [লোকবৎ] ব্রহ্মের শুধু লীলা বা ক্রীড়ামাত্র [লীলাকৈবল্যম্]—এই ভাবেও ত গ্রহণ করিতে পার। সাধারণতঃ সংসারে যেমন দেখা যায় যে, যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সেও শুধু খেলার ছলে এটা-ওটা করে। কিম্বা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনরূপ বাহ্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না, অথচ স্বভাবের বশে আপনা হইতেই অতি সহজে সম্পন্ন হয়। লৌকিক খেলায় কিছু-না-কিছু উদ্দেশ্য আছে, এমন অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই স্বসুখ হউক—এই ভাবিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস করে না, উহা স্বভাবের বশে আপনা হইতেই হয়। কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস আছে, থাকিয়া থাকিয়া মাথাটাকে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া। এই মুদ্রা-দোষের কারণ হয়ত ঐ ব্যক্তির শারীরিক গঠনের কোনরূপ বৈকল্য। ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন স্বভাবের বোধে ঐরূপ করে না। মূর্চ্ছিত অবস্থায় অনেকে হাত-পা ছোড়ে; কিন্তু তাঁহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিশ্চয়ই ওরূপ করে না। শারীরিক বিকৃতির ফলে ওরূপ হয় সত্য, মূর্চ্ছারোগ তাদৃশ ক্রিয়ার কারণ

বটে, কিন্তু ঐ ক্রিয়ার অন্তরালে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির কোনরূপ অভাববোধ আছে এবং সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য সে ঐরূপ করিতেছে, এমন বলিতে পারিবে না। একটা ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল—ইহাতে কাহারও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা অভাব পূরণ হইল, বলিতে পার কি? মূর্চ্ছারোগগ্রস্তের **স্বভাবই** হইল হাত-পা ছোঁড়া, বৃন্তচ্যুত ফলের **স্বভাবই** হইল মাটিতে পড়া। তাহাতে আবার প্রয়োজনের কল্পনা কি? দেখ, যাহার যাহা **স্বভাব**, তাহা আত্ম-প্রকাশ করিবেই, তাহাতে প্রয়োজনের কল্পনা করা বৃথা। স্বভাবের প্রয়োজন অনুসন্ধান নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। "অমুক এমন এমন করে," কেন করে?—যেহেতু ঐরূপ করাই তাহার স্বভাব, সে ঐরূপ না করিয়া থাকিতেই পারে না,—যদি না করে, তবে তাহার স্বভাবেরই লোপ হয়, আর স্বভাবের লোপ মানে বিনাশ; এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি কোন কথা উত্থাপন কর, তবে যেমন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেই হয়, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে তাহার **স্বভাবও** অবশ্য স্বীকার করিতে হয়—কারণ স্বভাবের অভাবে অস্তিত্বেরই অভাব হয়, ফলে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলাই চলে না। সুতরাং দেখিতেছ, **স্বভাবের** আর কোন প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না। **স্বভাবের** বশে যাহা হয়, তাহা হইবেই, তাহার আর দ্বিতীয় কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না; আর ওরূপ হওয়ার মূলে কোনরূপ অভাববোধ আছে—এমনও কল্পনা করা যায় না। মায়াশক্তিই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের **স্বভাব**। সেই স্বভাবের বশে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। এই জগৎস্বরূপে প্রকাশ হওয়াই ঐ স্বভাবের কার্য্য। তাহাতে আবার প্রয়োজনের কল্পনা কি? অপরিমিত শক্তিক ব্রহ্মের স্বভাবেই অবলীলাক্রমে এই জগৎ বিরচিত হইতেছে।

তারপর, পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে, বাস্তবিক সৃষ্টি বলিয়াই কিছু নাই। অবিদ্যার প্রভাবে ওরূপ একটা ভ্রম হয় মাত্র। অবিদ্যার স্বভাবই হইল সৃষ্টিরূপে প্রকট হওয়া, উহাই অবিদ্যার স্বরূপ। সর্পরূপে প্রকট হওয়াই রজ্জুগত অবিদ্যার স্বভাব—তাহাতে আবার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের কল্পনা কি ? বস্তুতঃ সর্প যখন হয়ই না, তখন তাহা কেন হয়—এরূপ প্রশ্নই ত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টির কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ব্রহ্ম উহার কারণ হইতে বাধা নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্ম যদি জগৎস্রষ্টা হন, তবে এ জগতে এত বৈষম্য কেন ? কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ পথের ভিখারী, কেহ রুগ্ন, কেহ স্বাস্থ্যবান—এরূপ বৈষম্য যখন জগতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম পক্ষপাতিত্ব দোষদুষ্ট। তাঁহারও তাহা হইলে ইতরজনের মত রাগ (ভাল জিনিষের প্রতি টান) ও দ্বেষ (মন্দের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা) আছে বলিতে হইবে। আবার, আপনার সৃষ্ট জীবকে এত দুঃখ দেওয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করা—এই সব কারণে তাঁহাকে নির্ঘৃণও (অতীব নির্দ্দয়) বলিতে হয়। সুতরাং শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্র যিনি সমদর্শী ও পরম দয়াল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি যদি জগতের স্রষ্টা হন, তবে যে তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় হইয়া পড়েন।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা হইলেও তাঁহার

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ—
তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

পক্ষপাতিত্ব ও নির্দ্দয়তা [বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে] নাই [ন]; কারণ, এই বৈষম্য ও নিগ্রহ জীবের নিজ নিজ কর্ম্মসাপেক্ষ [সাপেক্ষত্বাৎ],

শ্রুতি ও স্মৃতি সেইরূপই [তথাহি] বলেন [দর্শয়তি]। সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের স্বকৃত পাপ-পুণ্যের অনুরূপই তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন, তাহাতে তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলেই উত্তম, মধ্যম বা অধম হইয়া জন্মায়। দেখ, বৃষ্টি ধান্য, গোধুম, যব প্রভৃতি সমস্ত শস্যের উৎপাদনেই সমান ভাবে সাহায্য করে, বৃষ্টির কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তবে এক এক বীজ হইতে যে এক এক রকমের গাছ উৎপন্ন হয়, ইহার কারণ ঐ ঐ বীজের নিজ নিজ বিশিষ্টতা। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাও সর্ব্বজীবের সৃষ্টিবিষয়ে একই রূপের নিয়ন্তা; জীবের যে পার্থক্য তাহা তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন। শ্রুতিও বলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের (পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের) অনুরূপই তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন। যেমন, "মানুষ ভাল কাজ করিলে ভাল হইয়া জন্মায়, মন্দ কাজ করিলে মন্দ হইয়া জন্মায়" (বৃঃ ৩.২.১৩)। স্মৃতিতেও এরূপ বহু উক্তি আছে; যেমন, গীতা ৪.১১। সুতরাং জীবের বৈষম্য ও দুঃখের জন্য জীবই দায়ী, এই জন্য পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় বলা যায় না। অবশ্য তিনি যদি জীবের স্বকীয় কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে উক্ত দোষদুষ্ট বলা যাইত। কিন্তু তিনি জীবকে তাহার কর্ম্মানুরূপই সৃষ্টি করেন।

শিষ্য। আচ্ছা, কর্ম্মই যদি জগতের সুখ দুঃখের কারণ হয়, তবে আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? কর্ম্মই সৃষ্টি করে—এরূপ বলিলেই ত হয়?

গুরু। না, বৎস। কর্ম্ম স্বয়ং কিছু নিষ্পন্ন করিতে পারে না। কারণ, উহা জড়, অচেতন। অচেতন কিছুই চেতনের সাহায্য ব্যতীত কোন কিছু জন্মাইতে পারে না। (ব্রঃ সূঃ ২.২.১—৯)

শিষ্য। আচ্ছা, না হয় মানিলাম যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্ম

অনুসারে জীব এই জন্মে ভাল কি মন্দ হইয়া জন্মায়। কিন্তু প্রথম যখন সৃষ্টি হইল, তখন ত আর কিছুই ছিল না, একমাত্র অখণ্ডরূপী ব্রহ্মই ছিলেন, কোন জীবও ছিল না, কর্ম্মও ছিল না। শরীর থাকিলেই কর্ম্ম করা সম্ভব হয়। আবার শরীরই বা কিরূপে হইবে? তাহাও যে কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শরীর না হইলে কর্ম্ম হয় না, আবার কর্ম্ম না হইলে শরীর হয় না। সুতরাং সর্ব্ব প্রথম যখন সৃষ্টি হইল, তখন কোন কর্ম্ম না থাকায় সৃষ্টিতে কোনরূপ বৈষম্যই হওয়া উচিত নয়; অথচ সৃষ্টিতে বৈষম্য একান্তই প্রকট; বলিতে কি, সৃষ্টির অর্থই বৈষম্যের আবির্ভাব বা উৎপত্তি, একরূপতা বা অখণ্ড নির্ব্বিকারত্বকে সৃষ্টিই বলা যায় না। সুতরাং অন্ততঃ আদি সৃষ্টিব্যাপারে স্রষ্টাকে পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় বলিতেই হইবে। বৈষম্যের কারণই হইল আপনার মতে বিভিন্নরকমের কর্ম্ম। আদিসৃষ্টিতে কর্ম্মের সেরূপ কোন বিভাগ থাকার একেবারেই সম্ভাবনা নাই। অতএব বলিতে হইবে, হয় ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন না, না হয় তিনি পক্ষপাতী ও নির্দ্দয়। অন্য কথায় কর্ম্মকে বৈষম্যের কারণ বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষের নিরাস

ন, কর্ম্ম-অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ?—

হয় না [ন]; যেহেতু, আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য উৎপাদন করিতে পারে, এমন কোন কর্ম্মের বিভাগই নাই [কর্ম্মাবিভাগাৎ]—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

উত্তর। ন, অনাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

না, এরূপ বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, সৃষ্টির কোন আদি নাই [অনাদিত্বাৎ]। আদি সৃষ্টি বলিয়া একটা কিছু নাই। এক

সৃষ্টির পূর্ব্বে আর এক সৃষ্টি, তার পূর্ব্বে আর এক সৃষ্টি—এইরূপ অনাদি কাল হইতে সৃষ্টির একটা প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে (point of time) আরম্ভ হইল—এমন কথা হইতে পারে না। দেখ, গাছ আগে, কি বীজ আগে—তাহা বলা যায় না:—গাছ না হইলে বীজ হয় না, আবার বীজ না হইলে গাছ হয় না। এস্থলে আপাততঃ একটা বিরোধ হইতেছে মনে হইলেও গাছ ও বীজের উৎপত্তিতে কিন্তু কোন বাধা হইতেছে না, কিম্বা উহাদের পরস্পরের কার্য্য কারণ সম্বন্ধেও ব্যাঘাত হইতেছে না। সেইরূপ কর্ম্ম ও বিষম সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে একে অন্যের কারণ রূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কোন বিরোধ নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, সংসার বা সৃষ্টি যে অনাদি অর্থাৎ তাহা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আরব্ধ হয় নাই, সৃষ্টি—লয়, সৃষ্টি—লয়, এই ভাবে বরাবর চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। সৃষ্টির যে কোন একটা আদি নাই, ইহা

উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

যুক্তিসঙ্গতও বটে [উপপদ্যতে চ] এবং [অপি] শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্র এ কথার প্রমাণও পাওয়া যায় [উপলভ্যতে চ]। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, সহসা একদিন একটা সৃষ্টি হইল—এরূপ হইতেই পারে না। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি অসম্ভব। এরূপ কল্পনা করিলে বহু দোষ আসিয়া পড়ে। যেমন, যাঁহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, সহসা সৃষ্টি হইলে তাঁহাদিগকেও আবার জন্মাইতে হইতে পারে। মনে কর, তুমি পূর্ব্বে ছিলে না, অকস্মাৎ ধনীর গৃহে জন্মাইলে এবং তোমার পূর্ব্বকৃত কোন কর্ম্ম না থাকিলেও এই সংসারে বেশ সুখ ভোগ

করিলে। আবার, যে দরিদ্রের গৃহে জন্ম নিল, তাহাকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, অথচ সে বেচারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। জন্মের পরে না হয় যার যার কর্ম্মানুরূপ ফল হয়, কিন্তু একজন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে, অপর একজন দুঃখ কষ্ট মাথায় করিয়াই জন্মায়; জন্মাবধি এইরূপ বৈষম্যের জন্য নিশ্চয়ই ব্যক্তিবিশেষের ইহজীবনের কোন কর্ম্মই দায়ী নয়। এরূপ বৈষম্যের কারণ কি? মনে কর, তুমি নিতান্ত গরিবের ঘরে জন্মিলে; এখন তোমার জন্মের পূর্ব্বে যদি তোমার কোনরূপ অস্তিত্বই না থাকে, তুমি যদি আকস্মিক জন্মিয়া থাক, তবে তোমার দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী কে? অপরের কর্ম্মের ফলে তোমার এইরূপ দুর্ভোগ, এমনও বলিতে পার না, কেন-না, তাহা হইলে বলিতে হয়, এজগতে কোনই নিয়ম নাই। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিবে, এ জগতের প্রত্যেক কার্য্যই একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে। আমার কর্ম্মফল তুমি ভোগ করিলে—এরূপ হইলে বিনা কারণেই সব কিছু হয়—এরূপ একটা অসঙ্গত ও অসম্ভব সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা স্থির যে, যার যার কর্ম্ম ফল সেই ভোগ করে; ফলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্মের ফলেই এই জন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ হয়। পূর্ব্বে কিছুই থাকে না, হঠাৎ এক দিন একজন জন্মায়, এরূপ বলিলে সুখ দুঃখের কোন কারণই নাই—এরূপ একটা অদ্ভুত ও অসঙ্গত কল্পনা করিতে হয়। পরমেশ্বর এই সুখ দুঃখের কারণ হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় বলিতেই হয়, একথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। কেবল অবিদ্যাও এই বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না; কারণ, অবিদ্যাও এক অখণ্ড পদার্থ, সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত

কেবল একরূপতাই সৃষ্টি করিলেও করিতে পারে, বৈষম্য সৃষ্টি করিতে পারে না। অবিদ্যার সহকারীরূপে যদি কর্ম্মের একটা অনাদি প্রবাহ স্বীকার করা হয়, তবেই বৈষম্যের একটা সুসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা হয়। কর্ম্ম সহসা উৎপন্ন হয় বলিতে পার না; কারণ, কর্ম্মবীজকে আদিমান্ বলিলে, শরীর হইলেই কর্ম্ম হইবে, আবার কর্ম্ম থাকিলেই শরীর সম্ভব—এইরূপ একটা বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় এই কর্ম্মবীজকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য 'সৃষ্টির কোন আদি নাই'—এইরূপ উক্তিতে তোমার মন তৃপ্ত না হইতে পারে; কারণ, মানুষের মন সর্ব্বদাই খোঁজে,—'এ'র পূর্ব্বে কি, এ'র পূর্ব্বে কি?' 'অনাদি' – এই কথায় বাস্তবিক আমরা বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। 'সময়ের সীমা নাই'—এ যেমন আমরা ভাবিতে পারি না, আবার তেমনই 'অমুক ক্ষণের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না' একথায়ও তৃপ্ত হইতে পারি না; কারণ, 'যাহা কিছুই না' তাহার ধারণাই হয় না, এবং মনের স্বভাব 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব কিছুর' অনুসন্ধান করা। সুতরাং সৃষ্টি অনাদি বলিলে যদিও তোমার সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি না হউক, তথাপি সৃষ্টি সম্বন্ধে উহাই একমাত্র যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্ত, এবং যতদিন মানুষ দেশ ও কালের (Space and time) অতীত হইতে না পারে, তত দিন ইহার অধিক আশা করা বিড়ম্বনা।

উপনিষদে স্পষ্টতঃ সৃষ্টিকে অনাদি না বলিলেও এমন সব কথা আছে, যাহাতে শ্রুতির সিদ্ধান্তও উহাই, ইহা বুঝা যায়। যেমন, "আমি এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব" (ছা.৬.৩.২) ইত্যাদি। এই স্থলে দেখ, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টির আদি নাই; কেন না, "এই জীবাত্মারূপে'—এই কথাতেই

সৃষ্টির পূর্ব্বেও বীজরূপে জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আবার, "স্রষ্টা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মত সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন" (ঋগ্বেদ ১০.১৯০.৩)। এই শ্রুতিও পূর্ব্ব কল্পের উল্লেখ করিয়া সৃষ্টির অনাদিত্বই প্রমাণ করিতেছে। স্মৃতিও বলেন, 'এই সৃষ্টি ব্যাপারে পরমেশ্বরের রূপ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই" (গী: ১৫.৩ ; ইত্যাদি)। অতএব জগতের বাস্তবিক কোন আদি নাই।

এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে বোধ হয় বুঝিলে যে, জগৎ কারণের যে সমস্ত গুণ বা ধর্ম্ম থাকা প্রয়োজন, সেই

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-উপপত্তেঃ চ ॥ ৩৭ ॥

সমস্ত ধর্ম্মই [সর্ব্বধর্ম্ম] একমাত্র চেতন ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, অতএব [উপপত্তেঃ] তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় প্রকারেরই কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

শিষ্য : গুরুদেব! এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে প্রধান, পরমাণু ইত্যাদিকেই জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ প্রভৃতি মহর্ষি। সুতরাং তাঁহাদের প্রণীত দর্শনের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা স্বতঃই উৎপন্ন হয়। যদিও পূর্ব্বে বহুস্থলে দেখাইয়াছেন যে, ঐ সমস্ত দর্শনের মূলে কোন শ্রুতির পোষকতা নাই, উহা কেবলই মনগড়া এক একটা কল্পনামাত্র, তথাপি কপিল প্রভৃতি মহর্ষি যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ত অকাট্য বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত দর্শনের মত বেদবিরোধী হইলেও সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ সেই যুক্তির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ বেদান্তের সিদ্ধান্তই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে যেন একটু দ্বিধা বোধ হইতেছে।

সাংখ্যকার অনুমান করেন :—

ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদি যাবতীয় মৃত্তিকা নির্ম্মিত পদার্থের পরস্পরের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক, উহাদের প্রত্যেকের ভিতরেই মৃত্তিকা ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত দেখা যায়। বস্তুতঃ মৃত্তিকাই নানা আকারে পরিণত হইয়া ঘট, শরা ইত্যাদি হয়। সুতরাং মৃত্তিকাই

উহাদের কারণ। সেইরূপ, জগতের যত কিছু পদার্থ (কি বাহ্য ঘট, পট ইত্যাদি, কি আভ্যন্তর হর্ষ, বিষাদাদি ভাবসমূহ) সকলেরই বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, **সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞান** এই তিনটি উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সাধারণভাবে অনুস্যূত আছে ;— প্রত্যেক পদার্থই সুখকর, দুঃখকর কিম্বা অজ্ঞাত বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং এই তিনটীই পদার্থমাত্রের স্বরূপ। অন্য কথায় বলিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই মূলে সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞানাত্মক একটা কিছু পদার্থ হইতে উদ্ভূত। সেই মৌলিক পদার্থেরই অপর নাম সত্ত্ব (সুখ), রজ (দুঃখ) ও তমঃ (মোহ বা অজ্ঞান) এই **তিন-গুণ বিশিষ্ট প্রধান** ; এবং ঐ প্রধান যাবতীয় জড় পদার্থের কারণ বলিয়া স্বয়ং জড় বা অচেতন। ঐ অচেতন প্রধান চেতন আত্মার ভোগ ও মোক্ষ সাধনের জন্য আপন বিচিত্র স্বভাবের বশে স্বয়ং বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হয়। আপনার স্বভাবই প্রধানকে জগদ্রূপে পরিণত করে, ইহার জন্য অন্য চেতন অধ্যক্ষের কল্পনা করা নিরথক।

সুতরাং সাংখ্য দর্শনে যে প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করা হয়, এ ত বেশ যুক্তিযুক্তই বোধ হয়।

গুরু। না, বৎস !

রচনা-অনুপপত্তেঃ চ ন অনুমানম্ ॥১॥

এই অনুমান-লব্ধ প্রধান [অনুমানম্] জগৎ-কারণ হইতে পারে না [ন] ; যেহেতু তাহা হইলে এই বিচিত্র জগৎ রচনা কিছুতেই সম্ভব হয় না [রচনানুপপত্তেঃ]।

দেখ, সাংখ্য দর্শনে কেবল দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ জগৎ-

কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এমন কোথাও দেখিয়াছ কি যে, একটা অচেতন পদার্থ অন্য কোন চেতনের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বয়ং কোন ব্যবহারযোগ্য বস্তুরূপে পরিণত হয়? গৃহ, হর্ম্ম্য, শয্যা, আসন, ঘট, পট যত কিছু পদার্থ, সমস্তই ত চেতনাবান্ শিল্পীর দ্বারা রচিত হইতে দেখা যায়। এক টুকরা মাটিকে কখনও ত আপনা আপনি একটা ঘট হইয়া যাইতে দেখা যায় না। চেতননিরপেক্ষ হইয়া অচেতন কোন কিছুকেই ত বিশিষ্ট আকারে পরিণত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্তবলে জগৎকারণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলেও ত অচেতন প্রধানকে এই সুনিপুণ শিল্পীরও অবোধ্য, কল্পনার অতীত, সুনিয়ন্ত্রিত, অপূর্ব্ব পারিপাট্যযুক্ত বিচিত্র জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে ত এই মাত্র দেখা যায় যে, মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থ কুম্ভকারাদি চেতনের প্রেরণায়ই বিবিধ আকারে পরিণত হয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্ত অনুসারে, 'প্রধানও কোন চেতনের প্রেরণায়ই জগৎরূপে পরিণত হয়'—এইরূপ অনুমান করাই বরং সঙ্গত হয়। শ্রুতিনিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়াই যদি জগৎকারণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে দৃষ্টান্তস্থলে যেরূপ দেখা যায়, অনুমানও ঠিক্ ঠিক্ সেইরূপই করা সঙ্গত, তাহার অতিরিক্ত বা ন্যূন কিছু কল্পনা করা নিশ্চয়ই অপ্রামাণিক। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, প্রত্যেক পরিণাম ব্যাপারেই চেতনের অধ্যক্ষতা অপরিহার্য্য; কিন্তু জগৎকারণ নির্দ্ধারণ করিতে যে অনুমান অবলম্বন করা হয়, তাহাতে চেতনের কোন প্রেরণাই নাই—এরূপ বলা ত সঙ্গত হয় না, সুতরাং এই বিচিত্র জগৎকারণ সিদ্ধ হয় না বলিয়া চেতন-নিরপেক্ষ অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলা যায় না।

আরও দেখ, জগতের সমস্ত পদার্থই সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞানাত্মক

এরূপ কথাও বলা যায় না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, সুখ, দুঃখ বা অজ্ঞান বাহিরের বস্তুর স্বভাব নয়, উহা অন্তরেরই। বাহ্য বস্তুতে যদি সুখাদি থাকিত, তবে একই বস্তু একজনের পক্ষে সুখকর, অন্যের পক্ষে দুঃখকর, কিম্বা একজনেরই সময়ে সুখকর, সময়ে দুঃখকর বলিয়া প্রতীত হইতে পারিত না। বাহ্য বস্তুর সুখকরত্ব, কি দুঃখকরত্ব, কি অজ্ঞাতত্ব, মনের অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে, সুখ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থের ধর্ম্ম বা সারভূত উপাদান (essential ingredients) নয়।

তারপর, এই বিচিত্র বিশ্বের রচনার কথা দূরে থাকুক, এই রচনার জন্য যে একটা প্রচেষ্টা বা উন্মুখতা (Tendency to creation). তাহাও অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব

প্রবৃত্তেঃ চ ॥ ২ ॥

জগৎ রচনার জন্য যে প্রচেষ্টা বা উন্মুখতা, তাহাও অচেতন প্রধানের সম্ভব হয় না বলিয়া [প্রবৃত্তেঃ চ] প্রধানকে জগৎ কারণ বলা যায় না।

সাংখ্যমতে সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ সমান ভাবে অবস্থান করে, কোন একটী অপরটী হইতে অধিক শক্তিশালী রূপে থাকে না। সৃষ্টির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এই সাম্যাবস্থার (equilibrium) ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ একটী গুণের আধিক্য হয়, এবং তখনই বিশেষ একটা পরিণামের জন্য প্রধানের একটা স্পন্দন, চাঞ্চল্য বা প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু এই ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। মৃত্তিকাই বল, রথাদিই বল, কুম্ভকার বা অশ্বাদির প্রেরণা ভিন্ন উহাদিগকে স্বয়ং কখনও কোন কার্য্যের জন্য প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। চেতন-নিরপেক্ষ অচেতনের প্রবৃত্তি (ক্রিয়া প্রবণতা)

কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং প্রধান অচেতন বলিয়া সৃষ্টির জন্য উহার কোন প্রবৃত্তিই হইতে পারে না।

শিষ্য। আচ্ছা, চেতন-নিরপেক্ষ কেবল অচেতনের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায় না সত্য। কিন্তু কেবল চেতনেরও ত কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। বরং সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তিই (ক্রিয়া) অচেতনকে আশ্রয় করিয়াই হইতে দেখা যায়। অমুক পদার্থটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা তখনই বুঝা যায়, যখন দেখি পদার্থটী সচল হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে একটী পদার্থকে নড়িতে চড়িতে দেখিলেই আমরা বলি, পদার্থটী ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিমান্ হইয়াছে। এই যে পদার্থটির চাঞ্চল্য, স্পন্দন, গতি, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, ইহা কিন্তু ঐ পদার্থটীতেই প্রকাশমান্ দেখা যায়। কোন চেতন ঐ প্রবৃত্তির আশ্রয় বা প্রেরক মূলতঃ থাকিলেও সচল পদার্থটীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। কেবল ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিটী এবং ঐ প্রবৃত্তি যাহাতে হইতেছে, সেই অচেতন আশ্রয়টীই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। রেলগাড়ী চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে এই চলনক্রিয়া অবশ্যই রেল গাড়ীর, যদিও চেতন ড্রাইভার উহার পশ্চাতে আছে। অবশ্য রেল গাড়ী ইত্যাদির চলন ব্যাপারে উহার চেতন চালকের অস্তিত্ব ও তাহার প্রেরণা আমরা প্রত্যক্ষই দেখি বটে। কিন্তু এমনও অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যে স্থলে চেতনের প্রেরণা আছে, কি নাই, কিছুই বুঝা যায় না। যেমন বায়ুর গতি, জলস্রোতের প্রবাহ ইত্যাদি। সুতরাং সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা বা ক্রিয়াই যখন অচেতনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, এবং চেতনের প্রেরণা যখন স্থলবিশেষে দেখা যায় না, তখন এইরূপ অনুমান করাই ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, সর্ব্বত্রই অচেতনেরই ক্রিয়া হয়। অতএব চেতন হইতেই কর্ম্মের

প্রবৃত্তি বা প্রেরণা আসে, অচেতন হইতে আসে না—এরূপ সিদ্ধান্ত কিরূপে করেন ? অচেতননিরপেক্ষ কোন চেতনেই ত কোনরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না ?

গুরু। না, 'কেবল' চেতনে কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলেও, চেতনে ক্রিয়ার স্পন্দন প্রত্যক্ষ দেখা না গেলেও, চেতনই যে প্রেরণার মূল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। দেখ, চালক না থাকিলে গাড়ী নিশ্চলই থাকে। মৃত শরীরে কোনরূপ ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না, সচেতন শরীরেই প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, চেতনই প্রবৃত্তির কারণ, অচেতন নয়, যদিও প্রবৃত্তি অচেতনেই প্রকাশ পায় ?

শিষ্য। আচ্ছা, যত কিছু প্রবৃত্তি সবই যদি চেতন সমুদ্ভূত হয়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই জগৎসৃষ্টিরূপ প্রবৃত্তিও চেতন আত্মা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সেই চেতন আত্মার নিজের কোনরূপ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া হইতে পারে না, ইহা আপনি পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ১.১.৪ দ্রষ্টব্য)। যাহার নিজেরই কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই, সে অন্যকে প্রবর্ত্তিত করে কিরূপে ?

গুরু। কেন, একখণ্ড চুম্বক নিজে না চলিয়াও ত একখণ্ড লোহাকে চালায়, একটী ফুল গাছে নিশ্চল থাকিয়াও ত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিকার জন্মায়, পৃথিবী স্থূল দৃষ্টিতে স্বয়ং নিশ্চল থাকিয়াও ত সর্ব্ব পদার্থকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। তুমি হয়ত বলিবে, এ সকল অচেতনেরই দৃষ্টান্ত, এবং চুম্বকাদিও স্বয়ং একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়, ভিতরে ভিতরে উহাদেরও ক্রিয়াশক্তি সচল হইয়াই কার্য্য করে। তাহা হইলেও উহারা যে সচল, তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। আর তুমি বল, যাহাতে ক্রিয়াশক্তির স্পন্দন দেখা যায়, ক্রিয়া তাহারই

বলা উচিত, সুতরাং চুম্বকাদিকে যখন চলনশীল 'দেখা' যায় না, তখন তোমার যুক্তি অনুসারেই বলিতে পারি যে, একটি পদার্থ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অন্যকে পরিচালিত করিতে পারে। অতএব পরমেশ্বর স্বয়ং প্রবৃত্তি রহিত হইয়া অন্যকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই। যে স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, সে কখনও অন্যকে পরিচালিত করিতে পারে না (ব্রঃ সূঃ ২.২.৭ দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যঘন পরম ব্রহ্মের কোনরূপ ক্রিয়াই নাই, এবং তিনি কাহাকে প্রবর্ত্তিতও করেন না। সৃষ্ট্যাদি প্রবৃত্তি নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপের নয়, মায়াশক্তি উপহিত সক্রিয় পরমেশ্বরেরই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার। এ বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্তবলে এইমাত্র জানা যায় যে, চেতনের প্রেরণা ব্যতীত একক অচেতনের কোনরূপ প্রবৃত্তি হয় না।

শিষ্য। কেন,

পয়ঃ-অম্বুবৎ চেৎ ? —

[পয়ঃ = দুধ, অম্বু = জল]

দুধ যেমন অচেতন হইলেও আপনা আপনি বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, অচেতন জল যেমন জীবের কল্যাণার্থ বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, সেইরূপ অচেতন প্রধানও স্বভাববশে সৃষ্টি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে— একথা যদি বলি ?

গুরু। না, সে কথা বলিতে পার না ; কারণ,

তত্রাপি চ ॥ ৩ ॥

ঐ সব স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দেখ, তুমি যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিলে তাহাতে চেতনের কোন নিমিত্ততা আছে, কি নাই, তাহা প্রত্যক্ষ বুঝা যায় না তাহা নির্ণয় করিতে হইলে অন্যান্য দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই করিতে হইবে। দুগ্ধের ক্ষরণে কিম্বা জলবহনে, চেতনের নিমিত্ততা প্রত্যক্ষ না হইলেও উহা যে একেবারে নাই-ই, একথাও জোর করিয়া বলিতে পার না। দুগ্ধাদির ক্ষরণে চেতনের অধ্যক্ষতা আছে, কি নাই, তাহা অন্যান্য দৃষ্টান্ত অনুসারেই নির্দ্ধারণ করা যায়। অচেতন প্রধানের কোন চেতন অধিষ্ঠান আছে, কি না, ইহা যেমন নির্ণেতব্য, দুগ্ধাদির ক্ষরণেও চেতনের নিমিত্ততা, কি নিরপেক্ষতা তেমনই নির্ণেতব্য। সুতরাং দুগ্ধ ও বৃষ্টিপাতের দৃষ্টান্তে প্রধানের চেতননিরপেক্ষতা নির্দ্ধারণ করা যায় না। বরং দৃষ্টান্ত যাহা কিছু আছে, তাহা দ্বারা, কি দুগ্ধ, কি বৃষ্টি, কি প্রধান, প্রত্যেকেরই, চেতন অধিষ্ঠান আছে—ইহাই অনুমিত হয় বিশেষতঃ এইরূপ অনুমানের পোষক শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে। শ্রুতি বলেন যে, প্রত্যেক স্পন্দনের মূলে এক চেতন পরমেশ্বর বিরাজমান। যেমন "হে গার্গি! যিনি জল হইতে ভিন্ন, অথচ জলে অধিষ্ঠান করিয়া জলকে পরিচালিত করেন," "সেই অক্ষরের শাসনেই [পরিচালনায়] পূর্ব্ববাহিনী নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে" (বৃঃ ৩. ৮. ৯) ইত্যাদি।

আর, চেতন গাভীর ইচ্ছা ও স্নেহের বশে এবং বৎসের চোষণেই দুগ্ধ ক্ষরিত হয়. মৃত কিম্বা অনিচ্ছুক গাভীর দুগ্ধ ক্ষরিত হয় না। জলও নিম্নদিকেই আকৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহাও নিতান্ত নিরপেক্ষ নয়। অতএব সমস্ত স্পন্দনের মূলেই চেতনের অধ্যক্ষতা রহিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

[পূর্ব্বপাদের ২৪ সূত্রে যে অন্য নিরপেক্ষ দুগ্ধের প্রবৃত্তি দেখান

হইয়াছে, তাহা কেবল স্থূল দৃষ্টিতে লৌকিক দৃষ্টান্তমাত্র, বস্তুতঃ শাস্ত্র সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের অপেক্ষার কথা বলিয়াছেন।]

তারপর দেখ, সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান। সেই প্রধান ছাড়া অন্য কিছুই তাহার পরিচালক (প্রবর্ত্তক, নিয়ামক ও নিবর্ত্তক) বলিয়া স্বীকার করা হয় না। পুরুষ বা আত্মাও সাংখ্যমতে উদাসীন নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সেও প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কিছুই হইতে পারে না। ফলে বলিতে হয়, প্রধান নিজেই নিজের প্রবর্ত্তক, সে অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যদি তাহাই হয়, তবে প্রধান কখনও মহৎ প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়, কখনও বা হয় না, সাম্যাবস্থায়ই অবস্থান করে—এরূপ খামখেয়ালী করিবার কোন হেতুই ত দেখা যায় না। সুতরাং

ব্যতিরেক-অনবস্থিতেঃ চ অনপেক্ষত্বাৎ ॥৪॥

প্রধান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক আছে, এরূপ স্বীকার না করায় [ব্যতিরেক-অনবস্থিতেঃ] প্রধান একান্ত স্বাধীন বলিয়া [অনপেক্ষত্বাৎ] সে কখনও পরিবর্ত্তিত হয়, কখনও হয় না, এরূপ বলা অসঙ্গত। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা যদি অন্য কিছু দ্বারা প্রতিহত না হয়, তবে তাহা একবার এরূপ, আর একবার অন্যরূপ হইতে পারে না। প্রধান অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, তাহাকে প্রতিহত করিবারও কেহই নাই, সুতরাং সাম্যাবস্থায় অবস্থান করাই যদি তাহার স্বভাব হয়, তবে কোন কালেই সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই; আবার পক্ষান্তরে পরিণত হওয়াই যদি তাহার স্বভাব হয়, তবে সে চিরকালই পরিণত হইতে থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। আর কিছুকাল পরিণত হইয়া আবার উপসংহৃত হওয়া কোন বস্তুর স্বভাব সম্বন্ধে বলা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলা হয় যে, ঘাস জল এই সব যেমন অন্য কোন কারণের উপর নির্ভর না করিয়াই আপন স্বভাবে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও অন্য কোন নিমিত্ত নিরপেক্ষ হইয়াই আপন স্বভাবের বশে মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়।

গুরু। না, তাহা বলিতে পার না। ঘাস জল ইত্যাদি কখনও আপনা আপনি দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না। ঘাস যদি আপন স্বভাবেই দুধ হইত, তবে মাঠের ঘাস কিম্বা ষাঁড়ের ভক্ষিত ঘাসও অবশ্য দুগ্ধ হইত। সুতরাং

অন্যত্র অভাবাৎ ন তৃণাদিবৎ ॥৫॥

ষাঁড় প্রভৃতির উদরস্থ ঘাস যখন দুধ হয় না, তখন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঘাস আপন স্বভাবে দুধ হয় না, অন্য সহকারী কারণের সাহায্যেই দুধ হয়। সুতরাং ঘাস প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রধানের স্বাভাবিক পরিণতি স্বীকার করা যায় না।

তারপর প্রধান স্বীয় স্বভাববশে অন্যানিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় (পরিণত হয়), একথা

অভ্যুপগমে অপি—

স্বীকার করিলেও সাংখ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না;

অর্থাভাবাৎ ॥৬॥

যেহেতু, সেই প্রবৃত্তি বা পরিণামের কোন প্রয়োজন [অর্থ] খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রধানের স্বভাবই যদি হয় পরিণত হওয়া, তবে তাহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন ঐ স্বভাব ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা

যায় না। (পূর্ব্বপাদের ৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অথচ সাংখ্যকার বলেন, পুরুষের (আত্মার) প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি বা সৃষ্টিরূপে পরিণতি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষের এমন কোন্ প্রয়োজন থাকিতে পারে, যাহা সিদ্ধ করিবার জন্য প্রধানের পরিণাম স্বীকার করা যায়। প্রয়োজন যদি কিছু কল্পনা করিতে হয়, তবে বলিতে হয়, ভোগ, না হয় মোক্ষ, না হয় উভয়ই। কিন্তু পুরুষ হইলেন (সাংখ্যমতেও) সর্ব্বপ্রকার গুণ ও ক্রিয়া রহিত—নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার আবার ভোগের প্রয়োজনই বা কি, ভোগই বা কি ? যদি পুরুষেরও ভোগ স্বীকার কর, তবে তিনি ত ভোগ করিতেই থাকিবেন, প্রধানের পরিণাম একেবারে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত ত মোক্ষের কোন সম্ভাবনাই নাই। আর, পুরুষের মোক্ষই যদি প্রধানের পরিণামের উদ্দেশ্য হয়, তবে ত সে পরিণাম নিরর্থক ; কারণ, পুরুষ পরিণামের পূর্ব্বেই মুক্ত আছেন। পুরুষের মোক্ষ সম্পাদন করাই প্রধানের প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হইলে পুরুষ বিষয় ভোগ করে কেন ? আবার, ভোগ ও মোক্ষ উভয় সম্পাদন করাই যদি প্রধানের পরিণামের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভোগ্য বস্তুর কোন সীমা না থাকায় কোন কালেও মোক্ষ হইতে পারে না।

কোনরূপ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি প্রধানের পরিণামের উদ্দেশ্য, ইহাও বলা যায় না। কারণ, প্রধান অচেতন, তাহার আবার ঔৎসুক্য কি ?

শিষ্য। আচ্ছা, যদি বলি যে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া সেই চৈতন্যশক্তি বা জ্ঞানশক্তির একটা সার্থকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেই সার্থকতা সম্পাদনের জন্য কতকগুলি দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তুর সদ্ভাব থাকা চাই। দৃশ্য থাকিলেই দৃক্‌শক্তির সার্থকতা। জ্ঞেয় থাকিলেই জ্ঞানশক্তির সার্থকতা। । জ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধেই জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব

জ্ঞেয় নাই, অথচ জ্ঞাতা আছেন—এরূপ কল্পনা করা যায় না। আবার, প্রধান হইল ত্রিগুণবিশিষ্ট বা সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন। সৃষ্টি না করিলে সেই শক্তিও ব্যর্থ। সুতরাং পুরুষের চৈতন্যশক্তি ও প্রধানের সৃষ্টিশক্তি যাহাতে ব্যর্থ না হয়, সেইজন্যই প্রধানের পরিণাম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। না বৎস! তাহা হয় না। শক্তির সার্থকতা সম্পাদনই যদি প্রধান-পরিণামের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই পরিণাম চিরস্থায়ী হওয়াই উচিত; কারণ, যেমুহূর্তে সেই পরিণামের নিবৃত্তি বা বিলয় হইবে সেই মুহূর্তেই—তোমার যুক্তি অনুসারে—শক্তিরও ব্যর্থতা আসিয়া পড়িবে। পরিণামকে যদি স্থায়ী বল, তবে মুক্তি কোন কালেই হইতে পারে না। জ্ঞেয় পদার্থের অভাবে জ্ঞাতাকে জ্ঞাতা না বলিতে পার, কিন্তু তখন জ্ঞাতার স্বরূপেরও বিলয় হয়—এমন কথা বলিতে পার না। জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব অবশ্যই জ্ঞেয়পদার্থরূপ উপাধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু তাহা হইলেও তাদৃশ উপাধির বিগমে জ্ঞাতার স্বরূপেরই নাশ হয়, এমন বলা যায় না,—অবশ্য সেই স্বরূপ যে কি, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব; কারণ, যে কোনরূপ বর্ণনাই উপাধির সাহায্যে হইয়া থাকে, নিরুপাধিকের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না। তবে ইহাও নিশ্চয় যে, তাহা অ-সৎ নহে, বরং তাহাই একমাত্র যথার্থ সৎ—সর্ব্বকালে বর্তমান। সেই নিরুপাধিক স্বরূপ নির্গুণ—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়; তাহাই পরম সত্তা। সেই অখণ্ডৈকরস পরম চিৎসত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় জ্ঞেয়-পদার্থের প্রকাশ। (ব্রঃ সূঃ ১.১.৫ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং সেই সত্তার সার্থকতা চিরকালই বর্তমান, তাহার সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রধানের পরিণাম স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন;

সুতরাং যেরূপেই বল না কেন, অচেতন প্রধানের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তন কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলি যে, যেমন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন অথচ চলচ্ছক্তিরহিত এক পুরুষ (খোঁড়া) চলচ্ছক্তি-সম্পন্ন অথচ দৃষ্টিশক্তি-হীন (অন্ধ) অপর এক পুরুষকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সেইরূপ চেতন অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষ (আত্মা) অচেতন অথচ সক্রিয় প্রধানকে পরিচালিত করিতে পারে। কিম্বা একখণ্ড চুম্বক যেমন স্বয়ং কিছু না করিয়াও (নিষ্ক্রিয় হইয়াও) একখণ্ড লৌহকে চালায়, সেইরূপ পুরুষও কেবলমাত্র নিকটে থাকিয়াই (সন্নিধিবশে) প্রধানকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। অর্থাৎ প্রধানের প্রবৃত্তি

পুরুষ-অশ্মবৎ ইতি চেৎ ?---

অন্ধ ও পঙ্গু পুরুষের ন্যায়, কিম্বা লৌহ ও চুম্বকের ন্যায় [পুরুষাশ্মবৎ] —এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

গুরু।　　　　তত্রাপি ॥ ৭ ॥

তাহা হইলেও দোষ আছে। সাংখ্যমতে ত প্রধান স্বতন্ত্র, স্বাধীন এক সত্তা। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তনের জন্য যদি তাহাকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে আর তাহার স্বাধীনতা থাকে কই ? আবার সাংখ্যমতেই পুরুষ উদাসীন ; সে যদি প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তবে তাহারই বা উদাসীনতা বজায় থাকে কিরূপে ? পঙ্গুও, 'ডাইনে যাও,' 'বাঁয়ে যাও' ইত্যাদি বলিয়া চালাইয়া লয় ; কিন্তু পুরুষ যে সাংখ্যমতে একেবারে উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ, সে ত কোন প্রকারেই প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। তারপর, চুম্বকের

মত কেবল সন্নিধিবশে (নিকটে থাকিয়া) প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেই সন্নিধি ত সর্ব্বদাই আছে, কাজেই প্রবৃত্তিও সর্ব্বদাই হওয়া উচিত, প্রলয় বা মুক্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ত হওয়া উচিত নয়। চুম্বকের সন্নিধি সাময়িক, এবং তাহাও একটা বিশেষ রকমে সাধিত হইলেই কার্য্যকরী হয়। আরও দেখ, প্রধান অচেতন আর পুরুষ উদাসীন এবং উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। এখন, উহাদের মধ্যে যে-কোন রকমের একটা সম্বন্ধ হইতে হইলেই তৃতীয় একটা কিছুর দরকার। তাহাও সাংখ্যমতে নাই। সুতরাং প্রধানের পরিণাম অযৌক্তিক।

[মনে রাখিও, বেদান্তমতে পরমাত্মা স্বরূপতঃ উদাসীন হইলেও মায়াশক্তি সহযোগে তিনি সক্রিয়, সগুণ ও প্রবর্ত্তক]

আবার দেখ, সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ যখন ঠিক সমানভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ এই তিনটী গুণের মধ্যে যদি কোনটীরই অপরটী হইতে কোনরূপ প্রাধান্য বা শক্তির আধিক্য না থাকে, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া অবস্থান করে, তখনই তাহাকে বলা হয় 'প্রধান'। যখন ঐ গুণত্রয়ের একটী অপর দুইটী হইতে বলবান হইয়া উঠে, তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ বা বিচ্যুতি ঘটিয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা এই যে, ঐ স্ব-স্ব প্রধান তিন গুণের মধ্যে একটী হঠাৎ অপর দুইটী হইতে অধিক শক্তিশালী হইবে কেন?—একটী প্রধান, অপর দুইটী অপ্রধান হইবে কেন? একটী অঙ্গী, অপর দুইটী অঙ্গ হইবে কেন? সাম্যাবস্থার প্রত্যেক গুণই স্ব-প্রধান, সেই স্ব-প্রধানভাব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলে ত উহার স্বরূপই নষ্ট হইয়া যায়। গুণাতিরিক্ত

এমন অন্য কোন পদার্থও সাংখ্য স্বীকার করেন না, যাহার প্রভাবে গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে পারে। সুতরাং

অঙ্গিত্ব-অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৮ ॥

একটী গুণের প্রাধান্য [অঙ্গিত্ব] যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়াও [অনুপপত্তেঃ] সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয় না, ফলে মহদাদির সৃষ্টিও হইতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু এই দোষ পরিহারের জন্য যদি অন্যরূপ অনুমান করি ? গুণত্রয় বা প্রধানের স্বভাব তদুৎপন্ন কার্য্যের স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই অনুমিত ও নির্দ্ধারিত হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, গুণত্রয়কে অন্যনিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় (কূটস্থ) বলিলে তাহা হইতে মহদাদি কার্য্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়, তখন বাধ্য হইয়াই অনুমান করিতে হইবে যে, গুণত্রয় একেবারে স্বাধীন নয়, অন্য কিছুর প্রভাবেই তাহাদের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং উহাদের স্বভাবই সক্রিয় হওয়া ; সুতরাং সাম্যাবস্থায়ও বৈষম্য উৎপাদন করিবার একটা যোগ্যতা (বা সামর্থ্য) গুণত্রয়ের স্বভাবে বর্ত্তমানই থাকে, এবং তাহার প্রভাবেই সৃষ্টি হয়।

গুরু। অন্যথা অনুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

এই প্রকার অনুমান করিলেও [অন্যথানুমিতৌ চ] চৈতন্যশক্তি না থাকায় [জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ] জগৎরচনা হইতে পারে না—ইত্যাদি দোষ যে পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তাহা তদবস্থায়ই থাকিয়া যায়। আর কার্য্য দেখিয়া প্রধানের জ্ঞানশক্তিরও যদি অনুমান কর, তবে ত বেদান্ত মতই স্বীকার করা হয়, কেন-না বেদান্তে এক চেতন ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলা হইয়াছে (নামমাত্রে ভেদ)।

তারপর, সাম্যাবস্থায়ও গুণসমূহের বৈষম্য উৎপাদনের যোগ্যতা থাকে, একথা স্বীকার করিলেও সেই যোগ্যতা কার্য্যে পরিণত হইবার কি হেতু আছে? আর বিনা কারণেই যদি সেই যোগ্যতা কার্য্যকরী হয়, তবে চিরকালই বৈষম্য উৎপন্ন হয় না কেন? সুতরাং যেরূপই অনুমান কর না কেন, পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষ থাকিয়াই যায়।

বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

আর [চ], নানা রকমের বিরুদ্ধতা (contradictions) থাকায় [বিপ্রতিষেধাৎ] সাংখ্যদর্শন অযুক্ত [অসমঞ্জসম্]।

শ্রুতির সহিত এবং শ্রুত্যনুসারিণী স্মৃতির সহিত সাংখ্যদর্শনের বিরোধ ত প্রসিদ্ধই। উপরন্তু সাংখ্যের মতসমূহ অনেক সময় পরস্পর বিরুদ্ধ; যেমন, একস্থলে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সাতটী, আবার অন্যত্র বলা হয়, এগারটী। কোন স্থলে মহৎ-তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি, কোথাও অহংকার হইতে; কোথাও অন্তঃকরণ তিনটী, কোথাও একটী-- এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি আছে। অতএব সাংখ্যদর্শনের প্রধানকারণবাদ গ্রাহ্য নহে।

শিষ্য। সাংখ্যদর্শনে যে প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়—ইহা বুঝিলাম। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের যুক্তিটী ত বেশ সুন্দর বলিয়া মনে হয়। এবং সেই ভাবে দেখিতে গেলে কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায় না। বৈশেষিকেরা বলেন যে, কারণের গুণ কার্য্যে ঠিক ঐরূপ গুণই উৎপাদন করিতে দেখা যায়; যেমন সাদা সূতায় সাদা কাপড়ই তৈয়ারী হয়, লাল কাপড় হয় না। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়, তবে জগৎও চেতনই হইত, তাহাতে অচেতন কিছু থাকিতে পারিত না।

গুরু। কেন, পূর্ব্বপাদের ৬ সূত্রে ত এরূপ বৈলক্ষণ্যের সমাধান করা হইয়াছে ?

শিষ্য। হ্যাঁ, তাহা হইয়াছে সত্য। কিন্তু সে স্থলে সাংখ্যের আপত্তিরই খণ্ডন করা হইয়াছে। এবং ১২ সূত্রে অন্যান্য দর্শনের আপত্তিরও সাধারণভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। তথাপি বৈশেষিকের এই যুক্তিটী হৃদয়গ্রাহী মনে হওয়ায় এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা।

গুরু। আচ্ছা, তাহা হইলে বৈশেষিক মতে জগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা মোটামুটি বুঝিয়া লও। বৈশেষিকেরা বলেন :—

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একখণ্ড বস্ত্র কতকগুলি সূত্রের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক পদার্থই তদপেক্ষা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের সংযোগে উৎপন্ন হয়। ঐ স্থূল পদার্থটীকে **অবয়বী**, আর তাহার অংশগুলিকে **অবয়ব** বলা যাইতে পারে। যেমন, বস্ত্র অবয়বী (অবয়ব আছে যার), সূত্র তাহার অবয়ব। আবার একগাছি সূতা অবয়বী, সেই সূতার অংশু (fibre) তাহার অবয়ব। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, যত কিছু অবয়বী (অংশবান্ পদার্থ) সমস্তই ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এই অবয়বের বিভাগ করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় যাইয়া উপনীত হইতে হয়, যখন আর বিভাগ কল্পনা করা যায় না ; অর্থাৎ বিভাগের তাহাই সীমা, শেষ বা সূক্ষ্মতার চূড়ান্ত। ইহারই নাম **পরমাণু**। জগতের যত কিছু পদার্থ, সমস্তই সাবয়ব অর্থাৎ কতকগুলি অবয়বের সমষ্টি। সুতরাং এই জগতের আদি কারণ কতকগুলি পরমাণু ছাড়া আর কি হইতে পারে ? জগতের যাবতীয় পদার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে; যথা—মৃত্তিকা, জল, তেজ ও বায়ু। তদনুসারে পরমাণুও **চারি জাতীয়—পার্থিব বা ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়।** এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন বিভাগের (Dis-integration) চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন কেবল পরমাণুই থাকে—তাহারই নাম প্রলয়। আবার যখন সৃষ্টির সময় উপস্থিত হয়, তখন অদৃষ্টবশে প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে একটা বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য বা ক্রিয়া জন্মে। তখন সেই স্পন্দনের ফলে দুইটী বায়বীয় পরমাণু সংযুক্ত হয়, এবং একটী বায়বীয় **দ্ব্যণুক** উৎপন্ন হয়। ক্রমে তাহার সহিত আর একটী পরমাণু জুড়িয়া যায়, তাহাতে **ত্র্যণুক** জন্মে। এই রূপে জুড়িয়া জুড়িয়া **চতুরণুক** প্রভৃতি হইয়া ক্রমে স্থূল বায়ু নামক ভূতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া অনুসারে জল, তেজ ও মৃত্তিকা নামক ভূতও জন্মে, এবং তাহাদের পরস্পরের সংযোগে সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

আবার দেখ, কতকগুলি সাদা সূতার সংযোগে একখানি সাদা কাপড় উৎপন্ন হইল। কিন্তু একগাছি সূতার যে পরিমাণ (size), গোটা কাপড়খানার কিন্তু সেই পরিমাণ নয়, উহা একগাছি সূতা হইতে অনেক বড়। অতএব দেখা গেল যে, সূত্রের আত্মগত যে পরিমাণ, তাহা তদুৎপাদিত বস্ত্রে অনুগত হয় না। অথচ সূত্রের যে গুণ (শ্বেতবর্ণ), তাহা বস্ত্রেও অনুগত হয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, পরমাণুর যে নিজের একটা বিশেষ পরিমাণ আছে, তাহা দ্ব্যণুকে যায় না, দ্ব্যণুকের আপনারই একটা বিশেষ পরিমাণ উৎপন্ন হয়; আর, পরমাণুর যে স্বকীয় গুণ (রূপরসাদি), তাহা দ্ব্যণুকেও যায়। এইজন্য দুইটি বায়বীয় পরমাণুর সংযোগে একটী বায়বীয় দ্ব্যণুকই হয়, জলীয় বা অন্যজাতীয় দ্ব্যণুক হয় না; কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ, আর দ্ব্যণুকের

পরিমাণ এক নয়, ভিন্ন। পরমাণুর স্বরূপগত নিজস্ব পরিমাণের নাম **পারিমাণ্ডল্য**, দ্ব্যণুকের নিজস্ব পরিমাণের নাম **অণুহ্রস্ব**। একটী দ্ব্যণুক ও একটি পরমাণুতে যে ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণের নাম **মহৎ**। একটী দ্ব্যণুক আর একটী দ্ব্যণুকের সহিত মিলিয়া যে চতুরণুক জন্মায়, তাহার পরিমাণের নাম **মহৎ দীর্ঘ**। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, যখন দুইটী পরমাণু মিলিয়া একটী দ্ব্যণুক জন্মায়, তখন ঐ পরমাণু দুইটীর রূপরসাদি বিশেষ বিশেষ গুণ দ্ব্যণুকেও অনুগত হয়, কেবল 'পারিমাণ্ডল্য' নামক গুণ * দ্ব্যণুকে থাকে না, দ্ব্যণুকে একটী নূতন পরিমাণ উৎপন্ন হয়, যাহার নাম 'অণুহ্রস্ব।' এইরূপ ত্র্যণুকাদির বেলায়ও হয়। ফলে দেখ, বৈশেষিকও স্বীকার করিলেন যে, কারণের স্বরূপগত কোন না কোন গুণ কার্য্যে স্বীয় অনুরূপ গুণ না জন্মাইয়া অন্য রূপ গুণও জন্মাইতে পারে। কার্য্য ও কারণের এরূপ বৈলক্ষণ্য তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং

মহৎ-দীর্ঘবৎ বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥১১॥

দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে [হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্] ত্র্যণুক ও চতুরণুকের উৎপত্তির মত [মহদ্দীর্ঘবৎ] ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্য পরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে তদ্বিপরীত পরিমাণ বিশিষ্ট দ্ব্যণুকের, কিম্বা হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক হইতে তাহার বিপরীত পরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক চতুরণুকাদির উৎপত্তি বৈশেষিক যখন মানেন, তখন চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের সৃষ্টি হয়—একথা মানিতেই বা তাহার আপত্তি কি ?

---

* পরিমাণকেও 'গুণ' বলা যায়। দ্রব্য সম্বন্ধীয় রূপ, পরিমাণ প্রভৃতি সমস্তই দ্রব্যের গুণ (property)

বস্তুতঃ বৈশেষিকের ওরূপ পৃথক্ জাতীয় পরিমাণের উৎপত্তিই যুক্তিসঙ্গত নহে—ইহা ক্রমে দেখাইতেছি। এস্থলে এই মাত্র দেখান উদ্দেশ্য যে, কার্য্য ও কারণের পরস্পর কিছু-না-কিছু বৈলক্ষণ্য বৈশেষিক মতেও স্বীকৃত হয়, সুতরাং বৈশেষিককার ব্রহ্মকারণ সম্বন্ধে বৈলক্ষণ্যের আপত্তি উঠাইতে পারেন না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলা যায় যে, দ্ব্যণুকাদি কার্য্য দ্রব্যের যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেখা যায়, সেই পরিমাণটি কারণ দ্রব্যের (পরমাণুর) পরিমাণ হইতে বিরুদ্ধ স্বভাবের ; কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, কারণের পরিমাণ কার্য্যের পরিমাণ জন্মায় না। পক্ষান্তরে জগৎরূপ কার্য্যের যে অচেতনত্ব, তাহা কারণ ব্রহ্মের চেতনার বিরুদ্ধ কিছু নয়, উহা কেবল চেতনার অভাব মাত্র। সুতরাং কারণগত চেতনা কার্য্যে অন্য চেতনা উৎপাদন করে না, একথা বলা যায় না। যদি কার্য্যে এমন কিছু দেখা যায়, যাহা কারণের গুণের 'বিরুদ্ধ', তবেই বলা যায় যে, কারণের সেই গুণ কার্য্যে তদ্রূপ গুণ জন্মায় না।

গুরু। না, এরূপ বলা যায় না। কারণ, পারিমাণ্ডল্য নামক গুণ পরমাণুতে বিদ্যমান থাকিয়াও যেমন তাহা কার্য্য-দ্ব্যণুকে স্বজাতীয় পরিমাণ জন্মায় না, সেইরূপ চেতনা ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিয়াও জগতে চেতনার উৎপাদন করে না—দৃষ্টান্তের এইটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে। এইটুকু দেখাইবার জন্যই আমরা বৈশেষিকের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।

তারপর, দ্ব্যণুকাদি কার্য্যে অন্যবিধ পরিমাণ আছে বলিয়াই যে পরমাণুর পরিমাণ তাহা উৎপাদন করিতে নিবৃত্ত থাকে, এমন কথাও বলা যায় না। বৈশেষিক বলেন, কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া এক 'ক্ষণ' গুণরহিত হইয়া অবস্থান করে, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহাতে গুণের সঞ্চার হয়। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই প্রথম ক্ষণে পরমাণুর

পরিমাণ কি করে ? ততক্ষণ ত বিরুদ্ধ পরিমাণ জন্মায়ই না। কার্য্যের পরিমাণ জন্মানও তাহার ক্রিয়া নয় ; কারণ, বৈশেষিক মতেই 'বহুত্ব' 'স্থূলত্ব' প্রভৃতি কার্য্যের পরিমাণের জনক। কারণের অন্যান্য গুণ কারণে যে ভাবে থাকে, পরিমাণও ঠিক সেই ভাবে থাকে, কোনই ইতরবিশেষ থাকে না। অথচ অন্যান্য গুণ স্বজাতীয় গুণান্তর জন্মায়, কেবল পরিমাণটী অন্য পরিমাণ জন্মায় না। ইহার কারণ কি ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, পরিমাণের স্বভাববশেই ওরূপ হয়। তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি যে, ব্রহ্মচেতনাও স্বভাববশেই জগতে চেতনার সৃষ্টি করে না। তারপর দুই তিনটী পদার্থ একত্র সংযুক্ত হইয়া একটী ভিন্নাকারের পদার্থ উৎপন্ন হইতে ত সচরাচরই দেখা যায় ; সুতরাং সর্ব্বত্রই যে একই রকমের উৎপত্তি হইবে, এমন কি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে ?

যাহা হউক, এই পরমাণুকারণবাদ যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা দেখাইতেছি।—

বৈশেষিক বলেন, পরমাণুগুলি প্রলয়কালে বা সৃষ্টির পূর্ব্বে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করে। তারপর সৃষ্টিকালে একটী অন্যটীর সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ দুইটী পরমাণু নড়িয়া চড়িয়া পরস্পর সংযুক্ত হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে পরমাণুতে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য বা ক্রিয়া হয়, ইহার কারণ কি ? বিনা কারণে ত কিছু হইতে পারে না। ক্রিয়োৎপত্তির কারণ হইল 'প্রযত্ন', 'অভিঘাত' ইত্যাদি। [প্রযত্ন = শারীরিক চেষ্টা ; অভিঘাত = বায়ু প্রভৃতির আঘাতে বৃক্ষাদির চলন]। কিন্তু এই সমস্ত নিমিত্ত সৃষ্টির পরেই সম্ভব হয়। প্রথম ক্রিয়ার উৎপত্তির 'দৃষ্ট' কোন কারণই ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তারপর

যদি বল যে, কোন 'অদৃষ্ট' কারণে পরমাণুতে আদি ক্রিয়া হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অদৃষ্ট কাহার ? অদৃষ্ট* থাকে আত্মাতে ; সেই অদৃষ্ট পরমাণুতে বিক্ষোভ জন্মায় কিরূপে ? অদৃষ্টবান্ আত্মার সহিত পরমাণুর একটা সম্বন্ধ আছে, এরূপ কল্পনা করিলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সম্বন্ধ কি সহসা হয়, না বরাবরই থাকে ? সহসা একটা সম্বন্ধ হইলে অবশ্য তাহারও একটা কারণ থাকিবে, কিন্তু সেরূপ কারণ ত কিছুই প্রদর্শন করা যায় না। তারপর সেই সম্বন্ধ যদি বরাবরই থাকে, তবে চিরকালই সৃষ্টি হইতে থাকে না কেন, সময়ে আবার প্রলয় কেন হয় ? সুতরাং পরমাণুগুলি সৃষ্টিকালে সহসা সক্রিয় হইয়া উঠে, আবার প্রলয়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন হেতুই নাই। অতএব দেখা গেল, পরমাণুর প্রথম ক্রিয়ার প্রতি 'দৃষ্ট' কোন কারণ নাই ; 'অদৃষ্ট' কোন কারণও পরমাণুগতই হউক, আর আত্মগতই হউক

উভয়থা অপি ন কর্ম্ম, অতঃ তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

উভয় প্রকারেই [উভয়থাপি] পরমাণুতে কোনরূপ ক্রিয়া সম্ভব হয় না [ন কর্ম] ; অতএব [অতঃ] পরমাণুসংযোগে সৃষ্টি হইতে পারে না [তদভাবঃ]। পরমাণুর আবার অদৃষ্ট কি ? আত্মার অদৃষ্টও পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মাইতে পারে না। সুতরাং পরমাণু-কারণবাদ অসমীচীন।

তারপর, এই যে দুইটী পরমাণুর সংযোগের কথা বলা হয়, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে, ঐ সংযোগ কি সর্ব্বাবয়বে হয়, না আংশিকভাবে হয়, অর্থাৎ দুইটী পরমাণু কি সর্ব্বাংশে জোড়া লাগিয়া যায়, না

* অদৃষ্ট—সঞ্চিত কর্ম্মবীজ

একটার গায়ে [একাংশে] আর একটা লাগিয়া থাকে? যদি সর্ব্বাংশেই জোড়া লাগে বল, তবে ত যে পরমাণু সেই পরমাণুই থাকিয়া যায়, তাহার কিছু মাত্র স্থূলতা হইতে পারে না। বিশেষ একাংশের সহিত একাংশের লাগিয়া যাওয়ার নামই সংযোগ। সর্ব্বাংশে সংযোগের ত কোন অর্থই হয় না, ও যে এক হইয়া যাওয়া। আবার পাশাপাশি লাগিয়া যায়, এরূপ বলিলে পরমাণুরও অংশ (পাশ, মধ্য ইত্যাদি) আছে, একথাও স্বীকার করিতে হয়। অথচ পরমাণুর লক্ষণ বলা হয়, যাহার কোন অংশ কল্পনা করা যায় না। কাজেই দেখ, পরমাণুবাদ যুক্তিতে টিকিতেছে না।

তারপর, বৈশেষিক 'সমবায়' সম্বন্ধ নামে একটী পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন। একটা দ্রব্য দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় যে, এই দ্রব্যটীর এই এই গুণ, ইহা দ্বারা এই এই কাজ হইতে পারে, ইহা অমুক জাতীয়—ইত্যাদি। এইরূপ প্রতীতি হইবার কারণ 'সমবায়'। জাতি, গুণ প্রভৃতি কখনও দ্রব্যাদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করে না, কিম্বা পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধও হয় না। অথচ জাতি, গুণ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। সুতরাং ঐরূপ অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধির জন্য 'সমবায়' নামক একটী সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়। বৈশেষিক মতে পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ; অথচ দুইটী পরমাণুতেই একটী দ্ব্যণুক হইয়াছে—এরূপ প্রতীতি হইবার কারণ 'সমবায়' নামক সম্বন্ধ। তাহা হইলে এই সমবায়ও আবার একদিকে পরমাণু ও ও অপরদিকে দ্ব্যণুক হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্নভাবে অবস্থিত ও উপলব্ধ হয়। সুতরাং এই সমবায় সিদ্ধির জন্যও অপর সমবায় কল্পনা করিতে হয়, তাহার জন্য আবার অপর—এইরূপ অনন্ত কল্পনাতেও নিস্তার পাওয়া যায় না।

সুতরাং বৈশিষিক যখন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অভিন্ন প্রতীতি নির্ব্বাহের জন্য

সমবায়-অভ্যুপগমাৎ চ সাম্যাৎ অনবস্থিতেঃ ॥১৩॥

সমবায় নামক একটী অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা করেন, সেইজন্য [সমবায়াভ্যুপগমাৎ], এবং সমবায় সম্বন্ধের অভিন্ন প্রতীতি সমান হওয়ায় [সাম্যাৎ] 'অনবস্থা' দোষ হয় [অনবস্থিতেঃ] অর্থাৎ সমবায়ের সমবায়, তাহার সমবায়, তাহার সমবায়—এইরূপ অবিশ্রান্ত সমবায় কল্পনার আর বিরাম হয় না, ফলে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং বৈশেষিক মতে সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই হইতে পারে না।

তারপর বিচার করিয়া দেখ, পরমাণুগুলির 'স্বভাব' কি ? সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তিত হওয়াই যদি উহাদের 'স্বভাব' হয়, তবে চিরকাল সৃষ্টিই চলিতে থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে প্রবৃত্ত-না-হওয়া যদি স্বভাব হয়, তবে সৃষ্টি আর হইবে কিরূপে ? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই বিরুদ্ধ কার্য্য কাহারও 'স্বভাব' হইতে পারে না। আবার কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছার বশে পরমাণুর কখনও প্রবৃত্তি এবং কখনও নিবৃত্তি হয়—এরূপ বলাও সঙ্গত নয়। কারণ কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা ত সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ; ফলে সর্ব্বদাই হয় সৃষ্টি, না হয় প্রলয়ই হইতে থাকিবে। সুতরাং পরমাণুবাদ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে,

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥১৪॥

হয় সৃষ্টি, না হয় প্রলয় নিত্যকালই [নিত্যমেব] হইতে থাকে [ভাবাৎ] ; কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না।

তারপর, বৈশেষিক বলেন, সাবয়ব (অংশযুক্ত) দ্রব্যের অবয়ব (অংশ, parts)গুলি ভাগ করিতে করিতে যখন আর ভাগ করা সম্ভব হয় না, তখনই তাহার নাম 'পরমাণু'। সেই পরমাণু চারি জাতীয়—জলীয়, বায়বীয়, পার্থিব ও তৈজস। এই সমস্ত পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি গুণ আছে। পরমাণুগুলি নিত্য, অর্থাৎ তাহাদের বিনাশ নাই, তাহারা চিরকালই আছে ও থাকিবে। এই সমস্ত কল্পনা কিন্তু নিতান্তই অসমীচীন ; কারণ,

রূপাদিমত্বাৎ চ বিপর্য্যয়ঃ দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

পরমাণুর রূপ, রস প্রভৃতি গুণ আছে, একথা বলায় [রূপাদিমত্বাৎ] পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিত্য (অবিনাশী) এই লক্ষণের বিপরীত কথাই বলা হয় [বিপর্য্যয়ঃ] ; যেহেতু, সাধারণতঃ ঐরূপই দেখা যায় [দর্শনাৎ]।

দেখা যায়, যাহা কিছু রূপাদিযুক্ত, তাহাই আপন আপন কারণের তুলনায় স্থূল ও অনিত্য (নশ্বর)। যেমন বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র আবার অংশু (আঁশ, fibre) অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিকের পরমাণুর যখন রূপাদি আছে, তখন অবশ্যই তাহারও কারণ আছে। সেই কারণের তুলনায় পরমাণু নিশ্চয়ই স্থূল ও অনিত্য হইবে। বস্তুতঃ রূপাদিযুক্ত কোন পদার্থ নিত্য—ইহা কুত্রাপি দেখা যায় না। রূপাদি আছে অথচ তাহা নিত্য—এরূপ কল্পনা শ্রুতিতে ত নাই-ই, কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বলেও ওরূপ অনুমান করা যায় না। রূপাদিমান্ প্রত্যেক পদার্থই বিনাশশীল বলিয়া দৃষ্ট হয়। সুতরাং পরমাণুকারণবাদ শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য।

আবার দেখ, পৃথিবী স্থূল এবং তাহার গুণ—রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ।

পৃথিবী অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম, এবং তাহা রূপ-রস-স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট। তেজ জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তাহার গুণ রূপ ও স্পর্শ। বায়ু তেজ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার গুণ স্পর্শ। এইরূপে দেখা যায়, যে ভূতের গুণ যত বেশী, সে তত স্থূল। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, বৈশেষিকের চারি জাতীয় পরমাণুও অল্পাধিক গুণবিশিষ্ট, কি-না। অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিনা, এবং জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণ পর পর কম কি-না।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

গুণের অল্পাধিকতা স্বীকার করা না করা উভয় পক্ষেই [উভয়থা] দোষ আছে বলিয়া [দোষাৎ] পরমাণুবাদ অসমীচীন।

পার্থিব পরমাণুর গুণ যদি অধিক হয়. তবে সেইগুলি অবশ্য অন্য জাতীয় পরমাণু অপেক্ষা স্থূল। যাহার যত বেশী গুণ, সে তত বেশী স্থূল। ফলে পার্থিব পরমাণুর পরমাণুত্বই থাকে না; কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম যাহা, তাহারই নাম পরমাণু। এইরূপ অন্যান্য পরমাণুরও পরমাণুত্ব লোপ পায়। আবার যদি বলা হয় যে, এক এক জাতীয় পরমাণুর কেবল এক একটী গুণ আছে, তবে একমাত্র গন্ধগুণবিশিষ্ট পার্থিব পরমাণুর দ্বারা উৎপাদিত পৃথিবীতে কেবল গন্ধেরই উপলব্ধি হওয়া উচিত; তাহাতে রূপ, রস, স্পর্শ অনুভূত হইবে কিরূপে? অথচ পৃথিবীতে কিন্তু গন্ধাদি চারি গুণেরই উপলব্ধি হয়। এইরূপ অন্যান্য ভূতের বেলায়ও দোষ আসিয়া পড়ে। আবার প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুরই চার চার গুণ আছে, একথা বলিলেও প্রশ্ন হইতে পারে, বায়ু দেখা যায় না কেন, তাহারও ত রূপ আছে? সুতরাং যেভাবেই দেখ, পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রধানকারণবাদ, যাহা হউক, কোন কোন অংশে ঋষিরা স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু এই পরমাণুকারণবাদ

অপরিগ্রহাৎ চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

কেহই গ্রহণ করেন নাই, এইজন্যও [অপরিগ্রহাৎ চ] একেবারেই [অত্যন্তম্] উপেক্ষণীয় [অনপেক্ষা]।

শিষ্য। গুরুদেব! বৌদ্ধেরা জগতের কারণ সম্বন্ধে কি বলেন, এবং তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস, শুন! বৌদ্ধদিগের মধ্যে মোটামুটি তিন প্রকারের মত প্রচলিত দেখা যায়।* এক সম্প্রদায় বলেন—ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্য পদার্থও আছে, আবার জ্ঞান, সুখ ইত্যাদি আন্তর পদার্থও আছে। আর এক সম্প্রদায় বলেন—বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে ; অন্তরে বিজ্ঞান (Idea) আছে, তাহাই বাহিরের ন্যায় মনে হয় মাত্র, বস্তুতঃ বাহ্য কোন পদার্থই নাই। আর এক সম্প্রদায় বলেন,—কি ভিতর, কি বাহির কোথাও কোন পদার্থ নাই, সর্ব্বত্রই এক মহাশূন্য বিরাজমান।

প্রথমে সর্ব্বাস্তিত্ববাদের আলোচনা করা যাউক। এই মতে পৃথিবী (মৃত্তিকা) জল, তেজ ও বায়ু এই চারি ভূত। গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ এবং গন্ধাদির গ্রাহক নাসিকাদি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। সুতরাং বাহিরের যাবতীয় পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত—ভূত ও

---

* পরমকারণ সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধের নিজের মত ঠিক জানা যায় না। তিনি সাধনার যে সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার তত্ত্বোপদেশ শিষ্যগণ যিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

ভৌতিক। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি জাতীয় পরমাণুর **সংঘাতে** (মিলনে) এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার, আন্তর (ভিতরের) পদার্থেরও দুই ভাগ—এক **চিত্ত**, অপর **চৈত্ত**। চিত্ত ও আত্মা একই জিনিষ। আমি আমি—এই যে একটা অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-প্রবাহ—ইহার নাম **আলয়বিজ্ঞান**, **বিজ্ঞান-স্কন্ধ** (১), চিত্ত বা আত্মা। বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) এবং ইন্দ্রিয়সমূহের নাম **রূপ-স্কন্ধ** (২), বিষয় সকল দেহস্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত (অনুভূত) হয় বলিয়া তাহাদিগকে আন্তর বলা যায়। সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অনুভবের নাম **বেদনা-স্কন্ধ** (৩), গো, অশ্ব, মনুষ্য ইত্যাদি নাম সম্বলিত জ্ঞানবিশেষের নাম **সংজ্ঞাস্কন্ধ** (৪), আসক্তি, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম—এই সব **সংস্কার-স্কন্ধ** (৫), এই পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধ চিত্ত, অপর চারিটী চৈত্ত। তবে দেখিতেছ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মতে বাহিরে ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমষ্টি, সমুদায় বা সংঘাত ; আর ভিতরে চিত্ত ও চৈত্ত পঞ্চস্কন্ধরূপ সংঘাত (এই দুই প্রকারের সমুদায় দ্বারাই সৃষ্টি ও লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। বাহিরের সংঘাত পরমাণু দ্বারা উৎপন্ন হয় ; আর আন্তর সংঘাত স্কন্ধমূলক।

কিন্তু

সমুদায়ে উভয়-হেতুকে অপি তৎ-অপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

পরমাণুরূপ হেতু দ্বারা নিষ্পন্ন বাহ্য সমুদায় এবং স্কন্ধরূপ হেতু দ্বারা নিষ্পন্ন আন্তর সমুদায়—এই উভয় প্রকারের সমুদায় কল্পনা করিলেও [উভয়হেতুকে সমুদায়ে অপি] বৌদ্ধ মতে তাদৃশ

সমুদায়ই [তৎ] সম্ভব নয় [অপ্রাপ্তিঃ]; কারণ, এই মতে ঐ উভয়বিধ সমুদায়ের যে যে হেতু নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তাহা সকলই অচেতন জড়—পরমাণুও অচেতন, স্কন্ধও অচেতন। চেতনের শাসন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কতকগুলি অচেতন পদার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কিছু উৎপাদন করিতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু চিত্ত নামক বিজ্ঞান-স্কন্ধ ত চেতন ?

গুরু। হ্যাঁ, উহা চেতন হইলেও উহার চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ বিষয়াদির সম্পর্কেই হয়। অর্থাৎ সমুদায় উৎপত্তির পরেই চিত্তের চৈতন্য বিকাশ হইতে পারে। সুতরাং সেই চিত্ত সমুদায়-উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। ভোগ করে, নিয়ন্ত্রিত করে, এমন কোন স্থির চেতন বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ চেতনেরই পরমাণু প্রভৃতিকে সংহত (মিলিত) করা সম্ভব। পরমাণু প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—এরূপ হইলে সৃষ্টির কোন শৃঙ্খলা সম্ভব হয় না, এবং সৃষ্টির কোনকালে বিরাম হইবারও হেতু দেখা যায় না। আর, বৌদ্ধ মতে 'আমি আমি' এই যে বিজ্ঞান, ইহাও ক্ষণিক—এই ক্ষণে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরক্ষণেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়—ইহা বৌদ্ধদিগের মত। কিন্তু একটা ক্ষণিক পদার্থ স্বকীয় জন্ম ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে জন্মিয়াই মরে, সে আর অন্য কি করিবে ? সুতরাং এই বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে সমুদায় বা সংঘাতই সিদ্ধ হয় না।

শিষ্য। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন যে, আমরা কোন স্থির চেতনকে ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা ও সংঘাতকর্ত্তারূপে না মানিলেও লোক-ব্যবহার বেশ সম্পন্ন হইতে পারে। কি ভাবে ?—ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন—

যাহা একক্ষণ মাত্র থাকে, তাহাকে স্থায়ী বলিয়া মনে করার নাম **অবিদ্যা**। অবিদ্যা হইতে আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহ প্রভৃতি **সংস্কার** জন্মে। সেই সংস্কারের প্রভাবে গর্ভস্থ বস্তুতে এক প্রকার **বিজ্ঞান** উৎপন্ন হয়। উহার নাম "আলয় বিজ্ঞান" এবং উহা 'আমি আমি'—এইরূপ একটা বোধরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে পার্থিবাদি চারি জাতীয় পরমাণুর সমবায়ে **নামের** উৎপত্তি হয়। সেই নাম হইতে **রূপের** (শ্বেতবর্ণ শুক্র ও রক্তবর্ণ শোণিতের সম্মিলিত রূপ] উৎপত্তি হয়। ফলতঃ গর্ভস্থিত শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া যে সকল বুদ্‌বুদাদি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাকেই **নামরূপ** বলা হয়। তাহা হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এবং তাহাকে **ষড়ায়তন** বলা হয়। নামরূপ ও ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কের নাম **স্পর্শ**। সেই স্পর্শ হইতে **বেদনা** (সুখ দুঃখাদির অনুভূতি) উদ্ভূত হয়। বেদনা হইতে **তৃষ্ণা** বা ভোগেচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা হইতে হয় **ভব** অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম। তারপর জরা, মরণ, শোক ইত্যাদি। এই অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় এবং উহারাই ঘড়ির কাঁটার ন্যায় ক্রমাগত চলিতে থাকায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহাতে আর চেতন নিয়ন্তার কি প্রয়োজন ? সুতরাং অবিদ্যা প্রভৃতি

ইতরেতর-প্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ?—

(প্রত্যয়—হেতু, কারণ)

পরস্পর পরস্পরের কারণ হওয়ায় [ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ] সংঘাত আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতেছে—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলা হয় ?

শুদ্ধ। ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

না, এরূপ বলা যায় না [ন], যে হেতু, অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তির পক্ষেই কারণ হইতে পারে [উৎপত্তি-মাত্র-নিমিত্তত্বাৎ], সংঘাতের * পক্ষে নয়। অবিদ্যা সংস্কারের কারণ, সংস্কার বিজ্ঞানের কারণ-ইত্যাদি হয়, হউক। কিন্তু সকলগুলিকে সংহত, একত্রিত করিতে পারে, এমন ত কিছু বৌদ্ধমতে নাই। আরও দেখ, যাহার ভোগের জন্য দেহাদি সংঘাত, সেই ভোক্তা জীবও বৌদ্ধমতে ক্ষণস্থায়ী। জীব যদি এক ক্ষণমাত্রই অবস্থান করে, তবে ভোগই বা কাহার, মোক্ষই বা কাহার? সুতরাং অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তির হেতু হইলেও সংঘাত উৎপত্তির হেতু না থাকায় সংঘাত হইতে পারে না; আর কোন স্থায়ী ভোক্তা না থাকায় সেরূপ সংঘাত হওয়ার প্রয়োজনই বা কি?

তারপর দেখ, অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পরের উৎপত্তিরও কারণ হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে পরবর্ত্তী ক্ষণ জন্মিবা মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ এক-ক্ষণ মাত্র স্থায়ী কার্য্য-বস্তু উৎপন্ন হইবা মাত্র ক্ষণস্থায়ী কারণ বস্তুরও ধ্বংস হইয়া যায়। তাহা হইলে ত প্রকারান্তরে বলা হইল যে, অ-ভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কিছু-না হইতে কিছু জন্মে; কেন না, পরক্ষণ (কার্য্য-বস্তু) উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্ষণের (কারণ বস্তুর) বিনাশ হয়—ইহাই বৌদ্ধমত। আর যদি বলা হয় যে, পূর্ব্বক্ষণের অস্তিত্ব থাকিতে থাকিতেই পরক্ষণের উৎপত্তি হয়, তবে ত পূর্ব্বক্ষণের অন্ততঃ দুই ক্ষণ ব্যাপিয়া

---

* সংঘাত—বহু পদার্থের একত্র সমাবেশ। যেমন, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সমষ্টি লইয়া একটি মানুষ।

অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল ; ফলে ক্ষণভঙ্গবাদ (কোন বস্তু একক্ষণের বেশী থাকে না) বিনষ্ট হইয়া গেল। ফল কথা, কারণের সহিত কার্য্যের একটা সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; না হইলে যে কোন বস্তু হইতে যেকোন বস্তু উৎপন্ন হইতে বাধা থাকে না। কার্য্য ও কারণের এই অবর্জ্জনীয় সম্বন্ধ আছে বলিয়া কারণবস্তু অন্ততঃ দুই ক্ষণ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। একটা অভাবগ্রস্ত বস্তুর সহিত একটা ভাব পদার্থের কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার, একটি বস্তু এই ক্ষণে উৎপন্ন হইল, পরক্ষণে আবার বিনষ্ট হইয়া গেল। এক্ষণে এই যে উৎপত্তি ও নিরোধ (বিনাশ) ইহা কি বস্তুর স্বরূপ ? কিন্তু তাহা হইলে, 'বস্তু', 'উৎপত্তি' ও 'বিনাশ'— এই তিনটি শব্দের একই অর্থ হওয়া উচিত। আর উৎপত্তি, বস্তুর আদি অবস্থা, এবং নিরোধ উহার অন্ত্য অবস্থা—এরূপ বলিলে বস্তুটী আদি, মধ্য ও অন্ত—এই তিন ক্ষণে বর্ত্তমান থাকে, ইহাও বলা হয় ; ফলে ক্ষণ-ভঙ্গ-বাদ আর টেঁকে না। সুতরাং বৌদ্ধমতে যখন বলা হয় যে,

উত্তর-উৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

পরক্ষণের উৎপত্তিতে [উত্তরোৎপাদে] পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন [পূর্ব্বনিরোধাৎ] এই মতকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ, তাহাতে বৌদ্ধদের ক্ষণ-ভঙ্গ-বাদের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়।

আবার,

অসতি প্রতিজ্ঞা-উপরোধঃ, যৌগপদ্যম্ অন্যথা ॥ ২১ ॥

কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণে কারণ-বস্তু থাকে না [অসতি], একথা বলিলে

প্রকারান্তরে বলা হয় যে, বিনা কারণেই কার্য্য উৎপন্ন হয়; ফলে বৌদ্ধদের স্বকীয় মতেরই মূলোচ্ছেদ হইয়া যায় [প্রতিজ্ঞোপরোধঃ],—কারণ, বৌদ্ধেরা বলেন, চার প্রকারের হেতু হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে [অন্যথা], এই মতটী বজায় রাখিতে হইলে বলিতে হইবে, কারণটি কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণেও বর্ত্তমান থাকে, ফলে কার্য্য ও কারণের অন্ততঃ দুই ক্ষণ ব্যাপিয়া অবস্থানও [যৌগপদ্যম্] স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে ক্ষণ-ভঙ্গবাদ নষ্ট হইয়া যায়।

আবার, বৌদ্ধেরা বলেন, তিনটি ছাড়া সমস্তই উৎপাদ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন হইয়া এক ক্ষণ মাত্র অবস্থান করে এবং বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি-প্রকাশ্য। উৎপত্তিবিহীন তিনটী পদার্থ এই—(১) **প্রতিসংখ্যানিরোধ***—বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অর্থাৎ কতক বস্তু 'ইহা নষ্ট করি' এইরূপ বুদ্ধির পরে বোদ্ধার কার্য্য দ্বারা বিনষ্ট হয়—সেই বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। [২) **অপ্রতিসংখ্যানিরোধ** অর্থাৎ অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশ; কতক বস্তু আপনা আপনিই বিনষ্ট হয়, তাদৃশ বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। (৩) **আকাশ**—আবরণের অভাবের নাম আকাশ। এই তিনটীকে বৌদ্ধেরা স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র বিবেচনা করেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রথম দুই প্রকারের নিরোধ সম্ভব কি, না।

---

* প্রতিসংখ্যা—প্রতি=প্রতিকূল, সংখ্যা=বুদ্ধি। নিরোধ=বিনাশ, অভাব, না-থাকা। প্রতিসংখ্যা=অস্তিত্ববান্ বস্তুকে অস্তিত্বহীন করি—এইরূপ বুদ্ধি।

প্রতিসংখ্যা-অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ-অপ্রাপ্তিঃ অবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব [প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ]; কেন-না, বৌদ্ধমতেই প্রবাহের বিচ্ছেদ বা বিরাম হইতে পারে না [অবিচ্ছেদাৎ]।

জিজ্ঞাস্য হইতেছে—নিরোধ হয় কাহার ?—সন্তানের, না সন্তানীর ? 'সন্তান' কি-না প্রবাহ, 'সন্তানী' কি-না প্রবাহের অন্তর্গত এক একটী পদার্থ। যেমন,—একটী তরঙ্গ অন্য একটী তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সেটী আবার অন্য একটি তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপে তরঙ্গের একটা প্রবাহ, স্রোত চলিতে থাকে। এই তরঙ্গের প্রবাহের নাম 'সন্তান', আর এক একটী তরঙ্গ এক একটী সন্তানী। এখন দেখ, সন্তানের নিরোধ (বিরাম, বিচ্ছেদ) হইতে পারে না; কারণ সন্তান হইল কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ অনন্ত সন্তানীর প্রবাহ, এবং এই প্রবাহে উক্ত সম্বন্ধ সর্ব্বদাই অনুভূত হয়; ফলে সন্তানের বিরাম কল্পনা করা যায় না। সন্তানীর বিনাশও অসম্ভব। মনে কর, খানিকটা মাটি প্রথমে চূর্ণীত হইল, তারপর জলসংযোগে সেই চূর্ণের একটা ডেলা প্রস্তুত হইল, তারপর সেই ডেলাটীকে কুম্ভকারের চক্রে দুইটী কপালে (খাপড়ায়) পরিণত করা হইল, অবশেষে সেই দুইটী কপাল সংযুক্ত করিয়া একটী ঘট তৈয়ারী হইল। এক্ষণে এই যে চূর্ণ ডেলা, কপাল, ঘট ইত্যাদি সন্তানীর প্রবাহ চলিল, ইহার মধ্যে কোন সন্তানীই একেবারে ধ্বংস হইয়া অভাবগ্রস্ত হইল—এরূপ বলা যায় না; কারণ, প্রত্যেক অবস্থাতেই মাটি বলিয়া একটা প্রত্যভিজ্ঞান থাকিয়াই যায়। সুতরাং সন্তানীরও একেবারে বিনাশ হয় না। যে সমস্ত স্থলে

স্পষ্ট প্রতিভিজ্ঞান না হয় (বীজাঙ্কুরাদি স্থলে) সে স্থলেও কারণ বস্তুর স্বরূপতঃ অস্তিত্ব অনুমান করাই সঙ্গত। সুতরাং বৌদ্ধকল্পিত উক্ত উভয় প্রকারের নিরোধই অসম্ভব।

তারপর বৌদ্ধেরা বলেন, অবিদ্যা প্রভৃতির নিরোধে (অভাবে) মোক্ষ হয়। এই যে অবিদ্যা প্রভৃতির নিরোধ, ইহাও অবশ্য প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধের অন্তর্গত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অবিদ্যাদির নিরোধ কি যম, নিয়ম ইত্যাদির সহিত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা হয়, না আপনা আপনিই হয়? কিন্তু

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

উভয় প্রকারেই [উভয়থা] দোষ হয় বলিয়া [দোষাৎ] বৌদ্ধ দর্শন অসঙ্গত। যদি বলা হয় যে, অবিদ্যাদির নিরোধ যম, নিয়মাদির সহিত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়, তবে বৌদ্ধদের "সমুদায় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণবিধ্বংসী"—এই সিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয়। কারণ, ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অবিদ্যা স্বতঃই নিরুদ্ধ হইবে, যমনিয়ম ও জ্ঞান সাধন নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, অবিদ্যাদির নিরোধ আপনা আপনিই হয়, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া করিবার উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধেরা দুই প্রকারের নিরোধ ও আকাশকে স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ, অভাবমাত্র বিবেচনা করেন। কিন্তু কি প্রতিসংখ্যা-নিরোধ, কি অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, কোন প্রকারের নিরোধেই যে বস্তুর একেবারে অভাব হইতে পারে না, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইলাম। সুতরাং নিরোধকে অভাব বলা যায় না। সেইরূপ,

আকাশে চ অবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

একটা ভাব পদার্থ (যাহার অস্তিত্ব আছে, এমন কিছু)-রূপে অনুভূত হওয়া বিষয়ে নিরোধদ্বয়ের সহিত আকাশেরও কোন বিশেষ না থাকায় আকাশও একেবারে অবস্তু নয়। আকাশ যে একটা বস্তু, ভাবপদার্থ, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রুতি। যথা—"আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।" তারপর যাঁহারা শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহারাও শব্দ-গুণের দ্বারা আকাশ বলিয়া একটা পদার্থ আছে, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

তারপর বৌদ্ধমতে আকাশের লক্ষণ বলা হইয়াছে, "কোন মূর্ত্ত দ্রব্যের অভাব।" তাহাই যদি হয়, তবে যেমন সংসারে একটী মাত্র ঘট থাকিলেও ঘটের একেবারে অভাব বলা যায় না; সেইরূপ মনে কর, একটীমাত্র পাখী আকাশে উড়িল, ফলে আবরণের বা মূর্ত্তদ্রব্যের অভাব আর রহিল না; সুতরাং আকাশ (আবরণের অভাব) না থাকায় অপর একটি পাখী আর উড়িতে পারিবে না। তবে যদি বলা হয় যে, যেখানে আবরণের অভাব নাই, শুধু সেইখানেই উড়িতে পারিবে না, অন্যত্র উড়িতে বাধা কি? ইহার উত্তরে বলিব যে, যেহেতু আকাশেরও একটা বিশেষ বিশেষ অংশ যখন স্বীকার করিতেছ, তখন অবশ্যই আকাশকেও একটা বস্তু (ভাব পদার্থ) রূপে স্বীকার করা হইল। অস্তিত্ববান্ পদার্থেরই বিশেষ হয়, অভাবের আর বিশেষ কি? আবার, আকাশকে কিছুই না বলিয়া তাহাকে নিত্য বলার কোন তাৎপর্য্যই দেখা যায় না। যাহা কিছুই-না, তাহার আবার নিত্যতা অনিত্যতা কি? সুতরাং আকাশও একটা ভাব পদার্থ, অভাবমাত্র নয়।

আবার, বৌদ্ধেরা বলেন, সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, একক্ষণমাত্র স্থায়ী। তাহা হইলে যিনি উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন, তাঁহাকেও ক্ষণিক বলিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব ;

অনুস্মৃতেঃ চ ॥ ২৫ ॥

মনে কর, দশ দিন পূর্ব্বে একটা কিছু অনুভব করিয়াছ, আজ আবার তাহার স্মরণ হইল। এখন দেখ, সেই দশ দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অনুভব করিয়াছিল, সে যদি স্বয়ং ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আজ আর না থাকে, তবে দশদিন পরে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ (অনুস্মৃতি) হইবে কাহার? এইরূপ অনুস্মৃতি তখনই সম্ভব হয়, যখন পূর্ব্ব অনুভব-কর্ত্তা ও বর্ত্তমানের স্মরণ-কর্ত্তা একই ব্যক্তি হয়। একজন অনুভব করিল, আর অপর একজন তাহা স্মরণ করিল—এরূপ হইতেই পারে না, অনুভবকর্ত্তা ও স্মরণকর্ত্তা যে একই ব্যক্তি, তাহা প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অপলাপ কেহ করিতে পারে না। অমুকদিন যে ব্যক্তি অনুভব করিয়াছিল সে, আর আজ যে ব্যক্তি তাহা স্মরণ করিতেছে সে—এই দুইজন ভিন্ন, এক নয়, ইহা বাতুল ভিন্ন কেহই বলিতে পারিবে না। সুতরাং 'সংসারে সবই ক্ষণিক', এইরূপ অদ্ভুত মতের কোন মূল্য নাই।

তবে যদি বলা হয় যে, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে অসংখ্য কর্ত্তা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে, তথাপি যে তাহাদিগকে এক বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল উহাদের মধ্যে একটা 'সাদৃশ্য' আছে এবং একটীর পর একটী বায়স্কোপের ছবির মত অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হয় বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'এটী সেটীর সদৃশ', ইহা বলিবে কে? যদি দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য বুঝিবার মত ঐ উভয়

বস্তুর অস্তিত্বকালে বর্ত্তমান একজন কেহ না থাকে, তবে ওরূপ সাদৃশ্যের বোধই হইতে পারে না। কিন্তু 'সবই ক্ষণিক' এই মত স্বীকার করিলে সেরূপ কেহ ত থাকিতে পারে না। বাস্তবিক অভেদ-ব্যবহার সাদৃশ্যের জন্য হয় না; হইলে 'ইহা তাহার সদৃশ' এইরূপ জ্ঞানই হয়, 'ইহা তাহাই' এরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে 'এটা সেইটাই কি না',—এরূপ সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু 'সেই আমি', 'কি 'তৎসদৃশ আমি'—এরূপ সন্দেহ কাহারও হয় না। বস্তুতঃ লোকপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বানুভূত বস্তু স্বীকার না করিলে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। যিনি সিদ্ধান্ত করিবেন, তিনি স্বয়ংই যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হন, তবে আর তিনি কি স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন? এই সমস্ত কারণে বৌদ্ধমত অগ্রাহ্য।

আবার, বৌদ্ধেরা বলেন,—বীজ বিনষ্ট হইয়াই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ বিনষ্ট হইয়াই দধি জন্মে, মাটির ডেলা বিনষ্ট হইয়াই ঘট উৎপন্ন হয়; বীজাদি যাহা তাহাই রহিবে, অথচ তাহা হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হইবে, এরূপ কদাচ হয় না। এই সমস্ত দৃষ্টান্তের বলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কারণ কূটস্থ (অবিকৃত, যাহা তাহাই) থাকিলে তাহা হইতে কোন কার্য্যই জন্মিতে পারে না। কারণ অবিকৃতই রহিল, অথচ তাহা হইতে কার্য্য হইল, এরূপ হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে বাধা থাকে না। সুতরাং কূটস্থ অর্থাৎ অবিকারী বস্তু কোন কিছুর কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অভাবগ্রস্ত (বিনাশপ্রাপ্ত) বীজাদি হইতেই যখন অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তখন ইহাই স্থির হয় যে, অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়, কিছু-না হইতেই কিছু জন্মে। কিন্তু

ন অসতঃ, অদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অসৎ হইতে অর্থাৎ অভাব বা কিছু-না হইতে [অসতঃ] সত্তের, ভাব পদার্থের, কিছুর, উৎপত্তি হইতে পারে না [ন] ; যেহেতু, সেরূপ কোথাও দেখা যায় না [অদৃষ্টত্বাৎ]।

যদি "অভাব" হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট কারণ থাকিত না। কেন-না "অভাব" একই, তাহার ত কোন ইতর বিশেষ নাই। মাটির "অভাব"ও অভাব, বীজের "অভাব"ও অভাব। "অভাব" কারণ হইলে মাটির "অভাব" হইতে অঙ্কুর জন্মিতে বাধা কি ? যদি অভাবেরও বিশেষত্ব স্বীকার করা হয়—যেমন যদি বলা হয় যে, বিনষ্ট বীজে যে অভাব, আর আকাশকুসুমের যে অভাব, এই দুই অভাব এক নয়, উভয়ের বিশেষ বা পার্থক্য আছে,—তবেই বলা হইল, অভাবমাত্র কাহারও কারণ নয়। ফলকথা, যদি বলা যায় যে, বীজের অভাব হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, মাটির অভাব হইতে হয় না, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বীজেরই এমন কিছু বিশিষ্টতা আছে, যাহার অস্তিত্বেই অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে, অভাব স্বয়ং কাহারও কারণ হইতে পারে না। যাহার কোনরূপ বিশিষ্টতা নাই, এরূপ অভাব হইতে যদি কার্য্যোৎপত্তি হইত, তবে ঘোড়ার ডিম হইতেও অঙ্কুরোৎপত্তির বাধা থাকিত না। যদি বাস্তবিক অভাবেরও বিশেষত্ব থাকা স্বীকার করা হয়, তবে আর তাহা অভাব থাকে না, তাহাও ভাবই হয়। যদি অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইত, তবে প্রত্যেক ভাব পদার্থের মধ্যেই অভাব অনুস্যূত থাকিত, যেমন মৃত্তিকা নির্ম্মিত সকল পদার্থেই মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে।

আর, কূটস্থ বা অবিকারী বস্তু কাহারও কারণ হয় না, একথাও বলা যায় না। কেন, কঙ্কন, কেয়ূর প্রভৃতিতে কি অবিকৃত স্বর্ণ থাকে না? বীজের যে আপাতবিনাশ হয় বলিয়া মনে হয়, তাহাও প্রকৃত বিনাশ নহে। বীজের বীজত্ব নষ্ট হইলে কদাচ তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। তবে বীজের পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া অঙ্কুরাবস্থায় পরিণতি হয়—এইমাত্র। সে জন্য এই পরিবর্ত্তনকে বীজের ধ্বংস বলা যায় না। (ব্রঃ সূঃ ২.১.১৪ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি যখন কোথাও দেখা যায় না, তখন বৌদ্ধমত অগ্রাহ্য।

আর অভাব হইতে যদি ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে

উদাসীনানাম্ অপি চ এবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও [উদাসীনানামপি চ] অভিপ্রায় সিদ্ধি [সিদ্ধিঃ] হইতে পারে। অভাব হইতেই যখন সব হইবে, তখন আর কৃষকের ভূমিকর্ষণ নিষ্প্রয়োজন, শস্য অমনিই হইবে। মোক্ষের জন্যও কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই, সে ত হইবেই, যেহেতু মোক্ষ উৎপাদনের যাহা কারণ অর্থাৎ অভাব, তাহা ত সর্ব্বত্রই একান্ত সুলভ। সুতরাং অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, এ অতি অসঙ্গত অভিমত।

এ পর্য্যন্ত যে বৌদ্ধসম্প্রদায় বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মতেরই আলোচনা করা গেল। আর এক সম্প্রদায় বৌদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানবাদী বলা হয়। তাঁহারা বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে।

একমাত্র বিজ্ঞান বা বুদ্ধিই (Idea), কি বাহ্য, কি আন্তর, সর্ব্বপ্রকার ভাব বা বস্তুর আকারে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য বস্তু নাই। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য বস্তু থাকা সম্ভবই নয়। কেন-না, মনে কর, একটা স্তম্ভ। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, এই স্তম্ভটা কি কতকগুলি পরমাণু, না পরমাণুর সমষ্টি? যদি বস্তুতঃ পরমাণুই হয়, তবে স্তম্ভ বলিয়া কোন জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, পরমাণু ইন্দ্রিয়-গোচরই হইতে পারে না। আবার স্তম্ভকে পরমাণুর সমষ্টিও বলা যায় না; কারণ, 'সমষ্টি' পরমাণু হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এইরূপে অন্যান্য সমস্ত তথাকথিত বাহ্য পদার্থই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তারপর দেখ, স্তম্ভজ্ঞান, ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাকার যে সাধারণ জ্ঞান হয়, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য দ্বারাই যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, সে জন্য আর বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জ্ঞান ব্যতীত যখন বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না, জ্ঞানেই যখন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব, তখন বাহ্য বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বাহিরে কিছু না থাকিলেও যে কেবল অন্তঃস্থ জ্ঞানই বাহিরের জ্ঞেয় বিষয়ের আকার ধারণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরীচিকার জলদর্শন ইত্যাদি। স্বপ্নাদি স্থলে যেমন বিবিধ বাসনা (সংস্কার, impressions) স্বপ্নের বৈচিত্র্য জন্মায়, জাগ্রৎ অবস্থায়ও সেইরূপ অনাদি বাসনা বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া এই জাগতিক বিচিত্র ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। সুতরাং বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। ইহাই হইল বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মত। কিন্তু বাহ্য বস্তুর

ন অভাবঃ, উপলব্ধেঃ ॥২৮॥

অভাব নাই [অভাবঃ ন], অর্থাৎ বাহিরে কিছুরই অস্তিত্ব নাই, একথা হইতে পারে না; কারণ, বাহ্য বস্তু প্রত্যেক অনুভবেই উপলব্ধ হয় [উপলব্ধেঃ]। যাহা অনুভব করি, তাহা নাই—এ কেমন কথা? এ যেন উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজনান্তে বলা, 'নাঃ, আমি ত কিছুই খাই নাই'! বাহ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত অনুভব করিয়াও 'বাহ্য পদার্থ নাই', একথা প্রলাপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তবে বিজ্ঞানবাদী যদি বলেন যে, 'হ্যাঁ, বাহিরে কিছুই উপলব্ধি করি না, এমন নয়, তবে যাহা বাহিরে বলিয়া অনুভব করি, তাহাও অন্তরের উপলব্ধিরই একটা আকার-বিশেষ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি কখনও উপলব্ধিকেই স্তম্ভ, ঘট, পট ইত্যাদি বলিয়া অনুভব করে, না স্তম্ভের উপলব্ধি, ঘটের উপলব্ধি ইত্যাদি বলিয়াই অনুভব করে? ফলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বাহিরে যে বস্তু আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই অনুভবই। বিজ্ঞানবাদী বলেন, উপলব্ধি অন্তরেরই, তবে বাহিরের মত বোধ হয় মাত্র। কিন্তু বাহিরে যদি কিছুই না থাকে, তবে বাহিরের মত হয় কিরূপে? বস্তুতঃ বাহিরে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, ইহা প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ব প্রমাণেই স্থিরীকৃত হয়। জ্ঞানের যে আকার, বিষয়েরও সেই আকার (যেমন, ঘট-জ্ঞান)—সেই জন্য জ্ঞান আর বিষয় এক নয়। জ্ঞান না হইলে বিষয় থাকা না-থাকা সমান, আর বিষয় না হইলেও জ্ঞান হয় না; এই জন্য জ্ঞান ও বিষয় এক, ইহাও বলা যায় না। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এই যে একসঙ্গে উপলব্ধি, ইহার কারণ উভয়ের অভিন্নতা নয়, প্রত্যুত বিষয় উপলব্ধেই জ্ঞান হয় বলিয়া ঐরূপ অপৃথক্ উপলব্ধি হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে ঘট, পট

ইত্যাদিরই ভিন্নতা, জ্ঞানাংশে ভিন্নতা নাই। ফলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তু ও বস্তুর জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন, এক নহে। তারপর, বৌদ্ধেরা যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহার প্রমাণ কি? বৌদ্ধেরা নিশ্চয়ই বলিবেন, বিজ্ঞান অনুভবগম্য, তাই বিজ্ঞান স্বীকার করি। তাহা হইলে বাহ্যবস্তুও ত অনুভবগম্য, তাহা স্বীকার করিতে বাধা কি?

তারপর, স্বপ্নানুভূত পদার্থের সাদৃশ্য দেখাইয়া যে বাহ্যবস্তুর অভাব কল্পনা করা, তাহাও ঠিক নয়। কারণ,

বৈধর্ম্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

জাগ্রৎ অবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ানুভব হয়, তাহার সহিত স্বপ্ন, কি ইন্দ্রজাল প্রভৃতিতে অনুভূত বিষয়ের অনেক পার্থক্য আছে, এই জন্য [বৈধর্ম্মাৎ] বাহ্যবস্তুকে স্বপ্নাদির মত অলীক বলা যায় না [ন স্বপ্নাদিবৎ]। স্বপ্নের ধর্ম্ম বা স্বভাব, আর জাগ্রতের ধর্ম্ম বা স্বভাব এক নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেখ, স্বপ্নাদিতে অনুভূত পদার্থ জাগ্রত হইলে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় যে সব বিষয়ের উপলব্ধি করা যায়, তাহা কিন্তু ওরূপ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আবার স্বপ্ন-দর্শন এক রকমের স্মৃতি; কিন্তু জাগ্রতের জ্ঞান উপলব্ধি। স্মৃতি ও উপলব্ধি যে এক নয়, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। উপলব্ধি বর্ত্তমান বিষয়েরই হয়, কিন্তু স্মৃতি হয় কেবল অতীত বিষয়ের।

তারপর যে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, 'বিচিত্র বাসনার দ্বারাই বিচিত্র জ্ঞান (ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রকারের জ্ঞান) উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য আর বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই'—একথাও ঠিক নয়। কারণ, এই মতে বাসনার

ন ভাবঃ, অনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

অস্তিত্বই সম্ভব হয় না [ভাবঃ ন]; কেন-না, বাহ্য বস্তুর উপলব্ধিই হয় না [অনুপলব্ধেঃ]। কোন একটা জিনিষের উপলব্ধি হইলে, তবেই তাহার একটা বাসনা (সংস্কার, impression) থাকিতে পারে। বৌদ্ধমতে বাহ্য বস্তু নাই, সুতরাং তাহার উপলব্ধিও হয় না, ফলে কোনরূপ সংস্কার বা বাসনাও থাকিতে পারে না।

আর, এই যে বাসনা বা সংস্কার, ইহার অবশ্য একটা আশ্রয় থাকিবে। সংস্কার কোন স্থির অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধমতে স্থির কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এই মতে সকল পদার্থই

ক্ষণিকত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

ক্ষণিক বলিয়া বাসনার কোন আশ্রয় পাওয়া যায় না। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালে বিদ্যমান কোন এক সাক্ষী না থাকিলে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও কালে উৎপাদিত বাসনা, স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা (recognition, পূর্ব্বদৃষ্ট কোন পদার্থকে সেই পদার্থ বলিয়া চেনা) কিছুই সম্ভব হয় না। সুতরাং

সর্ব্বথা অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্ব প্রকারেই বৌদ্ধমত অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য। *

এক্ষণে জৈনমতের আলোচনা করা যাউক। জৈনেরা বলেন, পদার্থ (categories) সাতটী। (১) জীব—ভোক্তা। (২)

* সর্ব্বশূন্যবাদ যে নিতান্তই অসমীচীন, ইহা প্রমাণ করিতে যুক্তি প্রয়োগ অনাবশ্যক।

অজীব—ভোগ্যবস্তু। (৩) **আস্রব**—বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়ের **প্রবৃত্তি**। (৪) **সম্বর**—যম, নিয়ম ইত্যাদি। (৫) **নির্জ্জর**—তপ্তশিলায় আরোহণ প্রভৃতি পাপনাশন কঠোরতা। (৬) **বন্ধ**—**কর্ম্ম**। (৭) **মোক্ষ**—কর্ম্মপাশ বিনাশের পর আলোকাকাশে **সতত** ঊর্দ্ধ গমন। আবার সংক্ষেপে পদার্থ দুইটী—জীব ও অজীব। **অপর** যাবতীয় বস্তুই এই দুইটীর অন্তর্ভূত। এই জীব ও অজীব, **ইহাদের** আবার পাঁচ প্রকারের ভেদ আছে, তাহাকে **অস্তিকায়** **বলে**। 'অস্তিকায়' শব্দের অর্থ 'পদার্থ'। পাঁচ রকমের অস্তিকায় **যথা**:—**জীবাস্তিকায়**, **পুদ্গলাস্তিকায়** [পরমাণুর সমষ্টি], **ধর্ম্মাস্তিকায়**, **অধর্ম্মাস্তিকায়** ও **আকাশাস্তিকায়**। **ইহাদের** আবার নানা অবান্তর ভেদ জৈনেরা বিবৃত করেন। প্রত্যেক পদার্থে তাঁহারা **সপ্তভঙ্গীনয়** নামক যুক্তি প্রয়োগ করেন। **'সপ্তভঙ্গী'** অর্থ 'সাত প্রকারের ভঙ্গ বা বিভাগ আছে যাহাতে, তাহা'। **'নয়'** অর্থ 'ন্যায়' বা 'যুক্তি'। সেই সপ্তভঙ্গীনয় এই:—[১] **স্যাদস্তি**, [২] **স্যান্নাস্তি**, [৩] **স্যাদস্তি চ নাস্তি চ** [৪] **স্যাদবক্তব্যঃ**, [৫] **স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ**, [৬] **স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ**, [৭] **স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ**। **'স্যাৎ'** অর্থাৎ কথঞ্চিৎ, কোন এক প্রকারে। 'অস্তি' অর্থাৎ আছে। **'নাস্তি'** অর্থাৎ নাই। 'অবক্তব্য' অর্থাৎ বলিবার অযোগ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেই এই সাতটী নয় প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই একভাবে স্যাদস্তি অর্থাৎ কোনরূপে আছে, আবার অন্যভাবে স্যান্নাস্তি—অর্থাৎ অন্যরূপে নাই, আবার উহা স্যাদস্তি চ নাস্তি চ—অর্থাৎ আছেও, নাইও! এই ভাবে সবগুলি ভঙ্গই উহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অদ্ভুত মত

ন একস্মিন্ অসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

যুক্তিসঙ্গত নয় [ন]; কারণ, একই সময়ে একই বস্তুতে বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না [একস্মিন্ অসম্ভবাৎ]। একই বস্তু একই সময়ে আছে ও নাই—এরূপ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে না। এই জৈনমত স্বীকার করিলে কোন বিষয়েই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে পারে না। জৈন মতটীও একভাবে আছে, অন্যভাবে নাই, বলা যাইতে পারে। এরূপ সংশয়াপন্ন বস্তুজ্ঞান দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইতে পারে না। 'আছে ও নাই'—এই দুইটিকে যদি বস্তুর স্বরূপ বলা হয়, তবে কি ইহলৌকিক পদার্থ, কি স্বর্গ, কি মোক্ষ সমস্তই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এই অনিশ্চিতের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হইতে পারে না।

তারপর জৈনেরা বলেন, আত্মা শরীরপরিমাণ, অর্থাৎ শরীর যত বড়, আত্মাও তত বড়, কিন্তু

এবঞ্চ আত্মা-অকাৎ‍র্স্ন্যম্ ॥ ৩৪ ॥

এমন হইলে [এবঞ্চ] আত্মা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন [আত্মাকাৎ‍র্স্ন্যম্]।

আত্মা যদি শরীর পরিমিত হন তবে তিনি অপূর্ণ, স্বল্পস্থানব্যাপী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হন। ফলে ঘট পটাদির মত অনিত্যও হন। যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন, তাহাই অনিত্য, অচিরস্থায়ী, ধ্বংসশীল। সুতরাং আত্মাকে দেহপরিমাণ বলিলে তাঁহার নিত্যতা থাকে না।

আরও দেখ, শরীরের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। মনে কর, মানবশরীরপরিমিত মানবাত্মা কর্ম্মফলে হস্তিজন্ম প্রাপ্ত হইল *। এক্ষণে ঐ মানবশরীরপরিমিত আত্মা হস্তী-শরীরের সর্ব্বত্র কিরূপে

* জৈনেরা (বৌদ্ধেরাও) জন্মান্তর মানেন।

ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে? যদি পিপীলিকারূপে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাতেই বা কিরূপে ধরিবে? এক জীবনেই বা বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যে আত্মার কি অবস্থা হইবে? আত্মা যদি প্রতিনিয়ত এইরূপ ছোট বড় হইতে থাকে, তবে সেই অনিত্য আত্মাকে কর্ম্মফলভাগীই বা বলা যায় কিরূপে?

আত্মার বহু অবয়ব (অংশ) আছে, কোন শরীরে অবয়ব বৃদ্ধি হয়, কোন শরীরে কমিয়া যায়, এরূপ পর্য্যায়ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি স্বীকার করিলেও

ন চ পর্য্যায়াৎ অপি অবিরোধঃ,
বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

বিরোধের নিরসন হয় না [অবিরোধঃ ন]; যেহেতু, তাহাতে আত্মার বিকৃত হইয়া যাওয়া প্রভৃতি দোষ অনিবার্য্যই থাকিয়া যায় [বিকারাদিভ্যঃ]। সময়ে অবয়ব আসিয়া আত্মাকে বর্দ্ধিত করে, আবার সময়ে অবয়ব ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে ক্ষীণ করে—এরূপ হইলে আত্মার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিল না। ফলে সে বিকারী ও অনিত্য হইয়া পড়িল। আত্মা যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তবে বন্ধই বা কাহার, মোক্ষই বা কাহার? অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি থাকায় শরীরকে যেমন আত্মা বলা যায় না, সেইরূপ জৈনমতে আত্মাও অনাত্মা হইয়া পড়ে। আবার, বৃদ্ধির সময় অবয়ব কোথা হইতে আইসে, ক্ষয়ের সময়েই বা কোথায় যায়, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। আত্মা যখন ভূত (মৃত্তিকাদি) হইতে উৎপন্ন নয়, তখন ভূত হইতে অবয়বের আগমন এবং ভূতেই বিলয়—এরূপও বলা যায় না। এই সমস্ত কারণে আত্মাকে দেহ-পরিমাণ বলা যায় না।

আবার, জৈনেরা মুক্তাবস্থায় আত্মার পরিমাণকে স্থির, একরূপ, হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, নিত্য বলেন। কিন্তু

অন্ত্য-অবস্থিতেঃ চ উভয়-নিত্যত্বাৎ
অবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্য অবস্থায় অর্থাৎ মোক্ষ-অবস্থায় আত্মা যদি নিত্য হয় [অন্ত্যাবস্থিতেঃ] তবে আদি ও মধ্য অবস্থায়ও যে নিত্য, একথা বলিতেই হইবে [উভয়-নিত্যত্বাৎ] ; ফলে দাঁড়ায় এই যে, আত্মা আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব্ব অবস্থাতেই একরূপ, সর্ব্ব প্রকার বিশেষ-রহিত [অবিশেষঃ]।

মোক্ষাবস্থায় আত্মার যে পরিমাণ, তাহা যদি পূর্ব্বে না থাকে, ঐ সময়েই উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে নিত্য বলা যায় না ; কারণ, উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই ধ্বংসশীল, অনিত্য। ঐ পরিমাণ নিত্য হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে, উহা পূর্ব্বেও ছিল। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায়ই আত্মা এক পরিমাণ, ইহাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জৈনেরা তাহা স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য।

এক্ষণে যে সমস্ত দার্শনিক ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলেন, তাঁহাদের মতের পরীক্ষা করা যাউক। কোন কোন সাংখ্য-মতাবলম্বী ও যোগমতাবলম্বী দার্শনিক মনে করেন, প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিনটী তত্ত্ব পরস্পর একান্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে ঈশ্বর—প্রধান [প্রকৃতি] ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রধান ও পুরুষকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান নহেন। মহেশ্বর মতাবলম্বীরা এবং কোন কোন

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু

পত্যুঃ অসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের [পত্যুঃ] জগৎকারণতা যুক্তি-সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে অনেক অসামঞ্জস্য হয় [অসামঞ্জস্যাৎ]

প্রথমতঃ দেখ, যে ঈশ্বর স্বয়ং স্বতন্ত্রস্বভাব, তিনি যদি উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন, তবে তিনি অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হন।

শিষ্য। কেন, জীবের স্বকীয় কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর কাহাকেও উত্তম, কাহাকেও মধ্যম, কাহাকেও বা হীন করিয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ বলিলে ত তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না।

গুরু। না, সেরূপ বলা যায় না। কারণ, কর্ম্ম জড়, তাহা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; আবার কর্ম্মও ঈশ্বরকে প্রবর্ত্তিত করে, এরূপ বলিলে প্রথমে কে কাহার প্রবর্ত্তক তাহা স্থির করা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু যদি এরূপ বলা যায় যে, বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মের একটা অনাদি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, এবং ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে পর পর সৃষ্টি সম্পাদন করেন ?

গুরু। না, তাহাও বলা যায় না। কেন-না পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মও জড়, তাহাও ঈশ্বরকে সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। বীজ ও অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত আপাততঃ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ* দুষ্ট বলিয়া

---

* ক না হইলে খ হয় না, আর খ না হইলে ক হয় না—এরূপ অসম্ভাবনা রূপ দোষের নাম ন্যায়শাস্ত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ।

বোধ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, আবার অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য উহাদের একটা অনাদি প্রবাহ স্বীকার করিলেও অনবস্থা দোষ * হয় না; বর্ত্তমান স্থলে কিন্তু সেরূপ ঈশ্বর ও কর্ম্মের অনাদি প্রবাহ স্বীকার করা যায় না। কারণ উহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেরই অনুমোদিত নহে †। সুতরাং ওরূপ একটা নির্ম্মূল কল্পনা দ্বারা কোন সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব ঈশ্বর কর্ম্ম অনুসারে সৃষ্টি করেন, এরূপ বলিলেও কোন লাভ নাই। ফলে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিলে বলিতে হয়, তিনিই উত্তম, মধ্যম ও অধম সৃষ্টি করেন, এবং ঈদৃশ ঈশ্বর যে রাগদ্বেষদুষ্ট, ইহা বলাই বাহুল্য।

আবার, যাহারা ঈশ্বরকে 'উদাসীন' বলেন, তাঁহাদের মতও যুক্তিসহ নয়; কারণ উদাসীন হইলে তিনি ত কিছুই করিতে পারেন না, ফলে সৃষ্টিও হইতে পারে না.

তারপর, নিমিত্তকারণবাদীরা (যাঁহারা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলেন) ঈশ্বরকে প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্মা) হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন, অথচ বলেন যে, ঈশ্বরই ঐ উভয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রধান ও পুরুষের পরিচালক হন, তবে অবশ্যই তাঁহার সহিত উহাদের কোন-না-কোন প্রকারে একটা সম্বন্ধ থাকিবে। কিন্তু সেরূপ কোন

---

* অমুকের পূর্ব্বে অমুক, তার পূর্ব্বে অমুক—এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে যদি কোথাও শেষ না মিলে, তবে তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে।

† ব্রঃ সূঃ ২.১. ৩৪—৩৬ সূঃ তুলনা কর। বীজাঙ্কুর স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে দোষের পরিহার হয়, ঐ স্থানেও শ্রুত্যাদির প্রমাণে দোষ ক্ষালন হয়।

সম্বন্ধ-অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৩৮ ॥

সম্বন্ধই উপপন্ন (যুক্ত) হয় না বলিয়া এরূপ ঈশ্বর স্বীকার করা যায় না।—

এই মতাবলম্বীরা বলেন, প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—ইহারা সকলেই সর্ব্বব্যাপী ও অবয়বরহিত। তাহা হইলে ইহাদের 'সংযোগ' রূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ দুই বা দুই'এর অধিক পদার্থের আংশিক মিলনের নাম সংযোগ। প্রধানাদি যখন সর্ব্বব্যাপী (অতএব সর্ব্বদাই সংযুক্ত) এবং অংশরহিত, তখন সংযোগ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। আবার, যেহেতু উহারা কেহ কাহারও আশ্রিত নয় (মধুর মিষ্টত্ব যেমন মধুর আশ্রিত, সেইরূপ), সেইহেতু 'সমবায়' নামক সম্বন্ধও হইতে পারে না। আশ্রিত ও আশ্রয়ের (আধারের) সহিতই সমবায় সম্বন্ধ হয়। তবে যদি বল যে, যেহেতু এই জগৎ ঈশ্বর পরিচালিত প্রধানের কার্য্য, সেইহেতু ঐ তিনের মধ্যে অবশ্যই কোন-না-কোন রকমের একটা সম্বন্ধ আছেই—এরূপ অনুমান করিতে পারি। কিন্তু ইহার উত্তরে বলিব, জগৎটা যে ঈশ্বর-পরিচালিত প্রধানের কার্য্য, এই সিদ্ধান্তই অমূলক, কাল্পনিক, অপ্রতিষ্ঠিত; ঐরূপ মানিয়া লওয়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ অনুমান করা বিড়ম্বনামাত্র।

শিষ্য। কিন্তু এরূপ আপত্তি ত ব্রহ্ম ও মায়াসম্বন্ধেও হইতে পারে?

গুরু। না, তাহা পারে না; কারণ, ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে মায়াময়, অনির্ব্বচনীয় একটা অভেদ সম্বন্ধ আছে। কেবল-নিমিত্ত-কারণবাদী ও বৈদান্তিকের মতের পার্থক্য এই যে, কেবল-নিমিত্ত-কারণবাদীরা

অনুমান বলে (যেমন যেমন সচরাচর দেখা যায়, তেমন তেমন) ওরূপ কারণের অনুমান করেন, কাজেই তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ [যাহা কোন দিন দেখা যায় নাই] কিছুর কল্পনা করিতে পারেন না ; আর, বৈদান্তিক শাস্ত্রানুসারেই কারণের স্বরূপ নির্ণয় করেন, সুতরাং যেমন দেখা যায়, ঠিক্ তেমনই মানিতে হইবে,—এরূপ নিয়ম তাঁহাদের পক্ষে খাটে না।

তারপর, দেখা যায় যে, কুম্ভকার প্রভৃতি [নিমিত্ত-কর্ত্তা] প্রত্যক্ষ ও রূপাদিযুক্ত মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘটাদি প্রস্তুত করে ; কিন্তু অনুমান-সর্ব্বস্ব তার্কিকের পক্ষে সেরূপ

অধিষ্ঠান-অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৩৯ ॥

অধিষ্ঠান উপপন্ন হয় না বলিয়াও তাহার কল্পিত ঈশ্বর অমান্য। অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিবিহীন কোন কিছুকেই অধিষ্ঠেয় [অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত-কর্ত্তার অবলম্বনীয়] হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং ঈশ্বরও অপ্রত্যক্ষ রূপাদিহীন প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না।

শিষ্য। কিন্তু চক্ষুপ্রভৃতি করণ [ইন্দ্রিয়] অপ্রত্যক্ষ এবং তাহাদের কোন রূপ [আকার]ও নাই, অথচ পুরুষ [জীবাত্মা] তাহাদের অধিষ্ঠাতা [পরিচালক]। ঈশ্বরও

করণবৎ চেৎ ?—

ইন্দ্রিয়ের মত [করণবৎ] প্রধানের অধিষ্ঠাতা—এরূপ যদি বলি [চেৎ] ?—

গুরু। ন, ভোগাদিভ্যঃ ॥৪০ ॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন] ; কারণ, তাহা হইলে বলিতে হয়, ঈশ্বরেরও ভোগসুখ আছে। পুরুষ যে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা

তাহা পুরুষের সুখ দুঃখের ভোগ [অনুভব] হইতে অনুমান করা যায়; কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ কোন ভোগ স্বীকার করিলে তিনি আমাদেরই মত একটী সংসারী জীব হইয়া পড়েন।

এই মতে আরও দোষ আছে। সে দোষ হইতেছে ঈশ্বরের

অন্তবত্ত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

অন্ত [বিনাশ] থাকা [অন্তবত্ত্বম্] কিম্বা [বা] অসর্ব্বজ্ঞতা। অর্থাৎ ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিলে তিনি হয় অন্তবান্, না হয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ নন। এই মতাবলম্বীরা বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত। আবার প্রধান এবং পুরুষও অনন্ত, এবং এই তিনটী পরস্পর পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রধানের, পুরুষের ও আপনার ইয়ত্তা [সংখ্যা ও পরিমাণ] জানেন কি, না? অন্য কথায় ইহাদের ইয়ত্তা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন কি, না? যদি পরিচ্ছিন্ন হয়,তবে এই সঙ্কীর্ণত্বের (limitedness) জন্য প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলকেই বিনাশশীল বলিতে হয়। কারণ, ঘট, পট যাহা কিছু পদার্থ 'এতগুলি' ও 'এত বড়' – এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য, তাহা সমস্তই নশ্বর বা অন্তবৎ বলিয়া দেখা যায়। আর, প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর যখন পরস্পর ভিন্ন, তখন অবশ্যই প্রত্যেকের এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, যাহা দ্বারা পরস্পরের ভিন্নতা নিরূপিত হইতে পারে। আর, যাহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে এবং যাহা নশ্বর, তাহার একটা উৎপত্তিও আছে ; কারণ, সমস্ত নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ-বিশিষ্ট ও নশ্বর পদার্থই উৎপত্তিমান্ রূপে দেখা যায়। পক্ষান্তরে প্রধানাদির ইয়ত্তা যদি ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞাত না থাকে, তবে তিনি অসর্ব্বজ্ঞ। স্নুতরাং তার্কিক-কল্পিত ঈশ্বর-কারণবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অসমীচীন।

এক্ষণে যে সমস্ত দার্শনিক ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাতা (উপাদান ও নিমিত্ত) রূপে স্বীকার করিয়াও এমন সব অভিমত ব্যক্ত করেন, যাহা শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ, সেই সমস্ত দার্শনিকের মতের আলোচনা করা যাউক।

ভাগবতেরা বলেন, ভগবান্ বাসুদেব এক পরমার্থ তত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন—বাসুদেবব্যূহ (পরমাত্মা), সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ (জীব), প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ (মন) এবং অনিরুদ্ধ-ব্যূহ (অহঙ্কার)। এই চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই স্বরূপ। তন্মধ্যে বাসুদেবব্যূহ পরমা প্রকৃতি বা মূল কারণ। তাহা হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। সর্ব্বদা অনন্যচিত্তে ভগবদারাধনা করিলে মোক্ষলাভ হয়।

এক্ষণে দেখ, নারায়ণ পরমাত্মা, তিনি বহুরূপে বিরাজ করেন, তাঁহার আরাধনা করা উচিত—এই সব ভগবত-মত শ্রুতির অনুমোদিত, এবং আমরা তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তির কথা যে তাঁহারা বলেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ,

উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

ওরূপ উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। জীব (সঙ্কর্ষণ) যদি উৎপন্নই হয়, তবে সে ত অনিত্য, নশ্বর। যে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর মোক্ষলাভ কি? জীব যে উৎপন্ন হয় না, তাহা ব্রঃ সূঃ ২.৩.১৭ সূত্রে দেখাইব।

তারপর,

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

কর্ত্তা (যেমন একজন কাঠুরিয়া) হইতে [কর্ত্তুঃ] কখনও উপকরণ (যেমন কুঠার) [করণম্] উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। সুতরাং সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। মন একটা 'করণ', জীবের ভোগের সহায় বা সাধন, মনের সাহায্যেই জীব ভোগ করে। সেই 'করণ' জীব হইতে উৎপন্ন হয় কিরূপে? যেমন যেমন দেখা যায়, তেমন তেমনই অনুমান করা যায়; যেরূপ কোথাও দেখা যায় না, সেরূপ কিছুর অনুমান করা অসম্ভব। কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি যখন কুত্রাপি দেখা যায় না, তখন সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি স্বীকার করি কিরূপে? এরূপ অ-দৃষ্ট উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারিতাম, যদি কোন শ্রুতি এরূপ বলিতেন। কিন্তু এরূপ কোন শ্রুতি নাই।

ভাগবতেরা হয়ত বলিবেন, ঐ চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই, এবং তাঁহারা সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে ত বহু ঈশ্বর হইয়া গেল। এক ঈশ্বর মানিলেই যখন চলে, তখন বহু ঈশ্বর মানিবার কি প্রয়োজন? আর ঐ চতুর্ব্যূহকে

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎ-অপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যুক্ত বলিলেও [বিজ্ঞানাদিভাবে বা] পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তির অসম্ভবতা থাকিয়াই যায় [তদপ্রতিষেধঃ]। যেহেতু, কার্য্য হইতে কারণের কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব থাকিবেই। অথচ ঐ চারি ব্যূহ যদি সমধর্ম্মী হয়, তবে আর তাহাদের কোন ইতরবিশেষ থাকে না, ফলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ ইত্যাদির উৎপত্তিও হইতে পারে না।

আর, ভগবানের যে কেবল চারিটী ব্যূহই আছে, বেশী নাই, ইহাও অযৌক্তিক। শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের ব্যূহ।

আর,

বিপ্রতিষেধাৎচ ॥ ৪৫ ॥

ঐ ভাগবত দর্শনে অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি দেখিতে পাই। যেমন, কোথাও বলা হইয়াছে, গুণ ও গুণী পৃথক, আবার কোথাও বলা হইয়াছে, উহারা অভিন্ন। শ্রুতির সহিত বিরোধ ত স্পষ্টই রহিয়াছে। বেদের নিন্দাও যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত কারণে এই মত অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে শ্রুতিই সর্ব্ব প্রধান সহায়। কিন্তু সৃষ্টি বিষয়ক কোন কোন শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া আমার সন্দেহের নিরাস করুন। প্রথমতঃ সন্দেহ হয়,—আকাশের উৎপত্তি আছে কি না। আমার ত মনে হয়,

ন বিয়ৎ, অশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

আকাশ [বিয়ৎ] উৎপন্ন পদার্থ নয় [ন]; যেহেতু, শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা বলা হয় নাই [অশ্রুতেঃ]। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সৎস্বরূপ ব্রহ্ম তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন মহাভূতের সৃষ্টি করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৩)—এইরূপ বাক্যই আছে। আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি ঐ স্থলে উক্ত হয় নাই। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণ না থাকায় আকাশ উৎপত্তিহীন পদার্থ বলিয়াই মনে হয়।

অস্তি তু ॥ ২ ॥

পক্ষান্তরে আবার [তু] 'আকাশেরও উৎপত্তি হয়,' এরূপ শ্রুতি বাক্য আছে [অস্তি]: যেমন তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, "এই সেই আত্মা হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইল" [তৈঃ ২.১]। সুতরাং এক শ্রুতিতে পাই যে, প্রথমে তেজের সৃষ্টি হইল, আকাশের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কথাই সেস্থলে নাই, অপর শ্রুতিতে আবার আকাশকেই প্রথম সৃষ্ট মহাভূতরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রুতির এই বিরোধ

পরিহারের উদ্দেশ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ বাস্তবিক উৎপন্ন হয় না। তবে যে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্য নয়, পরন্তু সেই উক্তি

গৌণী, অসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

গৌণ [গৌণী]; যেহেতু আকাশের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবই নয় [অসম্ভবাৎ]। যে কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে হইলে তিনটি কারণের প্রয়োজন। প্রথম, **সমবায়ী কারণ**; যেমন ঘটের উৎপত্তিতে কপাল ও কপালিকা [অর্থাৎ যে দুইটী খাপড়া জুড়িয়া ঘট তৈয়ারী হয়]। দ্বিতীয়, **অসমবায়ী কারণ**; যেমন ঘটোৎপত্তিতে ঐ খাপড়া দুইটীর সংযোগ বা যোড়া লাগান। তৃতীয়, **নিমিত্ত কারণ**; যেমন উক্ত স্থলে দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার ইত্যাদি। এক্ষণে দেখুন, আকাশ উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কোন সমবায়ী কারণ নাই—আকাশজাতীয় কোন পরমাণু নাই। সমবায়ী কারণ না থাকায় অর্থাৎ আকাশ জাতীয় পরমাণু না থাকায় সংযোগ হইবে কাহাদের? সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ থাকিলেই নিমিত্ত কারণের কার্য্য হইতে পারে। সুতরাং যে তিন কারণে দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা না থাকায় আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব।

আবার, যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইলে একটা না একটা বিশেষ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মাটি দ্বারা যে কাজ হয়, ঘটের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অন্য রকমের বিশেষ কাজ হয়। কিন্তু আকাশের [শূন্যের] জন্মের [যদি জন্ম মানিয়াও লওয়া যায়] পূর্ব্বেও যে কাজ, পরেও সেই কাজ। সুতরাং আকাশের উৎপত্তি হয় না—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কাজেই তৈত্তিরীয় শ্রুতির গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শব্দাৎ চ ॥ ৪ ॥

অন্যান্য শ্রুতি বাক্য হইতেও [শব্দাচ্চ] জানা যায় যে, আকাশের উৎপত্তি নাই। বৃহদারণ্যক বলেন, "বায়ু ও আকাশ 'অমৃত' " [বৃ: ২.৩.৩]। যাহা 'অমৃত' অর্থাৎ অবিনাশী, তাহা নিশ্চয়ই জন্মরহিত। যাহার জন্ম আছে, তাহার নাশও অবশ্যম্ভাবী। আবার, "আকাশের মত 'নিত্য' ও সর্ব্বব্যাপী"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও আকাশ যে নিত্য, অবিনাশী, ইহাই প্রতীত হয়।

কিন্তু কেহ যদি আপত্তি করে যে, "এই সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল, তাহা হইতে তেজ: প্রভৃতিও সম্ভূত হইল"—এই শ্রুতিতে তেজ: প্রভৃতির বেলায় 'সম্ভূত' শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা হইলে,—অর্থাৎ তেজ: প্রভৃতি সত্য সত্যই উৎপন্ন হইল, এই অর্থ স্বীকার করিলে—আকাশের বেলায় 'সম্ভূত' শব্দের গৌণ অর্থ কিরূপে গ্রহণ করা যায়। একই শ্রুতি বাক্যে একই শব্দের মুখ্য ও গৌণ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। এরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,

স্যাৎ চ একস্য ব্রহ্ম-শব্দবৎ ॥ ৫ ॥

একই সম্ভূত শব্দের [একস্য] মুখ্য ও গৌণ অর্থ হইতেও পারে [স্যাৎ চ], ব্রহ্ম শব্দের ন্যায় [ব্রহ্মশব্দবৎ]। "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম" [তৈ: ৩.২]—এই বাক্যে যেমন একই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য ও গৌণ অর্থ স্বীকার করা হয়, সেইরূপ সম্ভূত শব্দেরও একই প্রকরণে মুখ্য ও গৌণ অর্থ স্বীকার করা যাইতে পারে।

ইহাই হইল যাঁহারা আকাশকে অনুৎপন্ন [জন্মরহিত, অজ]

পদার্থ বলেন, তাঁহাদের মত। ইহারা বলেন, আকাশ উৎপত্তিহীন নিত্য পদার্থ হইলেও "একমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছাঃ ৬.২.১] এই শ্রুতি বাক্য সার্থকই থাকে, এবং একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জানা হইয়া যায়—এরূপ প্রতিজ্ঞারও [proposition] হানি হয় না। কেন না, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, কোন কার্য্য [effect] ছিলনা; যত কিছু কার্য্য, ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের একমাত্র অধিষ্ঠাতা, দ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা নাই। আর, আকাশ নিত্য বর্ত্তমান পদার্থ বলিয়াই যে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইতে পারেন না, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ, দুইটী পদার্থ ভিন্ন বলিয়া তখনই স্বীকার করা যায়, যখন উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ থাকে। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের ও আকাশের লক্ষণ একই, উভয়েই তখন সর্ব্বব্যাপী ও রূপাদিবিহীন। ভিন্নতা হয় সৃষ্টির সময়ে—তখন ব্রহ্ম হন ক্রিয়াশীল, আর আকাশ থাকে নিশ্চল। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ নামক নিত্যপদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই উক্তির কোন বিরোধ হয় না। "ব্রহ্ম আকাশ-শরীর" [তৈঃ১.৬.২] শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ও আকাশের অভিন্নতা সূচিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হইতেও বাধা নাই। আবার, যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই আকাশের দেশ [space] ও আকাশের কালেই [time] উৎপন্ন হয়। আকাশের দেশ ও কাল এবং ব্রহ্মের দেশ ও কাল একই, উভয়ই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদা স্থায়ী। সুতরাং ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কার্য্য বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই জানা হইয়া যায়। যেমন, এক কলসী দুধের জ্ঞান হইলে সেই দুধের সহিত মিশ্রিত জলেরও জ্ঞান হয়। ইহাই হইল যাঁহারা আকাশকে অনুৎপন্ন পদার্থ বলেন, তাঁহাদের যুক্তি। এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন, আকাশ বাস্তবিকই নিত্য পদার্থ কি না?

গুরু। বৎস, আকাশ নিত্য পদার্থ নয়, উহাও অন্যান্য পদার্থের মত ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন।

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ অব্যতিরেকাৎ, শব্দেভ্যঃ চ ॥ ৬ ॥

"এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান"—এই প্রতিজ্ঞার [proposition, যে উক্তি প্রমাণ করিতে হইবে] সিদ্ধি [প্রতিজ্ঞাহানিঃ] তবেই হয়, যদি অবিশেষে সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাতিরিক্ত না হয় [অব্যতিরেকাৎ]; আর, শ্রুতিবাক্যসমূহ যে কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও [শব্দেভ্যশ্চ] ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয়।

যদি, "সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন"—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তবেই সেই একমাত্র কারণ ব্রহ্মের জ্ঞানে অন্য সমস্তের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয়। এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান—এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই এই যে, 'কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান'—ইহা শ্রুতিই মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বহুপ্রকারে বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়াই কোন কিছু ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়, ইহা শ্রুতি অতি স্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন। সুতরাং আকাশকে যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পদার্থ বলা না যায়, তবে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইতে পারে না। তবে ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু তৈত্তিরীয়কে আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতির অন্য প্রকার অর্থ করা যায় না; কিন্তু ছান্দোগ্যের যদি এরূপ অর্থ করা যায় যে, তিনি—আকাশ ও বায়ু সৃষ্টি করিয়া—তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, তবে উভয় শ্রুতির একটা সামঞ্জস্য হয়, এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতিরও অন্য কোন প্রকার বিকৃত গৌণ অর্থ কল্পনা করিবার প্রয়োজন

হয় না। আর, ছান্দোগ্যে এমন কথাও নাই যে, তিনি প্রথমেই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতিকে তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া পাঠ করাই সঙ্গত।

তারপর, আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইলেও আকাশ ও ব্রহ্ম যেহেতু একই দেশে [অর্থাৎ সর্ব্বত্র] ও একই কালে [অর্থাৎ সর্ব্বকালে, eternity] বর্ত্তমান আছে, সেই হেতু ব্রহ্মের জ্ঞানেই আকাশেরও জ্ঞান হইয়া যায় [যেমন, একটী পাত্রে জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত থাকিলে দুগ্ধের জ্ঞানেই জলেরও জ্ঞান হইয়া যায়]—একথাও সঙ্গত নয়। কেন না, ঈদৃশ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান যে শ্রুতির অভিপ্রেত নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সেরূপ হইলে শ্রুতি মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেখাইতেন না। ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্যই হইল—কারণের জ্ঞানে কার্য্যেরও জ্ঞান। দুগ্ধের সহিত জল অতি নিবিড় ভাবে মিশ্রিত থাকিলেও দুগ্ধের জ্ঞানেই যে জলেরও জ্ঞান হয়, একথা বলা যায় না। ওরূপ জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। বাস্তবিক ওরূপ স্থলে জলের একটা পৃথক্ জ্ঞান না হইলে উহা ভ্রমই হয়। শ্রুতি ঐরূপ একটা গোঁজামিল দিয়া একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, ইহা শ্রুতিজ্ঞমাত্রেরই অশ্রদ্ধেয়।

তারপর, আকাশ উৎপন্ন হইতেই পারে না, এরূপ যে অসম্ভাবনা দেখান হইয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়। যেহেতু,

যাবদ্বিকারং তু বিভাগঃ লোকবৎ ॥ ৭ ॥

ইহলোকে [লোকবৎ] যাহা কিছু বিকৃত অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ [যাবদ্বিকারম্] তৎসমস্তই বিভক্ত অর্থাৎ পরস্পর পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত [বিভাগঃ]। ঘট হইতে পট ভিন্ন, পট হইতে মঠ ভিন্ন। এইরূপ

যাহা কিছু উৎপন্ন পদার্থ, তাহাই অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্। পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন। অবিকৃত [অনুৎপন্ন] অথচ অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্—এরূপ কোথাও দেখা যায় না। আকাশও পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্ বস্তুরূপেই অনুভূত ও ব্যবহৃত হয়, অতএব আকাশও নিশ্চয়ই একটা উৎপন্ন পদার্থ।

শিষ্য। কিন্তু এই যুক্তিতে ত আত্মারও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আত্মাও ত আকাশাদি পদার্থ হইতে বিভক্ত [পৃথক্]।

গুরু। না, আত্মাকে উৎপন্ন পদার্থ বলা যায় না; কারণ শ্রুতি আত্মা হইতেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, আত্মার উৎপাদকের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। আত্মারও অপর উৎপাদক আছে স্বীকার করিলে, সমস্ত পদার্থই নিরাত্মক হইয়া পড়ে। যেহেতু আত্মা, সেই হেতুই আত্মার অস্তিত্ব অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ, তাঁহার উৎপত্তির কথা উঠিতেই পারে না। আত্মাই অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করেন। আত্মার অস্তিত্ব অন্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। আত্মার অস্তিত্ব যিনি নির্দ্ধারণ করিবেন, তিনি আত্মা ছাড়া আর কেহ হইতে পারেন না। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। সমস্তই আত্মার আশ্রিত, আত্মার অধীন। তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে, এমন কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাশ আপনা আপনিই হয়, অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। তিনি স্বপ্রকাশ। সমস্ত প্রমাণের মূলেই আত্মা। সেই আত্মার নিষেধ [কখনও থাকে, কখনও থাকে না, উৎপত্তির পরে হয়] অসম্ভব। কারণ, যে নিষেধ করিবে, সেও আত্মাই। স্বরূপের নিষেধ হইতে

পারে না। এটা দেখিলাম, ওটা জানিলাম ইত্যাকার সমস্ত জ্ঞানের মূলেই এই চিরন্তন সাক্ষী, নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। জ্ঞাতা যিনি অর্থাৎ যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বদাই একরূপ; যাহা জানা হয়, তাহাই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এই সমস্ত কালের বিভাগ জ্ঞেয় পদার্থের প্রতিই প্রযুক্ত হয়, জ্ঞাতার প্রতি হয় না। জ্ঞাতা তিন কালেই বিদ্যমান। সুতরাং আত্মা জন্মবান্ নহেন, আকাশাদিই জন্মবান্।

সমজাতীয় পরমাণুই অন্য স্বজাতীয় বস্তু উৎপন্ন করে; আকাশ-জাতীয় একাধিক পরমাণু নাই, সুতরাং আকাশ উৎপন্ন হইতে পারে না—এই যুক্তিও বিচারসহ নয়। কারণ, 'সমজাতীয় বহু কারণ দ্রব্য হইতেই কেবল কার্য্যের উৎপত্তি হয়, অসমান জাতীয় হইতে হয় না,' এরূপ কোন নিয়ম নাই। যেমন, সূত্র একটী 'দ্রব্য,' আর সূত্রের পরস্পর 'সংযোগ' একটী 'গুণ'। 'দ্রব্য' ও 'গুণ' বিভিন্ন জাতীয় ইহা আকাশের নিত্যত্ববাদিরা বলেন। অথচ সূত্র ও সূত্রসংযোগেই বস্ত্র উৎপন্ন হয়। কার্পাস সূত্র ও মেষলোম এই দুই বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারাও একখানি কম্বল উৎপন্ন হইতে পারে। আর, অনেক কারণ দ্রব্য একত্রিত হইয়া কার্য্য জন্মায়, একটী কারণ দ্রব্য কার্য্য জন্মাইতে পারে না—এমন নিয়মই বা কি আছে? পরমাণুতে যে প্রথম ক্রিয়া [দ্ব্যণুকোৎপাদনের জন্য স্পন্দন] হয়, তাহাতে অন্য দ্রব্যের অপেক্ষা নাই, ইহা আকাশের নিত্যত্ববাদিরাও বলেন। বস্তুতঃ কারণদ্রব্যই অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনাম ধারণ করে, তাহা ছাড়া কারণটা কার্য্য হইয়া যায়, উহার একটা পরিণাম হয়, এরূপ বলা যায় না। একই কারণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কার্য্য নামে প্রতীয়মান হয় মাত্র।

উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে আকাশের কাজের [অবকাশ প্রদানই

আকাশের কাজ] কোন বিশেষত্ব হয় না, এইজন্য আকাশের উৎপত্তি হয় না—এরূপ বলাও সঙ্গত নয়। কারণ, যদি বলি যে, বর্ত্তমানে যে জন্য আকাশকে আকাশ বলি, অর্থাৎ যে ধর্ম্মের জন্য আকাশ শব্দ ব্যবহার করি, সেই ধর্ম্মটী আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না, তাহা হইলে ত কোন দোষ হয় না। এই বিশেষ কাজই আকাশের উৎপত্তি দ্বারা সাধিত হয়।

শ্রুতিতে যে আকাশের সহিত তুলনা করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যরূপে বুঝান হইয়াছে, তাহাতেও আকাশের সত্যিকারের সর্ব্ব-ব্যাপিতা ও নিত্যতা সিদ্ধ হয় না। তুলনার উদ্দেশ্যই হইল, সহজবোধ্য বস্তুর সাহায্যে দুর্ব্বোধ্য বস্তুর ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া। আমাদের বোধ্যের মধ্যে আকাশই অপেক্ষাকৃত ব্যাপী ও নিত্য। সুতরাং তাহারই উপমা দিয়া ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব বুঝান হইয়াছে। শ্রুতি ত স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম আকাশ হইতেও বড়," "তাঁহার উপমা নাই" [শ্বেঃ ৪.১৯], "ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই নশ্বর" [বৃঃ ৩.৪.২]—ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মকে আকাশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বলিয়াই যে আকাশও ব্রহ্মেরই মত নিত্য, তাহা বলা যায় না। বুঝিবার সুবিধার জন্যই ওরূপ উপমার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে; তত্ত্বকথা—"তাঁহার উপমা নাই"।

অতএব আকাশও উৎপন্ন পদার্থই।

ছান্দোগ্যে আকাশের ন্যায় বায়ুর উৎপত্তির কথাও নাই। তাহা হইলেও

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

এই আকাশের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দ্বারাই [এতেন] বায়ুর উৎপত্তিও [মাতরিশ্বা] ব্যাখ্যাত হইল [ব্যাখ্যাতঃ] বুঝিতে হইবে।

[ছান্দোগ্যের সপ্তমে আকাশ ও বায়ুকে তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ছান্দোগ্যে আকাশ এবং বায়ুও স্বীকৃত হইয়াছে। তবে সৃষ্টি প্রসঙ্গে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রথমে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মূর্ত্ত তেজ, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তিই আলোচনা করা হইয়াছে]

শিষ্য। ব্রহ্মও কি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় ?

গুরু। না বৎস, সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হন না।

অসম্ভবঃ তু সতঃ অনুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের [সতঃ] উৎপত্তি হয় না [অসম্ভবঃ]; যেহেতু, ব্রহ্মের উৎপত্তি যুক্তি-সিদ্ধ নয় [অনুপপত্তেঃ]। সৎ হইতেই পদার্থের উৎপত্তি, অ-সৎ হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন "অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে ?" [ছাঃ ৮.৭.১]। সুতরাং ব্রহ্মের যদি উৎপত্তি হয়, তবে সৎ হইতেই হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং **সৎ-সামান্য, কেবল সৎ, নির্ব্বিশেষ সৎ**। সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি দেখা যায় (যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটের]। বিশেষ হইতে সামান্য হয় না। অতএব ব্রহ্ম কোন এক বিশেষ প্রকারের সৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন না, যাবতীয় সৎবিশেষই সৎ-সামান্য ব্রহ্মের অন্তর্ভূত। আবার, সৎসামান্য হইতেও ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব। কার্য্য অপেক্ষা কারণের একটা বিশেষত্ব, একটা অতিশয়, অবশ্যই থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের উৎপাদকও যদি সৎসামান্যই হয়, তবে আর বিশেষত্ব রহিল কই ? শ্রুতিও কুত্রাপি ব্রহ্মের উৎপত্তি উল্লেখ করেন নাই ; বরং ব্রহ্মের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে। "ইহার কোন জনক নাই" [শ্বেঃ ৬. ৯]।

শিষ্য। কিন্তু এক বিকার [যেমন ঘাসাদির বিকার দুধ] হইতেই অন্য বিকারের [যেমন দধি] উৎপত্তি দেখা যায়। সুতরাং ব্রহ্মেরও একটা উৎপাদক থাকিতে পারে।

গুরু। না, তাহা পারে না। মূলে এমন একটা অবিকৃত পদার্থ [প্রকৃতি] অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যাহা হইতে অন্যান্য বিকার উৎপন্ন হয়। তাহা না হইলে বিকারের আদির অনুসন্ধান কোন কালেই নিবৃত্ত হয় না। সেই মূল পদার্থই ব্রহ্ম, এবং তাহা হইতেই যাবতীয় বিকার উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। ছান্দোগ্য বলেন, ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি; আবার তৈত্তিরীয় বলেন, বায়ু হইতে। এই দুই শ্রুতির একটা সামঞ্জস্য এই ভাবে করা যাইতে পারে যে, তেজ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন; কারণ, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইলে একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানে অন্য সমস্তের জ্ঞান হইতে পারে না। তবে তৈত্তিরীয় শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—'ব্রহ্ম বায়ু সৃষ্টি করিয়া তারপর তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'।

গুরু। না, বৎস, ওরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে না।

তেজঃ অতঃ, তথা হি আহ ॥ ১০ ॥

তৈত্তিরীয় যখন বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি হয়, এরূপ [তথা হি] বলিয়াছেন [আহ], তখন এই বায়ু হইতেই [অতঃ] তেজের উৎপত্তি [তেজঃ] স্বীকার করিতে হইবে।

তৈত্তিরীয় যখন স্পষ্টভাবেই বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি বলিয়াছেন, তখন সেই শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। আর, ঐ শ্রুতিতে যে স্থলে তেজোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে

আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি এবং পরে জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। সেই আকাশাদির উৎপত্তিতে শ্রুতির সহজ অর্থই গ্রহণ করা হয়; সুতরাং কেবল মধ্যে একটা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার হেতু নাই। আর, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধির জন্যও যে ব্রহ্মকে সমস্ত বিকারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই কারণ হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সাক্ষাৎভাবে হউক, পরম্পরাক্রমে হউক, ব্রহ্ম সকলের কারণ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান হইতে বাধা থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজের সৃষ্টি।

এইরূপ তেজঃ হইতে

আপঃ ॥ ১১ ॥

জলের উৎপত্তি। ইহা শ্রুতিসম্মত সৃষ্টির ক্রম।

শিষ্য। ছান্দোগ্যে মৃত্তিকা-সৃষ্টির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বলা হইয়াছে, সেই জল ভাবনা করিল, 'আমি বহু হইব ও জন্মিব'। তারপর সে অন্ন সৃষ্টি করিল। [ছাঃ ৬.২.৪]। এই স্থলে অন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

গুরু। পৃথিবী, অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্নশব্দে মৃত্তিকাকেই [পৃথিবী] বুঝিতে হইবে; যেহেতু প্রথমতঃ যে প্রকরণে [অধিকার] ঐ অন্নশব্দের উল্লেখ আছে, সেই প্রকরণ মহাভূতের উৎপত্তি বিষয়ক, সুতরাং অন্নশব্দে একটী মহাভূতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এরূপই নিশ্চয় করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, অন্নের যে প্রকার রূপের [রূপ] বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে

[কৃষ্ণবর্ণ], তাহাও মৃত্তিকার পক্ষেই খাটে ; তৃতীয়তঃ, অন্যশ্রুতিতে [শব্দান্তর] জল হইতে মৃত্তিকারই উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ছান্দোগ্যোক্ত অন্নশব্দের অর্থ মৃত্তিকা।

শিষ্য। এই যে আকাশাদি মহাভূত, ইহারা কি নিজেরাই স্বাধীনভাবে আপন আপন বিকার উৎপাদন করে, না পরমেশ্বরই আকাশাদিরূপে অবস্থিত হইয়া বিকার সৃষ্টি করেন ?

গুরু। তদভিধ্যানাৎ এব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বরই [সঃ] আকাশাদিরূপে অবস্থিত হইয়া অভিধ্যান পূর্ব্বক—আমি এরূপ হইব এই প্রকার আলোচনা করিয়া—[তদভিধ্যানাৎ] বায়ু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন ; যেহেতু, শ্রুতিতে—পরমেশ্বরই সকলের নিয়ন্তা, চালক, শাসক—এরূপ উক্তি আছে ;—যেমন, "যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন" [তৈঃ ৩.৭.৩]—এবং এই উক্তি দ্বারা সূচিত হইতেছে [তল্লিঙ্গাৎ] যে, আকাশাদি ব্রহ্মের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব বিকারে পরিণত হয়। শ্রুতি আরও বলেন, "তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্ত হইলেন, তিনি আপনি আপনাকে সেই সেই রূপে প্রকট করিলেন" [তৈঃ ২.৬.১]—ইত্যাদি।

শিষ্য। সৃষ্টির ক্রম বুঝিলাম।এক্ষণে প্রলয়ের ক্রম বলুন।

গুরু। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমঃ অতঃ উপপদ্যতে চ ॥ ১৪ ॥

সৃষ্টি যে ক্রমে হয়, তাহা হইতে [অতঃ] বিপরীত [বিপর্য্যয়েণ]

প্রলয়ের ক্রম [ক্রমঃ], এবং [চ] এই বিপরীত ক্রম যুক্তিযুক্তও বটে [উপপদ্যতে]।

মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট, শরা প্রভৃতি মৃত্তিকাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; জল হইতে উৎপন্ন বরফ ইত্যাদি আবার জলই হয়। সুতরাং মৃত্তিকা জল হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল অবস্থান করে, তারপর আবার জলেই লীন হয়। জল আবার তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ব্রহ্মে লীন হয়। স্থূল বস্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্মে বিলীন হয়, তাহা আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতরে—এইরূপে ক্রমে পরম সূক্ষ্ম, পরম কারণে যাবতীয় পদার্থেরই বিলয় হয়—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।

শিষ্য। "এই ব্রহ্ম হইতে **প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়,** আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, বিশ্বাধার পৃথিবী জন্মে" (মুঃ ২. ১. ৩) এই অথর্ব্ব-শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম এবং পঞ্চমহাভূতের

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ ইতি চেৎ ?—

অন্তরালে [অন্তরা] বুদ্ধি ও মন [বিজ্ঞান-মনসী] একের পর আর [ক্রমেণ] উৎপন্ন হয়; যেহেতু, ঐ শ্রুতিই এরূপ সূচিত করে [তল্লিঙ্গাৎ]। সুতরাং উৎপত্তি ও প্রলয়ের যে ক্রমের কথা বলিয়াছেন, তাহা ত ঠিক রক্ষিত হইতেছে না—এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

গুরু। ন, অবিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥

না, ইহাতে ক্রমভঙ্গ হয় না [ন], কারণ বুদ্ধি, মন ইত্যাদির মহাভূত হইতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই [অবিশেষাৎ]। ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ভৌতিক (ভূত হইতে উৎপন্ন)। সুতরাং ভূতের উৎপত্তি

ও প্রলয় বলাতেই ইন্দ্রিয়াদিরও উৎপত্তি-প্রলয় বলা হইল। তাহাতে ক্রমের কোন হানি হয় না। শ্রুতিই বলেন, "মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাগিন্দ্রিয় তেজোময়" (ছাঃ ৬. ৫. ৪) ইত্যাদি। আর অথর্ব্ব শ্রুতিতেও বিশেষরূপে প্রাণাদির উৎপত্তির একটা ক্রম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, ও স্থলে সাধারণ ভাবেই বলা হইয়াছে যে, সমুদায় পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্রমের কোন ভঙ্গ হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, আকাশাদির যেরূপ উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, জীবেরও কি সেইরূপ হয়?

গুরু। না, তাহা হয় না।

শিষ্য। তবে আমরা বলি কেন যে অমুক জন্মিল, অমুক মরিল?

গুরু। চরাচর-ব্যপাশ্রয়ঃ তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ, তদ্‌ভাব-ভাবিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

ওরূপ ব্যবহার—অমুক জন্মিল, অমুক মরিল ইত্যাদি লৌকিক উক্তি—[তদ্ব্যপদেশঃ] গৌণ [ভাক্তঃ]—অর্থাৎ জীব বাস্তবিকই জন্মিল বা বাস্তবিকই মরিল এরূপ নয়; তবে স্থাবর [যাহা চলিতে পারে না] ও জঙ্গম [যাহা চলিতে পারে] শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই [চরাচর-ব্যপাশ্রয়ঃ] বস্তুতঃ ওরূপ জন্মমৃত্যুর উল্লেখ সঙ্গত হয় [স্যাৎ]। জীবের সম্বন্ধে যে সাধারণতঃ ওরূপ উক্তি করা হয়, তাহা কেবল গৌণ ভাবেই, মুখ্যভাবে নয়; যেহেতু, শরীর হইলেই 'জন্মিল' এবং শরীর বিনষ্ট হইলেই 'মরিল', এরূপ উক্তি করা হয়

[তদ্ভাবভাবিত্বাৎ]। স্বতরাং জীবের সম্বন্ধে জন্মমরণব্যবহার গৌণ, শরীর সম্বন্ধে মুখ্য।

শিষ্য। তবে কি আপনি বলিতে চান যে, জীব জন্মে না? কিন্তু জীব যদি জন্মরহিত—অতএব নিত্য—হয়, তবে এক ব্রহ্মের জ্ঞানে অন্যান্য সমস্তের জ্ঞান হয় কি প্রকারে? জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পদার্থ হইলেই ব্রহ্মের জ্ঞানে জীবের জ্ঞান হইতে পারে। আর অবিকৃত পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ংই জীব, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম হইলেন নিষ্পাপ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আর জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার, আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন প্রসঙ্গে আপনি বলিয়াছেন যে, বিভক্ত বস্তু মাত্রই উৎপন্ন হয়। জীবও প্রতি শরীরে বিভক্ত—এক এক শরীরে এক এক জীব; স্বতরাং জীবকেও জন্মবান্ বলিতে হয়। শ্রুতিতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্তে সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ও তাঁহাতেই প্রলয় দেখান হইয়াছে। স্বতরাং জীবও আকাশাদির মত জন্মবান্ বলিয়াই মনে হয়।

গুরু। না বৎস,

ন আত্মা, অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎচ তাভ্যঃ॥ ১৭ ॥

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না [আত্মা ন]; কারণ শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার জন্মের কথা বলা হয় নাই [অশ্রুতেঃ]। আর, জীবাত্মার উৎপত্তি হওয়া সম্ভবই নয়, কারণ অজ, অমর ইত্যাদি শ্রুতির উক্তি হইতে আত্মা যে নিত্য, ইহাই অবগত হওয়া যায় [তাভ্যঃ নিত্যত্বাৎ]। শ্রুতি বলেন, "আত্মা জন্মে না, মরে না" [কঃ ২. ১৮]; "জীব মরে না" [ছাঃ ৬. ১১. ৩]; "তিনিই এই। ইনি মহান্, জন্মরহিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয়, ব্রহ্ম" [বৃঃ

৪. ৪. ২৫]; "এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন" [কঃ ২.১৮];
"জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব" [ছাঃ ৬. ৩. ২];
"হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি" [ছাঃ ৬. ৮. ৭.); "আমি ব্রহ্ম"
[বৃঃ ১. ৪. ১০]; "এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম, সর্ব্বসাক্ষী" [বৃঃ ২. ৫. ১৯]
—ইত্যাদি। এইরূপ শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,
জীব ও পরমাত্মা এক। সুতরাং জীবের বস্তুতঃ জন্মমরণ কিছুই নাই।

তারপর, জীব যে বাস্তবিকই প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা
নয়। শ্রুতি বলেন, "একই দেব সর্ব্বভূতে গূঢ়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের
অন্তরাত্মা" [শ্বেঃ ৬. ১১]। এই প্রকার বহুশ্রুতি হইতে জানা যায়
যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি যোগে বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত
হন মাত্র, বস্তুতঃ তিনি একই। কোন কোন শ্রুতিতে যে জীবের
উৎপত্তি-প্রলয়ের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও শরীরাদি উপাধিকে লক্ষ্য
করিয়াই। কাহারও পাছে ভ্রম হয়, এইজন্য শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই
বলিলেন, (ঋষি বলিতেছেন) "আমি ভ্রান্ত কথা বলি নাই, আত্মা
অবিনাশী, আত্মার উচ্ছেদ বা পরিণাম নাই। তবে বিষয়ের সম্পর্কেই
তিনি বিষয়ী হন" [বৃঃ ৪. ৫. ১৪]—বস্তুতঃ তিনি বিষয়ী নন।
সুতরাং আত্মার উৎপত্তি হয় না—ইহাই শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ।
[ব্রঃ সূঃ ২. ৩. ৭ দ্রষ্টব্য]।

শিষ্য। বৈশেষিকেরা বলেন, 'আত্মার চৈতন্য নিত্য নয়, উহা
আগন্তুক। যেমন ঘটের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ঘটে একটা
লালবর্ণ আগত হয়, সেইরূপ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে
আত্মায় চৈতন্য উদ্ভূত হয়। আত্মা যদি নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ হইতেন, তবে
সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের অভাব হইত না। অথচ
সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর সকলেই অনুভব করে যে, ঐ ঐ অবস্থায়

চৈতন্য ছিল না। সুতরাং আত্মা যেহেতু কখন চেতন, কখনও অচেতন, সেইহেতু তাঁহার চৈতন্য নিশ্চয়ই নিত্য নয়, আগন্তুক।' এই বৈশেষিক মত কতদূর যুক্তিসহ জানিতে বাসনা।

গুরু। না বৎস, আত্মার চৈতন্য আগন্তুক নয়; আত্মা

জ্ঞঃ, অতঃ এব ॥ ১৮ ॥

নিত্যচৈতন্যরূপী [জ্ঞঃ], পূর্ব্বোক্ত কারণেই [অতঃ এব]—অর্থাৎ যেহেতু আত্মার উৎপত্তিপ্রলয় নাই, সেইহেতু তিনি নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ। অবিকৃত পূর্ণ ব্রহ্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে জীব নামে কথিত হন; সুতরাং তাঁহার চৈতন্য তাঁহার চিরন্তন স্বভাব বা স্বরূপ, উহা কখনও আগন্তুক হইতে পারে না। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও চৈতন্যের একেবারে অভাব হয় না। শ্রুতি বলেন, "সুপ্তিকালে আত্মা দেখেন না, এমন নয়, বস্তুতঃ দেখেন, অথচ যেন দেখেন না। দ্রষ্টব্যাই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা (সাক্ষী) তাঁহার লোপ হয় না। সেই সুষুপ্তি অবস্থায় একমাত্র তিনিই থাকেন, দ্বিতীয় কিছু থাকে না; অন্য অবস্থায় এই সকল দ্রষ্টব্য তাঁহা হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকে বলিয়াই তিনি তখন দেখেন" (বৃঃ ৪. ৩. ২৩) ইত্যাদি। এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, গভীর নিদ্রার অবস্থায়ও আত্মা বাস্তবিক অচেতন হন না, তবে দ্রষ্টব্য না থাকায় অচেতনের মত হন। যেমন দ্রষ্টব্য কিছু না থাকিলে দ্রষ্টার অভিব্যক্তি হয় না, কিন্তু দ্রষ্টার স্বভাব (অর্থাৎ দর্শনশক্তি) বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও আত্মার স্বরূপচৈতন্যের অভাব হয় না। আর, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাদি অবস্থায় চৈতন্য ছিল না, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছা ভঙ্গে লোকের যে এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, লোকে

ঐরূপ অনুমান করে মাত্র। কিন্তু মূর্চ্ছাদি অবস্থায় যদি চৈতন্যের একেবারে অভাবই হইত, তবে চৈতন্য যে ছিল না, ইহাই বা বোঝে কে ? যে ব্যক্তি 'এখন' বলিতেছে যে, 'তখন কিছুই জানি নাই,' সে নিশ্চয়ই 'তখনও' বর্ত্তমান ছিল, না হইলে 'তখনকার' কিছুই তাহার স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং চৈতন্যের একেবারে লোপ কোন কালেই হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তবে সেও নিশ্চয় সর্ব্বব্যাপী হইবে। কিন্তু

উৎক্রান্তি-গতি-আগতীনাম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিতে জীবের 'উৎক্রান্তি' (দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া), গতি (লোকান্তরে গমন) এবং তথা হইতে আগতি (প্রত্যাবর্ত্তন)—এই তিন কার্য্যের উল্লেখ থাকায় [উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্] জীব সর্ব্বব্যাপী নয়—ইহাই বুঝা যায়। দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া, স্থানান্তরে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন—এই সব কার্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া যে অবস্থান করে, তাহার হইতে পারে না, সেরূপ কল্পনাও অসম্ভব। যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থান করে, সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষেই উৎক্রান্তি প্রভৃতি সম্ভব। সুতরাং জীব সর্ব্বব্যাপী নয়। আর জীব যে দেহ-পরিমাণ নয়, ইহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। তবে কি জীব অণু-পরিমাণ ?

* শরীর ত্যাগ করা অর্থে উৎক্রান্তি শব্দ গ্রহণ করিলে ত্যাগকর্ত্তা (জীবাত্মা) একস্থান হইতে অন্যস্থানে না চলিয়াও ঐ কার্য্য করিতে পারেন বটে ; কিন্তু গতি (পরলোকে গমন) ও আগতি (ইহলোকে

আগমন), এই দুইটি ক্রিয়া কর্ত্তা স্বয়ং না চলিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন না ; যেহেতু,

স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ ॥ ২০ ॥

পরবর্ত্তী দুইটী ক্রিয়ার, অর্থাৎ গতি ও আগতির (গমন ও আগমন) [উত্তরয়োঃ] সম্বন্ধ কর্ত্তার সহিত অর্থাৎ স্বয়ং জীবাত্মার সহিত [স্বাত্মনা]। সুতরাং বলিতে হয়, জীবাত্মা স্বয়ংই গমনাগমন করেন। কিন্তু গমনাগমন সর্ব্বব্যাপকের পক্ষে অসম্ভব, কল্পনারও অযোগ্য। সুতরাং জীবাত্মা অণু-পরিমাণ (অতি ক্ষুদ্র)।

গুরু। কিন্তু শ্রুতি ত আত্মার অণু-পরিমাণের কথা বলেন নাই, বরং তদ্বিপরীত অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের কথাই বলিয়াছেন। যেমন "সেই এই আত্মা মহান্, অজ (জন্মরহিত), যিনি ইন্দ্রিয়াদিতে বিজ্ঞানময়" (বৃঃ ৪. ৪. ২২); "তিনি আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম" (তৈঃ ২. ১. ১)। সুতরাং আত্মা

ন অণুঃ, অতৎ-শ্রুতেঃ ইতি চেৎ ?—

অণু পরিমাণ নয় [নাণুঃ]; যে হেতু, শ্রুতিতে সেরূপ উক্তি নাই [অতচ্ছ্রুতেঃ]—এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

শিষ্য। ন, ইতরাধিকারাৎ ॥ ২১ ॥

না, সেরূপ বলিতে পারেন না [ন], কারণ ঐ শ্রুতির বিষয় জীবাত্মা নয়, অন্য, কে-না পরমাত্মাই উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু [ইতরাধিকারাৎ]। ঐ শ্রুতিতে যাঁহাকে মহান্ বলা হইয়াছে, তিনি জীব নন, ব্রহ্ম।

গুরু। কিন্তু "যিনি ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে বিজ্ঞানময়"—এই কথায় ত জীবকেই বুঝায়।

শিষ্য। না, উহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্ত জীব মনে করেন যে তিনি মহান্। যেমন, বামদেব ঋষি পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলিয়াছিলেন, "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য" ইত্যাদি। ফলতঃ

স্বশব্দ-উন্মানাভ্যাং চ ॥ ২২ ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতি বাক্য [স্বশব্দ] ও 'উন্মান' হইতেও জানা যায় যে, জীবাত্মা অণু। শ্রুতি বলেন, "যাহাতে প্রাণবায়ু পাঁচ প্রকারে (প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান, ব্যান) অবস্থিত আছে, সেই এই অণু আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য" (মুঃ ৩. ১. ৯)। এস্থলে শ্রুতি স্পষ্টভাবেই জীবের অণু পরিমাণ নির্দ্দেশ করিলেন। আবার শ্রুতি বলেন, "একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার শতভাগের একভাগ যতটুকু, জীবও ততটুকু" (শ্বেঃ ৫. ৮)। এস্থলে শতভাগ হইতেও শততম ভাগের উদ্ধার করিয়া যে মান (অর্থাৎ পরিমাণ, মাপ) পাওয়া যাইতেছে, তাহাই 'উন্মান'। এই উন্মান বলেও জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হয়।

গুরু। আচ্ছা, তোমার মতে ত জীব অণু। তাহা হইলে সে অবশ্য শরীরের কোন এক কোণে পড়িয়া আছে। মনে কর, তুমি শীতের দিনে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইলে। তুমি যদি অণুই হও, তবে তোমার সর্ব্বশরীরে শৈত্য অনুভব হয় কিরূপে ?

শিষ্য। কেন,

অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥ ২৩ ॥

যেরূপ এক ফোটা চন্দন শরীরের একস্থানে স্থাপিত হইলেও

সর্ব্বশরীরে একটা আনন্দ জন্মে, সেইরূপ আত্মা শরীরের একস্থানে থাকিলেও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। সুতরাং আর কোন বিরোধ থাকে না।

গুরু। কিন্তু তোমার চন্দনের দৃষ্টান্ত ত ঠিক হইল না।

অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ?—

কেন না, চন্দনবিন্দু একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং সেই ক্ষুদ্রস্থানে থাকিয়াও সমস্ত দেহে একটা সুখের সঞ্চার করে, ইহাও প্রত্যক্ষ। কিন্তু আত্মার সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া একটা অনুভূতি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইলেও আত্মা যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, ইহা কিরূপে জানা যায়? প্রত্যক্ষ ত হয় না। অনুমান করিতে হইলেও বলিতে হইবে যে, যেমন সর্ব্বশরীরে সুখ সঞ্চার করিয়াও একবিন্দু চন্দন এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানেই থাকে, সেইরূপ আত্মাও সর্ব্বশরীরে সুখ দুঃখ অনুভব করে বলিয়া সেও এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানেই অবস্থান করে। কিন্তু এরূপ অনুমান ঠিক নয়। কারণ, আমি এরূপ বলিতে পারি যে, আত্মার যে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অনুভূতি হয়, তাহা (১) ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত আছে বলিয়া, অথবা (২) আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, কিম্বা (৩) [তুমি যেমন বলিলে] আত্মা চন্দনবিন্দুর ন্যায় শরীরের একস্থানে অবস্থান করে বলিয়া। এই তিন কারণেই আত্মার সর্ব্বশরীরে অনুভূতি হইতে পারে। কোন্ কারণে হয়, তাহা নির্ণীত না থাকায় চন্দনের দৃষ্টান্ত একান্ত ভাবে গ্রহণ করা যায় না।

শিষ্য। ন, অভ্যুপগমাৎ, হৃদি হি ॥ ২৪ ॥

না, চন্দনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই [ন]; কারণ,

শ্রুতিই আত্মার শরীরের এক স্থানে অবস্থানের কথা স্বীকার করিয়াছেন [অভ্যুপগমাৎ]। সুতরাং উক্ত তিন কারণের সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রুতি প্রমাণ বলে চন্দনের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে হইবে। আর, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেছে হৃদয়ে [হৃদি]; যেহেতু, শ্রুতি বলেন, "হৃদয়েই এই আত্মা" (ছাঃ ৮. ৩. ৩)—ইত্যাদি।

আত্মা অণু ও একস্থানে অবস্থান করিলেও তাহার সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অনুভূতি কিরূপে হয়, তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে :—

গুণাৎ বা আলোকবৎ ॥ ২৫ ॥

একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ গৃহের এক কোণে অবস্থান করিয়া গৃহস্থিত সমস্ত বস্তু আলোকিত করে। প্রদীপের প্রকাশগুণের প্রভাবেই ওরূপ হয়। আত্মারও চৈতন্যরূপ 'গুণ' আছে; সেই গুণপ্রভাবে [গুণাৎ] প্রদীপের ন্যায় [আলোকবৎ] সর্ব্বশরীরে আত্মার অনুভূতি হইতে পারে।

গুরু। কিন্তু গুণ কি গুণীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে পারে? বস্ত্রের শুক্ল-গুণ কি বস্ত্রত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও থাকে? দীপের প্রভা কিন্তু 'গুণ' নয়; ঘনীভূত তেজই দীপ, আর তরল তেজই প্রভা। সুতরাং প্রভাও 'দ্রব্য', 'গুণ' নয়।

শিষ্য। কিন্তু গুণ যে গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না, এমন ত নয়। ইহার

ব্যতিরেকঃ গন্ধবৎ ॥২৬॥

ব্যতিক্রমও [ব্যতিরেকঃ] ত দেখা যায়; যেমন ফুলের গন্ধ [গন্ধবৎ]

ফুল ছাড়িয়া দূরেও প্রসারিত হয়। সুতরাং গুণ যে আপন আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতেই পারে না, এমন নয়।

গুরু। কিন্তু আমি যদি বলি যে, গন্ধপরমাণু আপন আশ্রয় হইতে বিযুক্ত হইয়া দূরে যায় ?

শিষ্য। যদি গন্ধযুক্ত পরমাণু মূলদ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে ব্যাপ্ত হয়, এ কথা বলেন, তবে অবশ্যই মূল দ্রব্যের ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, এ কথাও বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যায়, মূলদ্রব্যের আয়তন ও ওজন পূর্ব্বের মতই থাকে, কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

গুরু। যদি বলি, বাস্তবিক হ্রাস হয়, তবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয় না ?

শিষ্য। না, তাহা বলাও ঠিক নয়। কারণ, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম পরমাণু নাসিকাতে সংলগ্ন হইয়া অনুভূত হয়। কিন্তু পরমাণু কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আবার, কেহই এরূপ মনে করে না যে, আমি গন্ধের আশ্রয়-দ্রব্য আঘ্রাণ করিতেছি ; বরং এইরূপই সকলে অনুভব করে যে, গন্ধই আঘ্রাণ করিতেছি। সুতরাং, আত্মা অণু এবং হৃদয়ে অবস্থান করিয়া চৈতন্যগুণের সাহায্যে সর্ব্বশরীরে অনুভূতি করে, এরূপ বলায় কোন দোষ হয় না।

তথা চ দর্শয়তি ॥২৭॥

শ্রুতিও এইরূপই [তথা] প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহার পরিমাণ অণু—এই সব বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, "লোম পর্য্যন্ত, নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত" (ছাঃ ৮.৮.১) ইত্যাদি। ইহা দ্বারা চৈতন্যবলেই আত্মার সর্ব্বশরীরব্যাপী অনুভূতি দেখান হইয়াছে ।

আবার, "প্রজ্ঞার (চৈতন্যের) দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া"— (কৌঃ ৩.৬) ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা কর্ত্তা, চৈতন্য তাহার সাধন [অনুভব করিবার উপকরণবিশেষ, instrument]। শ্রুতির এই

পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২৮॥

পৃথক্ উপদেশ হইতেও বুঝা যায় যে, আত্মা চৈতন্যগুণের দ্বারাই সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হন। সুতরাং আত্মা অণু—এইরূপই ত মনে হয়।

গুরু। না, বৎস! আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারে না। দেখ, জীবাত্মা যে উৎপন্ন হন না, এবং স্বয়ং পরমব্রহ্মই যে জীব, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। জীব যদি পরব্রহ্মই হয়, তবে ব্রহ্মের যতটা পরিমাণ জীবেরও অবশ্য ততটাই হইবে। পরব্রহ্ম বিভু [সর্ব্বব্যাপী]; অতএব জীবও বিভু, সর্ব্বব্যাপী। জীবকে বিভু না বলিলে "এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অসত্য হইয়া পড়ে।

জীব যদি অণুই হয়, তবে সর্ব্বশরীরব্যাপী অনুভব হইতে পারে না। ত্বক্ [চর্ম্ম] সংযোগে ওরূপ অনুভব হয় বলিলে পদে কণ্টকবিদ্ধ হইলে সর্ব্বশরীরেই বেদনার অনুভব হওয়া উচিত, কারণ, ত্বক্ সর্ব্বশরীর ব্যাপীয়াই আছে।

যাহা অণু, তাহা গুণের দ্বারাও ব্যাপ্ত হইতে পারে না। গুণ গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। আশ্রয় ব্যতীত গুণের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। প্রদীপের প্রভাও বস্তুতঃ একটা গুণ নয়, উহাও এক প্রকারের দ্রব্য। ফুলের গন্ধও অতিসূক্ষ্ম পুষ্পরেণু আশ্রয় করিয়াই স্থানান্তরে প্রসৃত হয়।

চৈতন্য সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয় বলিলে জীবের ব্যাপিত্বই স্বীকৃত হয়।

জীবের স্বরূপই হইল চৈতন্য। চৈতন্য বাদ দিলে জীবের অস্তিত্বেরই লোপ হয়। অগ্নির স্বরূপ উষ্ণতা ও প্রকাশ বাদ দিলে অগ্নি বলিয়া কিছু থাকে না। সুতরাং চৈতন্য ব্যাপী বলিয়া জীবও নিশ্চয় ব্যাপী।

তবে শ্রুতিতে যে স্থানে স্থানে জীবকে অণু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বুদ্ধির [অন্তঃকরণের] গুণ বা ধর্ম্ম। এই সকল গুণ আত্মাতে অধ্যস্ত হইলে তাহাকে সংসারী জীব বলা হয়। জীবের সংসারের কারণই হইল এই সমস্ত বুদ্ধির গুণ। ফলে ব্যবহার দশায় বুদ্ধি আর জীব এক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

তদ্‌-গুণসারত্বাৎ তদ্‌ব্যপদেশঃ,

সেই বুদ্ধির গুণের প্রাধান্যহেতু [তদ্‌গুণসারত্বাৎ] বুদ্ধিগুণ অনুসারেই শ্রুতিতে জীবেরও অণুত্বের নির্দ্দেশ [তদ্ব্যপদেশঃ] করা হইয়াছে। বুদ্ধির সহিত মিলিত না হইলে জীবের আর জীবত্ব থাকে না, সে কেবল পরমাত্মাই হয়। সুতরাং জীবাত্মা পরমার্থতঃ বিভুই বটে, তবে ব্যবহারিক দশায় অর্থাৎ বুদ্ধির সাহচর্য্যে তাহাকে অণুও বলা যাইতে পারে। উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ইত্যাদি সমস্তই বুদ্ধির। বস্তুতঃ আত্মার কোন ক্রিয়া নাই। দেখ, শ্রুতি জীবকে শত শত ভাগে বিভক্ত কেশাগ্রের সহিত সমান পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলিলেন, "সেই জীব অনন্ত, অসীম।" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, জীবাত্মার অণুপরিমাণ পারমার্থিক নয়, অনন্তত্বই পারমার্থিক, অণুত্ব গৌণভাবে বলা যায় মাত্র। জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রতিপাদন করাই সমুদায় শ্রুতির অভিপ্রায়। সুতরাং জীবকে মুখ্য ভাবে অণুপরিমাণ কিছুতেই বলা যায় না। আত্মা হৃদয়ে থাকেন, এরূপ উক্তিও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে।

প্রাজ্ঞবৎ ॥২৯॥

প্রাজ্ঞ পরমাত্মা যেমন বিভু হইলেও তাঁহাকে "অণু হইতে অণু", "ধান্য অপেক্ষা, যব অপেক্ষা ক্ষুদ্র" (ছা: ৩.১৪.৩) ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, জীবের অণুত্বও সেইরূপ তাহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব দেখাইবার জন্যই।

শিষ্য। আচ্ছা, বুদ্ধির যোগেই যদি আত্মার সংসারিত্ব হয়, তবে ঐ বুদ্ধির সংযোগ অপগত হইলে তখন আত্মার আর কোন অবলম্বন না থাকায় আত্মার অস্তিত্বই লোপ হইবে, কিম্বা তাহার সংসারিত্বের অবসান হইবে। [বুদ্ধির সংযোগ একদিন না একদিন বিনষ্ট হইবেই, কারণ সংযোগ হইলে বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী]।

গুরু। **যাবৎ-আত্মভাবিত্বাৎ চ ন দোষঃ তদ্দর্শনাৎ ॥৩০॥**

না, ওরূপ কোন দোষ হয় না [ন দোষঃ]। বুদ্ধির সংযোগ বিযুক্ত হইলে আত্মার অস্তিত্বের লোপ কেন হইবে? বরং তখনই আত্মার সত্যিকারের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে এবং তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। বুদ্ধিরূপ উপাধিই ত আত্মাকে অনাত্মারূপে প্রতিভাত করে; তখনই বরং আত্মার যথার্থ অস্তিত্ব অভিভূত থাকে। আর বুদ্ধিরূপ উপাধির বিয়োগে যে আত্মার সংসারিত্বের অবসান হয়, তাহা ঠিক। কিন্তু তাহাতেও কোন দোষ হয় না; কারণ, অজ্ঞানের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই বুদ্ধি সংযোগের অবসান অসম্ভব; ফলে এই বুদ্ধিসংযোগ যতকাল সংসারিত্ব থাকে, ততকালই অক্ষুন্ন থাকে [যাবদাত্মভাবিত্বাৎ]। আত্মা যতকাল বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকে, ততকালই তাহার জীবত্ব ও সংসারিত্ব। আর আত্মা যে বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হইলেই সংসারী হন, তাহা শ্রুতিই দেখাইয়াছেন [তদ্দর্শনাৎ]। শ্রুতি বলেন, "এই যে পুরুষ,

যিনি প্রাণে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতি, তিনি বুদ্ধির সহিত এক হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করেন; ইনি **যেন** ধ্যান করেন, **যেন** ক্রীড়া করেন" (বৃঃ ৪. ৩. ৭)। এস্থলে বিজ্ঞানময় (অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত এক ভাবাপন্ন) আত্মাই গমনাগমন করেন বলা হইল ; এই সব ক্রিয়াও তিনি বাস্তবিক করেন না, তবে 'যেন' করেন, এইরূপ মনে হয় মাত্র—এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিলেন, **যেন** ধ্যান করেন, **যেন** ক্রীড়া করেন ইত্যাদি। তারপর মনে রাখিও, এই যে বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্পর্ক, ইহাও যথার্থ নয়, কেবল অজ্ঞানকৃত। সেই অজ্ঞানের যতদিন নাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধি সম্বন্ধেরও অবসান হয় না।

শিষ্য। কিন্তু স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় (সুষুপ্তিতে) এবং প্রলয় কালে অবশ্য আত্মার সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ থাকে না, কারণ, শ্রুতিই বলেন যে, জীব তখন ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। তাহা হইলে যতকাল সংসারিত্ব, ততকাল বুদ্ধি-সম্বন্ধ—এ সিদ্ধান্ত ত থাকে না।

গুরু। না, সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে যে বুদ্ধিসম্বন্ধ থাকে না, এরূপ বলা যায় না। অবশ্য তখন ঐ সম্বন্ধ প্রকট হয় না—এই মাত্র। নিদ্রাভঙ্গে ও প্রলয়ের অবসানে যখন সৃষ্টি হয়, তখন

পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য সতঃ অভিব্যক্তিযোগাৎ ॥৩১॥

শুক্র প্রভৃতির ন্যায় [পুংস্ত্বাদিবৎ] সেই বিদ্যমান [তস্য সতঃ] বুদ্ধি-সম্বন্ধেরই অভিব্যক্তি হয় বলিয়া [অভিব্যক্তিযোগাৎ] বুদ্ধিসম্বন্ধ যতকাল সংসারিত্ব, ততকালই থাকে। সুষুপ্তিতেই যদি বুদ্ধি-সম্বন্ধ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, তবে ত জীব সেই মুহূর্তেই মুক্ত হইত। বাল্যাবস্থায় পুংচিহ্ন শুক্র, শ্মশ্রু (দাঁড়ী) ইত্যাদি বাহিরে প্রকট না

থাকিলেও অবশ্য বীজরূপে থাকে। না হইলে নপুংসকের ঐ সব কোন কালেই হয় না কেন ? যৌবনে ঐ সব পুরুষত্ব অভিব্যক্ত হয়। বুদ্ধির সম্বন্ধও সেইরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে শক্তিরূপে বর্ত্তমানই থাকে, জাগ্রতে ও সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। নিদ্রাভঙ্গে একেবারে একটা নূতন জীবন কাহারও আরম্ভ হয় না ; সৃষ্টিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপই হয়। (ব্রঃ সূঃ ৩. ২. ৯ দ্রষ্টব্য)।

অন্তঃকরণ [বা বুদ্ধি] হইল আত্মার উপাধি। এই অন্তঃকরণে যখন 'এটা, কি ওটা' এইরূপ সংশয় জন্মে, তখন তাহাকে বলা হয় **মন** ; যখন 'এইটাই'—এরূপ নিশ্চয় হয়, তখন তাহাকে বলা হয় **বুদ্ধি** ; যখন 'আমি আমি'—এইরূপ ভাব [বৃত্তি] জন্মে, তখন তাহার নাম হয় **গর্ব্ব বা অহঙ্কার** ; আর স্মরণ হইলে তাহাকে বলা হয় **চিত্ত**। এই অন্তঃকরণের সম্বন্ধবশেই আত্মার যত কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান হয়। এই অন্তঃকরণ স্বীকার না করিলে

নিত্য-উপলব্ধি-অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ—

সর্ব্বকালেই, হয় উপলব্ধি, না হয় অনুপলব্ধি—এই দুইটীর একটি মাত্র হইতে পারে। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সর্ব্বদাই আছে। সুতরাং বিষয়ের উপলব্ধি সততই হওয়া উচিত। আর ইহাদের থাকা সত্ত্বেও যদি উপলব্ধি না হয়, তবে কোন কালেই হওয়া উচিত নয়। অথচ দেখিতেছি, আত্মা, ইন্দ্রিয়, ও বিষয় থাকা সত্ত্বেও কখনও উপলব্ধি হয়, কখনও হয় না। কাজেই মন বা অন্তঃকরণ নামক আর একটী পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই মনের ক্রিয়াতেই উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি।

শিষ্য। এই অন্তঃকরণ না মানিয়া যদি বলা হয় যে, আত্মা ও

ইন্দ্রিয় থাকিলেই বিষয়ানুভব হইতে পারে; তবে যে সময়ে অনুভব হয় না, তাহার কারণ—আত্মা কিম্বা ইন্দ্রিয়ের অনুভব করিবার শক্তি সময়ে তিরোহিত হয়।

গুরু। আচ্ছা,

অন্যতর-নিয়মঃ বা অন্যথা ॥৩২॥

অন্তঃকরণ না মানিলে [অন্যথা] তোমাকে বলিতে হইবে যে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়—এই দুইটীর একটির শক্তি রুদ্ধ হয় [অন্যতর-নিয়মঃ]। কিন্তু আত্মার শক্তিস্তম্ভ ত হইতে পারে না। অনুভব করিবার শক্তি মানে অনুভব করিবার ইচ্ছা। তাহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ, আত্মা স্বয়ং সর্ব্বকালে নির্ব্বিকার, সে সর্ব্বদা একইরূপে অবস্থান করে। আমি অনুভব করিব, বা করিব না, এরূপ প্রবৃত্তি [ইচ্ছা] আত্মার কখনও হয়, কখনও হয় না—এরূপ বলিলে আত্মা বিকৃত পদার্থ হইয়া পড়েন। ইন্দ্রিয়ের শক্তিস্তম্ভও অসম্ভব। পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহার শক্তি রুদ্ধ ছিল, পরমুহূর্ত্তে সহসা তাহার শক্তি ক্রিয়াশীল হইল, ইহার অবশ্য একটা কারণ আছে। সুতরাং মানিতেই হইবে যে যাহার অবধান [attention] বা অনবধান জন্য উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি হয়—এমন একটা কিছু আছে। ইহাকেই মন বা অন্তঃকরণ বলা হয়। শ্রুতিও বলেন, "মন অন্যত্র ছিল, তাই দেখি নাই; অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই শুনি নাই" (বৃঃ ১. ৫. ৩)। "মনের দ্বারাই দেখে, মনের দ্বারাই শুনে" (বৃঃ ১. ৫. ৩)। কাম প্রভৃতিও এই মনেরই ধর্ম্ম, ইহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন, "কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় ইত্যাদি সকলই মন" [বৃঃ ১. ৫. ৩]। সুতরাং অন্তঃকরণের (ইহাকেই পূর্ব্বে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে) প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মাকে অণুপরিমাণ বলা হইয়াছে, স্ব-স্বরূপে আত্মা বিভু—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

এই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ-সংশ্লিষ্ট জীবাত্মা যেমন অণু, সেইরূপ সে

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥৩৩॥

কর্ত্তাও বটে [কর্ত্তা]; যেহেতু জীব কর্ত্তা হইলেই বিধি-নিষেধরূপ শাস্ত্র সার্থক হয় [শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ)। জীব কর্ত্তা, সে-ই করে বা করিতে পারে, এরূপ হইলেই 'অমুক অমুক কাজ করিবে', 'অমুক করিবে না'— ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা রক্ষা হয়, অন্যথা নিরর্থক হইয়া পড়ে। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াই শাস্ত্র ওরূপ আদেশ প্রদান করেন। শাস্ত্র যদি জীবকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিতেন, তবে ওরূপ বৃথা আদেশ দিতেন না।

তারপর আবার শ্রুতি বলেন, "সেই অমৃত আত্মা যথেচ্ছ **বিহার করেন**" (বৃঃ ৪. ৩. ১২)। "তিনি নিজ শরীরে যথেচ্ছ বিচরণ করেন" (বৃঃ ২.১.১৮।) ইত্যাদি। এই সব

বিহার-উপদেশাৎ ॥৩৪॥

বিহার বা বিচরণের উপদেশ হইতেও বুঝা যায়, আত্মা কর্ত্তা। আত্মা কর্ত্তা না হইলে সে বিহার করে কিরূপে?

আবার, "জীব অন্তঃকরণ প্রভাবে জ্ঞানশক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে **গ্রহণ করিয়া**—" (বৃঃ ২. ১. ১৭-১৮) ইত্যাদি শ্রুতিতে

উপাদানাৎ ॥৩৫॥

ইন্দ্রিয়াদির গ্রহণরূপ কার্য্যের উল্লেখ থাকায়ও বুঝা যায়, শ্রুতি জীবকে কর্ত্তা বলিয়াই স্বীকার করেন।

জীব যে কর্ত্তা, তাহা

ব্যপদেশাৎ চ ক্রিয়ায়াম্, ন চেৎ নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥৩৬॥

লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় [ক্রিয়ায়াম্] শ্রুতি জীবেরই কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন বলিয়াও [ব্যপদেশাচ্চ] জানা যায়। যথা, "বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে, বিজ্ঞানই লৌকিক কর্ম্ম করে" [বৃঃ ২.৫.১]। এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান শব্দে জীবকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কেবল বুদ্ধিকে নয় ; তাহা না হইলে [ন চেৎ] শ্রুতি 'বিজ্ঞানম্' [বিজ্ঞান-রূপ কর্ত্তা] না বলিয়া 'বিজ্ঞানেন' [বিজ্ঞানরূপ করণ দ্বারা, বিজ্ঞান দ্বারা]—এইরূপ নির্দ্দেশই করিতেন [নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ]। যে স্থলে বুদ্ধি অর্থে বিজ্ঞানশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে স্থলে দেখিতে পাই, 'বিজ্ঞানেন' এই তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার আছে। এস্থলে প্রথমা-বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট থাকায় বিজ্ঞানকে জীবই বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং জীবেরই কর্ত্তৃত্ব, শুধু বুদ্ধির নহে।

শিষ্য। যদি জীবই কর্ত্তা হয়, এবং তাহার কর্ত্তৃত্ব যদি বুদ্ধি কিম্বা অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, অর্থাৎ জীব যদি স্বাধীন কর্ত্তা হয়, তবে সে কেন কেবল নিজের কল্যাণকর কার্য্যই করে না? স্বাধীনতা যাহার আছে, সে কেন নিজের অমঙ্গল নিজে করিবে? অথচ দেখিতে পাই, জীব প্রবৃত্তির বশে বা বুদ্ধির দোষে এমন সব কাজ করিয়া ফেলে, যাহার বিষময় ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়।

গুরু। জীব স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইলেই যে তাহাকে কেবল হিতকর কার্য্যই করিতে হইবে, এমন কোন

উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ ॥৩৭॥

নিয়ম নাই [অনিয়মঃ], এ ঠিক উপলব্ধির ন্যায় [উপলব্ধিবৎ]।

অনুভব [উপলব্ধি] করা-না-করা সম্বন্ধে জীবের স্বাধীনতা থাকিলেও যেমন সে ভালমন্দ উভয় প্রকারের উপলব্ধিই করে, সেইরূপ কর্ম্ম-করা সম্বন্ধেও জীবের স্বাধীনতা থাকিলেও সে ইষ্ট অনিষ্ট উভয়ই সম্পাদন করিতে পারে ও করে। কি উপলব্ধি, কি কর্ম্ম সর্ব্বত্রই জীবের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এই নয় যে, সে অন্য কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া উপলব্ধি বা কর্ম্ম করিতে পারে। সেরূপ হইলে বিষয়, যোগ্যস্থান ও যোগ্যকাল ইত্যাদি না হইলেও জীবের অনুভূতি বা কর্ম্ম হইতে পারিত। অবশ্য উহাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে জীবের স্বাধীনতা এইখানে যে, সে-ই উহাদিগকে চালিত করে, উহারা তাহাকে চালিত করেনা। বিষয়াদি সমস্ত বর্ত্তমান থাকিলেও জীব যদি ইচ্ছা করে, তবে তাহাদের উপলব্ধি বা ব্যবহার না করিতেও পারে। এইখানেই তাহার স্বাধীনতা। সহায় আবশ্যক বলিয়া কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা লোপ হয় না। এই সহকারীর ভিন্নতায়ই উপলব্ধির ও কর্ম্মের বৈচিত্র্য [বিভিন্ন রকমের উপলব্ধি, অনুপলব্ধি ও ইষ্টানিষ্ট কর্ম্ম] সম্পাদিত হয়।

যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে 'বিজ্ঞান' শব্দের বুদ্ধি অর্থই গ্রহণ করা হয়, তবে বুদ্ধিকেই কর্ত্তা বলিতে হয়। তাহা হইলে

শক্তি-বিপর্য্যয়ঃ ॥৩৮॥

বুদ্ধির করণশক্তির বিপর্য্যয় হইয়া [শক্তিবিপর্য্যয়াৎ] তাহাতে কর্ত্তৃশক্তির প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ বুদ্ধি কর্ত্তা হইলে তাহার নিজশক্তি লোপ হইয়া যাইবে ও কর্ত্তৃশক্তির উদ্ভব হইবে। বুদ্ধি যদি কর্ত্তৃশক্তি সম্পন্ন হয়, তবে বুদ্ধিকেই অহংজ্ঞানেরও আশ্রয় বলিতে হয়; কারণ, সমস্ত কার্য্যই 'আমি করিতেছি' এইরূপ অহংজ্ঞানপূর্ব্বক হয়। কিন্তু

বুদ্ধি যে অহংজ্ঞানের আশ্রয় নয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। সকলেই অনুভব করে যে, 'আমারই বুদ্ধি, আমিই বুদ্ধি নই'। সুতরাং বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলা যায় না।

তারপর, জীবকে কর্ত্তা না বলিলে শ্রুতিতে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা-সমাধি অবলম্বন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত

সমাধি-অভাবাৎ ॥৩৯ ॥

সমাধির আনর্থক্যই হয়। আত্মার যদি কর্ত্তৃত্বই না থাকে, তবে আর কে ধ্যানধারণা করিবে? সুতরাং আত্মারই কর্ত্তৃত্ব, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। আপনি যেরূপ বলিলেন তাহাতে মনে হয়, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক, অর্থাৎ আত্মা নিজ স্বভাবের বশেই কর্ম্ম করে, আত্মার কর্ত্তৃত্বের অন্য কোন নিমিত্ত নাই।

গুরু। না, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নয়। কর্ত্তৃত্বই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সেই কর্ত্তৃত্ব হইতে কোন কালেই তাহার নির্ম্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা ও প্রকাশ; সেই স্বভাবের অভাব হইলে অগ্নিরই বিলোপ হয়। সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সেই কর্ত্তৃত্বের লোপে আত্মারই লোপ হয়। কর্ত্তৃত্বই বস্তুতঃ যত দুঃখের মূল। সেই কর্ত্তৃত্বের কবল হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে আত্মার মোক্ষলাভ অসম্ভব। অথচ সেই কর্ত্তৃত্ব যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে কোনকালেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই, ফলে মুক্তিলাভও অসম্ভব হয়।

শিষ্য। কিন্তু যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকিলেও কাষ্ঠাদির

অভাবে সেই শক্তির কার্য্য হয় না, সেইরূপ মুক্তির অবস্থাতেও আত্মার কর্তৃত্বশক্তি থাকিলেও যদি সেই শক্তির কার্য্য না হয়, তবে দুঃখও হইতে পারে না, ফলে মুক্তিলাভও হইতে পারে। অর্থাৎ মুক্তি-অবস্থায় আত্মা কর্তৃত্ব-স্বভাব হইলেও সে যদি স্থিরসঙ্কল্প করিয়া বসিয়া থাকে যে, না, আমি আর কর্ম্ম করিব না, তবেই ত তাহার মুক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

গুরু। না, বৎস, সেরূপ হইতে পারে না। শক্তি আছে, একথা বলিলে যাহাতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে এমন একটা কিছুও অবশ্যই কোন-না-কোন আকারে আছে—একথাও বলিতে হয়; না হইলে শক্তি থাকার কোন অর্থই হয় না। দাহ্য পদার্থের সহিত দাহিকাশক্তির অবশ্যই একটা সম্বন্ধ আছে, কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাকে দাহিকাশক্তিই বলা যায় না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, একথার তাৎপর্য্যই এই যে, দাহ্য-পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে ঐ শক্তি ক্রিয়াশীল হইতে পারে। এইরূপ শক্তির ক্রিয়া যদি কোনকালেই না হয়, তবে অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকার কোন অর্থই হয় না। দাহিকাশক্তি থাকার তাৎপর্য্যই এই যে, সে আবশ্যক হইলে এবং যোগ্য অবসর পাইলে কার্য্যকরী হইতে পারে। সেইরূপ মুক্তিদশায় আত্মার কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে কার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে; ফলে তাদৃশ মুক্তি চিরস্থায়ী নয়। মুক্তি যদি চিরস্থায়ী বা নিত্য না হয়, তবে সে মুক্তির স্বার্থকতা কি? মুক্তিদশায় আত্মার কর্তৃত্ব থাকিবে, তবে তাহা কোন কালেই আর কার্য্যকরী হইবে না, এরূপ বলিলে ত কর্তৃত্ব আত্মার স্বভাব নয়, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তারপর, যাহার যাহা স্বভাব, তাহা রুদ্ধ হওয়া মানে তাহারই বিনাশ।

সুতরাং কর্ত্তৃত্ব আত্মার স্বভাব হইলে আত্মা মুক্তি দশায়ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। শ্রুতি বলেন, "আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব।" ঈদৃশ আত্মাকে জানিলেই মুক্তি অর্থাৎ জীব যখন আপনাকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তরূপে অনুভব করে তখনই তাহার মুক্তি। ঈদৃশ আত্মার কর্তৃত্বও স্বভাব বা স্বরূপ হইতে পারে না। তবে আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা উপাধি বশেই আত্মাতে কল্পিত মাত্র। শ্রুতিও বলেন, "আত্মা যেন ধ্যান করেন, যেন বিচরণ করেন" (বৃঃ ৪.৩.৭)। "আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের যোগেই আত্মাকে ভোক্তা বলা হয়" (কঃ ৩.৪)। এই সমস্ত শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বভাবগত নয়, উপাধি নিমিত্ত।

বাস্তবিক যাঁহার আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতীত পৃথক্ কোন কর্ত্তা ভোক্তা জীব নাই। তা' বলিয়া পরমাত্মাই যে কর্ত্তা ভোক্তা, তাহাও নয়। কারণ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব অবিদ্যার প্রভাবেই কল্পিত হয়। শ্রুতি অবিদ্যা-দশায় কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়া ["যে অবস্থায় দ্বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায় একে অন্যকে দেখে…" (বৃঃ ২.৪.১৪)] জ্ঞান-দশায় আবার সেই কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করিয়াছেন—"যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, অর্থাৎ যখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকেনা, তখন কে, কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ?" (বৃঃ ২.৪.১৪)। সুতরাং আত্মা অবিদ্যার প্রভাবেই কর্ত্তা সাজিয়া নানা দুঃখ ভোগ করে, আবার সেই প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে সে আপনার স্বরূপে অবস্থান করিয়া শান্তি লাভ করে।

যথা চ তক্ষা উভয়থা ॥ ৪০ ॥

যেমন একজন সূত্রধার [তক্ষা] হাতুড়ি, বাটালি ইত্যাদি গ্রহণ

করিয়া যখন কার্য্য করে, তখন তাহার কার্য্য দৃষ্টে তাহাকে কর্ত্তা বলা যায়; আবার যখন কার্য্য করে না, তখন আর সে কর্ত্তা নয়। কিন্তু যখন সে কার্য্য করে, তখনও বস্তুতঃ সে স্বীয় শরীরে অকর্ত্তাই বটে। তাহার কর্ত্তৃত্ব হাতুড়ি ইত্যাদি উপকরণ সাপেক্ষ; সেই সব উপকরণ ব্যতীত কাঠ কাটা ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। সূত্রধার যেমন উপকরণ সাপেক্ষ হইয়া কর্ত্তা হয়, আবার স্বশরীরে অকর্ত্তাই থাকে, এই উভয় প্রকারেই [উভয়থা] যেমন সে বর্ত্তমান থাকে, আত্মাও সেইরূপ মন প্রভৃতি উপকরণসাপেক্ষ হইয়া কর্ত্তা হয়, আর স্ব-স্বরূপে (মন প্রভৃতি উপকরণনিরপেক্ষ হইয়া) অকর্ত্তাই থাকেন। সুতরাং আত্মার কর্ত্তৃত্ব ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়। এই ব্যবহারিক কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াই সমুদায় বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, তাহা প্রথমেই বুঝাইয়াছি। স্বপ্নাদি অবস্থায়ও মন থাকে, তখনকার ক্রিয়া কলাপও কেবল আত্মার নয়, সুতরাং দেখা গেল, মন প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব, স্ব-স্বরূপে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে মন প্রভৃতি উপাধি নিবন্ধন আত্মার কর্ত্তৃত্ব, এই কর্ত্তৃত্ব ব্যাপারে আত্মা স্বাধীন, না সেই কর্ত্তৃত্ব পরিচালনাও তাহাকে পরমেশ্বরের অধীন হইয়া করিতে হয়?

গুরু। আত্মার এই যে কর্ত্তৃত্ব, ইহাও

পরাৎ তু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

কিন্তু [তু] পরমেশ্বর হইতেই [পরাৎ] লব্ধ; যেহেতু, শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তচ্ছ্রুতেঃ]। "ঈশ্বরই যাহাকে উর্দ্ধ লোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শুভ কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অশুভ কর্ম্ম করান" (কৌঃ ৩.৮)।

"যিনি আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া আত্মাকে নিয়মিত (চালিত) করেন" ইত্যাদি।

যদিও জীব রাগ (সুখ লাভের ইচ্ছা), দ্বেষ (দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা) প্রভৃতির প্রেরণায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যদিও কার্য্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ তাহার সহজ লভ্য, যদিও সাধারণতঃ কার্য্য করিতে ঈশ্বরের কোন অপেক্ষাই দেখা যায় না, তথাপি সর্ব্বকার্য্যের, সর্ব্ব-প্রবৃত্তির মূলে ঈশ্বরের নিমিত্ততা আছে, ইহা শ্রুতি প্রমাণে নিশ্চিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, ঈশ্বরই যদি করান, আর জীব যদি তিনি যেমন করান তেমনই করে, তবে বলিতে হয়, ঈশ্বরই জীবকে দুঃখকর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহা হইলে এরূপ ঈশ্বর যে নিতান্ত নিষ্ঠুর, ইহা বলাই বাহুল্য। আবার তাঁহার পক্ষপাতিত্বও যথেষ্ট হয়, কারণ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই কেহ সৎকর্ম্ম করিয়া উত্তম হয়, অপরে অসৎ কর্ম্ম করিয়া অধম হয়। সুতরাং ঈশ্বর করান, জীব তাঁহার ইঙ্গিতে করে—এরূপ বলিলে ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা ও বৈষম্যকারিত্ব দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

গুরু। কেন, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারেই ঈশ্বর তাহাদিগকে নিয়মিত করেন। সুতরাং ঈশ্বরকে জীবের স্বীয় কর্ম্মের অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া উক্ত দোষ হয় না। যে জীবের যেরূপ প্রসত্ত অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার, ঈশ্বর তাহাকে ঠিক তদনুরূপ কার্য্যেই নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম (কর্ম্ম-সংস্কার) পৃথক্ পৃথক। সেইজন্য এক ঈশ্বর সকলের প্রেরক ও চালক হইলেও ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের পার্থক্যের জন্যই কর্ম্ম ফলেরও পার্থক্য হয়। বৃষ্টি—ধান্য, গোধূম, যব ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় শস্যের একমাত্র

অসাধারণ ও অবর্জ্জনীয় কারণ হইলেও ঐ সব শস্যের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য উহাদের নিজ নিজ জাতির বিশিষ্টতা। সেইরূপ ঈশ্বরও সর্ব্ব জীবের সাধারণ নিয়ন্তা। অবশ্য তিনি জীবের নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে চালিত করেন। সুতরাং ঈশ্বর জীবের

কৃত-প্রযত্নাপেক্ষঃ তু—

স্বকৃত প্রযত্নের [কর্ম্ম সংস্কারের] অপেক্ষা রাখেন বলিয়া উক্ত দোষ হয় না।

শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্নের অপেক্ষা রাখিয়া তাহাদিগকে চালিত করেন, এরূপ বলিবার কি প্রয়োজন? জীব স্বয়ংই করে, এইরূপ বলিলেই ত সহজ হয়, আবার ঈশ্বরকে টানিয়া আনা কেন?

গুরু। বৎস! একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, জীব যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন, সে যত শৃঙ্খলা ও সতর্কতার সহিতই কার্য্য সম্পাদন করুক না কেন, সেই কার্য্যের সফলতায় তাহার কোনই হাত নাই। কোন্ এক অলক্ষিত দুর্ণিবার মহাশক্তি যেন অন্তরাল হইতে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জীবের সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাহার মহাশক্তি যেন জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই মহা সত্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। শ্রুতিও এই সত্যেরই মহিমা ঘোষণা করিয়া বলেন, "ইনিই করান।" সুতরাং ঈশ্বরই যে জীবকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যদি জীবের স্বকৃত কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপই করান, তবে তিনি স্বেচ্ছাচারী হন, তাঁহার নির্দ্দয়ত্ব ও বিষমকারিত্বও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তারপর, সেই নিয়ন্তা যদি স্বেচ্ছাচারী হন, তবে জীবের

অবস্থা ত নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে। সে ত বুঝিবে,—'আমি চেষ্টা করিয়া আর কি করিব! ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, তিনি ত সেইরূপই করিবেন। আমার সৎ কি অসৎ কোন কর্ম্মই ত ঈশ্বরের ইচ্ছার গতি ফিরাইতে পারিবে না।' ফলে তাহার কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হইবে না। তারপর, শাস্ত্রে যে সৎকর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ও অসৎকর্ম্ম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, উহাও নিরর্থক বলিতে হইবে। কারণ জীব করিয়াই বা কি করিবে? ঈশ্বর ত তাহার ভালমন্দের বিচার করিবেন না। সুতরাং ঈশ্বর যদি জীবকৃত কর্ম্মানুরূপ তাহাকে চালিত না করিয়া নিজের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপই করেন, তবে কি শাস্ত্রীয়, কি লৌকিক কোন কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি থাকিবে না। সুতরাং

বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪২ ॥

যাহাতে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক না হয়, এবং জীবেরও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, সেইজন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর জীবের স্বকৃত কর্ম্মের অনুরূপই তাহাকে কার্য্যে প্রেরিত করেন ও তাহার ফল ভোগ করান। অর্থাৎ ঈশ্বর নিতান্ত নিরপেক্ষ নহেন; তিনিও জীবকৃত প্রযত্ন, দেশ, কাল ইত্যাদি বিচার করিয়াই জীবকে কার্য্যে প্রেরিত করেন।

[জীবের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি যে অনাদি, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং দেখিতেছ, জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও জীবেরও স্বাধীনতা যথেষ্ট রহিয়াছে। যেমন শিক্ষক ছাত্রকে ছাত্রের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে পাঠ করাইলেও পাঠকরা বিষয়ে ছাত্রেরও যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।]

শিষ্য। আচ্ছা, জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা উপকার্য্য-উপকারক সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বর উপকারক, জীব উপকার্য্য। এক্ষণে এই সম্বন্ধ দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ, কিম্বা (২) অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধ। তবে পরমেশ্বর যখন চালক এবং জীব যখন ঈশ্বরচালিত, তখন মনে হয়, ঈশ্বরের সহিত জীবের প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ।

গুরু। না, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নয়,

অংশঃ—

যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, জীবও সেইরূপ ঈশ্বরের অংশ। তবে ঈশ্বরের কোন অবয়ব (অংশ, Part) না থাকায় জীবকে মুখ্য অংশ বলা যায় না, তবে অংশের মত এই মাত্র।

শিষ্য। ঈশ্বর যখন নিরবয়ব, তখন সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বরই ত জীব।

গুরু। না, ঈশ্বরের বাস্তবিক কোন অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ হিসাবে জীবকে ঈশ্বরের অংশই বলিতে হইবে, জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ শ্রুতিতে ঈশ্বর ও জীবের

নানাব্যপদেশাৎ—

নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ বা পার্থক্য দেখান হইয়াছে। যেমন "তিনি জীবের অন্বেষণীয়, জিজ্ঞাস্য" (ছাঃ ৮. ৭. ১)। "ইহাকেই জানিয়া জীব মুনি হয়"। "তিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্য্যামী রূপে জীবকে নিয়মিত করেন"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদই প্রতীত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মের সহিত জীবের যদি ভেদই থাকে, অর্থাৎ জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অন্য একজন হয়, তবে ত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই অংশ-অংশী সম্বন্ধ হইতে অধিকতর যোগ্য হয়।

গুরু। হ্যাঁ, এই হিসাবে প্রভু-ভৃত্য ভাবই সঙ্গত বটে, কিন্তু শ্রুতি আবার

অন্যথা চ অপি—

অন্য প্রকারেও দেখাইয়াছেন যে, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। যেমন

দাশ-কিতবাদিত্বম্ অধীয়তে একে ॥৪৩॥

কোন কোন শ্রুতির শাখা [একে] ব্রহ্মই দাশ (কৈবর্ত্ত), কিতব (ধূর্ত্ত) প্রভৃতিরূপেও অবস্থান করেন, এরূপ পাঠ করেন [অধীয়তে]। যেমন, "দাশেরা ব্রহ্ম, দাসেরা ব্রহ্ম, কিতবেরাও ব্রহ্ম"। এই শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, হীন জাতিরা পর্য্যন্ত ব্রহ্ম। আবার অন্যত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ হইয়া যষ্টি গ্রহণ করিয়া গমন কর, তুমিই সর্ব্বপ্রকারে জাত" (শ্বেঃ ৪. ৩)। আবার "ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন দ্রষ্টা নাই" (বৃঃ ৩. ৭. ২৩)। এইরূপ বহু শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। আবার অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গ যেমন উষ্ণতাহিসাবে অভিন্ন, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্ম চৈতন্যহিসাবে অভিন্ন। সুতরাং ভেদ ও অভেদ উভয়ই যখন শ্রুতি দেখাইয়াছেন, তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্তে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই নিশ্চয় করিতে হয়, ভৃত্য বলিয়া নয়।

মন্ত্রবর্ণাৎ চ ॥৪৪॥

আবার [চ] বৈদিক মন্ত্রের অক্ষরার্থ হইতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়—যেমন, "সর্ব্বভূতই ইঁহার পাদ, একাংশ" (ছাঃ ৩. ১২. ৬)।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৫॥

এবিষয়ে স্মৃতির প্রমাণও রহিয়াছে। যেমন গীতা বলেন, "আমারই চিরন্তন অংশ জীবলোকে জীবরূপে অবস্থান করিতেছে" (গীঃ ১৫. ৭)।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব যদি ঈশ্বরের অংশই হয়, তবে জীবের সংসার-দুঃখ ঈশ্বরকেও ভোগ করিতে হয়। শরীরের এক অংশে বেদনা হইলে অংশীরও (অর্থাৎ যে ব্যক্তির অঙ্গে বেদনা হয়, তাহার) দুঃখ হয়। কাজেই বলিতে হয়, সমস্ত জীবের দুঃখ ঈশ্বরকেও ভোগ করিতে হয়। আবার যে জীব সাধনাদির দ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহার দুঃখ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশীই হইবে, কারণ সমস্ত জীবের দুঃখ সমষ্টিই তখন তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিলে জীবের আর মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা হইবে না, কারণ তাহা অধিকতর দুঃখকর। ফলে মোক্ষশাস্ত্রই নিরর্থক হইয়া পড়িবে, এবং ঈশ্বরেরও জীবের ন্যায় দুঃখভোগ হয়—ইহাও বলিতে হইবে।

গুরু। না, জীব যেরূপ সংসারদুঃখ ভোগ করে,

প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ ॥ ৪৬ ॥

পরমেশ্বর [পরঃ] সেরূপ [এবম্] করেন না [ন], ইহার দৃষ্টান্ত সূর্য্যালোক প্রভৃতি [প্রকাশাদিবৎ]। মনে কর, সূর্য্যালোক সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। ঐ আলোক কোন একটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ ছিদ্রের আকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তা' বলিয়া আকাশব্যাপী আলোক ছিদ্রাকার প্রাপ্ত হয় না। একটী ঘট নাড়াইলে ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ (ফাঁক) খণ্ডও যেন নড়িতেছে বলিয়া মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু আকাশ নড়ে না। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলকম্পনে কম্পান্বিত বলিয়া মনে হইলেও যেমন সূর্য্যের

কম্পন হয় না ; সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত জীবাত্মার দুঃখভোগ হইলেও সেই দুঃখে উপাধিশূন্য বিম্বস্থানীয় পরমেশ্বরের কোনই দুঃখ হয় না। বস্তুতঃ পারমার্থিক হিসাবে দেখিতে গেলে জীবের যে দুঃখ প্রাপ্তি, তাহাও উপাধি নিবন্ধন। অবিদ্যার বশেই জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতির সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে, এবং সেইজন্য 'আমি দুঃখী' এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। বাস্তবিক 'দেহাদিই আমি' এইরূপ আত্মাভিমান হইলেই দুঃখ হয়, না হইলে হয় না—এ তত্ত্ব প্রথমেই বুঝিয়াছ। সুতরাং অবিদ্যাজনিত অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধির যোগে জীবনামক অংশ যদি আপনাকে দুঃখিতের ন্যায় মনে করে, তথাপি সেই দুঃখে অংশী ঈশ্বরের দুঃখ হয় না।

স্মরন্তি চ ॥ ৪৭ ॥

জীবের দুঃখ হয় বলিয়া যে পরমেশ্বরেরও দুঃখ হয়, তাহা নয়। ঋষিরা এ কথা স্মৃতি শাস্ত্রে (এবং শ্রুতিতেও) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যেমন, "পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না"। "জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া কেবল প্রকাশ পাইতে থাকেন" (শ্বেঃ ৪.৬) ইত্যাদি।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ দুইই দেখান হইয়াছে, এই জন্য জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা উচিত, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু শ্রুতি ত আর যথার্থই ভেদ এবং অভেদ এই দুই বিরুদ্ধ ভাবকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন না। শ্রুতির প্রামাণ্য যত বড়ই হউক না কেন, এরূপ বিরুদ্ধ কথা কাহারও গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর, ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা একটা গোঁজামিল দেওয়া যায় বটে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সত্যিকারের কোন ধারণা জন্মিতে পারে না।

সুতরাং নিশ্চয়ই শ্রুতির কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মনে হয়, যে ভেদ সকলেই সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি, তাহা প্রতিপাদন করা শ্রুতির নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতির সার্থকতা, প্রামাণ্য ও বৈশিষ্ট্যই হইল এই যে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিবার উপায় নাই, এমন নূতন কিছু প্রতিপাদন করা। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আমাদের বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং অভেদ প্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায় এবং তাহাতেই শ্রুতির সার্থকতা। অতএব শ্রুতির ভেদ ও অভেদ দেখাইবার তাৎপর্য্য এই বলিয়া বোধ হয় যে, সর্ব্বানুভূত ভেদ পারমার্থিক নহে, অভেদই পারমার্থিক (ব্রঃ সূঃ ৩. ২. ১১-৭৭ দ্রষ্টব্য)। আর জীব যে ব্রহ্মের মুখ্য অংশ হইতে পারে না, তাহাত পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছেন। অতএব বলিতে হয়, একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং জীবরূপেও তিনিই বিরাজমান। কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রীয়বিধিনিষেধ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ? "অমুক অমুক করিবে" এইরূপ শাস্ত্রের 'অনুজ্ঞা' (বিধি) আছে ; আবার "অমুক অমুক করিবে না" এইরূপ শাস্ত্রের 'পরিহার' (নিষেধ) আছে। এইরূপ অনুজ্ঞা কিম্বা পরিহার ভেদ বা দ্বৈত না হইলে কিছুতেই কার্য্যকরী হইতে পারে না। আত্মা যদি এক হয়, দ্বৈত বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তবে এই অনুজ্ঞা পরিহারের সার্থকতা থাকে কিরূপে ?

গুরু। হ্যাঁ বৎস ! ঠিকই বলিয়াছ, পরমার্থতঃ অভেদই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এক ছাড়া দুই নাই—ইহাই পরমার্থ সত্য, তথাপি

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহ-সম্বন্ধাৎ—

আত্মার সহিত দেহের একটা (কাল্পনিক) সম্বন্ধ আছে বলিয়া [দেহ-সম্বন্ধাৎ] অনুজ্ঞা পরিহার সিদ্ধ হইতে পারে [অনুজ্ঞা-পরিহারৌ]।

পরস্পর সংযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে "আমি" এইরূপ একটা অভিমান বা অভিনিবেশ হয়। সেই অভিনিবেশের নামই 'দেহ-সম্বন্ধ'। যতকাল আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া না যায়, ততকাল ঐ অভিনিবেশ, ঐ মিথ্যাজ্ঞান অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। আত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও অবিদ্যাপ্রভাবে উৎপন্ন দেহাদি উপাধি সেই এক অদ্বিতীয় আত্মাকেও বহুরূপে প্রতীত করায়। এই কল্পিত ভেদ অবলম্বনেই অনুজ্ঞা পরিহার কার্য্যকরী হয়। বাস্তবিক যাহার আত্মার একত্ব জ্ঞান হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধই প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর তাহার প্রতি বিধি নিষেধের প্রয়োজনই বা কি? সে ত কৃতার্থ। বিধি নিষেধ, গৌণভাবেই হউক, মুখ্যভাবেই হউক, জীবকে মোক্ষের দিকে, যথার্থ জ্ঞানের দিকেই চালিত করে। যে তাহা পাইয়াছে, তাহার আর বিধি নিষেধ কি? (ব্রঃ সূঃ উপক্রম ও ১. ১ দ্রষ্টব্য)। [যদিও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিধি নিষেধ প্রযুক্তই হইতে পারে না, তথাপি সেই জন্যই যে সে যথেচ্ছচারী হইবে, তাহা নয়। দেহাদিতে যাহার আত্মবুদ্ধি আছে, সে-ই ভাল কি মন্দ যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহার কোন অভিমান নাই, সে যথেচ্ছচারী হইবে কিরূপে? প্রারব্ধবশে জীবন ধারণ করিলেও কোনরূপ অসৎকর্ম্মও তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, সে তাহাতে অনভ্যস্ত; অসৎকর্ম্ম করিয়া কেহ কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জীবন্মুক্তাবস্থায় নূতন কর্ম্ম করা অসম্ভব, পূর্ব্ব অভ্যাস মতই দৈহিক ক্রিয়া চলিতে থাকে মাত্র (ব্রঃ সূঃ ৪. ৩. ৪ দ্রষ্টব্য)]। সুতরাং আত্মা এক হইলেও দেহাদি সম্পর্কেই অনুজ্ঞা পরিহার সার্থক হয়; ইহার দৃষ্টান্ত—

জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

যেমন অগ্নি এক হইলেও শ্মশানের অগ্নি ত্যাগ করিতে হয়, যজ্ঞের অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ দেহাদির সম্পর্কেই গ্রহণ ও বর্জ্জনের ব্যবস্থা।

শিষ্য। আচ্ছা, বিশেষ বিশেষ দেহের যোগে না হয় অনুজ্ঞা ও পরিহারের একটা ব্যবস্থা হইল; কিন্তু আত্মা যদি একটাই হয়, তবে আমার দেহে যে আত্মা, অন্যের দেহেও সেই একই আত্মা; সুতরাং যে দেহে যে কার্য্যই হউক না কেন, দেহান্তে সকল কার্য্যের ফলই একই আত্মাকে ভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমি নরকের কার্য্য না করিলেও আমার নরক ভোগ হইবে; আবার আমি স্বর্গের কার্য্য না করিলেও অন্যকৃত কর্ম্মের ফলে আমারও স্বর্গবাস হইতে পারে। সুতরাং আত্মা একটী মাত্র, এরূপ বলিলে কর্ম্মফলের এইরূপ একটা 'সঙ্কর' বা 'ব্যতিকর' অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। রামের দোষে শ্যামের দুর্ভোগ, এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা।

গুরু। না, সেরূপ কোন

অসন্ততেঃ চ অব্যতিকরঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যতিকর (কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য, অব্যবস্থা) হয় না [অব্যতিকরঃ]; কারণ, কর্ত্তৃ-আত্মার সহিত অন্যদেহের কোন সম্বন্ধ হয় না [অসন্ততেঃ, সন্ততি – সম্বন্ধ]। যে জীব যে শরীরে থাকিয়া কর্ম্ম করে, সেই জীবের সহিত অন্য শরীরের এবং সেই শরীর উপহিত জীবের কোন সম্বন্ধ থাকে না। উপাধি নিবন্ধনই জীব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে

অবস্থান করে, এবং দেহাদি উপাধিতে আত্মাভিমান বিশিষ্ট জীবাত্মাই কর্ম্ম করে ও তাহার ফলভোগ করে। নিরুপাধিক আত্মার কোন কর্ম্মও নাই, ভোগও নাই। উপাধিও আত্ম-যাথার্থ্য জ্ঞান হওয়া অবধি অব্যাহতই থাকে [স্থূল দেহের বিনাশ হইলেও সূক্ষ্ম ও কারণ দেহই উপাধির কার্য্য করে, এবং পরলোকগত জীবের পরস্পর পার্থক্য রক্ষা করে]। উপাধিগুলি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং উহাদের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না ঘটায় এক উপাধিতে উপহিত জীব অন্য উপাধিতে উপহিত জীবের কর্ম্মফলের ভোক্তাও হইতে পারে না।

জীবকে পরমত্মার

আভাসঃ এব চ ॥৫০॥

আভাস (প্রতিবিম্ব) রূপেও বুঝিতে পার। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন আকাশস্থ সূর্য্যের আভাস, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের আভাস। [আভাস শব্দে বুঝা যায় যে, জীব সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম নয়, তবে একেবারে অন্য একটা কিছু নয়]। এক্ষণে দেখ, যেমন এক জলপাত্রের সূর্য্য-প্রতিবিম্বের কম্পনাদিতে অন্য পাত্রের প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না, সেইরূপ এক জীবের কর্ম্মফল অন্যজীবে সংসক্ত হয় না। মনে রাখিও, এই আভাসও অবিদ্যাকৃত। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পারমার্থিক ব্রহ্মাত্মভাব উদিত হয়। সুতরাং পরমার্থতঃ আত্মা এক হইলেও উপাধিভেদে আত্মা বহু। এবং সেইজন্য কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের কোন সাঙ্কর্য্য হয় না। [স্মরণ রাখিও, উপাধিও অবিদ্যাজনিত; কাজেই কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলও পারমার্থিক নহে, ঔপাধিকমাত্র]। পক্ষান্তরে যাঁহারা বলেন, আত্মা পরমার্থতঃই বহু এবং প্রত্যেক আত্মাই

সর্ব্বব্যাপী [যেমন সাংখ্যেরা], তাঁহাদের মতেই কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য। দেখ, সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা চৈতন্যরূপী, সর্ব্বব্যাপী ও বহু; আর 'প্রকৃতি'—'পুরুষের' [আত্মার] ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক পুরুষের পক্ষেই সমানভাবে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ হইলে এক পুরুষের সুখদুঃখে অন্য পুরুষের সুখদুঃখ না হইবার কোন কারণ নাই। সুখদুঃখ নিয়মিত করে, এমন তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব সাংখ্যও স্বীকার করেন না; অথচ সমস্ত পুরুষই একরূপ, প্রধানও সকলের পক্ষেই সমান।

আবার, কণাদমতাবলম্বীরা (বৈশেষিকেরা) বলেন, আত্মা অচেতন জড় পদার্থ (পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন), সংখ্যায় বহু (অনন্ত, অথচ প্রত্যেক আত্মাই বিভু, সর্ব্বত্র বিদ্যমান (সর্ব্বব্যাপী) ; অণুপরিমাণ বহু জড় মনও আছে। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই ইচ্ছাদি চৈতন্যের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু আত্মা যদি সর্ব্বব্যাপী হয়, তবে প্রত্যেক মনের সহিতই তাহার সংযোগ আছে। ফলে এক ব্যক্তির সুখ দুঃখ হইলে তাহার মনের সহিত অন্য ব্যক্তিরও সংযোগ থাকায় সেই অন্য ব্যক্তিরও সুখ দুঃখ অবশ্য হইবে। যে সময়ে এক আত্মায় মন সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে অন্য আত্মায় তাহার সংযোগ হওয়ার বাধা কি? সুতরাং বহু অথচ সর্ব্বব্যাপী আত্মা স্বীকার করিলে সুখ দুঃখের যে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে (আমার পায়ে আঘাত লাগিলে আমিই বেদনা বোধ করি, অন্যে করে না ইত্যাদি); তাহার ব্যাঘাত হয়। এই ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে পারে এমন কিছুই ঐ মতে স্বীকার করা হয় না।

বহু-আত্মবাদীরা হয়ত বলিতে পারেন যে, প্রত্যেক আত্মার এক একটা 'অদৃষ্ট' [সঞ্চিত কর্ম্ম সমষ্টি] আছে। ঐ অদৃষ্ট আপন আশ্রয়স্থল

আত্মাতে মনঃসযোগ ঘটায়, তাহাতে সেই আত্মারই সুখদুঃখ হয় ; অন্য আত্মার সহিত সেই 'অদৃষ্টের সম্পর্ক না থাকায় অন্যআত্মাতে মনঃ-সংযোগও জন্মাইতে পারে না, সুতরাং অন্য আত্মার সুখ দুঃখও হয় না। অতএব অদৃষ্ট স্বীকার করিলেই সুখদুঃখের ব্যবস্থা বেশ হইতে পারে। ইহার উত্তরে ভগবান্ ব্যাস বলেন যে, ঐ ভাবে সুখ দুঃখের ব্যবস্থা হইতে পারে না ;

অদৃষ্ট-অনিয়মাৎ ॥৫১॥

কারণ, অদৃষ্টেরও কোন নিয়ামক নাই, অর্থাৎ অমুক আত্মার এই অদৃষ্ট—এরূপ নিশ্চয় করিবার কোন উপায় নাই। সাংখ্যমতে আত্মা শরীর, মন ইত্যাদির সাহায্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট উপার্জ্জন করে। এক্ষণে ঐ অদৃষ্ট যদি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে, তবে প্রত্যেক আত্মাই আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রত্যেক আত্মার সহিতই ঐ অদৃষ্টের একটা সংশ্রব হয় ; ফলে অদৃষ্ট এক আত্মাতে সুখদুঃখ উৎপাদন করিলেই তাহা অন্য আত্মাতেও সংক্রমিত না হইবে কেন ? আর অদৃষ্ট যদি প্রধানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহা হইলেও প্রধান যখন সমুদায় আত্মার সাধারণ সম্পত্তি ও সর্ব্বব্যাপী প্রত্যেক আত্মার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত, তখন অদৃষ্ট কোন্ আত্মার সুখ দুঃখ জন্মাইতেছে, তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় ? কণাদমতেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ সর্ব্ব আত্মার পক্ষেই সমান বলিয়া অদৃষ্ট কাহার, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং সুখ দুঃখের সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য।

শিষ্য। আচ্ছা, যদি এরূপ বলা যায় যে, এক এক আত্মায় 'আমি অমুক করিব'—এইরূপ এক একটা 'অভিসন্ধি', কর্ম্ম প্রবৃত্তি

জাগে ; সেই অভিসন্ধি প্রভৃতিই কাহার কোন্ অদৃষ্ট তাহা নিরূপণ করিবে ? অর্থাৎ যে আত্মার ঐরূপ অভিসন্ধি হয়, কেবল সেই আত্মাই কর্ম্ম করে ও তাহার ফলভোগ করে, অন্যে করে না—এরূপ বলিলে ত সুন্দর ব্যবস্থা হয় ?

গুরু। না, ওরূপ বলিলেও সুখ দুঃখের ব্যবস্থা হয় না ; কারণ,

অভিসন্ধি-আদিষু অপি চ এবম্ ॥৫২॥

অভিসন্ধির বেলায়ও পূর্ব্বোক্ত রূপেই নিয়ামকের অভাব হয়। আত্মা ও মনের সংযোগেই অভিসন্ধি প্রভৃতি জাগে। সুতরাং সেই অভিসন্ধি প্রভৃতিও প্রত্যেক আত্মার পক্ষেই সাধারণ। এক মনের সহিত এক আত্মার যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আত্মার সহিতও তাহার যোগ হইয়া যায়, কারণ সব আত্মাই সর্ব্বব্যাপী। কাজেই অভিসন্ধিও প্রত্যেক আত্মাতেই জাগিবে ; ফলে সুখ দুঃখের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অভিসন্ধিও করিতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলা যায় যে, এক একটী শরীর দ্বারা আত্মার এক একটী 'প্রদেশ' (সীমাবদ্ধ অংশবিশেষ) নির্দ্ধারিত আছে। মন শরীরেই থাকে। সুতরাং যে শরীরে যে মন থাকে, সেই শরীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) আত্ম-প্রদেশের সহিতই সেই মনের সম্বন্ধ হয়, অন্য আত্মপ্রদেশের সহিত হয় না। কাজেই যে আত্মপ্রদেশের সহিত মনঃসংযোগ হয়, কেবল সেই আত্মপ্রদেশেই সুখ দুঃখ হয়, অন্য আত্মায় হয় না। সুতরাং

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ ?

'প্রদেশ' স্বীকার করিলেই ব্যবস্থা হয়, এরূপ যদি বলি ?

গুরু । ন, অন্তর্ভাবাৎ ॥৫৩॥

না, ওরূপ বলিতে পার না [ন]; কারণ, সমস্ত আত্মাই সমস্ত শরীরের অন্তর্ভূত [অন্তর্ভাবাৎ], অর্থাৎ সকল আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক আত্মাই প্রতিশরীরে আছে। সুতরাং এই শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ অমুক আত্মার, অমুক আত্মার নয়, ইহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিবে? অতএব প্রদেশ স্বীকার করিলেও কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য দোষ হইতে নিষ্কৃতি নাই।

আরও দেখ, সর্ব্বব্যাপী অথচ বহু—এ' এক অদ্ভুত কল্পনা বটে! এরূপ কল্পনা কথায় প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু কাহারও ধারণায় আসিতে পারে না। একের অধিক দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলেই সে এক ঐ দ্বিতীয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার আর সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকেনা। সুতরাং আত্মা এক, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আকাশাদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা বুঝিলাম। সেই আকাশাদির মত **প্রাণ**গুলিও (ইন্দ্রিয় সকল) কি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; না উহারা অনুৎপন্ন? অবশ্য কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণ সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; যেমন, মুঃ ২. ১. ৩; কিন্তু কোন শ্রুতিতে আবার উৎপত্তি প্রকরণে প্রাণ সকলের উৎপত্তির কোন উল্লেখ নাই। এই উভয় প্রকার শ্রুতির মীমাংসা কি?

গুরু। আকাশাদি যেরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়,

তথা প্রাণাঃ ॥১॥

ইন্দ্রিয়গুলিও [প্রাণাঃ] সেইরূপ [তথা] পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হয়। কোন কোন শ্রুতি প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে নীরব থাকিলেও যে সমস্ত শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ উহাদের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত শ্রুতিই প্রবল। সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যে প্রাণগুলির উৎপত্তিই নির্দ্ধারিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে (তৈঃ ২. ৭) প্রাণগুলি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে, এরূপ উক্তি থাকায় প্রাণোৎপত্তি বিধায়ক শ্রুতির একটা গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই ত উচিত বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, যে সমস্ত শ্রুতি প্রাণের উৎপত্তি হয়, এরূপ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত শ্রুতি

গৌণী-অসম্ভবাৎ ॥২॥

গৌণী হইতে পারে না। গৌণ অর্থ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, প্রাণগুলি বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না, তবে উৎপন্নের মত হয়। তাহা হইলে প্রাণগুলিকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে হয়, ফলে একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানে অন্য সমস্তের জ্ঞান সম্ভব হয় না। অথচ শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল—কিরূপে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করা। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাণগুলি বাস্তবিকই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়; তাহা হইলেই এক ব্রহ্মের জ্ঞানে প্রাণাদি যাবতীয় পদার্থেরও জ্ঞান হইতে পারে, এবং শ্রুতির উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়।

তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রাণের অস্তিত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই নয় যে, ঐ প্রাণই মূল কারণ। মূল কারণ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, "তাহা প্রাণ নয়, মন নয়, শুভ্র, **অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ**" (মু: ২. ১. ২)। 'অক্ষর' শব্দের অর্থ 'যে ক্ষরিত, বিনষ্ট হয় না', অর্থাৎ খণ্ড প্রলয়ে অন্যান্য সমস্ত বিকার লয় প্রাপ্ত হইলেও যাহা পরম কারণে লয় প্রাপ্ত হয় না। ইহারই অপর নাম **হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ**। এই প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ খণ্ড প্রলয়ে বর্ত্তমান থাকে, মহা প্রলয়ে পরব্রহ্মে লীন হয়। যে শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রাণের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্রুতি এই হিরণ্যগর্ভ নামধারী, **স্বকীয় সৃষ্টির মূল কারণ**, প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলিও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন।

আবার দেখ, শ্রুতি বলেন, "এতস্মাৎ **জায়তে** প্রাণঃ, মনঃ,

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং, বায়ুঃ জ্যোতিঃ—" (মুঃ ২. ১. ৩) অর্থাৎ ইহা হইতে জন্মে প্রাণ, মন, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ ইত্যাদি। এস্থলে

তৎ প্রাক্ শ্রুতেঃ ।।৩।।

'জন্মে' এই পদটী [তৎ] প্রথমেই [প্রাক্] দেখিতে পাই, সেই জন্ম [শ্রুতেঃ] ঐ পদটীর সহিত প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ ইত্যাদি সকলেরই সমান অন্বয় আছে। এই শ্রুতিতে আকাশাদির জন্ম যখন মুখ্য অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের জন্মও মুখ্য অর্থেই গ্রহণ করা উচিত।

তারপর, ছান্দোগ্য উপনিষদে যদিও তেজ, জল ও পৃথিবী, মাত্র এই তিনটী ভূতের উৎপত্তির বর্ণনাই করা হইয়াছে, প্রাণগুলির উৎপত্তি বর্ণিত হয় নাই, তথাপি

তৎপূর্ব্বকত্বাৎ বাচঃ ॥ ৪ ॥

বাগিন্দ্রিয়ের [বাচঃ] তেজঃ-মূলতা [তৎপূর্ব্বকত্বম্] দেখান হইয়াছে। (সেইরূপ মনের মূল অন্ন, [পৃথিবী]; প্রাণের মূল জল, ইহাও দেখান হইয়াছে)। সেইজন্য ইন্দ্রিয়াদিরও পরম মূল ব্রহ্ম, ইহা স্থির হয়। ব্রহ্ম হইতে তেজঃ প্রভৃতি জন্মে, তেজঃ প্রভৃতি হইতে বাগাদি ইন্দ্রিয় জন্মে—শ্রুতির এইরূপ বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ইন্দ্রিয়গুলিও মূলে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। *

* ছান্দোগ্যে প্রথম জিজ্ঞাসুর বুঝিবার সুবিধার জন্য অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা মাত্র এই তিনটী মূর্ত্ত ভূতের উৎপত্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

শিষ্য। **ইন্দ্রিয় কয়টী ?** আমার ত মনে হয়, ইন্দ্রিয়

সপ্ত ; গতেঃ বিশেষিতত্বাৎ চ ॥ ৫ ॥

সাতটী [সপ্ত] ; যেহেতু, শ্রুতি হইতে সেইরূপই অবগত হওয়া যায় [গতেঃ], এবং [চ] শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সাতটি-স্থানের-উল্লেখ রূপ বিশেষ কথাও আছে [বিশেষিতত্বাৎ]। "তাহা হইতে সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" (মুঃ ২.১.৮) —এই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয় সাতটি। আবার "শীর্ষদেশস্থ অর্থাৎ মস্তকস্থ প্রাণ সাতটি (দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসাচ্ছিদ্র ও এক জিহ্বা, তৈঃ ৫.১.৭)। এই শ্রুতিতে প্রাণের বিশেষ বিশেষ সাতটি স্থানেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রাণ সাতটিই। তবে কোন কোন শ্রুতিতে (বৃঃ ৩.৯.৪,২.৪.১১,৪.৮) সাতের অধিক সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ সপ্ত ইন্দ্রিয়েরই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

গুরু। হস্তাদয়ঃ তু স্থিতে অতঃ ন এবম্ ॥ ৬ ॥

কিন্তু [তু] শ্রুতি হস্ত, পদ প্রভৃতিকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং এই শ্রুতি প্রমাণ হইতে [অতঃ] ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ অবধারিত হওয়ায় [স্থিতে] ওরূপ বলিতে পার না [ন এবম], অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাতটি মাত্র, একথা বলিতে পার না। **ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এগার।**

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতি ত সাত, আট, দশ, বার ইত্যাদি বহুবিধ সংখ্যাই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং অন্য সংখ্যা ত্যাগ করিয়া একাদশ সংখ্যাই গ্রহণ করিতে হইবে কেন ?

গুরু। দেখ, বিষয় অনুভব ও কর্ম্ম করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়। ঐ উভয় কার্য্য সম্পাদন করিতে একাদশটি ইন্দ্রিয়েরই একান্ত প্রয়োজন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচ বিষয়ের জন্য পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, চর্ম্ম ও কর্ণ) আবশ্যক ; বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ ও রমণ—এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য ও লিঙ্গ) আবশ্যক ; এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্ববিষয়ক ধারণা বা বোধের জন্য অন্তঃকরণ নামক আর একটি ইন্দ্রিয়েরও আবশ্যক (ব্রঃ সুঃ ২.৩.৩১-৩২ দ্রষ্টব্য)। এই এগারটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল কাজ সম্পন্ন হইতে পারে ; আর ইহার অধিকও অনাবশ্যক। সুতরাং শ্রুতির সপ্ত প্রভৃতি কম সংখ্যা ও দ্বাদশ প্রভৃতি অধিক সংখ্যা স্থানাদিভেদে ও বৃত্তিভেদে ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত। শ্রুতিতে কোন স্থলে উপাসনার জন্য, কোন স্থলে বা ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কার্য্য দেখাইবার জন্য কম বেশী সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় এগারটিই।

শিষ্য। আচ্ছা, এই সব ইন্দ্রিয় কি ব্যাপী, না অণু ?

গুরু।　　অণবঃ চ ॥ ৭ ॥

এই সব ইন্দ্রিয় অণু। তবে অণু বলিতে এরূপ মনে করিও না যে, উহারা পরমাণুর মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। পরমাণুর মত ক্ষুদ্র হইলে সর্ব্ব শরীর ব্যাপী কার্য্য হইতে পারিত না। ইন্দ্রিয়ের অণুত্ব বলিতে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, উহারা অতীব সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই উহাদের প্রসার)। ইন্দ্রিয় যদি সর্ব্বব্যাপী হইত, তবে এই স্থানে বসিয়া উত্তর মেরুর বরফও দেখা যাইত।

শিষ্য। আচ্ছা, ইন্দ্রিয়গুলি যেমন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, মুখ্যপ্রাণও কি (জীবনীশক্তি, life-force, vital spirit) সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ?

গুরু। হাঁ,

শ্রেষ্ঠঃ চ ॥ ৮ ॥

মুখ্য প্রাণও পূর্ব্বোক্ত কারণেই (শ্রুতিবাক্য, একবিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে।

শিষ্য। এই প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলে কেন?

গুরু। অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়) এই মুখ্য-প্রাণের অভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না (মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়), এই জন্যই এই প্রাণ অন্যান্য প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণকে আবার জ্যেষ্ঠও বলা হয়, কারণ গর্ভে শুক্র পতিত হইবামাত্রই এই প্রাণের কার্য্য আরম্ভ হয় (অবশ্য তৎপূর্ব্বেও তাহার শক্তি থাকে, তবে গর্ভস্থ হইলেই প্রাণ শক্তির ক্রিয়া ব্যক্ত হইয়া কার্য্যারম্ভ করে)। অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়) ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব স্থানে বৃত্তি লাভ করে। সেইজন্য এই প্রাণ জ্যেষ্ঠও বটে।

শিষ্য। এই মুখ্য প্রাণ বা প্রাণশক্তি কি ভৌতিক বায়ু (যাহা আমরা ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি), না ঐ বাহ্য বায়ুরই বিকার বিশেষ, না সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একটা সাধারণ বৃত্তি (ক্রিয়া)?

গুরু। এই মুখ্য প্রাণ

ন বায়ু-ক্রিয়ে, পৃথক্ উপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

ভৌতিক বায়ুও নয়, কিম্বা ইন্দ্রিয়গুলির সাধারণ ক্রিয়াও নয় [ন বায়ু-ক্রিয়ে], যেহেতু, ভৌতিক বায়ু ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে পৃথক্ করিয়া এই প্রাণের উপদেশ শ্রুতি করিয়াছেন [পৃথগুপদেশাৎ]। যথা— "প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ (অংশ), এই প্রাণ বায়ুরূপ জ্যোতির সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়া আপন কার্য্য সম্পন্ন করে" (ছাঃ ৩.১৮.৪)। এস্থলে প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক করিয়া দেখান

হইয়াছে। আবার, "এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু জন্মে" (মুঃ ২.১.৩)—এস্থলে প্রাণকে ইন্দ্রিয় হইতেও পৃথক্‌রূপে দেখান হইয়াছে। এক একটি ইন্দ্রিয়ের এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করে না। ইন্দ্রিয়গুলির কাহারও এমন শক্তি নাই যে, সে প্রাণন ক্রিয়ার (শ্বাস প্রশ্বাসাদির) সাহায্য করিতে পারে। কর্ণ শ্রবণ ছাড়া আরও কিছু করে, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও এক একটি মাত্র কার্য্যই সম্পাদন করে। আর, এই প্রাণন ক্রিয়া শ্রবণাদি ব্যাপার হইতে একেবারে অন্য জাতীয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা এই কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব দেখা গেল, মুখ্য প্রাণ বায়ুও নয়, ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ব্যাপারও নয়।

শিষ্য। তবে শ্রুতি যে বলেন, "যে প্রাণ, সেই বায়ু"—ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বায়ু নামক ভূতই শরীরাভ্যন্তরে এক এক বিশেষগুণ যুক্ত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এই পঞ্চব্যূহে আপনাকে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে এবং প্রাণ নামে অভিহিত হয়। এই প্রাণের বাহ্ মূর্ত্তি কতকটা বায়ুর মত [আর ইহারও শক্তি জল হইতে লব্ধ ; ছান্দোগ্য দ্রষ্টব্য], সুতরাং এই প্রাণকে ঠিক ভৌতিক বায়ুও বলা যায় না, আবার বায়ু হইতে একেবারে একটা স্বতন্ত্র তত্ত্বও বলা যায় না। কাজেই উভয় প্রকারের শ্রুতিই অবিরুদ্ধ।

শিষ্য। তাহা হইলে জীব যেমন এই শরীরে স্বতন্ত্র স্বাধীন, প্রাণও সেইরূপ স্বাধীন কি ?

গুরু। না, প্রাণ জীবের ন্যায় স্বাধীন কর্ত্তা ও ভোক্তা নয়,

চক্ষুরাদিবৎ তু তৎ-সহশিষ্টি-আদিভ্যঃ ॥১০॥

কিন্তু [তু] চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় [চক্ষুরাদিবৎ] জীবের অধীন; যেহেতু প্রাণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহযোগে একশ্রেণীতে উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কারণেও [তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ]। ইন্দ্রিয়ের সহিত এক শ্রেণীতে উক্ত হওয়ায় প্রাণও ইন্দ্রিয়ের মত জীবের অধীন, ইহাই বুঝা যায়। মনে কর, জীব যেন রাজা, ইন্দ্রিয়গুলি তাহার প্রজা, প্রাণ তাহার মন্ত্রী। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ জীবের ভোগ সাধন করে বলিয়া উহারা জীবের অধীন, কেহই স্বাধীন নয়। তারপর এই প্রাণের চৈতন্য (consciousness) নাই, উহা উৎপন্ন, সংহত (একাধিক উপাদানের সংমেলনে উৎপন্ন) পদার্থ। যাহা চৈতন্যশূন্য ও সংহত, তাহা চেতনের ভোগোপকরণ মাত্র। সুতরাং প্রাণ স্বাধীন নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রাণকে যদি জীবের ভোগ সাধনের উপযোগী একটা উপকরণ মাত্র বলা হয়, তবে অবশ্যই তাহারও একটা নির্দিষ্ট বিষয় থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, বিষয় সর্ব্বসমেত এগারটা, সুতরাং ইন্দ্রিয়ও এগারটা। ঐ একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারাই জীব যাবতীয় বিষয় উপভোগ করিতে পারে। এমন একটা অতিরিক্ত বিষয় কি আছে, যাহার ভোগের জন্য প্রাণ বলিয়া ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত একটা উপকরণ, সহায় স্বীকার করিতে হইবে? সুতরাং প্রাণ যদি পূর্ব্বোক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়ের কোনটীই না হয়, কিম্বা জীবের মত স্বতন্ত্র পদার্থও না হয়, তবে জীবকে কোন্ বিষয় ভোগ করাইবার জন্য উহার প্রয়োজন?

গুরু। প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির মত জীবের অধীনে থাকিয়া জীবের ভোগ-সাধক হইলেও

অকরণত্বাৎ ন দোষঃ, তথাহি দর্শয়তি ॥১১॥

কোন দোষ হয় না [ন দোষঃ] ; কেন না, চক্ষুরাদি যেমন বিষয়বিশেষে এক এক রকমের জ্ঞান বা কর্ম্ম সম্পাদনের 'করণ', প্রাণ সেইরূপ কোন বিষয়বিশেষের ভোগের জন্য 'করণ' নয় [অকরণত্বাৎ], শ্রুতিও সেইরূপই দেখাইয়াছেন [তথাহি দর্শয়তি]। প্রাণ চক্ষুরাদির মত 'করণ' নয়, শরীরাদির মত ভোগের সহায়ক মাত্র। শরীর যেমন জীবের ভোগের সাহায্য করে, প্রাণও সেইরূপ সাহায্য করে মাত্র। ভোগ করিতে সাহায্য করে বলিয়াই যে তাহাকে ইন্দ্রিয়ই হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। (শরীর ইন্দ্রিয়-না-হইলেও ভোগের সহায়)। চক্ষুরাদি বিষয় গ্রহণ করে, প্রাণ সেরূপ কিছু করে না বলিয়া তাহাকে 'করণ' বলা যায় না। 'করণ' নয় বলিয়া যে তাহার কোন বিশেষ (অসাধারণ) কার্য্যও নাই, এমন নয়। এই বিশেষ কার্য্য শ্রুতি দেখাইয়াছেন। শরীর ও ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া রাখাই মুখ্য প্রাণের বিশেষ কার্য্য।

তারপর, এই মুখ্য প্রাণ

পঞ্চবৃত্তিঃ মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥১২॥

মনের ন্যায় [মনোবৎ] পাঁচটী বৃত্তি বিশিষ্ট [পঞ্চবৃত্তিঃ] বলিয়া শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে [ব্যপদিশ্যতে]। মনের যেরূপ অধ্যবসায়, বিকল্প ইত্যাদি একাধিক বৃত্তি আছে, প্রাণেরও সেইরূপ পাঁচটী বৃত্তি (অবস্থা) আছে—ইহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন। যথা, "প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান"। এই বৃত্তির ভেদে বিভিন্ন কার্য্য প্রাণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন, উচ্ছ্বাসাদি প্রাক্ (ঊর্দ্ধ) বৃত্তির—প্রাণের—কার্য্য, মলমূত্র ত্যাগাদি অবাক্ (অধঃ) বৃত্তির—অপানের—কার্য্য ইত্যাদি।

আর এই প্রাণ

অণুশ্চ ॥১৩॥

অণুও বটে। এস্থলেও অণু বলিতে অতি সূক্ষ্ম ও সীমাবদ্ধ শক্তিতে আবদ্ধ—ইহাই বুঝিতে হইবে, পরমাণুর মত অণুত্ব নহে (৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়গুলি যে আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার শক্তি কি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব, না অন্য কাহারও শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাহারা কার্য করে ?

গুরু। বৎস ! ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব কোন স্বাধীন শক্তি নাই। এক একজন দেবতা এক একটি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই দেবতার শক্তিতেই ঐ ইন্দ্রিয় কার্যক্ষম হয়। বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না।

জ্যোতিরাদি-অধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥১৪॥

কিন্তু [তু], অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান [জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্] অর্থাৎ অধ্যক্ষতা বা পরিচালনা বশেই ইন্দ্রিয়গুলি কার্যে প্রবৃত্ত হয়। শ্রুতি এইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন [তদামননাৎ]। "যেমন অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন" (ঐঃ ২.৪)। অগ্নির এই প্রকার বাক্যরূপে মুখে প্রবিষ্ট হওয়ার তাৎপর্য এই যে, অগ্নিদেবতা বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। তাহা ছাড়া বাক্য বা মুখে অগ্নির কোন বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। এইরূপ বায়ু প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন।*

---

* ইন্দ্রিয়ে দেবতার অধিষ্ঠান, ইহার তাৎপর্য—যে শক্তি বাহ্য জগতে অগ্নিরূপে পদার্থের প্রকাশ করে, সেই শক্তিই শরীরে বাক্ রূপে মনোভাব ব্যক্ত করে ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে, অতএব সেই কার্য্য করিবার শক্তি উহাদের নিজস্ব হইতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। দেখ, একখানি গাড়ী চলিতে পারে সত্য, কিন্তু সেই চলিবার শক্তি গাড়ীর নিজস্ব নয়, চালকের অধিষ্ঠানেই গাড়ী চলে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যশক্তি উহাদের নিজস্ব, কিম্বা অন্য কিছু হইতে লব্ধ, তাহা অনুমানাদির দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কাজেই এ বিষয়ে শ্রুতি যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে

শিষ্য। যদি দেবতাবিশেষই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হন, তবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যত কিছু ভোগ হয়, তাহা অধিষ্ঠাতা দেবতারই হওয়া উচিত; তাহা হইলে কিন্তু জীবকে আর ভোক্তা বলা যায় না।

গুরু। না, যদিও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তথাপি ইন্দ্রিয়গুলির প্রধান সম্বন্ধ

প্রাণবতা, শব্দাৎ ॥১৫॥

প্রাণধারী শরীরাদির মালিক জীবের সহিতই [প্রাণবতা], একথা শ্রুতি হইতে [শব্দাৎ] জানা যায়। "যে বোঝে 'আমি এই ঘ্রাণ লইতেছি' সেই আত্মা, তাহার গন্ধ গ্রহণের জন্যই ঘ্রাণেন্দ্রিয়" (ছাঃ ৮.১২. ৪) ইত্যাদি। এই সমস্ত শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গণের সহিত জীবের স্বামীভাব-সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়গণ ভৃত্যাদির ন্যায় জীবেরই ভোগ সাধক, দেবতারা উপকারক মাত্র। যেমন সূর্য্যালোক বস্তু-দর্শন-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের উপকারক বা সহায়, কিন্তু বস্তুর দর্শন সূর্য্যালোকের হয় না, হয় জীবেরই। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি জীবেরই ভোগের জন্য, দেবতাদের ভোগের জন্য নয়, যদিও দেবতারা ইন্দ্রিয়দিগকে সাহায্য

আরও দেখ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনেক (এক একটী ইন্দ্রিয়ের এক একটী দেবতা)। এক শরীরে বহুর ভোগ কল্পনা করা যায় না ; শরীরের একমাত্র মালিক জীব, সুতরাং তাহারই ভোগ।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

আর [চ] সেই জীবের [তস্য] সহিতই ইন্দ্রিয়ের নিত্য-সম্বন্ধ বলিয়া [নিত্যত্বাৎ] জীবই ভোক্তা। শরীর জীবের নিজ কর্ম্মের ফলেই উপার্জ্জিত, সুতরাং ইহাতে জীবেরই ভোগ নিত্য অর্থাৎ নিয়মিত। এক জনের ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে উৎপন্ন শরীরে অন্যের ভোগ হইতে পারে না। শরীর যাহার উপার্জ্জিত, ভোগও তাহারই—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

শিষ্য। মুখ্য প্রাণ একটী, আর অন্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়) এগারটী। এই একাদশ প্রাণ কি মুখ্য প্রাণেরই বিভিন্ন বৃত্তি (অবস্থা) ?

গুরু। না, একাদশ প্রাণ মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন অবস্থা নয়,

তে ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপদেশাৎ অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

মুখ্য প্রাণ ব্যতীত [শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র] সেই অপর একাদশ প্রাণ [তে] ইন্দ্রিয়ই [ইন্দ্রিয়াণি], মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন অবস্থা নয় ; যেহেতু শ্রুতি ঐ একাদশ প্রাণকেই (মুখ্য প্রাণকে নয়) ইন্দ্রিয় আখ্যা প্রদান করিয়াছেন [তদ্ব্যপদেশাৎ]। শ্রুতি কেবল ঐ একাদশ প্রাণকেই ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন ; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মুখ্য প্রাণ হইতে ঐ একাদশ প্রাণ ভিন্ন, পৃথক্ বস্তু। "ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় জন্মে" (মুঃ ২. ১. ৩)—ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে দেখান হইয়াছে, সুতরাং মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি এক বস্তু নয়।

শিষ্য। কিন্তু ঐ শ্রুতিতে ত মনকেও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। অথচ মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটী। সুতরাং কেবল পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়াই যে মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা স্বীকার করা যায় না।

গুরু। হ্যাঁ, মনকে ও মুখ্য প্রাণকে উদাহৃত শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া বলা হইলেও কেবল মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা বলিয়া গণ্য করিবার হেতু এই যে, স্মৃতিতে মনকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই স্মৃতির বচন অনুসারে মন উক্ত শ্রুতিতে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহাকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কি শ্রুতি, কি স্মৃতি কোথাও মুখ্য প্রাণকে ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই। সুতরাং মুখ্য প্রাণের বেলায় শ্রুতিতে যেমন দেখান হইয়াছে, ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে, মনের বেলায় স্মৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং মুখ্য প্রাণ একাদশ প্রাণ হইতে পৃথক্ বস্তু।

আর, শ্রুতি বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আলোচনা এক প্রকরণে (section) সমাপ্ত করিয়া নূতন আর এক প্রকরণে মুখ্য প্রাণের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং

ভেদ-শ্রুতেঃ ।। ১৮ ।।

শ্রুতির এই পৃথক্ আলোচনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, মুখ্য প্রাণ অন্যান্য প্রাণ হইতে পৃথক্।

বৈলক্ষণ্যাৎ চ ।। ১৯ ।।

তারপর আবার মুখ্য প্রাণের সহিত অন্যান্য প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বভাবগত বৈলক্ষণ্যও (পার্থক্যও) যথেষ্ট রহিয়াছে, সেই জন্যও

উভয়কে পৃথক্ জাতীয় বলা উচিত। শেষ, বাগাদি ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও মুখ্য প্রাণকে পূর্ববৎ ব্যাপার সাধন করিতে দেখা যায় (যেমন সুষুপ্তিতে)। মুখ্য প্রাণের অবস্থানেই দেহ টিকিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও দেহ থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি বিষয় গ্রহণ করে, মুখ্য প্রাণ সেরূপ কিছু করে না। এইরূপ বহু বৈলক্ষণ্য থাকায় নির্ধারিত হয় যে, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ এক পদার্থ নয়। তবে যত কিছু ক্রিয়া বা স্পন্দন, তাহার মূলে এই মুখ্য প্রাণ শক্তি। ইন্দ্রিয়াদির স্পন্দনও এই মুখ্য প্রাণেরই একান্ত অধীন, সুতরাং এই হিসাবে ইন্দ্রিয়গণকেও 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত করা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ নয়।

১৯। ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রথমে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই তিন ভূতের সৃষ্টির বিষয় বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "সেই দেবতা ভাবনা করিলেন, এখন আমি এই তিন দেবতায় (উক্ত তিন সূক্ষ্ম ভূতে) জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের* ব্যাকরণ করিব অর্থাৎ স্থূল বস্তুর সৃষ্টি করিব, এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহাদের এক একটীকে ত্রিবৃৎ করা যাউক, অর্থাৎ সূক্ষ্ম অগ্নিভূতের সহিত সূক্ষ্ম জল ও মৃত্তিকার কিছু অংশ মিশাইয়া (এইরূপ সূক্ষ্ম জলভূতের সহিত সূক্ষ্ম অগ্নি ও মৃত্তিকার কিছু অংশ, এবং সূক্ষ্ম মৃত্তিকার সহিত সূক্ষ্ম জল ও অগ্নির কিছু অংশ মিশাইয়া) তিন

---

* প্রত্যেক স্থূলবস্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা এক একটা বিশেষ নামে ও বিশেষ আকারে সংবলিত হয়। নাম—যেমন, অগ্নি, পশু, গৃহ ইত্যাদি। রূপ—যেমন, গৃহের রূপ, পশুর রূপ, মনুষ্যের রূপ ইত্যাদি। সূক্ষ্ম ভূত একটা বিশেষ নামে ও বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইলেই স্থূল হয়, ইহারই নাম 'ব্যাকরণ' অর্থাৎ 'ব্যক্ত' করা।

তিনটীর সংমিশ্রণে স্থূল বস্তুর সৃষ্টি আরম্ভ করা যাউক" (ছাঃ ৬.৩.২)*। এই শ্রুতি বাক্যে যে নামরূপ ব্যাকরণের (ব্যক্ত করার) অর্থাৎ স্থূল সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কে করে? জীব, না পরমেশ্বর?

গুরু। সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-ক্লৃপ্তিঃ তু
ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ উপদেশাৎ ॥২০॥

সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম এবং মূর্ত্তি অর্থাৎ আকার বা রূপ ইহাদের কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টি [সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ] যিনি ত্রিবৃৎ করেন, তাঁহারই [ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ]; যেহেতু, শ্রুতি সেইরূপই উপদেশ করিয়াছেন [উপদেশাৎ]। যিনি অগ্নি, জল, ও মৃত্তিকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূল সৃষ্টিও করেন। শ্রুতিতে "সেই দেবতা" বলিতে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং তিনিই নামরূপ ব্যাকরণ করিব বলায় ব্রহ্মই স্থূল বস্তুরও স্রষ্টা—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ঐ তিনভূতে 'জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট' হইলেও ব্রহ্মই ত্রিবৃৎকরণের—স্থূল সৃষ্টির—কর্ত্তা, জীব নহে। জীব—ঘট, পট প্রভৃতি স্থূল নাম রূপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তা হইলেও সে যখন ব্রহ্ম হইতে একেবারে স্বতন্ত্র একটা কিছু নয় (উপাধি-নিবন্ধনই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ), তখন ঐ সমস্ত সৃষ্টিতেও মূলতঃ ব্রহ্মই কর্ত্তা (পর্ব্বতাদি নামরূপ সৃষ্টির বিষয়ে ত কথাই নাই)। তারপর, ব্রহ্মই যে সর্ব্ববিধ নামরূপ সৃষ্টির কর্ত্তা, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপেও

* এই প্রক্রিয়ার নাম ত্রিবৃৎকরণ। পাঁচটী ভূতের ঐরূপ সংমিশ্রণের নাম পঞ্চীকরণ। ছান্দোগ্যে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই তিনটি মূর্ত্ত ভূত অবলম্বনেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যত্র অমূর্ত্ত আকাশ এবং বায়ুও অবলম্বিত হইয়াছে।

বলিয়াছেন,—"আকাশই (ব্রহ্ম) নামরূপের নির্ব্বাহক (স্রষ্টা)" ইত্যাদি (ছাঃ ৮. ১৪. ১)।

মাংসাদি ভৌমম্ যথাশব্দম্ ইতরয়োঃ চ ॥২১॥

মাংসাদি পদার্থ [মাংসাদি] ত্রিবৃৎকৃত মৃত্তিকার বিকার [ভৌমম্], অন্য দুইটীরও [ইতরয়োঃ চ] অর্থাৎ অগ্নি এবং জলেরও এইরূপ বিকার আছে, তাহা যেরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, সেইরূপই [যথাশব্দম্] বুঝিবে। শ্রুতি বলেন, "অন্ন ভক্ষিত হইলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়—উহার সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলাংশ বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, মধ্যমাংশ মাংস, সূক্ষ্মাংশ মন হয়" (ছাঃ. ৬. ৫. ১) *। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিবৃৎকৃত মৃত্তিকা-ধাতুই ধান্যাদি শস্যরূপে পরিণত হয়, এবং জীবকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া বিষ্ঠা, মাংস ও মনের পোষক হয়। অন্য দুই ধাতুরও এইরূপ বিকার জন্মে, তাহা শ্রুত্যনুসারে স্থির করা যায়। মূত্র, রক্ত, প্রাণ—জলধাতুর কার্য্য ; অস্থি, মজ্জা, বাক্য—তেজ ধাতুর কার্য্য ইত্যাদি।

শিষ্য। আচ্ছা, ত্রিবৃৎকৃত প্রত্যেক ভূতে অপর দুই ভূতের অংশও ত আছে। তবে এইটা জল, এইটা অগ্নি, এইটা মৃত্তিকা—এরূপ বলা ত ঠিক হয় না।

গুরু। না, তাহাতে দোষ হয় না। প্রত্যেক ভূতে অন্য দুই ভূতের অংশ থাকিলেও যাহা যে ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যে ভূত বলা হয়, সেই ভূতে তাহার নিজেরই

---

* ভারতীয় দর্শনে মনকেও জড় পদার্থ বলা হয়। একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত যাবতীয় পদার্থই জড়। অবশ্য এই জড় ও চেতনের বিভাগও ঔপাধিক, অতএব অবিদ্যাজনিত এক ব্রহ্ম চৈতন্যই উপাধির পার্থক্যে মন, প্রাণ, মাটি, গাছ ইত্যাদি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ ।।২২।।

আধিক্য থাকায় [বৈশেষ্যাৎ] তাহার সেই নাম [তদ্বাদঃ] দেওয়া হয়। যেমন, যাহা জল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে জলের ভাগই অধিক, অন্যান্য ভূতের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম, এই জন্য তাহাকে জল বলায় কোন দোষ হয় না।

['তদ্বাদঃ' শব্দটী দুইবার বলায় অধ্যায়টী শেষ হইল, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালে ঐরূপ নিয়ম ছিল]

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায় বুঝিলাম, জীব ব্যতীত যাবতীয় পদার্থই জীবের ভোগোপকরণ এবং সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। এক্ষণে জীব, এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে কোথায় যায়, কি প্রকারেই বা আবার জন্মগ্রহণ করে, তাহা আমাকে বলুন।*

গুরু। বৎস! শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিলেই এই সব রহস্য বুঝিতে পারিবে। বৃহদারণ্যকের ৪. ৪. ১. হইতে ৪. ৪. ৪. পর্য্যন্ত শ্রুতি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, জীব মৃত্যুকালে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, অবিদ্যা, কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কাররাশির সহিত এই দেহ পরিত্যাগ করে। যুক্তিদ্বারাও বুঝা যায় যে, জীব প্রাণ প্রভৃতির সহিতই দেহ পরিত্যাগ করে; কারণ, তাহা না হইলে কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাঘাত হয়। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি না থাকিলে ভোগ হইবে কাহার? জীব স্ব-স্বরূপে চৈতন্যমাত্র, তাহার ত কোন ভোগই নাই। সুতরাং মৃত্যুকালে জীব সূক্ষ্মশরীর পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

শিষ্য। জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ

---

* জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শনে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে, এবং ইহা প্রমাণ করিতে সেরূপ চেষ্টাও করা হয় নাই। অবশ্য শ্রুতিপ্রমাণই এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ, জন্মান্তর স্বীকার না করিলে কর্ম্মফলের ব্যবস্থা, পরমেশ্বরের অপক্ষপাতিত্ব ও সমত্ব ইত্যাদি বহু বিষয়েই অসঙ্গতি উপস্থিত হয়।

করিবার উদ্দেশ্যে গমন করে, তখন সেই ভাবী দেহের উপাদানস্বরূপ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশও কি সঙ্গে লইয়া যায়?

গুরু। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥১॥

জীব যখন একদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে [তদন্তরপ্রতিপত্তৌ] গমন করে, তখন দেহবীজ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত [সম্পরিষ্বক্তঃ] হইয়াই গমন করে [রংহতি], একথা শ্রুতির প্রশ্ন ও উত্তর হইতে [প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্] জানা যায়।

রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিলেন (ছাঃ ৫. ৩. ৩.)—"যে প্রকারে অপ্ [জল] পঞ্চম আহুতিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষ নামে অভিহিত হয়, তাহা কি তুমি জান?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "না, ভগবন্"। তখন প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে বুঝাইতে লাগিলেন (ছাঃ ৫. ৪-৯)—"দ্যুলোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পাঁচটি মনে কর অগ্নি। এই পাঁচ অগ্নিতে পাঁচটী আহুতি দেওয়া হয়—শ্রদ্ধা*, সোম (চন্দ্র), বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রদ্ধাময় জীব নূতন দেহ ধারণের জন্য প্রথমে দ্যুলোকে, সেখান হইতে চন্দ্রময় হইয়া মেঘে, মেঘ হইতে বৃষ্টিময় হইয়া পৃথিবীতে, পৃথিবী হইতে অন্ন (শস্য)-ময় হইয়া পুরুষে, পুরুষ হইতে শুক্রময় হইয়া স্ত্রীতে আগমন করে। অর্থাৎ দেহবীজভূত সূক্ষ্ম জল† ক্রমে

* শ্রদ্ধা শব্দে জলকে বুঝায়, তাহা পরে বুঝান হইবে।

† এস্থলে জল বলিতে কেবল সূক্ষ্ম জলাংশই নয়, সমস্ত ভূতের সূক্ষ্মাংশসমষ্টিই বুঝিতে হইবে, তবে জলের আধিক্য বশতঃ কেবল জলের উল্লেখ আছে, ইহা পরে বিশদ-ভাবে বলা হইবে।

ক্রমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে পরিণত হইয়া কালক্রমে ভূমিষ্ঠ হয় ও পুরুষ নামে আখ্যাত হয়। এই ব্যাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, জীব মৃত্যুকালে ভূতসূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

শিষ্য। কিন্তু অন্য এক শ্রুতিতে ত বলা হইয়াছে যে, "যেমন জলৌকা (জোঁক) এক তৃণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, জীবও সেইরূপ দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে" (বৃঃ ৪.৪.৩)। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর একটা বিরোধ বোধ হইতেছে।

গুরু। না, বিরোধ কিছুই নাই। মৃত্যু যন্ত্রণা এই দেহের প্রতি যে একটা মমত্বের অভিমান আছে, তাহা এবং জীবনের কার্য্যকলাপ সকলই ভুলাইয়া দেয়। তখন পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহ সম্বন্ধে একটা ভাবনা উৎপন্ন করে। অর্থাৎ তখন জীব এই দেহের সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারের প্রভাবে ভাবিতে আরম্ভ করে, 'আমি অমুক হইব', এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহাতে একটা গাঢ় অভিনিবেশ হয়। ফলতঃ এরূপ ভাবনাময় একটা দেহ, এই দেহ বর্ত্তমান থাকিতেই হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই জলৌকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

দেহান্তর গ্রহণ প্রণালী অনেকে অনেকরূপ কল্পনা করেন। কিন্তু কোনটীই শ্রুতির অনুমোদিত নয় বলিয়া অগ্রাহ্য। জীবৎকালের অভিজ্ঞতার অতীত এই বিষয়ে শ্রুত্যুক্ত প্রণালী স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুত্যুক্ত প্রণালীতে কেবল জলেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। অথচ আপনি বলিলেন, জীব সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের দ্বারাই পরিবেষ্টিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া যায়।

গুরু। হাঁ, শ্রুতি কেবল জলেরই উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ জল বলিতে অগ্নি ও মৃত্তিকাকেও* গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, ঐ জল

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ ।।২।।

ত্রি-আত্মক, অর্থাৎ জল, অগ্নি ও মৃত্তিকা এই তিন ভূত-সূক্ষ্মের সমষ্টি [ত্র্যাত্মকত্বাৎ]; তবে [তু] জলের ভাগ বেশী বলিয়াই [ভূয়স্ত্বাৎ] শ্রুতি কেবল জলের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য ভূতের সংমিশ্রণ ব্যতীত কেবল জল কোন দেহ জন্মাইতে পারে না। দেহ যে সমুদায় ভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, শরীরে দ্রব বা তরল পদার্থের ভাগই বেশী। সুতরাং শ্রুতি অপ্ শব্দে সমুদায় ভূত-সূক্ষ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়।

তারপর দেখ, শ্রুতি বলিতেছেন, "জীবের দেহত্যাগ কালে মুখ্য-প্রাণ জীবের অনুগমন করে, এবং মুখ্য-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে" (বৃঃ ৪.৪.২)। প্রাণ আর কিছু নিরাশ্রয়ে গমন করিতে পারে না। প্রাণের যত কিছু গতি, তাহা একটা কিছু অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াই হয়। সুতরাং শ্রুতিতে

প্রাণগতেঃ চ ।।৩।।

এই প্রাণের গতির উল্লেখ থাকায়ও স্থির হয় যে, জীব ভূতসূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়াই পরলোক গমন করে।

---

* ছান্দোগ্যে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই তিন ভূতের সম্বন্ধেই আলোচনা আছে, সেই জন্য অমূর্ত্ত আকাশ ও বায়ু এস্থলে উপেক্ষিত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিতে এরূপও বলিয়াছেন যে, "তখন এই মৃত পুরুষের বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে, এবং প্রাণ বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়" (বৃঃ ৩.২.১৩)। সুতরাং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়

অগ্নি-আদি-গতিশ্রুতেঃ ইতি চেৎ ?—

অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় গমন করে, এরূপ শ্রুতির বলে [অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেঃ] প্রাণাদি জীবের সহিত যায় না, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

উত্তর। ন, ভাক্তত্বাৎ ॥৪॥

না, সেরূপ বলিতে পার না, কারণ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাদি দেবতায় গমনের যে উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা মুখ্য গমন নয়; পরন্তু গৌণ [ভাক্তত্বাৎ]। গৌণ অর্থ এই জন্য গ্রহণ করি যে, ঐ শ্রুতিই লোম সকলের ওষধিতে (শাক-শবজীতে), কেশের বনস্পতিতে (বড় বড় গাছে) গমনের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু লোম বা কেশ ত আর সত্য সত্যই ওষধি বা গাছে যায় না। এই স্থলে গমন যেমন মুখ্য নয়, সেইরূপ অগ্নি প্রভৃতিতে বাগাদির গমনও মুখ্য নয়। কারণ, প্রাণ হইল জীবের উপাধি, সেই উপাধি ছাড়িয়া জীব চলিয়া গেলে ত তাহার মোক্ষই হইল। সুতরাং প্রাণাদির জীবের সহিত গমন না হইলে দেহান্তর ভোগ হইতেই পারে না। অন্য শ্রুতি যখন স্পষ্টই প্রাণাদির জীবের সহিত গমনের কথা বলিয়াছেন, এবং উহা যখন একান্তই আবশ্যক, তখন অগ্নি প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়াদির গমন মুখ্য নয়। ইন্দ্রিয়াদির অগ্ন্যাদিতে গমনের তাৎপর্য্য এই যে, জীবিতকালে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য করেন, মৃত্যুকালে

আর সেরূপ করেন না। এই কথাই শ্রুতি ভঙ্গিক্রমে বলিয়াছেন যে, বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় যে পাঁচটী আহুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রথমটী হইল 'শ্রদ্ধা'। তাহা হইলে জলই পঞ্চম আহুতিতে পুরুষ নামে অভিহিত হয়—এ উক্তি সঙ্গত হয় কি প্রকারে? —প্রথম আহুতি ত জল নয়, শ্রদ্ধা। সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ—ইহাদিগকে বরং জল বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, কারণ এইগুলিতে জলীয় ভাগ যথেষ্ট আছে। কিন্তু শ্রদ্ধা হইল একটা মানসিক ভাববিশেষ। তাহার সহিত জলের ত কোন সংশ্রবই নাই। সুতরাং

প্রথমে অশ্রবণাৎ ইতি চেৎ?—

প্রথম অগ্নিতে [প্রথমে] জলের উল্লেখ না থাকায় [অশ্রবণাৎ] জলই পুরুষনাম লাভ করে, শ্রুতির এই উক্তি সঙ্গত বোধ হয় না, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ]?—

গুরু। ন, তাঃ এব হি উপপত্তেঃ ॥৫॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; যেহেতু [হি] শ্রদ্ধা শব্দে জলই [তা এব] বুঝিতে হইবে; কেননা, সেইরূপ বলিলেই শ্রুতির উক্তি উপপন্ন হয় [উপপত্তেঃ]। শ্রুতির পূর্ব্বাপর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রদ্ধা শব্দের 'জল' অর্থ গ্রহণ করিলেই শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। প্রশ্ন ও উত্তর দেখিয়া শ্রদ্ধা শব্দের জল অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন হয়, অন্যথা শ্রুতিকে প্রতারক বলিতে হয়। যেরূপ প্রশ্ন, উত্তরও তদনুরূপ হয় (বিশেষতঃ যখন প্রশ্নকর্ত্তাই স্বয়ং উত্তর করিতেছেন)। তারপর দেখ, শ্রদ্ধানামক মানসিক ভাববিশেষ আর কিছু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। শ্রুতিতে জল অর্থে

শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগও আছে (তৈঃ সঃ ১.৬.৮.১)। শ্রদ্ধা সূক্ষ্ম, দেহবীজ জলও সূক্ষ্ম—এই সাদৃশ্য অবলম্বনে জল বুঝাইতে শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিতে জলই কিরূপে পুরুষ পদবাচ্য হয়, তাহা দেখান হইয়াছে; কিন্তু আপনি ত দেখাইলেন, জীব জলাদি দেহবীজ পরিবেষ্টিত হইয়া দেহত্যাগ করে এবং পরে সেই জীবই ক্রমে আকাশাদির ভিতর দিয়া গমন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলে পুরুষ নাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং

অশ্রুতত্বাৎ ইতি চেৎ ?—

শ্রুতির ঐ প্রকরণে জীববোধক কোন শব্দ না থাকায় [অশ্রুতত্বাৎ], আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ]—

গুরু। ন, ইষ্ট-আদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

না, এরূপ বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, যদিও ঐ শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবে জীববোধক কোন শব্দ পাওয়া যায় না, তথাপি 'যাহারা ইষ্ট (যজ্ঞাদিতে দান), পূর্ত্ত (কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা) ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম করে, সেই সমস্ত জীবেরই [ইষ্টাদিকারিণাম্] চন্দ্রলোকে গমন হয়, এই অর্থ প্রতীয়মান হয় [প্রতীতেঃ]। চন্দ্রলোক গমন সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্য সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুণ্য কর্ম্মকারী জীব ভাবিদেহের বীজভূত জলাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া গমন করে, শুধু জলাদি গমন করে না।

শিষ্য। আচ্ছা, পুণ্যকর্ম্মা জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে গমন করে। কিন্তু সেই লোকে যে তাহাদের কোন ভোগ হইতে পারে, এমন ত মনে হয় না। কারণ, শ্রুতি বলেন, "এই

চন্দ্র রাজা, সে দেবতাদের অন্ন (ভক্ষ্য), দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন" (ছাঃ ৫.১০.৪)। আবার, "যাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়,দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের ন্যায় আস্বাদন করিয়া ভক্ষণ করে" (বৃঃ ৬.২.১৬)। এই সব শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, যাহারা চন্দ্রলোকে যায়, তাহারা দেবতাদের ভোগ্য হয়। যাহারা নিজেরাই অন্যের ভোগ্য, তাহাদের আবার ভোগ কি হইবে ?

গুরু। না, চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবের ভোগ হইতে বাধা নাই। ঐ যে দেবতাদের দ্বারা 'ভক্ষণ' তাহা মুখ্য নয়, অর্থাৎ উহার অর্থ এইরূপ নয় যে, দেবতারা তাহাদিগকে চর্ব্বণ করিয়া গিলিয়া ফেলে ; উহা

ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥৭॥

গৌণ [ভাক্তম্]। যেমন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব লইয়া মনুষ্য সুখে বিহার করে, এই ভাবে যেমন স্ত্রী পুত্রাদিকে মনুষ্যের ভোগ্য বলা যায়, সেইরূপ চন্দ্রলোক গত লোকদিগকে লইয়া দেবতারা বিহার করেন—এই ভাবেই সেই জীবগণকে দেবতাদের ভোগ্য বলা হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই জীব চন্দ্রলোকে যায়, ইহা শ্রুতিই বলেন। সেই স্থানে যদি তাহারা দেবতাদের ভক্ষ্যই হয়, তবে শ্রুতির উক্তিই ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং দেবতাদের দ্বারা ভক্ষণের অর্থ গৌণ, মুখ্য নয়। স্ত্রী পুত্রাদি মনুষ্যের ভোগ্য হইলেও তাহাদেরও একটা ভোগ আছে। চন্দ্রলোকস্থ জীবেরও সেইরূপ। তাহাদিগকে দেবতাদের ভোগ্য এই জন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করে নাই [অনাত্মবিত্ত্বাৎ], শুধু পুণ্যকর্ম্মই করিয়াছে। আত্মজ্ঞানবিহীন জীব যে দেবতার ভোগের সহায় হয়, তাহা শ্রুতিও দেখাইয়াছেন [তথাহি দর্শয়তি] (প্রঃ ৫.৪, বৃঃ ৪.৩.৩৩)।

শিষ্য। জীব কি ভাবে চন্দ্রলোকে যায়, তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে কহুন, কি ভাবে আবার এ জগতে আসে, তাহা বলুন।

গুরু। এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন, "সেখানে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যতকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, ততকাল বাস করিয়া জীব যে পথে গিয়াছিল, সেই পথেই আবার ইহলোকে গমন করে।...সদাচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনি এবং অসদাচারীরা কুক্কুরাদি যোনি প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ৫.১০.৫-৭)।

শিষ্য। চন্দ্রলোকে কি সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ শেষ হইয়া গেলে ইহলোকে আগমন হয়, না কিছু কর্ম্ম থাকিতে থাকিতেই সেস্থান হইতে পতন হয়।

গুরু। কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্—

যে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য চন্দ্রলোকে গমন হয়, সেই সুকৃতের শেষ হইলে [কৃতাত্যয়ে], অবশিষ্ট কর্ম্মরাশির সহিত জীব [অনুশয়বান্ ; অনুশয় = কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ] ইহলোকে আগমন করে। একথা স্পষ্ট শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায় [দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্ ; দৃষ্ট = শ্রুতি]। মৃত্যু কালে জীবের সঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম ফলদানের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, অবশিষ্ট কর্ম্ম এই প্রবল কর্ম্ম সমূহ দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে। এই প্রবল কর্ম্মসমূহের ফলই চন্দ্রলোকে ভোগ হইয়া যায়। তারপর আবার আর কিছু কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবকে ইহলোকে আনয়ন করে। ঐ উদ্বুদ্ধ কর্ম্ম সৎ হইলে সৎ জন্ম হয়, অসৎ হইলে অসৎ জন্ম হয়। চন্দ্রলোকে যাবতীয় কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না। কর্ম্মের ফল ভোগ হইলেই ক্ষয় হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা কিছু বিনষ্ট হইতে পারে বটে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বকর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু

চন্দ্রলোকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পুণ্যকর্ম্মেরই ভোগ হইয়া ক্ষয় হয়, এবং সেখানে ভোগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তাদি বা জ্ঞানালোচনা কিছুই হয় না, সুতরাং অনেক সঞ্চিত কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ উভয়ই) তখন জীবের থাকে, সেই কর্ম্মের প্রভাবে তাহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

আর ; জীব

যথেতম্, অনেবম্ ॥ ৮ ॥

যে ক্রমে চন্দ্রলোকে যায় [যথেতম্], সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ঠিক সেইরূপ হয় না [অনেবম্], একটু বিশেষ আছে। অবরোহণ কালে 'ধূম' ও 'আকাশের' উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা আরোহণ কালে উল্লিখিত হয় নাই।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, চন্দ্রলোক গত জীবের অবশিষ্ট কর্ম্মের (অনুশয়ের) প্রভাবেই বিশেষ বিশেষ জন্ম লাভ হয়। কিন্তু শ্রুতি ত দেখাইয়াছেন যে, সৎ বা অসৎ আচরণের অর্থাৎ চরিত্রের ফলেই সৎ বা অসৎ জন্ম হয় (ছাঃ ৫.১০.৭)। সুতরাং শ্রুতিতে কেবল

চরণাৎ ইতি চেৎ ?—

চরিত্রকেই সদসৎ জন্মের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় [চরণাৎ] অনুশয় (অবশিষ্ট কর্ম্ম, অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল ভোগ হয় নাই) জন্মের কারণ নয়, একথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

গুরু। ন, উপলক্ষণার্থা ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

না, সেরূপ বলিতে পার না ; কারণ, যে শ্রুতিতে চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুশয় অর্থকেই লক্ষ্য করে [উপলক্ষণার্থা]। অর্থাৎ চরণ শব্দে যদিও সাধারণতঃ চরিত্রই বুঝায়, তথাপি আলোচ্য স্থলে

উহার অর্থ অনুশয় স্বীকার করাই সঙ্গত, ইহা আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির মত [ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ]।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিতে চরণ শব্দে আচার, চরিত্র বা শীলকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার লাক্ষণিক অর্থ * (অর্থাৎ অনুশয়) গ্রহণ করিলে শ্রুতিতে চরিত্রবান্

আনর্থক্যাৎ ইতি চেৎ ?—

হইবার যত উপদেশ আছে, তাহার আনর্থক্য উপস্থিত হয় বলিয়া [আনর্থক্যাৎ] লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা সঙ্গত নয়, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

গুরু। ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥১০॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; কারণ, আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি বলেন, শ্রৌত, স্মার্ত্ত যত কিছু কর্ম্ম, তাহা চরিত্রবান্ লোকেই করিতে পারে, অসদাচারী সে সমস্ত কর্ম্মে অধিকারীই নয়। সুতরাং কর্ম্মের জন্য চরিত্রেরও অপেক্ষা আছে [তদপেক্ষত্বাৎ]। অতএব শ্রুতির চরণোপদেশ অনর্থক নয়।

শিষ্য। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় ত বুঝা যায় যে, চরণ শব্দে কেবল সদাচারই বোধ করায়, অথচ অনুশয় (অভুক্তফল কর্ম্ম-সমষ্টি) সৎ ও অসৎ উভয় মিশ্রিত।

গুরু। হাঁ, তাহা সত্য বটে, সেই জন্য

সুকৃত-দুষ্কৃতে এব ইতি তু বাদরিঃ ॥১১॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন যে [ইতি], ঐ চরণশব্দে

---

* 'তিনি গঙ্গায় বাস করেন'—এ স্থলে গঙ্গা শব্দের অর্থ বাস্তবিক গঙ্গাতীর, গঙ্গার খাদ নয়। এই অর্থ লাক্ষণিক।

সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের কর্ম্মই [সুকৃত-দুষ্কৃতে এব] বুঝায়। চরণ কিনা যাহা আচরণ করা যায়, সম্পাদন করা যায়, অর্থাৎ কর্ম্ম। শ্রুতির তাৎপর্য্যও এই যে, যাহাদের সদাচরণ সঞ্চিত আছে [রমণীয়চরণাঃ], তাহারা সৎ হইয়া জন্মে, আর যাহাদের অসদাচরণ সঞ্চিত আছে [কপূয়চরণাঃ], তাহারা অসৎযোনিতে জন্মে (ছাঃ ৫. ১০. ৭)। সুতরাং চরণ শব্দে 'অভুক্তফল কর্ম্মই' বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে গমন করে। আবার

অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি চ শ্রুতম্ ॥১২॥

যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করে না, অর্থাৎ পাপাচারী তাহাদেরও [অনিষ্টাদি-কারিণাম্ অপি চ] চন্দ্রলোকে গমন হয়, একথা শ্রুতিতে পাওয়া যায় [শ্রুতম্]। যেমন, "যে কেহ এ লোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়" (কৌঃ ১. ২)। এই শ্রুতিতে কি পুণ্যকর্ম্মা, কি পাপকর্ম্মা নির্ব্বিশেষে সকলেরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে।

গুরু। না, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না। চন্দ্রলোকে গমন বিশেষ ভোগের জন্যই হয়। অনিষ্টকারীর এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহার ফল সে চন্দ্রলোকে ভোগ করিতে পারে। চন্দ্রলোকে কেবল সুকর্ম্মের ফলভোগই হয়। সুতরাং পাপাচারীর চন্দ্রলোক-গমন নিষ্প্রয়োজন। [কৌষীতকি শ্রুতির "যে কেহ" এই কথার অর্থ "যে কোন পুণ্য কর্ম্মা"]।

শিষ্য। পাপাচারীরা তাহা হইলে কোথায় যায় ?

গুরু । সংযমনে তু অনুভূয় ইতরেষাম্
আরোহ-অবরোহৌ, তদ্গতিদর্শনাৎ ॥১৩॥

অন্যের অর্থাৎ যাহারা পুণ্যকর্ম করে না, তাহাদের [ইতরেষাম্] যমলোকে [সংযমনে] আরোহণ করিয়া যমযাতনা ভোগ করার পর [অনুভূয়] সে স্থান হইতে অবরোহণ অর্থাৎ পতন হয়। এইরূপে তাহাদের আরোহণ ও অবরোহণ [আরোহাবরোহৌ] হয়। শ্রুতি তাহাদের সেইরূপ গতিই প্রদর্শন করিয়াছেন [তদ্গতি-দর্শনাৎ] (কঃ ১. ২. ৬)।

স্মরন্তি চ ॥১৪॥

মনু, ব্যাস প্রভৃতি স্মৃতিকার ঋষিরাও বলিয়াছেন যে, পাপকর্মের ফলভোগ যমলোকে হয়।

অপি চ সপ্ত ॥১৫॥

আর [অপিচ] পৌরাণিকেরা পাপের ফল ভোগ জন্য সাতটী [সপ্ত] নরকের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না।

শিষ্য। কিন্তু চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিই সেই সমস্ত নরকের কর্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অথচ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, পাপীরা যমলোকে যাইয়া যমের হস্তে শাস্তি পায়। নরকে গেলে ত চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিই শাস্তি দিতে পারে। সে স্থানে যমের কি অধিকার? এ বিরোধের মীমাংসা কি?

গুরু । তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাৎ অবিরোধঃ ॥১৬॥

না, এরূপ কোন বিরোধ হয় না [অবিরোধঃ]; কারণ সেই সব নরকেও [তত্রাপি চ] যমেরই কর্তৃত্ব [তদ্ব্যাপারাৎ]। বিভিন্ন

নরক যমেরই অধিকার ভুক্ত। যমকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন নরক শাসন ও পরিচালন করেন। (যম রাজা, চিত্রগুপ্তাদি তাঁহারই নিযুক্ত প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারী)। সুতরাং নরকের উপর প্রধান কর্তৃত্ব যমেরই।

শিষ্য। শ্রুতিতে এইরূপ একটী প্রশ্ন আছে, "তুমি কি জান, কিরূপে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না?" (ছাঃ ৫. ৩. ৩)। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, যাহারা এই দুই পথের কোনটীতেই যাইবার যোগ্য নয়, সেই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর (ডাঁশ, মশা ইত্যাদি) জন্ম পুনঃ পুনঃ জন্মমরণযুক্ত **তৃতীয় স্থান**। সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না" (ছাঃ ৫. ১০. ৮)। এই উত্তরে যে দুইটী পথের কথা বলা হইয়াছে, তাহার একটীর নাম **দেবযান**—যে পথে কতক প্রাণী ব্রহ্মলোকে গমন করে, অপরটী **পিতৃযান**—যে পথে কতক প্রাণী চন্দ্রলোকে গমন করে। এতদ্ব্যতীত আর একটী তৃতীয় স্থানেরও উল্লেখ ঐ শ্রুতি করিয়াছেন। এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলুন, কি রকম জীব কোন্ পথে কোন্ স্থানে গমন করে।

গুরু। দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটী

বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ ইতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥১৭॥

জ্ঞান ও পুণ্যকর্ম্মের [বিদ্যাকর্ম্মণোঃ] পথ; অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানের সাধন করেন, তাঁহারা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, আর যাঁহারা যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে উপনীত হন; এ'রূপ সিদ্ধান্ত [ইতি] এই জন্যই করি যে, দেবযান ও পিতৃযান প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রস্তাবনাই

শ্রুতি করিয়াছেন [প্রকৃতত্বাৎ]। তারপর শ্রুতি অবিশ্রান্ত-জন্ম-মরণযুক্ত তৃতীয় স্থানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, যাহারা জ্ঞান সাধনও করেনা, কিম্বা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানও করে না, অর্থাৎ পাপাচারীরা তৃতীয়স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য নিশ্চয় হয় যে, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, এবং সেই জন্যই চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।

শিষ্য। কিন্তু কৌষীতকী শ্রুতি যে অবিশেষে সকলেরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন ?

গুরু। না, ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত জীব চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, অন্য কোথাও নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চম আহুতিতে জল (অর্থাৎ ভূতসূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত জীব, ১ম সূত্র দ্রষ্টব্য) পুরুষ নামে অভিহিত হয়। সুতরাং পুরুষ হইতে হইলে পাঁচটী আহুতির প্রয়োজন। অনিষ্টকারীরা যদি চন্দ্রলোকে না যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চম সংখ্যা পূরণ হয় না, কাজেই বলিতে হয়, তাহাদের জন্মও হইতে পারে না।

গুরু। না, ঐ পঞ্চ আহুতি কেবল পুণ্যকর্ম্মা জীবের জন্মলাভের জন্যই প্রয়োজন ; ওরূপ আহুতি

ন তৃতীয়ে, তথা উপলব্ধেঃ ॥১৮॥

তৃতীয় স্থানে [তৃতীয়ে] আবশ্যক হয় না [ন], অর্থাৎ পাপীরা যে তৃতীয়স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য আহুতির কোন প্রয়োজন হয় না ; কারণ তৃতীয় স্থান প্রাপ্তির জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই [তথা] শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়, সাধারণতঃও সেইরূপই দেখা যায় [উপলব্ধেঃ]। শ্রুতি তৃতীয় স্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "জন্মে আর মরে, জন্মে আর মরে"।

ইহাতে বুঝা যায়, তাদৃশ জন্মলাভের জন্য পাঁচটী আহুতিই একান্ত আবশ্যক নয়। তারপর শ্রুত্যুক্ত 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, ঐ আহুতিসংখ্যা মনুষ্য সম্বন্ধেই নির্দ্দিষ্ট। আবার ঐ শ্রুতি হইতে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়মও পাওয়া যায় না যে প্রত্যেক জীবকে জন্ম-লাভের জন্য পাঁচটী আহুতির অভ্যন্তর দিয়া আসিতেই হইবে—আহুতি না হইলে জন্মই হইবে না। শ্রুতি হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, কতক জীব পাঁচটী আহুতির ভিতর দিয়া আসিয়া পুরুষ (Person) শব্দে অভিহিত হয় [অন্যজীব বিনা আহুতিতেও জন্মলাভ করিতে পারে]।

এমন কি, মনুষ্য যোনি প্রাপ্তির জন্যও যে সব ক্ষেত্রে পাঁচটী আহুতিই প্রয়োজন, তাহাও নয়; কারণ পাঁচের কম আহুতির দ্বারা জীবের জন্ম

স্মর্য্যতে অপি চ লোকে ।।১৯।।

এ লোকে [লোকে] স্মৃতিকারগণ স্বীকার করিয়াছেন [স্মর্য্যতে]। যেমন, দ্রোণের পঞ্চম আহুতি [মাতৃগর্ভে অবস্থান] হয় নাই, ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্থ ও পঞ্চম আহুতি [শুক্রে ও মাতৃগর্ভে স্থিতি] হয় নাই। এইরূপ, সীতা, দ্রৌপদী ইত্যাদির দৃষ্টান্ত আছে। লোকে বলে, বকী কেবল মেঘগর্জ্জন শুনিয়াই গর্ভিণী হয়, বকের সহিত মৈথুনের আবশ্যক হয় না।

দর্শনাৎ চ ।।২০।।

দেখাও যায় [দর্শনাৎ চ] যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি জাতির প্রাণীর মধ্যে স্বেদজ [যাহারা ময়লা হইতে জন্মে] ও উদ্ভিজ্জ এই দুই জাতীয় প্রাণীর মৈথুন হয় না। হইলেও দেখা যায় না। তাহাদের জন্ম সম্বন্ধে আহুতি সংখ্যা পাঁচটীই, এরূপ ধরা বাঁধা নিয়ম স্বীকার করা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতি ত তিন জাতীয় প্রাণীর কথাই বলিয়াছেন, অথচ আপনি বলিলেন, প্রাণী চারি জাতীয় (১) জীবজ, যেমন মনুষ্য, (২) অণ্ডজ, যেমন পক্ষী, (৩) উদ্ভিজ্জ, যেমন বৃক্ষ, (৪) স্বেদজ, যেমন মশক। কিন্তু শ্রুতি স্বেদজ প্রাণীর ত কোন উল্লেখ করেন নাই।

গুরু। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও

তৃতীয়শব্দ-অবরোধঃ সংশোকজস্য ॥২১॥

স্বেদজ প্রাণীর [সংশোকজস্য] তৃতীয় শব্দের মধ্যে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জের মধ্যে অন্তর্ভাব [তৃতীয়শব্দাবরোধঃ] আছে। অর্থাৎ স্বেদজ প্রাণীকে উদ্ভিজ্জের মধ্যেও ধরা যায়, কেন না, উভয়েই উদ্ভেদ করিয়া জন্মে,— একটী মৃত্তিকা হইতে, অপরটী ক্লেদ (ময়লা) হইতে। এই জন্যই শ্রুতি কেবল তিন জাতির নামই করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহার সারমর্ম এই যে—জ্ঞান-সাধক জীব মৃত্যুর পরে দেবযান পথে গমন করে, পুণ্যকর্ম্মা জীব পিতৃ-যান পথে চন্দ্রলোকে যায়, কতক পাপী যমলোকে যাইয়া যমযাতনা ভোগ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে, কতক জীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে মরিয়াই আবার জন্মে। ইহা ছাড়া ইহজীবনেই যাঁহারা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা পরম ব্রহ্মই হইয়া যান, তাহাদের আর কোন প্রকার গতি হয় না *।

শিষ্য। চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন, "অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। প্রথমে চন্দ্র হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূম হয়" ইত্যাদি (ছাঃ ৫. ১০. ৫)।

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ব্রঃ সূঃ ৪. ২. ৩ এ করা হইয়াছে।

এস্থলে যে আকাশাদি প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহা কি রকমের প্রাপ্তি ? চন্দ্রলোক হইতে পতিত জীব কি আকাশ, বায়ু, ধূম, ইত্যাদিই হইয়া যায়, না আকাশাদির মত হয় ? অর্থাৎ তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, না আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় ?

গুরু। না, তাহাদের আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু আকাশাদির

স্বাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্তেঃ ॥২২॥

সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্তি [স্বাভাব্যাপত্তিঃ] হয় ; যেহেতু সেরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত [উপপত্তেঃ]।

চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় শরীর হয়, পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ হইয়া গেলে সেই শরীর গলিয়া গিয়া সূক্ষ্ম আকাশের মত হয়। তারপর সূক্ষ্ম ও লঘু বলিয়া বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ধূমাদির সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে ক্রমে ধূমাদিতে প্রবিষ্ট হয়। জীব যদি প্রথমে আকাশত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে বায়ু আদি ক্রমে আরোহণের কোন অর্থই হয় না। সুতরাং শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জীব আকাশাদির সাম্য প্রাপ্ত হয় মাত্র।

শিষ্য। আচ্ছা, ধ্যানাদি ভাব প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে আকাশাদি ভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা কি বহুকাল ধরিয়া হয়, না শীঘ্র শীঘ্রই সম্পন্ন হয় ?

গুরু। ন অতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥২৩॥

আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া শস্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অবরোহণ দীর্ঘকাল ধরিয়া হয় না [নাতিচিরেণ] পরন্তু শীঘ্র শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া যায় ; কারণ আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া শস্যাদিতে গমনব্যাপার এবং শস্যাদি হইতে বাহির হওয়া এই দুই কার্য্যের বিশেষ

আছে [বিশেষাৎ], ইহা শ্রুতি দেখাইয়াছেন। শ্রুতি বলেন "ধান্যাদি হইতে বহির্গত হওয়া **পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কষ্টকর**"। ইহাতেই বুঝা যায়, আকাশাদি হইতে নিঃসরণ অল্পায়াসেই হয়, সুতরাং সময়ও সে জন্য বেশী লাগে না। কিন্তু ধান্যাদি হইতে নিঃসৃত হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য।

শিষ্য। আচ্ছা, ধান্যাদিতে প্রবিষ্ট জীবেরা কি ধান্যাদির কর্ত্তন, পেষণ ইত্যাদিতে দুঃখ ভোগ করে ? অর্থাৎ ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া কি তাহারা ধান্যাদির সুখ দুঃখ ভাগী হয় ? অর্থাৎ সেই সব শস্যের অধিষ্ঠাতা জীব কি তাহারাই, না অন্য জীবাধিষ্ঠিত ধান্যাদিতেই চন্দ্রলোকচ্যুত জীবের প্রবেশ মাত্র হয় ?

গুরু। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববৎ অভিলাপাৎ ॥২৪॥

অন্য জীব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্যাদিতেই [অন্যাধিষ্ঠিতে] চন্দ্রলোকচ্যুত জীবের প্রবেশমাত্র হয়, ধান্যাদি জীবরূপে তাঁহারা মুখ্য জন্মলাভ করে না ; যেহেতু পূর্ব্বের বায়ু প্রভৃতির ন্যায় [পূর্ব্ববৎ] ধান্যাদিতেও সংশ্লেষ (মিশ্রণ)—মাত্র হয়, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন [অভিলাপাৎ]।

বায়ু, ধূম ইত্যাদিতে যেমন সংশ্লেষ হয়, ধান্যাদিতেও সেইরূপ সংশ্লেষই হয় ; যদি ধান্যাদিতে মুখ্য জন্ম স্বীকার করা যায়, তবে সেই ধান্যাদিরূপ দেহের নাশে সেই জীবের মৃত্যু হইল বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে রেতঃসেক্তার (পিতার) সহিত যোগ হইয়া চন্দ্রচ্যুত জীব মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়, শ্রুতির এই সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে। ধান্যাদিতে প্রবেশ যদি মুখ্য জন্মই হয়, তবে ধন্যাদি প্রাপ্ত হইয়া রেতঃসিক্ যোগে মনুষ্য দেহ লাভ হয়, শ্রুতি এরূপ বলিবেন কেন ? সুতরাং ধান্যাদিতে প্রবেশ-মাত্র হয়, ধান্যাদিতে 'আমি,

আমার' ইত্যাকার কোন অভিমানও তাহার হয় না। কাজেই সে ধান্যাদির সুখ দুঃখের ভাগীও হয় না। অবশ্য এরূপ বলি না যে, ধান্যাদি কোন জীবেরই ভোগায়তন (ভোগের জন্য শরীর) নয়; তবে যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, তাহারা ধান্যাদিতে আত্মাভিমানী জীব নয়, তাহাদের সহিত ধান্যাদির সংশ্লেষ হয় মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু চন্দ্রলোকচ্যুত জীবই শস্যাদি হইয়া দুঃখ ভোগ করে, এরূপও ত বলা যায়। কারণ যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করে, তাহারাই চন্দ্রলোকে যায়। কিন্তু যজ্ঞাদি করিতে পশুহিংসাও করিতে হয়। তাহাতে অবশ্য তাহাদের পাপ হয়। সেই পাপের ফল আর কিছু চন্দ্রলোকে ভোগ করিতে পারে না, সেই পাপের ফল ধান্যাদিরূপে ভোগ হইয়া যায়। সুতরাং ধান্যাদিভাব প্রাপ্তিও মুখ্য জন্মই, যেহেতু যজ্ঞাদি কর্ম্ম

অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ-

অশুদ্ধ, হিংসাদি পাপমিশ্র, এবং তাহার ফলভোগ করাও আবশ্যক—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু।　　　　ন, শব্দাৎ ॥২৫॥

না, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অশুদ্ধ বলিতে পার না [ন], কারণ, শাস্ত্রই উহার বিধান দিয়াছেন [শব্দাৎ]। কোন্ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, কোন্ কার্য্যে অধর্ম্ম হয়, তাহা শাস্ত্র ছাড়া জানিবার উপায় নাই। দেখ, যে দেশে, যে কালে, যে কারণে, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, ঠিক সেই কার্য্যই অন্য দেশে, অন্য কালে বা অন্য কারণে অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং শাস্ত্র যখন যজ্ঞাদিতে পশু বধের বিধান দিয়াছেন, তখন তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে হিংসা হইলেও তাহাতে কোন পাপ হইতে পারে না।

শিষ্য। আচ্ছা, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পর কি হয়?

গুরু। রেতঃসিগ্‌যোগঃ অথ ॥২৬॥

তারপর [অথ] যিনি রেতঃ ত্যাগ করেন অর্থাৎ পিতা, তাহার সহিত যোগ হয়। শস্যাদি ভক্ষিত হইয়া রেতঃরূপে পরিণত হয়। এখানেও দেখ, রেতঃ-সেক্তার সহিত সংশ্লেষ মাত্র হয়, জীবই স্বয়ং রেতঃসেক্তা হয় না। ইহা দ্বারাও বুঝা যায়, ধান্যাদির সহিত সংশ্লেষ মাত্রই হয়।

রেতঃসেক্তার সহিত যোগ হওয়ার পরে যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর সেই চন্দ্রলোকচ্যুত জীব

যোনেঃ শরীরম্ ॥২৭॥

যোনি হইতে ভোগোপকরণ শরীর লাভ করে।

এইরূপে চন্দ্রলোকচ্যুত জীবের পুনরায় জন্মলাভ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

গুরু। এক্ষণে জীবের স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থার আলোচনা করা যাউক।

স্বপ্ন

শিষ্য। স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হয়, তাহা কি সত্য, না কাল্পনিক? "সে স্থানে (অর্থাৎ স্বপ্নে) রথ থাকে না, রথের বাহন অশ্ব থাকে না, রাস্তা থাকে না, অথচ রথ, অশ্ব, রাস্তা **সৃষ্টি করে**" (বৃঃ ৪. ৩. ১০) ইত্যাকার শ্রুতি হইতে ত মনে হয় যে, স্বপ্নের সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায়ই সত্য। সুতরাং বলিতে হয়

সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ, আহ হি ॥১॥

স্বপ্নে [সন্ধ্যে]* জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়ই সত্য সৃষ্টি হয় [সৃষ্টিঃ]; যেহেতু [হি] শ্রুতি সেইরূপই বলেন [আহ]।

নির্ম্মাতারং চ একে পুত্রাদয়শ্চ ॥২॥

আবার [চ] কোন কোন বেদের শাখায় [একে] আত্মাকে কামের স্রষ্টা বা নির্ম্মাতা [নির্ম্মাতারম্] বলা হইয়াছে। আর [চ] ও স্থলে কামশব্দে পুত্রাদি কাম্য পদার্থই [পুত্রাদয়ঃ] বুঝায়। "ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যিনি বাঞ্ছিত পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া জাগ্রত থাকেন—" (কঃ ৫. ৮) ইত্যাদি বাক্যে ঐ নির্ম্মাতা বা স্রষ্টা পরমেশ্বর বলিয়াই মনে হয়, কারণ ঐ স্থলে তাঁহার সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। সুতরাং

---

* জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলে।

পরমেশ্বরই যখন স্বপ্ন পদার্থের স্রষ্টা, তখন স্বাপ্নিক পদার্থও জাগ্রৎ পদার্থের ন্যায়ই সত্য হইবে।

গুরু। না বৎস! স্বপ্নের সৃষ্টি জাগ্রদবস্থার পদার্থ সকলের ন্যায় সত্য নহে, উহা

মায়ামাত্রং তু কাৎর্স্নেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥৩॥

কেবল মায়াময়ী [মায়ামাত্রম্]; যেহেতু, জাগ্রদবস্থার পদার্থ সমূহের যে সমস্ত স্বভাব, তাহা স্বপ্ন-পদার্থে সম্পূর্ণরূপে [কাৎর্স্নেন] অভিব্যক্ত হয় না [অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ]। অন্ততঃ ব্যবহারিক হিসাবেও যে সমস্ত কারণে আমরা বস্তুর সত্যতা নির্দ্ধারণ করি, তাহার কোনটীই স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থে নাই। প্রথমতঃ মনে কর, স্বপ্নে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিলে। এই ক্ষুদ্র দেহাভ্যন্তরে ওরূপ বৃহৎ অট্টালিকার স্থান সঙ্কুলন হয় কি? স্বপ্নাবস্থায় জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বস্তু উপলব্ধি করে—এরূপও বলিতে পার না। কেন-না, মনে কর—তুমি এই গৃহে শয়ন করিয়া আছ। স্বপ্নে দেখিলে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করিতেছ। এরূপ অল্প সময়ে অতদূর যাওয়া কি সম্ভব? আবার এমন স্বপ্নও হয়, যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তনই হয় না, স্বপ্নদৃষ্ট দূরদেশে থাকিতে থাকিতেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্নে যদি জীব যথার্থই দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তবে যে ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, সে স্থলে দেহ ত নির্জ্জীব হইবার কথা,কিন্তু তাহাত হয় না। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় জীব দেহ ছাড়িয়া যায় না, ইহা নিশ্চিত। আবার দেখ, স্বপ্ন দেখিতেছ রাত্রে, অথচ মনে হয়, দিন। স্বপ্ন হয়ত পাঁচ মিনিট ব্যাপিয়া হইল, অথচ মনে হয় যেন পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাল সম্বন্ধেও স্বপ্নের সত্যতা নাই। তারপর দেখ, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে,

অথচ মনে হয় যেন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বেশ নিজ নিজ কাজ করিতেছে। বিশেষতঃ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জাগ্রত হইলে মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয়। এমন কি, স্বপ্নেও সময়ে ঐ সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। একটী মানুষ দেখিতে দেখিতে হস্তী হইয়া যায়, আবার সেই হস্তীই মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী অট্টালিকায় পরিণত হয়—এরূপ স্বপ্ন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মায়া বা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়। উহা কেবল সংস্কার-সহায়ে অজ্ঞানের পরিণাম বা বিজৃম্ভণ মাত্র।

তবে স্বপ্ন মায়ার বিজৃম্ভণ হইলেও উহা দ্বারা সময়ে সত্যের আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেন-না স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের

সূচকঃ চ হি শ্রুতেঃ আচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৪॥

সূচক, যেহেতু; শ্রুতিও সে কথা বলেন [শ্রুতেঃ হি] এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও [তদ্বিদঃ চ] সেরূপ বলেন [আচক্ষতে]। শ্রুতি বলেন, "কোন কাম্য কর্ম্ম সম্পাদন কালে স্বপ্নে যদি স্ত্রীদর্শন হয়, তবে সেই স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সেই কাম্য কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে—জানিও" (ছাঃ ৫. ২. ৯)। "স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দৃষ্ট হইলে সেই পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার বিনাশ সূচনা করে।" এই সব শ্রুতি বাক্য ও স্বপ্নতত্ত্ব-বিদ্গণের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচক।

শ্রুতিতে যে স্বপ্নে রথাদির সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তব সৃষ্টি অর্থে উক্ত হয় নাই। জীব সংস্কার বশে ও অবিদ্যার প্রভাবে ওরূপ এক একটা কল্পনা করে মাত্র। ঐ সৃষ্টি ব্রহ্মপ্রকরণে উক্ত হইলেও উহা ব্রহ্মের সৃষ্টি নয়, জীবেরই কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র। স্বপ্নাদি বিভিন্ন অবস্থায় জীবের স্বরূপ

প্রদর্শন করিয়া সে যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়—শ্রুতি ঐস্থলে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে সেই স্বপ্নের সৃষ্টিতেও সেই সর্ব্বনিয়ন্তাই অধিষ্ঠাতা বটেন। তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত জীব কোনরূপ কল্পনা করিতেও অক্ষম। ব্যবহারিক সৃষ্টিতে ও স্বাপ্নিক সৃষ্টিতে প্রধান পার্থক্য এই যে, ব্যবহারিক সৃষ্টি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর স্বাপ্নিক সৃষ্টি প্রতিনিয়তই বাধিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব যখন ঈশ্বরের অংশ, তখন তাহারও অবশ্য ঈশ্বরের মত অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণ ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে। ফুলিঙ্গেরও কিঞ্চিৎ দাহিকাশক্তি ও প্রকাশশক্তি আছে। সুতরাং সেই ঐশ্বরিক শক্তির বলে জীব স্বপ্নে সত্য সত্যই রথাদি সৃষ্টি করে, এরূপ বলিতে দোষ কি ?

গুরু। দোষ আছে; জীব ঈশ্বরের অংশ হইলেও উভয়ের পার্থক্যও যথেষ্ট। ঈশ্বর যখন যে সংকল্প করেন, তাহা তন্মুহূর্ত্তেই সিদ্ধ হয়, কিন্তু জীব যাহা সঙ্কল্প করে, তাহা কদাচিৎ কার্য্যে পরিণত হয়। জীবের ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে বটে,

পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতম্, ততঃ হি অস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥৫॥

কিন্তু [তু] তাহা অবিদ্যার আবরণে তিরোহিত [তিরোহিতম্] থাকে, কার্য্যকরী হইতে পারে না, অবিদ্যা সেই শক্তিকে ব্যক্ত হইতে দেয় না, রুদ্ধ করিয়া রাখে। যখন পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা [পরাভি-ধ্যানাৎ] সেই অবিদ্যার আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ যখন 'আমি ব্রহ্মই' ধ্যানযোগে এই জ্ঞান উদিত হয়, তখন জীবের চিরসিদ্ধ

জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি আপনিই প্রকাশ পায় এবং তখনই সে সর্ব্বশক্তিমান্ হয়। তৎপূর্ব্বে জীবের সাধ্য নাই যে সে স্বপ্নেও ওরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থ যথার্থই সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্যই [হি] জীবের [অস্য] বন্ধ এবং মোক্ষও [বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ] পরমেশ্বরের অধীন [ততঃ]। পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে মোক্ষ এবং স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ। যতদিন অজ্ঞান বা অবিদ্যা, ততদিনই শক্তির অবরোধ; জ্ঞান হইলে জীবের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বতঃই প্রকাশ পায়।

দেহযোগাৎ বা সঃ অপি ॥৬॥

সেই যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যশক্তির তিরোভাব, তাহাও [সোঽপি] আবার দেহসম্বন্ধ থাকায় [দেহযোগাদ্বা] হয়। জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বরিক শক্তি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির সম্পর্কে অবরুদ্ধ থাকে। দিয়াশলাই কাঠিতে অগ্নি থাকিলেও তাহার যেমন প্রকাশ নাই, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিক শক্তিও অপ্রকট। জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও দেহাদিতে অভিমানই জীবকে খর্ব্ব করিয়া রাখে। সুতরাং সে সঙ্কল্পমাত্রে রথাদি সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব স্বপ্ন মায়া বা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুষুপ্তি

শিষ্য। স্বপ্নহীন গাঢ়নিদ্রাকেই সুষুপ্তি বলে। সেই অবস্থা উদ্দেশ করিয়া কোন শ্রুতি বলেন, "জীব তখন হিতা নামক নাড়ীতে

শয়ন করে" (ছাঃ ৮. ৬. ৩)। কোন শ্রুতি বলেন, "জীব তখন **পুরীততে** (হৃদয়াভ্যন্তরে) শয়ন করে" (বৃঃ ২. ১. ১৯)। আবার কোন শ্রুতি বলেন, "জীব তখন **পরমাত্মায়** বিশ্রামলাভ করে" (ছাঃ ৬. ৮. ১)। এরূপ বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্য কি ?

গুরু। শ্রুতি বস্তুতঃ সুষুপ্তিতে বিভিন্ন স্থানের নির্দ্দেশ করেন নাই। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে,

তদভাবঃ নাড়ীষু তৎ-শ্রুতেঃ আত্মনি চ ॥৭॥

স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি [তদভাবঃ] নাড়ীতে [নাড়ীষু], পুরীততে এবং পরমাত্মাতে [আত্মনি চ] হয়; যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তচ্ছ্রুতেঃ]; অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য 'হিতা'নামক নাড়ীপথে 'পুরীততে' গমন করিয়া পরমাত্মায় বিশ্রামলাভ করে—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। দেখ, শ্রুতি সুষুপ্তি সম্বন্ধে বলেন যে, "জীব তখন ব্রহ্মসম্পন্ন হয়" (ছাঃ ৬. ৮. ১) [কিন্তু অজ্ঞানবীজ বর্ত্তমান থাকায় বুঝিতে পারে না যে, 'আমি ব্রহ্ম হইয়াছি'] এবং তখন 'এটা ওটা সেটা' ইত্যাকার ভেদজ্ঞানও লোপ পায়। এই সমস্ত শ্রুতির উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, **জীব সুষুপ্তি কালে পরমাত্মাতেই** অবস্থান করে,* নাড়ী, পুরীতৎ এই সব তাহার দ্বারমাত্র।

---

* সুষুপ্তিতে অজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য উপাধি অপগত হয় বলিয়া জীবের স্বরূপ অনেকটা অনাবৃত হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ জীবের স্বরূপ বুঝাইতে বিশেষভাবে সুষুপ্তির আলোচনা করিয়াছেন। সুষুপ্তি ও সমাধি বা স্বরূপে স্থিতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, সুষুপ্তিতে অজ্ঞানরূপ উপাধি থাকে, সমাধিতে থাকে না।

তারপর, সুষুপ্তির স্থান যে আত্মা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই ; কারণ,

অতঃ প্রবোধঃ অস্মাৎ ॥৮॥

আত্মাই সুষুপ্তি স্থান বলিয়া [অতঃ] শ্রুতি আত্মা হইতেই [অস্মাৎ] প্রবোধ [প্রবোধঃ] হয়—ইহা বলিয়াছেন। শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, জীব পরমাত্মা হইতেই [নিদ্রাভঙ্গে] পুনঃ প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হয়—নাড়ী বা পুরীতৎ হইতে নহে। সুতরাং এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, জীব পরমাত্মাতেই সুপ্ত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, যে জীব সুপ্ত হয়, সেই কি জাগ্রত হয়, না অন্য কেহ ?

গুরু। এরূপ সন্দেহ কেন করিতেছ ?

শিষ্য সুষুপ্তির অবস্থায় জীব যখন ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তখন সে-ই যে আবার উত্থিত হয়, তাহা বুঝি কিরূপে ? সমুদ্রের মধ্যে এক বিন্দু জল ফেলিয়া দিলাম, আবার এক বিন্দু জল উঠাইলাম ; এক্ষণে এই জলবিন্দুই যে সেই পূর্ব্বের নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু, তাহাত স্থির করা যায় না, হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।

গুরু। না, বৎস ! যে সুপ্ত হয়,

স এব তু কর্ম্ম-অনুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥৯॥

সে-ই [স এব তু] উত্থিত হয়, অন্যে নহে,—ইহা কর্ম্ম, অনুস্মৃতি ; সাক্ষাৎ শ্রুতি বাক্য ও শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য দ্বারা [কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দবিধিভ্যঃ] নির্ণয় করা যায়। (১) দেখ, সুপ্তির পূর্ব্বে যে কর্ম্ম অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় থাকে, সুপ্তিভঙ্গের পর সেই কর্ম্মেরই অবশিষ্ট ভাগ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। সুপ্ত ও সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যদি এক

না হয়, তবে এরূপ হইতে পারে না। একের আরব্ধ কর্ম শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন? (২) সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যে স্মরণ করে 'আমিই অমুক অমুক করিয়াছিলাম'—ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে সে-ই সুপ্ত হইয়াছিল। (৩) শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "যে যেজীবরূপে সুপ্ত হয়, সে সেই জীবরূপেই উত্থিত হয়" (ছাঃ ৬.৯.৩)। (৪) তারপর, একবার সুপ্ত হইলেই যদি জীবের ব্যক্তিত্ব (identity) অনিশ্চিত হইয়া যায়, তবে কি কর্মবিধি ('এরূপ এরূপ করিবে'—ইত্যাকার শাস্ত্রের আদেশ), কি জ্ঞানবিধি ('জ্ঞান লাভ করিবে'—ইত্যাকার শাস্ত্র) সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ জলবিন্দুর ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকিলেও জীবের ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিবার উপায় যথেষ্টই পাওয়া যায়। আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, এইরূপ যে জীবে জীবে একটা পার্থক্য, তাহা আমার, তোমার, রামের, শ্যামের এক একটা পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট উপাধি নিবন্ধনই হয়। এই উপাধি না থাকিলে (জাগ্রতাদি সমস্ত অবস্থায়ই) জীবে জীবে কোন পার্থক্যই থাকে না। একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত সেই উপাধিলয়ের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সুতরাং কি সুপ্তি, কি সুপ্তোত্থান, সব সময়েই নির্দ্দিষ্ট উপাধি জীবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; ফলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি রাম, কি শ্যাম এরূপ সন্দেহের অবসরই হয় না। সুষুপ্তিতে স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি উপাধির লয় হইলেও প্রত্যেক জীবের অজ্ঞানবীজরূপ উপাধি পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহার প্রভাবেই আবার প্রবোধ হয়, না হইলে পুনঃ প্রবোধই অসম্ভব হইত। আর জলবিন্দুর দৃষ্টান্তও ঠিক নয়। জল-বিন্দুকে যে ভাবে পৃথক্ করা যায়, জীবকে কিন্তু সে ভাবে পৃথক্ করা যায় না। পরমাত্মা স্বয়ং উপাধি সম্পর্কে জীব বলিয়া কথিত হন—

ইহা বারংবার বলিয়াছি, স্মরণ রাখিও। সুতরাং যে সুপ্ত হয়, সে-ই প্রবুদ্ধ হয়, ইহা নিশ্চিত।

শিষ্য। মূর্চ্ছা কি?

গুরু। মূর্চ্ছা জাগ্রত অবস্থা নয়, কারণ তখন ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে ও চৈতন্যের কোন অভিব্যক্তি হয় না। মূর্চ্ছা স্বপ্নও নয়, কারণ স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকিলেও মন আপনার কাজ করিতে থাকে। ইহাকে মৃত্যুও বলা যায় না, কারণ মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও প্রাণক্রিয়া চলিতে থাকে, শরীরের উত্তাপও বর্ত্তমান থাকে, এবং মৃতব্যক্তির শরীরে পুনরায় চেতনার সঞ্চার হয় না, কিন্তু মূর্চ্ছিতের হয়। আবার মূর্চ্ছাকে ঠিক সুষুপ্তিও বলা যায় না, কেন-না সুষুপ্তের মুখমণ্ডল প্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত, এবং দেহ নিষ্কম্প থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসও নিয়মিতভাবেই প্রবাহিত হয়; কিন্তু দীর্ঘকাল শ্বাসরুদ্ধ হয়, দেহ অনেক সময় কম্পিত হয়, মূর্চ্ছিতের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়, নেত্রও উন্মীলিত থাকিতে পারে। সুপ্ত ব্যক্তিকে অতি সহজেই জাগ্রত করা যায়, কিন্তু মূর্চ্ছিতকে অতি কষ্টেই চেতন করা যায়। ইন্দ্রিয়গণ পরিশ্রান্ত হইলে সুপ্তি আসে, মূর্চ্ছা আঘাতাদি কারণে উৎপন্ন হয়। এই জন্য

মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥১০॥

পরিশেষে [পরিশেষাৎ] বলিতে হয় যে, মূর্চ্ছিত অবস্থায় [মুগ্ধে] কতকটা সুষুপ্তি-অবস্থা প্রাপ্তি, কতকটা অন্যান্য অবস্থা প্রাপ্তি [অর্দ্ধসম্পত্তিঃ] হয়।

শিষ্য। সুষুপ্তি অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে আপনি বলিয়াছেন যে, এক ব্রহ্মই জাগ্রতাদি অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকেন, তবে ঐ সমস্ত উপাধি (অবস্থা) নিবন্ধনই তাঁহাকে জীব বলা হয়। তাহা হইলে ত ব্রহ্ম অবস্থার অতীতরূপে এক প্রকার, আর অবস্থার সহযোগে অন্য প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটী রূপ—একটী অবস্থার অতীত, তাহাতে কোন প্রকার ভেদ বা বিশেষ নাই, অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ; অপর অবস্থার অধীন, সবিশেষ। **সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ** ব্রহ্মের এই দুই রূপই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিবলেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম অবস্থাভেদে উভয়রূপ—অর্থাৎ তিনি নির্ব্বিশেষও বটেন, সবিশেষও বটেন।

গুরু। না, বৎস! একই বস্তু সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এরূপ পরস্পর—একান্তবিরুদ্ধ স্বভাবান্বিত হইতে পারে না। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম বিশেষ বিশেষ রূপ (যেমন, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি)যুক্ত এবং রূপাদিবিহীনও—এরূপ হইতে পারে না। কোন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি প্রযুক্তই হইতে পারে না। শ্রুতির প্রামাণ্য যত বড়ই হউক না কেন, ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি করিলে সেই শ্রুতি প্রলাপ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাদৃশ বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই কাহারও হইতে পারে না।

শিষ্য। আচ্ছা, একই সময়ে ও একই অবস্থায় একবস্তু বিরুদ্ধধর্ম্মান্বিত হইতে না পারিলেও বিভিন্ন অবস্থায় ওরূপ হইতে বাধা কি? যেমন, একই ব্যক্তি জাগ্রৎ অবস্থায় একরূপ, স্বপ্নাবস্থায় অন্যরূপ, সুষুপ্তাবস্থায় আবার আর একরূপ। সেই প্রকার ব্রহ্মও অবস্থাভেদে কখনও রূপাতীত (নির্ব্বিশেষ), কখনও রূপবান্ (সবিশেষ) হইতে পারেন।

গুরু। ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্,
সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

না, অবস্থাভেদেও [স্থানতোঽপি] পরম ব্রহ্মের [পরস্য] সবিশেষ ও ও নির্ব্বিশেষ এই উভয়স্বভাব [উভয়লিঙ্গম্] সত্য হইতে পারে না [ন], যেহেতু [হি] সমস্ত শ্রুতিতেই [সর্ব্বত্র] ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায় পরিস্ফুট।

উপাধি থাকিলেও বস্তুর যাহা সত্যিকারের স্বরূপ, তাহার কদাচ ব্যত্যয় হইতে পারে না, হয়ও না। জবাপুষ্পরূপ উপাধির সহযোগে স্বচ্ছস্বরূপ স্ফটিকখণ্ডকে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক আর ঐ স্ফটিকখণ্ড রক্তবর্ণ হইয়া যায় না, উহার স্বচ্ছতা উপহিত অবস্থায়ও পূর্ব্বাপর একরূপই থাকে। রক্তবর্ণ বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রম ছাড়া আর কি? একগাছি দড়িকে একটা সাপ বলিয়াই মনে কর, কিম্বা একখানা লাঠি বলিয়াই মনে কর, দড়ি কিন্তু দড়িই থাকে। বস্তুর স্বরূপ যাহা, তাহা অবস্থা-ভেদেও একই রূপে বর্ত্তমান থাকে, অবস্থার ভেদে যাহা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বস্তুর স্বরূপ হইতে পারে না। স্বরূপের পরিবর্ত্তন বা বিচ্যুতি মানে বস্তুটীরই ধ্বংস। পরমাত্মা বস্তুতঃ যাহা, সর্ব্ব অবস্থায় তিনি তাহাই থাকেন, উপাধি যোগে যদি তাঁহাকে অন্যরূপ মনে হয়, তবে সেইরূপ মনে হওয়া নিশ্চয়ই ভ্রম। সুতরাং উপাধিযোগেও পরমার্থতঃ ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—এই দুই স্বভাবান্বিত বলা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মের দুইটী রূপই না হয় সত্য না হইল। কিন্তু তিনি যে কেবল নির্ব্বিশেষই, তাহা স্থির করেন কিরূপে? শ্রুতি ত

উভয়রূপের কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং, ব্রহ্মের সবিশেষরূপই সত্য, নির্ব্বিশেষ রূপ ভ্রম, এরূপও ত বলিতে পারি। নির্ব্বিশেষের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? বিশেষ শ্রুতি যখন নানা প্রকারে ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন—যেমন, চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনত্বাদি-গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম ইত্যাদি। সুতরাং নির্ব্বিশেষের প্রতি পক্ষপাত

ন, ভেদাৎ ইতি চেৎ ?

ঠিক নয় [ন]; যেহেতু, শ্রুতিই নানা প্রকারে ব্রহ্মের ভেদ বা সবিশেষভাব প্রদর্শন করিয়াছেন [ভেদাৎ], এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ]?

গুরু। বৎস! শ্রুতি উভয়রূপের কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু একই বস্তুর ওরূপ উভয়াত্মক স্বভাব যখন একান্তই অসম্ভব, তখন ঐ উভয়ের একটীই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এক্ষণে কোনটা গ্রহণ করিব, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে:—প্রথম দেখিতে হইবে, শ্রুতির তাৎপর্য্য কোন্ পক্ষে। দ্বিতীয়তঃ, দ্রষ্টব্য এই যে, সকল শ্রুতিই যখন সমান প্রামাণ্য, তখন কোনটিকেই একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। অথচ দুই জাতীয় শ্রুতি পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলেন। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, শ্রুতি কি সত্য সত্যই একটা গোঁজামিল দিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন? যদি গোঁজামিল দেওয়াই শ্রুতির উদ্দেশ্য হয়, তবে কি করিয়া আমরা শ্রুতির প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি? উহাকে যে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতিকে যখন আমরা চিরসত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার

করি, তখন নিশ্চয়ই শ্রুতি নির্দ্দোষ—ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বিচার করিতে হইবে, শ্রুতি ওরূপ আপাতঃ-বিরুদ্ধ কথা কেন বলিলেন? শ্রুতির গূঢ় অভিপ্রায় কি? শ্রুতি কোন্ পক্ষ প্রতিপাদন করিতে চান—সবিশেষ, না নির্ব্বিশেষ?

তারপর বিবেচনা কর, সবিশেষ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে কি না। যদি সবিশেষকে সত্যরূপে প্রতিপাদান করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হয়, তবে নির্ব্বিশেষবোধক শ্রুতির গতি কি? আর সবিশেষ মিথ্যা এই তথ্য প্রতিপাদন করিবার জন্যই যদি সবিশেষের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহাতেই বা শ্রুতির লাভ কি? পক্ষান্তরে আবার বিবেচনা কর, নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদন করায় শ্রুতির কোন বিশেষত্ব আছে কি-না, এবং তাহাতে সবিশেষবোধক শ্রুতি অনর্থক হইয়া পড়ে কি-না। মোটের উপর এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে শ্রুতির ঐ আপাতঃবিরোধের একটা ন্যায়সঙ্গত সামঞ্জস্য ও মীমাংসা হইবে, অথচ উভয় জাতীয় শ্রুতির প্রামাণ্যও অব্যাহত থাকিবে।

এক্ষণে দেখ, সবিশেষ অর্থাৎ ভেদ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ ভেদ ত সকলে সর্ব্বত্র অনুভবই করিতেছে। শ্রুতির বিশেষত্বই এই যে, অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞাপন করা, কিম্বা জ্ঞাতবস্তু সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করা, অর্থাৎ যাহা অন্য কোন প্রকারে জানিবার উপায় নাই, তাহা বিজ্ঞাপন করে বলিয়াই শ্রুতির শ্রুতিত্ব, প্রামাণ্য ও বিশেষত্ব। ভেদ যখন সর্ব্ববিদিত, সকলেই যখন ভেদকে সত্য বলিয়া অনুভব করে, তখন শ্রুতি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়া পণ্ডশ্রম করিবেন কেন? ভেদ যে সত্য, তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষই জানিতে পারিতেছি। তাহা বুঝিবার জন্য

আর শ্রুতির শরণাপন্ন হইতে হইবে কেন? সুতরাং ভেদও সত্য, ইহা শ্রুতির প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ 'ভেদও সত্য'—শ্রুতি যদি যথার্থই একথা বলেন, তবে নির্ব্বিশেষবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের আনর্থক্য উপস্থিত হয়। অথচ নির্ব্বিশেষ বা অভেদই আমাদের নিকট নূতন তথ্য, অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যেই এই তথ্য উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই (প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণই ভেদের বা সবিশেষের অতীত কোন কিছুর সন্ধান দিতে পারে না)। শ্রুতি এই অভিনব তথ্য প্রকাশ করেন বলিয়াই শ্রুতির সার্থকতা। তবে সবিশেষ যে অনেক স্থলে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও সবিশেষের সত্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নহে; সবিশেষ, অনুভূতি সত্য নয়, মিথ্যা, পরামার্থ তত্ত্ব নির্ব্বিশেষ—এই উদ্দেশ্যেই সবিশেষের অবতারণা। অন্য কথায়,—শ্রুতি বলিতে চান যে—আমরা সবিশেষ অনুভব করি সত্য, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভ্রমাত্মক। সবিশেষ সম্বন্ধে এই তথ্যটীই আমাদের নিকট নূতন এবং অন্য প্রমাণের অগম্য। এই খানেই শ্রুতির বিশেষ সার্থকতা। সুতরাং নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদন ও ও সবিশেষের মিথ্যাত্ব উদ্‌ঘাটন করাই শ্রুতির গূঢ় অভিপ্রায়। শ্রুতির এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই উহার সার্থকতা রক্ষা হয় এবং সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহেরও একটা সুসঙ্গত সামঞ্জস্য হয়। সুতরাং তুমি যে বলিয়াছ, সবিশেষ প্রতিপাদন করাও শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা

ন, প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

নয় [ন], কারণ, প্রত্যেক সবিশেষ বোধক শ্রুতিবাক্যেই— [প্রত্যেকম্] যাহা সবিশেষ নয় তাহা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষই সত্য বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছে [অতদ্বচনাৎ]। যেমন, "যিনি পৃথিবীতে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, যিনি শরীরে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, ইনিই সেই, যিনি এই আত্মা" (বৃঃ ২.৫.১)। ইত্যাদি শ্রুতি পৃথিবী প্রভৃতি ভেদের উল্লেখ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই দেখাইয়াছেন, মূলে সমস্তই এক আত্মা অর্থাৎ অভেদ। যাহাকে আমরা ভেদ বা সবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করি, শ্রুতি তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, বস্তুতঃ উহা সবিশেষ নয়, উহার পরমার্থ স্বরূপ নির্ব্বিশেষ। এই উদ্দেশ্যেই সবিশেষের এত বিস্তৃত বর্ণনা, ইহা শ্রুতিবাক্য একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবে। যাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রুতির প্রবর্ত্তন, তাহারা সকলেই অর্থাৎ জীবমাত্রেই সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্ব চিন্তায় ভেদের একান্ত অধীন। সেই ভেদাভিভূত জীবকে কিছু বুঝাইতে হইলে ভেদের সাহায্যেই বুঝাইতে হয়। ভেদের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই ঐ গণ্ডী অতিক্রম করিতে হয়, তাহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেইজন্য শ্রুতির তাৎপর্য্যও ভেদপ্রতিপাদনেই, একথা বলিতে পার না। [এই তথ্য ক্রমে আরও পরিস্ফুট হইবে]।

ভেদজ্ঞান যে যথার্থ নয়, এবং অভেদই যে পরমার্থ সত্য,

অপি চ এবম্ একে ॥ ১৩ ॥

তাহা আবার [এবমপি চ] অনেক শ্রুতি [একে] ভেদজ্ঞানের নিন্দাচ্ছলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেমন, "ব্রহ্মস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে প্রতিভাত হয়। ইহাতে নানা অর্থাৎ ভেদ বিন্দুমাত্রও নাই। যে ব্রহ্মকে ভেদযুক্ত দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়, অর্থাৎ তাহার বন্ধনের আর বিরাম হয় না" (কঃ ৪.১১)—ইত্যাদি বহুশ্রুতি স্পষ্টই ভেদের মিথ্যাত্ব ও অভেদের সত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার উভয় বোধক শ্রুতিবাক্য থাকা সত্বেও সাকার ত্যাগ করিয়া নিরাকারকেই কেন পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহার যুক্তি ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—

অরূপবৎ এব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম রূপাদিশূন্যই [অরূপবদেব হি]; যেহেতু, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সমস্ত শ্রুতিবাক্যই প্রধানভাবে রূপাদিরহিত ব্রহ্মই প্রতিপাদন করেন [তৎপ্রধানত্বাৎ]। তাহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। "তত্তু সমন্বয়াৎ"—এই সূত্রেও এই তথ্যই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নিরাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতির মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করা। ফলতঃ উহাদের আর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সাকারবোধক শ্রুতিবাক্যের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই। নিরাকারের ন্যায় সাকারও ব্রহ্মের স্বরূপ, এরূপ বিরুদ্ধ কথা শ্রুতি বলিতে পারেন না। সুতরাং সাকারবোধক বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা নয়, কিন্তু উপাসনার পদ্ধতি প্রদর্শন মাত্র, অর্থাৎ জীব যাহাতে সাকারের ভিতর দিয়াই নিরাকারে পৌঁছিতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দেওয়া; তাহাতেই ঐ সমস্ত বাক্যের সার্থকতা। মোটের উপর কথা হইল এই যে, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ যখন পরস্পর বিরুদ্ধ, তখন উভয়কেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আবার নির্ব্বিশেষকে মিথ্যা বলিলে নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়; তাহাদের আর কোন কার্য্যই থাকে না। কিন্তু শ্রুতির এক অংশ সত্য, আর এক অংশ মিথ্যা—এরূপ বলিলে শ্রুতির প্রামাণ্যই নষ্ট হয়। নির্ব্বিশেষ-প্রতিপাদক বাক্যের যখন ব্রহ্ম স্বরূপ প্রতিপাদন ছাড়া আর কোন সার্থকতা নাই, তখন তাহাকে অবশ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার

করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে, তবে কি সবিশেষ বোধক বাক্য নিরর্থক? ইহার উত্তরে বলিব, না শ্রুতিবাক্য কোনটাই নিরর্থক নহে। সবিশেষ মিথ্যা হইলেও সবিশেষবোধক শ্রুতিরও একটা সার্থকতা আছে।

প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥১৫॥

যাহাতে সবিশেষ শ্রুতির ব্যর্থতা না হয়, সেইজন্য [অবৈয়র্থ্যাৎ] ব্রহ্মকে আলোকের ন্যায় [প্রকাশবৎ] বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যেমন আকাশব্যাপী সূর্য্যালোক গবাক্ষাদির সম্পর্কে চতুষ্কোণ, গোল ইত্যাদি নানাবিধ আকারে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির সম্পর্কে সবিশেষ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তিনি নির্ব্বিশেষই— এই তথ্য প্রকাশ করাতেই সবিশেষ শ্রুতির সার্থকতা; এবং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সত্য স্বরূপ অবধারণ করার সাহায্য হয়।

শিষ্য। কিন্তু একটু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছেন যে, উপাধি যোগেও ব্রহ্মের উভয়রূপতা সিদ্ধ হয় না (১১ সূত্র)।

গুরু। হ্যাঁ, বলিয়াছি বটে, কিন্তু সেরূপ বলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পার নাই। তাৎপর্য্য এই যে, উপাধিযোগেও ব্রহ্মের উভয়রূপতা সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ একাদশ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে— "উপাধিসংযোগে ব্রহ্মকে যে সবিশেষ বলিয়া মনে না হয়, এমন নয়; তবে সেরূপ মনে হইলেও সবিশেষত্ব ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ হইতে পারে না। উপাধির সম্পর্কে যে রূপের প্রতীতি হয়, তাহা উপহিত বস্তুর সত্যিকারের স্বরূপ নয়, ভ্রমমাত্র। সুতরাং উপাধিযোগেও ব্রহ্মের স্বরূপ যে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়াত্মক, তাহা বলা যায় না"।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥১৬॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন [আহ চ] যে, ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র [তন্মাত্রম্], নির্ব্বিশেষ, ভেদরহিত। যথা, "এক টুক্‌রা সৈন্ধব লবণ, যেমন, কি ভিতরে, কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই লবণ ছাড়া আর কিছু নয়, উহা যেমন বাহ্যাভ্যন্তররহিত নিরেট লবণ মাত্র, আত্মাও সেইরূপ বাহ্যাভ্যন্তররহিত, পরিপূর্ণ, চৈতন্যঘন, কেবল চৈতন্যমাত্র, চৈতন্য ছাড়া তাঁহার আর কিছুই নাই" (৪. ৫. ১৩)—এই প্রকার শ্রুতি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সত্যিকারের রূপ।

সেই চৈতন্য ছাড়া আত্মার যে দ্বিতীয় কোন রূপ নাই, তাহা

দর্শয়তি চ, অথো অপি স্মর্য্যতে ॥১৭॥

শ্রুতিও দেখাইয়াছেন [দর্শয়তি চ], এবং [অথো অপি] স্মৃতিও দেখাইয়াছেন [স্মর্য্যতে]। সর্ব্বানুভূত ভেদের উল্লেখ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, "হ্যাঁ, ভেদ বলিলাম বটে, কিন্তু সত্য উপদেশ এই যে—ইহা নয়, ইহা নয়—অর্থাৎ ভেদ সত্য নয়" (বৃঃ ২. ৩. ৬)। আবার, "তিনি জ্ঞানাজ্ঞানের, বাক্যমনের অতীত" (কঃ ১.৩)। শ্রুতিতে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা অবলম্বনে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। বাস্কলী তাঁহার গুরু বাহ্বকে বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ করুন"। গুরু কোনই উত্তর করিলেন না। বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও নিরুত্তরই রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "বৎস! আমার নীরবতা দ্বারাই ত আমি ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ তোমাকে বলিয়াছি। তুমি বুঝিতে পারিলে না? সে যে অখণ্ডৈকরস, প্রজ্ঞানঘন, চৈতন্যমাত্র, কোনরূপ ভেদ যে তাহাতে নাই, বাক্যদ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিব কিরূপে? বাক্য যাহা কিছু বলিবে, তাহা ত

সবই দ্বৈত অবলম্বনেই। সুতরাং ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না"। স্মৃতিতেও বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন, "তুমি যে আমাকে রূপবিশিষ্ট দেখিতেছ, এ মায়া, আমার সত্যিকারের স্বরূপ তুমি দেখিতে পার না"। ইত্যাকার শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের সবিশেষ প্রতীতি যথার্থ নহে, নির্ব্বিশেষত্বই পারমার্থিক। যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ-স্বভাব,

অতএব চ উপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥১৮॥

সেই হেতুই [অতএব] আবার [চ] শ্রুতি উপমা [উপমা] দিয়াছেন—জলসূর্য্যের ন্যায় [সূর্য্যকাদিবৎ]। শ্রুতি বলেন, "যেমন সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহু বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ স্বপ্রকাশ জন্মাদিরহিত আত্মা পরমার্থতঃ এক হইলেও উপাধিনিবন্ধন প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়" (ব্রঃ বিঃ ১২)।

শিষ্য। কিন্তু এই জলসূর্য্যের দৃষ্টান্তটী ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে না। জল একটা মূর্ত্ত অর্থাৎ সাকার পদার্থ, সূর্য্যও মূর্ত্ত পদার্থ। আবার জল হইতে সূর্য্য পৃথক্ এবং দূরে অবস্থিত। সুতরাং জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হইতে পারে। কিন্তু আত্মার কোন আকারই নাই, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অদ্বিতীয়। সুতরাং

অম্বুবৎ অগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্ ॥১৯॥

জলের মত [অম্বুবৎ] দ্বিতীয় কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করায় [অগ্রহণাৎ] ওরূপ [তথাত্বম্] হইতে পারে না [ন], অর্থাৎ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্তটী খাটে না—এরূপ যদি বলি ?—

গুরু। না, এরূপ বলিতে পার না। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক (অর্থাৎ যাহাকে সহজে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হয়, তাহা, কখনও সর্ব্বাংশে সমান হয় না। 'দেবদত্ত সিংহের তুল্য পুরুষ'—ইহাতে কেহই এমন মনে করে না যে, দেবদত্তেরও একটা লেজ আছে, সেও পশুমাংস ভক্ষণ করে, বনে বাস করে ইত্যাদি। দু'টা একটা সাধারণ গুণ বা অবস্থার সাদৃশ্য থাকিলেই সুবিদিত কোন বস্তুর দৃষ্টান্ত দিয়া লোকে দুর্জ্ঞেয় পদার্থকে সহজে বুঝিবার একটা উপায় করিয়া দেয়। দৃষ্টান্তের উপযোগিতা এইটুকুই। সেইরূপ শ্রুতি যে জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে এমন মনে করা উচিত নয় যে, ব্রহ্মও সূর্য্যের মত একটা গ্রহ, আকাশে ঝুলিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিতে হইবে, শ্রুতি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন্ তথ্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য ঐ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রুতির অভিপ্রায় এই মাত্র যে, জলরূপ উপাধির অন্তর্গত হওয়ায় এক অবিকৃত সূর্য্য যেমন বহু ও বিকৃত বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক ও অবিকৃতই থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মও দেহাদি উপাধির সম্পর্কে বহু ও বিকৃত বলিয়া মনে হয় মাত্র। সুতরাং দৃষ্টান্তস্থলে সর্ব্বাংশের সাদৃশ্য গ্রহণ না করিয়া বিবক্ষিত অংশমাত্রই গ্রহণ করা উচিত।

আর,

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ অন্তর্ভাবাৎ উভয়সামঞ্জস্যাৎ এবম্ ॥২০॥

উপাধির অন্তর্ভাব বশতঃ, অর্থাৎ সূর্য্যপক্ষে জল এবং ব্রহ্মপক্ষে দেহাদি উপাধির (মায়িক) সম্পর্ক থাকায় [অন্তর্ভাবাৎ] বৃদ্ধি, হ্রাস ইত্যাদি অংশমাত্রই [বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্] জলসূর্য্যের দৃষ্টান্তে শ্রুতির বিবক্ষিত অংশ, সূর্য্যের আকার, প্রকাশ, দূরত্ব, পৃথকত্ব

ইত্যাদি নহে। অর্থাৎ শ্রুতি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটুকুই বুঝাইতে চান যে, জলের হ্রাস, বৃদ্ধি, কম্পন, আলোড়ন ইত্যাদিতে যেমন সূর্য্যেরও কম্পনাদি ভ্রম হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধির বহুত্ব, অল্পত্ব, বিকৃতি ইত্যাদিতে ব্রহ্মকেও বহু, বিকারশীল ইত্যাদি বলিয়া ভ্রম হয়, ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক ও অবিকৃতই থাকেন। ঠিক এই ভাবেই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের একটা সামঞ্জস্য হয় বলিয়াই [উভয়সামঞ্জস্যাৎ] এইরূপই [এবম্] স্বীকার করা উচিত। [মনে রাখিও, দেহাদি উপাধিও মায়িক, কাল্পনিক ; উহাদেরও পরমার্থতঃ কোন সত্তা নাই]।

দর্শনাৎ চ ॥২১॥

শ্রুতিও দেখাইয়াছেন যে, অবিকৃত পরমাত্মাই দেহাদি উপাধিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট আছেন। যথা, "দ্বিপদ, চতুষ্পদ সর্ব্ববিধ প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তিনি আত্মারূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন" ইত্যাদি (বৃঃ ২.৫.১৮)। সুতরাং জলসূর্য্যের দৃষ্টান্তে কোন দোষ নাই।

অতএব স্থির হইল, ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়াত্মক নহেন।

শিষ্য। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু নির্ব্বিশেষ যাহা, তাহা ত একরূপ নিঃস্বরূপ শূন্য বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক শ্রুতির একটী বাক্য যেন এই সন্দেহ আরও গুরুতর করিয়া তোলে। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ঐ শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মের দুইটী রূপ—এক মূর্ত্ত, অপর অমূর্ত্ত" (বৃঃ ২.৩.১)। ক্রমে শ্রুতি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ কি, তাহা দেখাইতেছেন—মৃত্তিকা, জল ও অগ্নি, এই ভূতত্রয় মূর্ত্তরূপ, আর বায়ু ও আকাশ অমূর্ত্ত রূপ। তারপর এই রূপদ্বয় সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া অবশেষে শ্রুতি বলিলেন, "ইহার

পরের কথা, অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ হইল এই যে, "এ নয়, এ নয় [নেতি নেতি]"। অর্থাৎ সমুদায় রূপ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নয়, ব্রহ্মের যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা ঐ রূপ প্রপঞ্চের অতীত। রূপ প্রপঞ্চ সাধারণ দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নয়, সেইজন্য ব্রহ্মকে বলা হয় "সত্যের সত্য"। যেহেতু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সেইজন্য তিনিই কেবল স্বস্বরূপে পরম সত্য। শ্রুতির অর্থ এইরূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু শ্রুতি দুইবার 'এ নয়', 'এ নয়' এইরূপ নিষেধ করিয়া কোন্ কোন্ বস্তুর অনস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আপাততঃ ত মনে হয় যে, দুইটী নিষেধ দ্বারা ব্রহ্ম এবং রূপ প্রপঞ্চ উভয়েরই নিষেধ করা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মও নাই, রূপ প্রপঞ্চও নাই—শ্রুতি যেন এইরূপ বলিতে চান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রূপপ্রপঞ্চ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাহার নিষেধ (তাহা নাই, এরূপ উক্তি) কিরূপে হইবে? বরং ব্রহ্ম নাই, এরূপ নিষেধ সম্ভব হইতে পারে, কারণ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ফলে তাদৃশ ব্রহ্ম বস্তুতঃ বাক্য মনের অগোচর। আর যাহার সম্বন্ধে কিছু বলাও যায় না, যাহাকে চিন্তা করাও যায় না, তাহা ত একরূপ নাই-ই।

গুরু। না বৎস! তুমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। বাক্য ও মনের অগোচর বস্তু তোমার কাছে নাই, একথা সত্য বটে। তোমার কাছে যাহা আছে, অর্থাৎ যতটা তোমার জ্ঞানের বিষয় হয়, শ্রুতিও যদি ততটাই বলেন, তবে আর শ্রুতির বিশেষত্ব কি? তুমি যাহা জান না, কিংবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে যাহা জানিতে পার না, এমন কোন নূতন তথ্য আছে এবং সেই তত্ত্ব কিরূপে

জানা যায়, শ্রুতি সেরূপ উপদেশ দেন বলিয়াই শ্রুতির বিশেষত্ব, তাহাতেই শ্রুতির প্রামাণ্য, তাহাই শ্রুতির শ্রুতিত্ব। শ্রুতি ব্রহ্মের নিষেধ করেন নাই, বরং রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রূপপ্রপঞ্চের নিষেধের অর্থও এই নয় যে, উহা একেবারেই নাই, আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। ঐ নিষেধের অর্থ এই যে, তুমি যেভাবে রূপপ্রপঞ্চ দেখিতেছ—অর্থাৎ তুমি যে ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছ—বাস্তবিক ইহা তা নয়—অর্থাৎ ইহা সত্য নয়, মিথ্যা। ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রুতি কুত্রাপি ব্রহ্মের নিষেধ করেন নাই, করিতে পারেন না। ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির প্রবৃত্তি। আলোচ্য শ্রুতিও প্রথমেই এই বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, "তোমাকে ব্রহ্ম কি, তাহা বলিব" (বৃ.২.১.১)। শ্রুতি স্বয়ং সেই ব্রহ্মেরও নিষেধ করিয়াছেন, ইহা একান্ত অসম্ভব। তারপর দেখ, ব্রহ্ম ও রূপপ্রপঞ্চ সবই যদি শ্রুতি নিষেধ করিবেন, তবে ত শূন্যবাদই শ্রুতির প্রতিপাদ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুই নাই (শূন্যবাদ) এরূপ হইতে পারে না। কিছুই নাই, এ তত্ত্ব যাহার নিকট প্রতিভাত হইতেছে, সে অবশ্যই আছে। সুতরাং শূন্যবাদ একটা কথার কথা মাত্র। সর্ব্ববিধ নিষেধের মূলে একটী অস্তিত্ববান্ পদার্থ থাকিবেই। সেই অস্তিত্ববানের অবলম্বনেই নিষেধের প্রবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতির নিষেধদ্বয় ব্রহ্ম ও রূপপ্রপঞ্চ উভয়ের অনস্তিত্ব বা মিথ্যাত্ব খ্যাপনের অভিপ্রায়ে নয়, ইহা নিশ্চিত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই যখন সমস্ত শ্রুতির উদ্দেশ্য, তখন ব্রহ্মও নিষিদ্ধ হয় নাই, ইহাও নিশ্চিত। ফলে স্থির হয় যে, উক্ত শ্রুতিতে রূপপ্রপঞ্চই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই কথাই সূত্রকার বলিতেছেন,

প্রকৃত-এতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততঃ ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥২২॥

শ্রুতি এযাবৎ যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে [প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্] (অর্থাৎ ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত রূপদ্বয়) তাহাই ("নেতি নেতি" বলিয়া) নিষেধ করিতেছেন [প্রতিষেধতি], নিষেধ করিয়া আবার [চ] 'ইহা হইতে [ততঃ] অধিক [ভূয়ঃ] আছে' ইহাও বলিয়াছেন [ব্রবীতি]। অর্থাৎ শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, কি মূর্ত্ত রূপ, কি অমূর্ত্তরূপ কিছুই ব্রহ্মের সত্যিকারের স্বরূপ নয়, সত্যিকারের স্বরূপ যাহা, তাহা ঐ উভয়াতিরিক্ত, তাহাই সত্যের সত্য।

শ্রুতি ব্রহ্মকে বাক্য মনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম নাই-ই, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রুতি সমুদায় রূপপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়া বলিলেন, "এই সব প্রপঞ্চের অতীত পরম পুরুষ আছেন" (বৃঃ ২. ৩. ৬)। "তিনিই চরম সত্য" (বৃঃ ২. ১. ২০)। সুতরাং শ্রুতি ব্রহ্মের নিষেধ করেন নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, যদি প্রপঞ্চাতিরিক্ত ব্রহ্ম বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাঁহাকে জানা যায় না কেন ?

গুরু। **তৎ অব্যক্তম্ আহ হি ॥ ২৩ ॥**

যেহেতু [হি] শ্রুতিই বলেন [আহ] যে, তিনি [তৎ] অব্যক্ত [অব্যক্তম্], অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইবার অযোগ্য। যিনি সমস্ত জ্ঞানের সাক্ষী, তাঁহাকে কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিবে ? একমাত্র শ্রুতি ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ অবধারণের দ্বিতীয় উপায় নাই।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

তবে [অপি] আরাধনা দ্বারা অর্থাৎ ধ্যানযোগে [সংরাধনে]

সেই অব্যক্ত, প্রপঞ্চাতীত পরমাত্মা যোগিগণের চিত্তে প্রকাশিত হন—ইহা প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) ও অনুমান (স্মৃতি) হইতে জানা যায় [প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্]। শ্রুতি বলেন, "স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখীন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারা বহিঃ পদার্থই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে কোন কোন প্রশান্তচিত্ত মোক্ষার্থী সাধক ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখিতে পান" (কঃ ৪. ১)। স্মৃতিও বলেন, "যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে দেখেন" ইত্যাদি।

শিষ্য। আচ্ছা, যোগীরা ধ্যানবলে পরমাত্মাকে দেখেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে একজন ধ্যাতা (যিনি ধ্যান করেন), আর একজন ধ্যেয় (যাঁহার ধ্যান করা হয়)—এই দুইজন থাকায় ধ্যেয় পরমাত্মা ছাড়া অন্য একজন আছে, ইহাও স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাহা হইলে ত ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব থাকে না।

গুরু। আরাধ্য ও আরাধক ভাব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হয় না ;

প্রকাশাদিবৎ চ অবৈশেষ্যম্, প্রকাশশ্চ কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ ॥ ২৫ ॥

সূর্য্যালোক প্রভৃতির ন্যায় [প্রকাশাদিবৎ] ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিশেষ বা ভেদ রহিত, তাহা [অবৈশেষ্যম্] স্থির হয়। সূর্য্যালোক, আকাশ কিম্বা সূর্য্য যেমন স্বতঃ এক হইলেও গবাক্ষাদি, ঘটাদি কিম্বা বিভিন্ন জলপাত্রাদি উপাধিতে বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাও [প্রকাশশ্চ] সেইরূপ

ধ্যানাদি কর্ম্মরূপ উপাধিতে [কর্ম্মণি] বহু বলিয়া প্রতিভাত হন মাত্র, বস্তুতঃ তিনি একই, তাঁহার আর কোন বৈশেষ্য বা পার্থক্য নাই—একথা শ্রুতির পুনঃ পুনঃ অভেদ উক্তি হইতে [অভ্যাসাৎ] স্থির করা যায়। "তুমিই সেই," "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার বহু শ্রুতিই আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সুতরাং যেহেতু অভেদই পারমার্থিক ও স্বাভাবিক এবং ভেদ অবিদ্যাকল্পিত, ঔপাধিক,

অতঃ চ অনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥

সেই হেতুই [অতঃ চ] জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া জীব অনন্তের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত [অনন্তেন] ঐক্য প্রাপ্ত হয়; কারণ শ্রুতি সেইরূপই [তথা] নিদর্শন [লিঙ্গম্] দিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, "যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে পরব্রহ্মই হয়" (মুঃ ৩.২.৯.)* ভেদ যদি পারমার্থিক হইত, তবে জ্ঞানের ফলে পরম ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া কোন মতেই সম্ভব হয় না। জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্তিরই বিনাশ হইতে পারে, পরমার্থ সত্যের লয় হইতে পারে না। সুতরাং ভেদ ভ্রান্তিমাত্র, অভেদই পরমার্থ।

(কোন কোন শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, বহুস্থলে আবার অভেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ এই উভয় প্রকার উপদেশের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—

---

* যে-কোন বস্তু জ্ঞাত হইবার যোগ্য, তাহাই আত্মাতিরিক্ত। সুতরাং আত্মাকে জানা অসম্ভব। তবে আত্মজ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মা সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বিনাশ মাত্র, কাজেই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্ম হওয়া—যদিও এই 'হওয়া' একটা নূতন কিছু হওয়া নয়, আত্মা চিরকাল সত্য সত্য যাহা, তৎস্বরূপেই প্রকাশ পাওয়া মাত্র।

উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহি-কুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥

যেহেতু ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকারের উপদেশই শ্রুতিতে আছে, সেই হেতু [উভয়ব্যপদেশাৎ] উভয় প্রকার শ্রুতির সার্থকতার জন্য বলিতে হইবে যে, তত্ত্ব হইল—সর্প ও সর্পকুণ্ডলীর মত [অহিকুণ্ডলবৎ], অর্থাৎ সর্প হিসাবে—কি প্রসারিত আকৃতি, কি কুণ্ডলাকৃতি উভয়ই এক, প্রসারিত-দেহ সর্পও সর্প, কুণ্ডলাকৃতি সর্পও সর্প; আবার প্রসারণ ও সঙ্কোচন হিসাবে বহু। ঠিক এইভাবে ব্রহ্মরূপে সবই এক, আবার জীব, ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে বহু। সুতরাং ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য।

প্রকাশ-আশ্রয়বৎ বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

অথবা [বা] আলোক ও আলোকের আশ্রয় সূর্য্য যেরূপ তেজ হিসাবে [তেজস্ত্বাৎ] এক, আবার আলোক ও সূর্য্য রূপে ভিন্ন, সেইরূপ আলোক ও সূর্য্যের ন্যায় [প্রকাশাশ্রয়বৎ] জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ উভয়ই ব্যাখ্যাত হইতে পারে।)

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার দোষ এই যে, ভেদ যদি সত্যই হয়, তবে কোন কালেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ ভেদই হইল বন্ধন। সুতরাং ভেদ সত্য হইলে সমুদায় মোক্ষশাস্ত্রকে ব্যর্থ বলিতে হয়। কারণ বন্ধন বা ভেদ সত্য বলিয়া মোক্ষ কোনকালেই হইতে পারিবে না। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত উভয়প্রকারের ব্যাখ্যাই অসমীচীন। অতএব বলিতে হইবে,

পূর্ব্ববৎ বা ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপই [পূর্ব্ববৎ বা] সঙ্গত ব্যাখ্যা; অর্থাৎ ২৫ সূত্রে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই সমীচীন।

প্রতিষেধাৎ চ ।। ৩০ ।।

আর [চ] শ্রুতি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তের নিষেধ করিয়াছেন বলিয়াও [প্রতিষেধাৎ] বলিতে হইবে যে, ভেদ উপাধি-নিবন্ধন, অভেদই পারমার্থিক।

শিষ্য। ২২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, চরম বস্তু। কিন্তু

পরম্ অতঃ সেতু-উন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশাৎ ।। ৩১ ।।

এই ব্রহ্ম হইতেও [অতঃ] শ্রেষ্ঠ কেহ [পরম] আছেন বলিয়া বোধ হয় ; কারণ শ্রুতি এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে **সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদের** উল্লেখ করিয়াছেন [সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশাৎ]। (১) সেতুর উল্লেখ, যেমন—"যিনি আত্মা, তিনি বিধারক সেতু" (ছাঃ ৮.৪.১)। ইহাতে মনে হয়, লোকে যেমন সেতুর (পুল) সাহায্যে অপর পারে গমন করে, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সেতু অবলম্বনে অন্য কিছু পাওয়া যায়। (২) 'উন্মান', যথা—"ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টক্ষুরবিশিষ্ট এবং ষোড়কলাত্মক" [কলা – অংশ] ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের একটা পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। যাহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, 'ইহা এতটা বড়', তাহা অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, এবং তাহা হইলে তাহা ছাড়া অন্য কিছুও অবশ্য আছে। (৩) আবার শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, সুষুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য পদার্থও (জীব) আছে, যাহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয়। (৪) তারপর আবার শ্রুতি "আদিত্য পুরুষ"

(ছাঃ ১.৬.৬), "অক্ষি পুরুষ" (ছাঃ ১.৭.৫) ইত্যাদিরূপে নানা-রকমের ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন (ভেদ)। ইহাতেও মনে হয়, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য তত্ত্ব আছে ; কারণ, ঐ ভেদে ব্রহ্মকে সসীম বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় ; আর যাহা সসীম, তাহা অন্য কিছু দ্বারাই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই চার কারণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্বও শ্রুতি স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থ বা তত্ত্ব নাই। ব্রহ্ম হইতেই যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব, তাঁহাতেই অবস্থান ও লয় হয়। সুতরাং কোন কিছুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়—এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই স্থাপন করা হইয়াছে। 'এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' রূপ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় দ্বারাও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রুতি ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই। তুমি শ্রুতির সেতু প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্য ভুল বুঝিয়াছ। পরমাত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে

সামান্যাৎ তু ॥৩২॥

কেবল সেতুর সহিত একটী বিষয়ের সাম্য আছে বলিয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দৃষ্টান্তের সকল গুণ লক্ষ্য করিয়া কোথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় না। সেরূপ হইলে ব্রহ্মকে সেতুর মত ইষ্টক লৌহাদি নির্ম্মিতও বলিতে হয়। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, লৌকিক সেতু যেমন উভয় পারের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উভয়ের সীমা নির্দ্দেশ করে, ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের (গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু ইত্যাদির) আপন আপন সীমা বা গণ্ডীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমুদায় পদার্থকে ধারণ করিয়া আছেন। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুও আছে, ইহা দেখান শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়।

আর ব্রহ্মকে যে 'পাদ (অংশ) বিশিষ্ট' বলা হইয়াছে, তাহাতেও ব্রহ্ম ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ব্রহ্মকে

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩৩॥

পাদবিশিষ্ট [পাদবৎ] বলা হইয়াছে উপাসনার জন্য [বুদ্ধ্যর্থঃ]। অনন্ত পরমাত্মায় যাহারা মনঃসংযোগ করিতে পারে না, সেই সমস্ত সাধকের ক্রমিক ধ্যানের জন্য ব্রহ্মের পাদাদি কল্পনা করা হইয়াছে।

আর 'সম্বন্ধ' ও 'ভেদে'র উল্লেখেও পরমাত্মা ব্যতীত অন্যের সদ্ভাব প্রমাণিত হয় না। 'সম্বন্ধ' ও 'ভেদে'র উল্লেখ

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি বিশেষ অবলম্বনেই [স্থানবিশেষাৎ] করা হইয়াছে। যেমন সূর্য্যাদির আলোক [প্রকাশাদিবৎ] এক ও ব্যাপী হইলেও গবাক্ষাদি উপাধির সম্বন্ধে বহু ও সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্পর্কেই ভেদজ্ঞান হয়, সেই উপাধির উপশমে এক অদ্বৈত জ্ঞানস্বরূপতাই প্রকাশিত থাকে—এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, এবং সেইরূপ উপাধির ভেদেই পরমাত্মার ভেদ শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বরূপগত ভেদ প্রদর্শন করেন নাই।

উপপত্তেঃ চ ॥ ৩৫ ॥

উপাধি সম্পর্কেই যে সম্বন্ধ ও ভেদের বর্ণন, স্বরূপতঃ এ সব কিছুই নয়, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে। 'সুষুপ্তিতে জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়'—শ্রুতির এই উক্তিতে এবং অদ্বৈত প্রতিপাদক অসংখ্য শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভেদসম্বন্ধ উপাধি-নিবন্ধন, পারমার্থিক নয়।

ব্রহ্ম ছাড়া যে অন্য তত্ত্ব নাই, তাহা

তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতির অন্য তত্ত্বের স্পষ্ট নিষেধ উক্তি দ্বারাও [তথান্যপ্রতিষেধাৎ] স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এমন কিছু নাই, যাহা ব্রহ্ম হইতে পর" (শ্বেঃ ৩.৯)।

অনেন সর্ব্বগতত্বম্ আয়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

এই কারণে—অর্থাৎ সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার নিরাস এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ দ্বারা—[অনেন] ব্রহ্ম যে সর্ব্বব্যাপী তাহাও [সর্ব্বগতত্বম্] সিদ্ধ হয়। সেতু প্রভৃতির মুখ্য অর্থ স্বীকার করিলে এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্ম অবশ্যই তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন হইবেন, এবং তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বের হানি হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সর্ব্বগতত্ব আবার শাস্ত্রোক্ত 'আয়াম' (ব্যাপ্তি) প্রভৃতি শব্দ হইতে [আয়ামশব্দাদিভ্যঃ] জানা যায়। শ্রুতি বলেন, "ইনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য "(ছাঃ ৩.১৪.৩)। স্মৃতি বলেন, "তিনি সর্ব্বগত, স্থির ও অচল" (গীঃ ২. ২৪)—ইত্যাদি।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্র হন, তবে জীবের কর্ম্মফল বিধান করে কে ? সমস্ত কর্ম্মের ফলই আর কিছু সদ্য সদ্য লাভ হয় না, জন্ম জন্মান্তরেও কর্ম্মের ফল ভোগ হইতে পারে। সেই ফলদাতা কে ? ব্রহ্ম নিশ্চয়ই ফলদান করেন না, কারণ তাঁহার কোন প্রয়োজনই নাই, তিনি নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, স্থাণুর (স্তম্ভ) ন্যায়

অচল, অটল। কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া গেলেই তাহার অস্তিত্বের লোপ হয়, সুতরাং কর্ম্ম স্বয়ং কালান্তরে কোন ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। যে নিজেই নাই, সে আবার অন্য কিছু উৎপন্ন করিবে কিরূপে? ফল কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই হয়, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা কালান্তরে তাহা ভোগ করে—একথাও বলা যায় না। কারণ, ভোগের নামই ফল। যতক্ষণ ভোগ না হয়, ততক্ষণ কর্ম্মের আবার ফল কি? জ্যোতিষ্টোম যাগ করিলে স্বর্গফল হয়; এই ফলের অর্থ ত এই বুঝি যে, যজ্ঞকর্ত্তা স্বর্গসুখ ভোগ করেন। সুতরাং ভোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফল হয়ই না। কাজেই বুঝিতে পারিতেছি না, কর্ম্মের ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়।

গুরু। দেখ, পরমব্রহ্ম পারমার্থিক হিসাবে নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বটেন, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে সগুণ, সবিশেষ, সক্রিয় বলিতেই হইবে। কর্ম্মের ফল ব্যবহারিক জগতেরই, সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও ব্যবহারিক ভাবেই হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিই নাই, কর্ম্মফল ত দূরের কথা। ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ব্যবস্থা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই করিতে হয়*। ইহার সহিত পারমার্থিক দৃষ্টির বিনিময় করিয়া ভুল করিও না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন ঈশ্বর আছেন। তাঁহার শাসনেই সংসার চলিতেছে;

ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ ।। ৩৮ ।।

এই ঈশ্বর হইতেই [অতঃ] কর্ম্মফল [ফলম্] উৎপন্ন হয়; কেন-না, ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলেই সমস্ত উপপন্ন হয় [উপপত্তেঃ]। তিনি

---

* এই সমস্ত বিচার ঠিক রজ্জুতে সর্পের আকৃতি প্রকৃতি বিচারের মতই। ঐ সর্প সম্বন্ধে যেমন বিচার হইতে পারে যে, সর্পটী কাল, কি হলুদে, চার হাত লম্বা, না তিন হাত, ফণা আছে, কি নাই ইত্যাদি, ব্যবহারিক বিচারও এইরূপ।

সমস্তের অধ্যক্ষ, তাঁহার অধ্যক্ষতায়ই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র চরম কর্ত্তা, তিনিই দেশকাল সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, সুতরাং দেশকালাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ফল একমাত্র তাঁহার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে।

শ্রুতত্বাৎ চ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিও ঈশ্বরকেই ফলদাতা বলিয়াছেন। যথা, "ইনিই অন্ন দান করেন, ইনিই ধনদান করেন" (বৃঃ ৪.৪.১৪) ইত্যাদি।

কিন্তু—

ধর্ম্মং জৈমিনিঃ অতঃ এব ॥ ৪০ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] ধর্ম্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকেই [ধর্ম্মম্] ফলদাতা বলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ দ্বারাই [অতএব] স্বমত স্থাপন করেন, অর্থাৎ তিনি বলেন যে, শ্রুতি ও যুক্তি (উপপত্তি) তাঁহার মতের সমর্থন করে। শ্রুতি বলেন "স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিবে"। শ্রুতির এই বিধি হইতে বুঝা যায়, যজ্ঞই স্বর্গরূপ ফল দান করে। তবে তুমি যে বলিয়াছ, কর্ম্ম মাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, সুতরাং কালান্তরে অভাবগ্রস্ত হওয়ায় সে কিছু উৎপন্ন করিতে পারে না—তাহা সত্য। কিন্তু শ্রুতিবাক্য ত অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং যুক্তির সহিত শ্রুতির যখন একটা আপাতঃবিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন যুক্তির এমন একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে সেই যুক্তি শ্রুতির প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হয়। এবং সেই উদ্দেশ্যে বলা উচিত যে, কর্ম্ম স্বয়ং বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মকর্ত্তাতে এমন একটী শক্তি (যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে অপূর্ব্ব) উৎপন্ন করিয়া যায়, যাহার প্রভাবে কর্ত্তা বহুকাল পরেও স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারে। সেই 'অপূর্ব্বই' কর্ম্মের সূক্ষ্ম চরমাবস্থা, কিম্বা ফলের

বীজ। এইরূপ না বলিয়া ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় হইয়া পড়েন, এবং শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, ফলে সে সব নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মই (কর্ম্ম) ফলদাতা, ঈশ্বর নহেন। ইহা হইল আচার্য্য জৈমিনির মত।

পূর্ব্বং তু বাদরায়ণঃ, হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

কিন্তু [তু] সূত্রকার বাদরায়ণঃ [বাদরায়ণঃ] পূর্ব্বোক্ত মতই, অর্থাৎ ঈশ্বরই ফলদাতা এই মত [পূর্ব্বম্] সমর্থন করেন ; যে হেতু শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে ফলের 'হেতু' বলা হইয়াছে [হেতুব্যপদেশাৎ]। এমন কি, ঈশ্বর যে কেবল ফলদান করেন, তাহা নয়, সমস্ত কর্ম্ম করানও বটে—শ্রুতি স্মৃতির ইহাই সিদ্ধান্ত। তবে ঈশ্বর কর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া স্বেচ্ছাচারী ভাবে ফল দেন না, ইহাও ঠিক। কর্ম্ম অনুসারেই তিনি জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তাহার ফলও প্রদান করেন। ("কৃত-প্রযত্নাপেক্ষ"—ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য, ২—৩—৪২)। সুতরাং তাহার পক্ষপাতিত্ব বা নির্দ্দয়ত্ব হয় না। এইরূপ বলিলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধানও নিরর্থক হয় না। না হইলে কর্ম্ম স্বয়ং ফল উৎপন্ন করে—ইহা অসম্ভব। কর্ম্ম স্বয়ং জড়, অচেতন, তাহা চেতনের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না, ইহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আরও দেখ, যজ্ঞাদিকর্ম্ম যদি স্বাধীনভাবে কিছু উৎপন্ন করিতেই পারিত, তবে আর যজ্ঞে দেবতাদের অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনার কি প্রয়োজন? অথচ যজ্ঞে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়াই ফল পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চেতনের সাহায্য ব্যতীত ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। আর ঈশ্বরচৈতন্যই সমস্ত চেতনের মূল, সেই এক চৈতন্যই সর্ব্বত্র বিরাজিত—ইহা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং মূলে সেই ঈশ্বরই সর্ব্ব ফলদাতা—ইহা নিশ্চিত।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব। আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, জীব ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কেবল মায়া বা অজ্ঞানান্ধকারে এই তত্ত্ব আবৃত আছে বলিয়া জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন, কিরূপে সেই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে।

গুরু। বৎস! দেখ, মানসিক শক্তির তারতম্যে কেহ বেশী বোঝে, কেহ কম। যাহার চিন্তাশক্তি যত তীক্ষ্ণ ও যত বিশুদ্ধ হয়, সে তত অধিক বুঝিতে পারে। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের আবেষ্টনে আমাদের চিন্তা শক্তি নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, এবং মনে মালিন্য জমিয়া গিয়াছে, সুতরাং অসীম, অনন্ত, বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। যাহাতে আমাদের চিন্তা শক্তি প্রসার লাভ করে ও মলিনতা দূর হয়, তাহার জন্য সাধনার আবশ্যক, কেবল পুস্তক পাঠে বা বক্তৃতা শুনিয়া তাহা হয় না। সাধনার বলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পায়।

সকল মনুষ্যের শক্তি সামর্থ্য, রুচি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর কিছু একরূপ নয়। সেই জন্য শাস্ত্র সাধনার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন। দুইটী লোকের মনের অবস্থা, রুচি, সামর্থ্য ইত্যাদি যখন একরূপ নয়, তখন উভয়ের সাধন-প্রণালীও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই উচিত। অবশ্য যাহারা গতানুগতিক, তাহারা যে কোন একটা ঢং

অবলম্বন করিয়া সাধকম্মন্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা প্রকৃত সাধনা-ভিলাষী প্রারম্ভেই নিজেদের বিশিষ্টতা বুঝিতে পারিয়া বিশিষ্ট সাধন-মার্গই অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের এমন শক্তি নাই যে, কোন্ প্রণালীতে সাধন করিলে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে, তাহা সে নিজেই নির্ণয় করে। ফলতঃ, প্রকৃত আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত কেহই তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং সাধনেচ্ছুকে একান্তভাবে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনিই তাহার কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া দেন। যে সাধক যেমন অধিকারী, সদ্গুরু তাহাকে তদনুরূপ পথে পরিচালিত করেন। সাধক এক বা একাধিক সাধনা বা উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন।

সমস্ত শ্রুতি ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব বুঝাইতেই পর্য্যবসিত, এবং তজ্জন্য বিভিন্ন শ্রুতি বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কোথাও সূর্য্য, কোথাও আকাশ, কোথাও প্রাণ ইত্যাদি প্রতীক অবলম্বনে শ্রুতি আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। এ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের বিভিন্ন প্রণালী। সেইজন্য ইহাদিগকে এক এক প্রকারের বিদ্যা বা উপাসনা বলা হয়। যেমন, 'প্রাণ বিদ্যা'—প্রাণ শক্তির বিভিন্ন বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা ও ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ মহাপ্রাণ ব্রহ্মশক্তির জ্ঞান হয়। "বৈশ্বানর বিদ্যা"—দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, পৃথিবী তাঁহার পাদ ইত্যাদিরূপে ধ্যান করিতে করিতে বিশ্বব্যাপী নারায়ণের ধারণা সহজ হইয়া যায়। এই প্রকার বহুবিধ উপাসনা বা বিদ্যার উপদেশ শ্রুতি করিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিলেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিতে এমন কতকগুলি বিদ্যা বা উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এক বেদান্তে (উপনিষদে) এক

রকমে বর্ণিত, আবার অন্য বেদান্তে অন্য রকমে। যেমন, বাজসনেয়ী উপনিষদেও প্রাণবিদ্যার বর্ণনা আছে, আবার ছান্দোগ্যেও আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এইরূপ বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত বিদ্যা কি এক, না বিভিন্ন—অর্থাৎ একই বিদ্যা কি বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে, না ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে ?

গুরু। সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়ম্ চোদনাদি-অবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

সমস্ত বেদান্তে (উপনিষদে) প্রতীয়মান অর্থাৎ বর্ণিত প্রাণাদি বিদ্যা [সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়ম্] একই, অর্থাৎ একই বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে ; যেহেতু, বিধি, ফল ইত্যাদি বিষয়ে কোন বেদান্তেই কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই [চোদনাদ্যবিশেষাৎ]। চোদনা শব্দের অর্থ বিধি বাক্য, যেমন—"এইরূপে উপাসনা করিবে," "এইরূপে জানিবে" ইত্যাদি। এই বিধিবাক্য সর্ব্ববেদান্তেই একরূপ। উপসনার ফলও সর্ব্বত্র এক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। উপাস্যও সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম। উপাসনার নামও এক। প্রণালীও প্রায় একরূপ—তবে গুণ* বা উপাসনার অবান্তর খুঁটিনাটী সম্বন্ধে যা একটু ইতরবিশেষ আছে। সুতরাং বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইলেও উপাসনা বা বিদ্যা একই।

শিষ্য। কিন্তু		ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ?—

এইরূপ গুণ-ভেদ আছে বলিয়া [ভেদাৎ] বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত বিদ্যা এক নয় [ন], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

---

* যেমন কোন স্থলে উপাস্যের দুইটী গুণ অবলম্বনে উপাসনা, কোনস্থলে তিনটী

গুরু। ন, একস্যাম্ অপি ॥ ২ ॥

না, এরূপ বলিতে পার না [ন]; কারণ, এক বিদ্যাতেও [একস্যামপি] ওরূপ গুণভেদ থাকিতে পারে। ওরূপ অবান্তর গুণ ভেদ যে স্থলে আছে, সেস্থলে যে বেদান্তে কম গুণের উল্লেখ আছে, তাহাতে অন্য বেদান্তোক্ত অধিক গুণের যোগ করিয়া অল্পতার পূরণ করিলেই চলিতে পারে (৫ম সূত্র দ্রষ্টব্য)। বহু অংশে যখন অভেদ রহিয়াছে, তখন দুই একটী অবান্তর খুটিনাটীর ভেদে বিদ্যার ভিন্নতা বলা সঙ্গত নয়। আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে একই বিষয়ের একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিতেও হয়, তাহাতে সেই বিষয়টীরই ভেদ হইয়া যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, বিভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট বিদ্যা যদি একই হয়, তবে যিনি এইরূপ একটী বিদ্যার অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাকে সেই বিদ্যার যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপারও অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এক্ষণে অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐ বেদান্ত বলেন যে, যাহারা শিরোব্রত (মস্তকে অগ্নিপাত্র ধারণরূপ এক প্রকার ব্রত) অনুষ্ঠান করিয়াছে, কেবল তাহারাই ঐ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, অন্যে নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ঐ শিরোব্রতটী ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গীভূত। অথচ ঐ ব্রত অথর্ব্ববেদী ছাড়া অন্য কেহ অনুষ্ঠান করে না, করার বিধিও নাই। কিন্তু একজন সামবেদী যদি ঐ ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সে তাহা পারিবে না, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ শিরোব্রত সে অনুষ্ঠান করে নাই। সুতরাং তাহার জন্য নিশ্চয়ই নূতন রকমের ব্রহ্মবিদ্যার বিধান করিতে হইবে। কাজেই সর্ব্ব বেদান্তে একই বিদ্যা, ইহা কিরূপে বলেন ?

গুরু। দেখ, ঐ যে শিরোব্রত, উহা বিদ্যার অঙ্গ নয়, বেদা-

ধ্যয়নেরই অঙ্গ, অর্থাৎ শ্রুতি ও স্থলে এই মাত্র বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা মুণ্ডক উপনিষৎ পাঠ করিবেন। ইহাতে বুঝা যায়, শিরোব্রতটী পাঠের জন্যই অনুষ্ঠেয়, বিদ্যার জন্য নহে। সুতরাং শিরোব্রতটী

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারে অধিকারাৎ চ,
সববৎ চ তৎ-নিয়মঃ ॥ ৩ ॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠের [স্বাধ্যায়স্য] অঙ্গরূপে উক্ত হওয়ায় [তথাত্বেন] বিদ্যার ভেদ জন্মাইতে পারে না। আর [চ] 'সমাচার' নামক গ্রন্থে [সমাচারে] এই শিরোব্রতকে অধ্যয়নের অঙ্গরূপে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মুণ্ডক অধ্যয়নের অধিকার এই ব্রতানুষ্ঠানকারীরই আছে—এরূপ অধিকার নির্দ্দেশ হইতেও [অধিকারাৎচ] শিরোব্রতের অধ্যয়নাঙ্গত্ব নির্দ্ধারিত হয়। মুণ্ডক পাঠ করিতে হইলে শিরোব্রত করিতে হইবে, এই নিয়মটী আবার [তন্নিয়মশ্চ] 'সবের' ন্যায় [সববৎ]। অর্থাৎ সূর্য্যসম্বন্ধীয় সাত প্রকার সবের (হোম) সহিত কেবল অথর্ব্ববেদীয়দিগের এক অগ্নিরই সম্পর্ক, অন্যবেদীয় অগ্নিত্রয়ের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং ঐ 'সব' অথর্ব্ববেদীয়েরাই অনুষ্ঠান করেন, অন্যে নহে ; সেইরূপ শিরোব্রতটিও মুণ্ডক অধ্যয়নের সহিতই সম্পর্কিত, বিদ্যার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। সুতরাং তাহাতে বিদ্যার ভেদ হয় না।

শ্রুতিও বিদ্যার অভেদ

দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥

প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, "সমস্ত বেদ যাঁহার বিষয় বলেন" (কঃ ২.১৫)—ইত্যাদি। ইহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, সর্ব্ববেদান্তে

একই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে, বহুদেবতার বিভিন্ন উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট হয় নাই।

অতএব, যেহেতু বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত এক নামের উপাসনা বা বিদ্যার (যেমন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয় বেদান্তে বর্ণিত "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা") কোন পার্থক্য নাই, ইহা প্রমাণিত হইল, সেই হেতু এক বিদ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিষদে উক্ত যত কিছু আনুষঙ্গিক ব্যাপার, তৎসমস্তই একত্র

উপসংহারঃ অর্থাভেদাৎ, বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৫ ॥

সংগ্রহ [উপসংহারঃ] করিতে হয়, কারণ তাহা হইলেই উপাসনারূপ বস্তুর অভিন্নতা সিদ্ধ হয় [অর্থাভেদাৎ], অর্থাৎ এক উপাসনা প্রসঙ্গে যে যে স্থলে যাহা কিছু নূতন কথা আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিয়াই উপাসনাটীর পূর্ণাঙ্গত্ব সাধিত হয়। পূর্ব্বমীমাংসায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, একই যাগ (যেমন অগ্নিহোত্র) যদি বিভিন্ন শাখায় বিহিত থাকে, তবে ঐ যাগটী সর্ব্বশাখার পক্ষেই সমান বলিয়া ঐ বিধির যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপার (অঙ্গ) একত্র সংগৃহীত করিয়া একটী পূর্ণ যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন শাখার বিধি যদি এক হয়, তবে ঐ বিধিপ্রসঙ্গে সর্ব্বশাখোক্ত যাবতীয় অঙ্গেরই একত্র সমাবেশ করিতে হয়। হয়ত অগ্নিহোত্র যাগ প্রসঙ্গে এক শাখায় একটী ব্যাপার উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু শাখান্তরে হইয়াছে। যিনি যে শাখা অনুসারেই অগ্নিহোত্র করিবেন, তাঁহাকে ঐ ব্যাপারটীও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই বিধির সমস্ত অঙ্গের একত্র সমাবেশের ন্যায় [বিধিশেষবৎ] বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত বিদ্যা এক হইলে [সমানে] ঐ বিদ্যার প্রসঙ্গে উক্ত যাবতীয় অঙ্গের একত্র সমাবেশ করা উচিত।

সুতরাং দেখা গেল যে, বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইলেও উপাসনা

বা বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন নয়। তবে সর্ব্বত্রই যে এই নিয়ম, তাহা নয়। যেমন, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে একই নাম দিয়া "প্রাণোপাসনার" বর্ণনা আছে। ঐ উপাসনার নাম এবং উদ্দেশ্য এক হইলেও বৃহদারণ্যকোক্ত প্রাণোপাসনা হইতে ছান্দোগ্যোক্ত প্রাণোপাসনা পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। যেহেতু বৃহদারণ্যকে যে প্রণালীতে প্রাণোপাসনা করিবার বিধান আছে, ছান্দোগ্যে সেরূপ প্রণালীর বিধান নাই। সুতরাং

অন্যথাত্বং শব্দাৎ ইতি চেৎ ?—

শ্রুতি হইতেই [শব্দাৎ] প্রমাণিত হয় যে, এক বেদান্তে বিহিত উপাসনা অপর বেদান্তে বিহিত উপাসনা হইতে পৃথক্ [অন্যথাত্বম্], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] আমি বলি, তবে তুমি হয়ত বলিবে যে, "আপনি ওরূপ বলিতে পারেন

ন, অবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥

না [ন]; কারণ ঐ উভয় বেদান্তে প্রাণোপাসনার কোন বিশেষ নাই [অবিশেষাৎ]। উভয়ত্রই একই উদ্দেশ্যে প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে, এবং বহু অংশেই ঐক্য আছে। সামান্য এক আধটু প্রণালীর অনৈক্যে উপাসনা ভিন্ন মনে করা সঙ্গত নয়, একথা আপনিই প্রথমে প্রমাণ করিয়াছেন"—

কিন্তু তোমার ওরূপ বলা ঠিক

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥

নয় [ন]; ওস্থলে উপাসনার ভেদই স্বীকার করিতে হইবে; যেহেতু, উভয় বেদান্তে প্রকরণের (subject-matter, topic) ভেদ

রহিয়াছে [প্রকরণভেদাৎ], অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে যে ভাবে প্রাণোপাসনার বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে, ছান্দোগ্যে সে ভাবে হয় নাই। বৃহদারণ্যকে সমগ্র 'উদ্গীথ'কে (উদ্গীথ—এক প্রকার বৈদিক গান) প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু ছান্দোগ্যে ঐ উদ্গীথের একটীমাত্র অংশ (পদ বা কলি) ওঁকারেই প্রাণদৃষ্টির বিধান আছে। সুতরাং ঐ উভয় বেদান্তোক্ত উপাসনা এক নয়। এইরূপ নাম এক হইলেও যে, উপাসনার ভেদ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্য্যন্ত একবার উদ্গীথোপাসনার কথা আছে, আবার অষ্টম খণ্ডেও গল্পচ্ছলে উদ্গীথোপাসনা বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রথম সাত খণ্ডে উদ্গীথের অংশ ওঁকারকে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এবং অষ্টমখণ্ডে উদ্গীথকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; অধিকন্তু এই উদ্গীথকে 'পরোবরীয়ান্' (পর = জ্যেষ্ঠ, বর = শ্রেষ্ঠ, পরোবরীয়ান্ = যাহা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কিছু নাই), 'অনন্ত' প্রভৃতিশব্দেও অভিহিত করা হইয়াছে। এস্থলে পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা যেমন প্রথমোক্ত উপাসনা হইতে পৃথক্ (যদিও নাম এক) সেইরূপ পরোবরীয়স্ত্বাদির ন্যায় [পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ] ছান্দোগ্যোক্ত প্রাণোপাসনাও বৃহদারণ্যকোক্ত প্রাণোপাসনা হইতে পৃথক্।

শিষ্য। কিন্তু

সংজ্ঞাতঃ চেৎ ?

সংজ্ঞা অর্থাৎ নামের ঐক্য থাকায় উপাসনাও এক, এরূপ যদি বলি ?—

গুরু। তদুক্তম্, অস্তি তদপি ॥ ৮ ॥

না, সেরূপ বলিতে পার না ; কারণ, নাম এক হইলেও বিদ্যার ভেদ

হইতে পারে, তাহাত ইতঃপূর্ব্বেই বলিলাম [তদুক্তম্]। যেস্থলে ভেদ স্বীকৃত, (যেমন, পরোবরীয়স্ত্বাদিস্থলে) সেস্থলেও নামের ঐক্য [তদপি] আছে [অস্তি]। সুতরাং নামের ঐক্য থাকিলেই যে সর্ব্বত্র উপাসনারও ঐক্য হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

শিষ্য। ছান্দোগ্যে ওঁকারকে উদ্গীথশব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে—ইহার সার্থকতা কি ?

গুরু। ইহার সার্থকতা এই যে, ওঁকার সর্ব্ববেদেই আছে, উহা সর্ব্ববেদসাধারণ। কিন্তু যখন প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে হইবে, তখন উদ্গীথশব্দে বিশেষিত ওঁকারেই প্রাণদৃষ্টি করিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণ ওঁকারে নয়। প্রাণোপাসনার জন্য উদ্গীথ শব্দদ্বারা বিশেষিত ওঁকারই প্রশস্ত—শ্রুতি এইরূপ বলিতে চান, কাজেই ওঁকার যখন

ব্যাপ্তেঃ চ সমঞ্জসম্ ॥ ৯ ॥

সর্ব্ব বেদেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে [ব্যাপ্তেঃ] তখন অভিলষিত প্রাণোপাসনার জন্য ওঁকারকে উদ্গীথ শব্দে বিশেষিত করিলেই সকলের সামঞ্জস্য হয় [সমঞ্জসম্]।

———

শিষ্য। বাজসনেয়ী, ছান্দোগ্য ও কৌষীতকী এই তিন উপনিষদেই "প্রাণবিদ্যার" বর্ণনা আছে। সর্ব্বত্রই প্রাণকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ী উপনিষদে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত গুণ, তাহাও প্রাণেরই গুণরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু কৌষীতকীতে ঐ কথাটী বলা হয় নাই। অর্থাৎ কৌষীতকীতে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের গুণও প্রাণেরই গুণ—এরূপ কোন

কথা নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কৌষীতকীর এই প্রাণবিদ্যায়ও কি বাগাদির গুণ যোজনা করিতে হইবে ?

গুরু। সর্ব্ব-অভেদাৎ অন্যত্র ইমে ॥১০॥

বাগাদির এই সমস্ত গুণ (যাহা ছান্দোগ্যে ও বাজসনেয়ীতে উক্ত হইয়াছে) [ইমে] অন্য উপনিষদে অর্থাৎ কৌষীতকীতেও [অন্যত্র] যোজনা করিতে হইবে ; কারণ সর্ব্বত্রই অর্থাৎ উক্ত তিন উপনিষদেই বিদ্যার অভিন্নতা [সর্ব্বাভেদাৎ] আছে। বিদ্যা যখন সর্ব্বত্রই এক, তখন একস্থলে যে গুণের উল্লেখ নাই, তাহা অন্য স্থল হইতে আনিয়া পূরণ করিতে হইবে (৫ম সূত্র দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। আচ্ছা, আনন্দস্বরূপ, বিজ্ঞানঘন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাত্মক, সত্য-স্বরূপ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, তাহার সমস্ত গুলিই এক স্থানে কথিত হয় নাই। কোন উপনিষদে দুইটী, কোথাও তিনটী ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন উপনিষদে 'আনন্দরূপত্বাদি' গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনায় ঐ সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ করিয়া ধ্যান করিতে হইবে, না, যে উপনিষদে যে কয়টী গুণের উল্লেখ আছে, কেবল সে কয়টি গুণ অবলম্বনেই পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে ?

গুরু। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥১১॥

আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি [আনন্দাদয়ঃ] ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক যত কিছু গুণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের [প্রধানস্য] গুণরূপে একত্রিত করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, কারণ একই ব্রহ্ম সর্ব্ব-

বেদান্তের প্রতিপাদ্য। এক বেদান্তে সাক্ষাৎভাবে দুটী একটি গুণের উল্লেখ না থাকিলেও তাৎপর্য্যবশে বুঝিতে হইবে যে, ঐ গুণগুলি প্রত্যেকেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনায় সকল গুলিই সংগৃহীত হইবে। এই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক গুণ সম্বন্ধে। কিন্তু অধিকারিবিশেষের বুঝিবার বা উপাসনার সুবিধার জন্য যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, তাহা সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে না। যেমন, তৈত্তিরীয়কে বলা হইয়াছে, "প্রিয় তাঁহার (ব্রহ্মের) শিরঃ—মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ—"(তৈঃ ২.৫ ; * । এই সমস্ত

প্রিয়শিরস্ত্বাদি-অপ্রাপ্তিঃ, উপচয়-অপচয়ৌ হি ভেদে ॥১২॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ, যাহা ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্বত্র তাহাদের প্রাপ্তি নাই, অর্থাৎ তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে না [প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ] ; যে হেতু [হি], ঐ সমস্ত গুণ বা ধর্ম্ম স্থির নহে, উহাদের হ্রাস বৃদ্ধি [উপচয়াপচয়ৌ] আছে, অর্থাৎ প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদি ধর্ম্ম আনন্দের কমবেশী তীব্রতার উপর নির্ভর করে বলিয়া স্থির নহে, বিকারী ; এবং এইরূপ অস্থির বা বিকারী ধর্ম্ম ভেদেতেই (ভেদেই) সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহার ঐরূপ ধর্ম্ম আছে, সে নিজেও বিকারী। কিন্তু ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ বা বিকার নাই ; সুতরাং প্রিয়াদি তাঁহার স্বরূপ গত ধর্ম্ম হইতে পারে না। এবং এইজন্য ব্রহ্মোপাসনায় ঐ সমস্ত ধর্ম্মের একত্র সন্নিবেশ হয় না,

---

* অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে আনন্দ, তাহার নাম 'প্রিয়', লাভে যে আনন্দ তাহার নাম 'মোদ', ভোগে যে আনন্দ তাহার নাম 'প্রমোদ'—এই সব একই আনন্দের বিকৃতি, তারতম্য, কমবেশী ভাব।

কেবল যে স্থলে ঐ সব ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেই স্থলেই তাহাদের উপযোগিতা, অন্যত্র নহে।

ইতরে তু অর্থসামান্যাৎ ॥১৩॥

প্রিয়শিরস্থাদি ভিন্ন অন্যান্য আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্ম [ইতরে] কিন্তু [তু] ব্রহ্মের সহিত সমানাত্মক বলিয়া [অর্থসামান্যাৎ], অর্থাৎ সে সমস্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক বলিয়া সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই উপযোগী এবং সংগৃহীতও হয়।

শিষ্য। কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে, "ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (বিষয়) পর (শ্রেষ্ঠ), অর্থ অপেক্ষা মন পর ..." এইরূপে ক্রমে দেখান হইয়াছে, "পুরুষ অপেক্ষা পর কিছুই নাই, পুরুষই পরাকাষ্ঠা, চরম, গতি" (কঃ ৩. ১০-১১)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রুতিতে কি অর্থাদির পরত্বও জ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, না কেবল পরমপুরুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে জ্ঞাতব্য? অর্থাৎ শ্রুতি কি কেবল ব্রহ্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে জানিবার কৌশলস্বরূপ অর্থাদির পরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, না ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি পর পর শ্রেষ্ঠ—এ তথ্যও জানিতে বলেন? *

গুরু। না, শ্রুতি অর্থাদির পর পর প্রাধান্য জানাইবার জন্য ওরূপ উপদেশ করেন নাই, তবে ঐ ক্রমে

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥১৪॥

পরম পুরুষের ধ্যান করিবার জন্য [আধ্যানায়] অর্থাৎ উক্তক্রমে ভাবনা করিয়া সর্ব্বপর পুরুষের জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই শ্রুতি ওরূপ

---

* প্রশ্নের অভিসন্ধি :—এইস্থলে অর্থাদিবিদ্যা ও পুরুষবিদ্যা এই দুইটী বিভিন্ন বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, না, একটী।

উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাদির পরত্ব প্রতিপাদনের জন্য নয়, কারণ অর্থাদির পরত্ব জানিবার কোন প্রয়োজন নাই [প্রয়োজনাভাবাৎ]। অর্থাদির পরত্ব জানিয়া কোন ফল নাই, পরন্তু পরমপুরুষকে জানিলেই মোক্ষরূপ ফল হয়, সুতরাং শ্রুতির তাৎপর্য্য পরপুরুষের জ্ঞান বিষয়ে, অর্থাদির পরত্ব বিষয়ে নহে।

ঐ শ্রুতি যে পুরুষেরই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে, তাহা ঐ শ্রুত্যুক্ত

আত্মশব্দাৎ চ ॥১৫॥

'আত্মা' এই শব্দ হইতেও [আত্মশব্দাৎ] জানা যায়। শ্রুতি ঐ পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইনি সমস্ত ভূতে গূঢ় আত্মা—(সাধারণ জ্ঞানে) প্রকাশিত হন না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হন" (কঃ ৩.১২)। এই শ্রুত্যংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঐ পুরুষ বা আত্মা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, কেবল ধ্যানাদি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত বুদ্ধিরই গম্য, তাহা ছাড়া আর সমস্তই অনাত্মা। এই আত্মার সাক্ষাৎকার করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সুতরাং অর্থাদির জ্ঞান উপদেশ করা যে শ্রুতির অভিপ্রায় নয়, তাহা ঐ পুরুষকে আত্মারূপে প্রদর্শন করাতেও স্থিরীকৃত হয়।

শিষ্য। ঐতরেয় উপনিষদে আছে, "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত (দৃশ্য পদার্থ) একমাত্র আত্মাই ছিল, অন্য কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল না। তিনি 'আমি লোক সকল সৃজন করিব' এইরূপ ভাবনা করিয়া স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্ত্য, পাতাল—এইসব লোক সৃষ্টি করিলেন" (ঐঃ ১.১-২)। এস্থলে এই আত্মা কি পরমাত্মাই (ব্রহ্ম), না সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা ?

গুরু। এস্থলে আত্মা-শব্দে

আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ ॥১৬॥

অন্যান্য সৃষ্টি বাক্যের ন্যায় [ইতরবৎ] পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে [আত্মগৃহীতিঃ]; যেহেতু শ্রুতির পরবর্ত্তী বাক্য হইতে [উত্তরাৎ] বুঝা যায় যে, ঐ আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল" (তৈঃ ২.১.১)—ইত্যাদি সৃষ্টিবাক্যে যেমন পরমাত্মা আত্মা-শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ "তিনি এই সব লোক সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি আলোচ্য সৃষ্টিবাক্যেও পরমাত্মারই বোধ হয়।

শিষ্য। কিন্তু আলোচ্য স্থলে শ্রুতি যদি পরমাত্মাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতেন, তবে আকাশাদি মহাভূতের সৃষ্টিরই উল্লেখ থাকিত, স্বর্গাদি লোকসৃষ্টির উল্লেখ থাকিত না। কারণ অন্যান্য শ্রুতিতে দেখিতে পাই, পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশাদি মহাভূতেরই সৃষ্টি হয়, এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে জানা যায় যে, মহাভূতেরই বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ দ্বারা ব্রহ্মা (প্রজাপতি) স্বর্গাদি লোক সৃষ্টি করেন। সুতরাং

অন্বয়াৎ ইতি চেৎ ?—

পূর্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ হইতে [অন্বয়াৎ] বুঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকে না বুঝাইয়া ব্রহ্মাকেই বুঝাইতেছে—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?— *

* আলোচ্য শ্রুতিতে বাস্তবিক যদি প্রজাপতি ব্রহ্মার উল্লেখ হইয়া থাকে, তবে দুইজন সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং ফলে বিদ্যারও ভেদ হয়—এক ব্রহ্মের বিদ্যা, অপর ব্রহ্মার বিদ্যা—ইহাই এই বিচারের অভিসন্ধি।

গুরু। না বৎস! লোকসৃষ্টির সহিত আলোচ্য শ্রুতির সম্বন্ধ থাকিলেও ব্রহ্মাকে গ্রহণ না করিয়া পরমাত্মার গ্রহণ

স্যাৎ অবধারণাৎ ॥১৭॥

হইতে পারে [স্যাৎ]; কারণ, আলোচ্য শ্রুতিতেই "উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন" (বৃঃ ১.৪.১), এইরূপ 'অবধারণ' আছে বলিয়া [অবধারণাৎ] ঐ আত্মা-শব্দে পরমাত্মা ছাড়া আর কাহাকেও গ্রহণ করা যায় না। শ্রুতি প্রথমেই বলিলেন, "আত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিল না"—ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঐ আত্মা পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নয়। এরূপ 'অবধারণ' (অন্য সব নিষেধ করিয়া একমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব ঘোষণা) পরমাত্মার পক্ষেই হইতে পারে, যেহেতু তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। প্রজাপতি ব্রহ্মা দৃশ্য সৃষ্টির তুলনায় আদি পুরুষ হইলেও তিনি চরম নহেন, তিনিও স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ছাড়া আর কোন কিছুই ছিল না। তবে আলোচ্য শ্রুতিতে যে লোকসৃষ্টির কথা দেখিতে পাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা মহাভূত সৃষ্টি করিয়া স্বর্গাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই শ্রুতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে।

শিষ্য। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণবিদ্যার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করিতে হয় এবং ঐ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে চিন্তা করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ স্থলে কি শ্রুতি আচমন

করা এবং জলকে আচ্ছাদনরূপে চিন্তা করা—এই উভয়েরই বিধি দিয়াছেন, না একটীর ?

গুরু। না, ওস্থলে আচমনের বিধি নাই, আচমন স্মৃতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত, অর্থাৎ আচমনের বিধি স্মৃতিশাস্ত্রেই দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রত্যেক সজ্জনই আচমন করিয়া থাকেন; সুতরাং সে বিষয়ের উপদেশ করা শ্রুতির নিষ্প্রয়োজন। অপ্রাপ্তবিষয়ে উপদেশ করাই শ্রুতির কার্য্য। সুতরাং আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদনরূপে চিন্তা করিতে হইবে, এইরূপ

কার্য্যাখ্যানাৎ অ-পূর্ব্বম্ ॥১৮॥

কর্ত্তব্যের উল্লেখ থাকায় [কার্য্যাখ্যানাৎ] উহাই অনুক্ত-পূর্ব্ব [অপূর্ব্বম্], অর্থাৎ ঐ কর্ত্তব্যটী ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য নির্দ্ধারিত হয়, শ্রুতি এইরূপ চিন্তারই বিধান করিয়াছেন, আচমনের নয়। তাৎপর্য্য এই যে, আচমন প্রাণবিদ্যার অঙ্গ নয়, জলকে আচ্ছাদন রূপে ভাবনা করাই বিদ্যার অঙ্গ।

শিষ্য। বাজসনেয়ী শাখার দুইস্থলে (অগ্নিরহস্যে ও বৃহদারণ্যকে) **শাণ্ডিল্য বিদ্যা** বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একস্থলে বলা হইয়াছে, "আত্মা মনোময়, প্রাণ-শরীর, দীপ্তিস্বরূপ—"। অন্যস্থলে এই সব গুণ ছাড়া আরও কয়েকটী বিশেষণের উল্লেখ আছে। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, ঐ উভয় স্থলে বিদ্যা এক, কি ভিন্ন। বিভিন্ন শাখায় যদি ওরূপ কম বেশী গুণের উল্লেখ থাকিত, তবে বিদ্যার ঐক্য স্বীকার করিতে বাধা ছিল না; কারণ এক এক শাখা এক এক লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু এক শাখাতেই যখন দুইবার বর্ণনা আছে,

তখন পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্য অবশ্যই বলিতে হয়, বিদ্যাও ভিন্ন এবং সেইজন্য একস্থলে কথিত গুণ অন্যস্থলে যোজনা করিবারও প্রয়োজন নাই।

গুরু। না, ওস্থলে বিদ্যা ভিন্ন নয়,

সমানে এবঞ্চ অভেদাৎ ॥১৯॥

এক শাখাতেও [সমানে] এইরূপ [এবঞ্চ] বিদ্যার ঐক্য ও গুণের সংগ্রহ হইবে ; যেহেতু উভয়স্থলেই উপাস্যের অভিন্নতা রহিয়াছে [অভেদাৎ]। অগ্নিরহস্যে যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৃহদারণ্যকেও প্রথমে মনোময়ত্বাদি গুণ দৃষ্টে সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যারই প্রত্যভিজ্ঞা হয় (চেনা যায়); তারপর তাহাতে অন্যান্য গুণের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং মনোময়ত্বাদি গুণের বিধি বৃহদারণ্যকে করা হয় নাই (ঐ বিধি পূর্ব্বেই অগ্নি রহস্যে করা হইয়াছে), অগ্নিরহস্যোক্ত গুণের উল্লেখমাত্র করিয়া বৃহদারণ্যক উহাকে প্রথমে শাণ্ডিল্যবিদ্যারূপে চিনাইয়া দিলেন, পরে অন্যান্য গুণের বিধান করিলেন। সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হয় না, এবং বিদ্যারও ঐক্য হয়।

শিষ্য। বৃহদারণ্যকে **সত্য-ব্রহ্মের** উপাসনার ব্যবস্থা আছে। ঐ প্রসঙ্গে শ্রুতি একবার আদিত্যমণ্ডলে সত্যব্রহ্মের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, এবং সেই আদিত্যমণ্ডলের পুরুষের শাস্ত্রীয় গুহ্য নাম বলিয়াছেন 'অহঃ'। আর একবার দক্ষিণচক্ষুতে সত্যব্রহ্মের ধ্যান করিতে বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রীয় গুহ্য নাম বলিয়াছেন 'অহম্'। সুতরাং

সম্বন্ধাৎ এবম্ অন্যত্রাপি ॥২০॥

এক উপাস্য সত্যব্রহ্মের যখন উভয়ত্রই সম্বন্ধ আছে [সম্বন্ধাৎ]

অর্থাৎ উপাস্য যখন উভয় স্থলেই এক সত্যব্রহ্ম, তখন শাণ্ডিল্যবিদ্যার গুণ সংগ্রহের ন্যায় [এবম্] 'অহঃ ও অহম্' এই দুইটী নামের বেলায়ও একটিকে অন্যত্র [অন্যত্রাপি] সংযোজিত করা উচিত বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষের নামও 'অহঃ' এবং 'অহম্' এই দুইটীই, এবং চক্ষুস্থ পুরুষের নামও 'অহম্' ও 'অহঃ'—এই দুইটীই।

গুরু। **ন বা বিশেষাৎ ॥২১॥**

না, বিদ্যা এক হইলেও উভয় নাম উভয় স্থলে সংগৃহীত হইবে না [ন বা]; কারণ, আদিত্য ও চক্ষুরূপ স্থানভেদে উপাস্যও পৃথক্ [বিশেষাৎ]। যদিও বস্তুতঃ এক সত্যব্রহ্মই উভয়স্থলে উপাস্য, তথাপি যে অধিষ্ঠানে তাঁহার উপাসনা করা হয়, তাহার ভেদে উপাস্যেরও ভেদ স্বীকার করিতে হয়। একটা আধার অবলম্বনে উপাসনা করিলে বস্তুতঃ উপাস্যের ভেদ না থাকিলেও স্থানকৃত একটা ভেদ মানিয়াই ওরূপ উপাসনা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং, ওরূপ উপাসনায় আধার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ নামও যথানির্দ্দিষ্ট বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, পরস্পরের সহিত বিনিময় বা সংযোজন করা সঙ্গত নয়—অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলস্থ সত্যব্রহ্মের যখন উপাসনা করা হইবে, তখন তাঁহাকে 'অহঃ' নামেই অভিহিত করিতে হইবে, 'অহং' নামে নয়; এইরূপ চক্ষুস্থ সত্যব্রহ্মকেও কেবল অহং নামেই অভিহিত করিতে হইবে। [উপাসনাকালে একবার এ স্থানে, আবার ও স্থানে, একবার এ নামে, আবার ও নামে ধ্যান করিলে চিত্তের বিক্ষেপই হয়]।

দর্শয়তি চ ॥২২॥

আর, শ্রুতিও এই কথাই প্রদর্শন করিয়াছেন শ্রুতি ঐ উপাসনা

প্রসঙ্গে আদিত্য-পুরুষ ও চাক্ষুষ-পুরুষের সারূপ্য (পরস্পরের রূপ-সাদৃশ্য) দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি ঐ স্থলে ঐ নামদ্বয়ের উভয় স্থলে সংগ্রহ করিতে হইবে, শ্রুতির এইরূপ অভিপ্রায় হইত, তবে সে অভিপ্রায় ৫ম সূত্রের রীতিতেই সিদ্ধ হইতে পারিত, তজ্জন্য শ্রুতির আর পৃথক্ প্রয়াস স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু শ্রুতি যখন বিশেষ ভাবে এই স্থলেই সারূপ্য দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, ৫ম সূত্রের রীতি এ স্থলে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং ঐ নামদ্বয়ের একত্র সংগ্রহ হইবে না।

শিষ্য। রাণায়ণীয় শাখার খিলকাণ্ডে (খিল—বিধিও নয়, নিষেধও নয়, এরূপ সাধারণ বাক্য) কথিত আছে, "ব্রহ্মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীর্য্য সমূহ সঞ্চিত ছিল, প্রথমে আদি পুরুষ ব্রহ্ম সমস্ত দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন" ইত্যাদি। ব্রহ্মের এইরূপ **বীর্য্যসম্ভার** ও **দ্যুলোকব্যাপ্তি** প্রভৃতি বিভূতি কোন উপাসনাবিশেষের প্রসঙ্গে বলা হয় নাই। সুতরাং মনে হয়, ব্রহ্মের এই সাধারণ বিভূতি সমূহ সমস্ত উপাসনাতেই সঙ্কলিত করিতে হইবে।

গুরু। না, ঐ সমস্ত বিভূতি যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, কেবল সেই স্থলেই চিন্তনীয়, সর্ব্বত্র (অন্যান্য উপাসনায়) নহে, অর্থাৎ

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি-অপি চ অতঃ ॥২৩॥

বীর্য্যসম্ভার ও দ্যুলোকব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্মবিভূতিও [সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি চ] এই কারণেই [অতঃ] অর্থাৎ পূর্ব্ব সূত্রোক্ত কারণেই, কেবল যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলেই নিবদ্ধ থাকিবে, অন্য উপাসনায় সংযোজিত হইবে না। হৃদয়াদি ক্ষুদ্র স্থানে যে সমস্ত

উপাসনার বিধি আছে, তাহাতে দ্যুলোকব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতির চিন্তা করা অসম্ভব। বীর্য্যসম্ভারও দ্যুলোকব্যাপকের সহযোগেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়াদি স্থান অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা, তাহাতে সংগৃহীত হইবে না। সুতরাং উপাসনার স্থানের পার্থক্য হেতু সম্ভৃতি প্রভৃতি বিভূতির সর্ব্বত্র সংগ্রহ হইবে না। অবশ্য কোন কোন উপাসনায় স্থানের উল্লেখ নাই ; না থাকিলেও এক জাতীয় গুণের সহিত অন্যজাতীয় গুণের পার্থক্য দ্বারাই উপাসনার পার্থক্য স্বীকার করা হয়, না হইলে সমস্ত উপাসনাতেই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, কি পরম্পরা-ক্রমেই হউক, একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য। সেইভাবে দেখিতে গেলে সমস্ত উপাসনাই এক বলিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সাধকের শক্তি-সামর্থ্য, রুচি, অবস্থা অনুসারে উপাসনাও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে, সকলের পক্ষে একরূপ উপাসনা হইতে পারে না। আর, উপাসনার পার্থক্য গুণের পার্থক্য দ্বারাই নির্ণীত হয়। [গুণ—বিভিন্ন জাতীয় গুণ, আদিত্য মণ্ডলাদি স্থল ইত্যাদি]। সুতরাং সম্ভৃতি প্রভৃতি বিভূতি সর্ব্ববিধ উপাসনায় উপযোগী নহে।

এইরূপ আবার ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে **পুরুষবিদ্যা** নামে এক বিদ্যার বর্ণনা আছে। উপাসক আপনাকে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবেন ইহাই পুরুষবিদ্যা। এই

পুরুষবিদ্যায়াম্ অপি চ ইতরেষাম্ অনাম্নানাৎ ॥২৪॥

পুরুষবিদ্যাতেও [পুরুষবিদ্যায়ামপি চ] ছান্দোগ্যে যে সমস্ত গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মের [ইতরেষাম্] তৈত্তিরীয়কে উল্লেখ না থাকায় [অনাম্নানাৎ] ঐ দুই স্থলের বর্ণিত বিদ্যা এক নয়, এবং সেই জন্য গুণের সংযোজনাও হইবে না। ঐ উভয় বিদ্যার

ফলেরও পার্থক্য আছে :—তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিদ্যার ফল ব্রহ্মমহিমা-প্রাপ্তি, ছান্দোগ্যে শতবর্ষ আয়ু। এইরূপ গুণের ভেদ ও ফলের ভেদে বিদ্যা ভিন্ন বলিয়া নির্ণীত হয়।

শিষ্য। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে কয়েকটী মন্ত্র আছে। যেমন, "হে দেব! তুমি আমার শত্রুর সর্ব্বশরীর বিদীর্ণ কর। তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া শিরা সকল ছিন্ন করিয়া মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল—" ইত্যাদি। এই সব মন্ত্র কি উপাসনার অঙ্গ?

গুরু। না, ঐসব মন্ত্রের উপাসনার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই;

বেধাদি-অর্থ-ভেদাৎ ॥ ২৫ ॥

যেহেতু হৃদয়বেধ প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ উপসনার অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ উপাসনার সহিত "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের কোন অর্থ সঙ্গতি হয় না। ঐ সমস্ত মন্ত্র আভিচারিক ক্রিয়ার উপযোগী, শত্রুনাশ বা অমঙ্গল দূরীকরণ উহাদের উদ্দেশ্য। আর উপাসনার উদ্দেশ্য হইল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। সুতরাং ঐ সব মন্ত্রদ্বারা উপাসনার কোন সাহায্য হয় না। তবে উপনিষদে ঐ সব মন্ত্র এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সব কর্ম্ম অরণ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, আর উপনিষদও বানপ্রস্থাবলম্বীর পাঠ্য।

শিষ্য। শ্রুতির এক শাখায় আছে, "জ্ঞানী তখন (মৃত্যুকালে) পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হন এবং পরমব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান" (ছাঃ ৮.১৩.১)। এই স্থলে কেবল পুণ্য ও পাপের পরিত্যাগের উল্লেখ আছে। আবার অন্য শাখায় আছে, "পুত্রেরা

তাঁহার ধনাদি গ্রহণ করে, বন্ধুরা তাঁহার পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার পাপ গ্রহণ করে"। অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে, "জ্ঞানী তখন জ্ঞান-প্রভাবে সুকৃত, দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিরা সুকৃত এবং বিদ্বেষীরা দুষ্কৃত গ্রহণ করে" (কৌঃ ১.৪)। এইরূপ কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্যের পরিত্যাগের উল্লেখ আছে, কোন শ্রুতিতে আবার পাপপুণ্যের শত্রু ও সুহৃৎকর্তৃক গ্রহণেরও উল্লেখ আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যে স্থলে কেবল ত্যাগের কথাই আছে, সেস্থলেও কি 'গ্রহণের' সংযোজনা করিতে হইবে ?

উত্তর। হাঁ,

হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্বাৎ
কুশা চ্ছন্দঃ-স্তুতি-উপগানবৎ, তদুক্তম্ ॥২৬॥

যেস্থলে কেবল ত্যাগের কথা আছে [হানৌ, হানি – ত্যাগ] সেস্থলেও গ্রহণের যোজনা করিতে হইবে ; যেহেতু গ্রহণ কথাটা ত্যাগের উপর একান্ত নির্ভর করে [উপায়নশব্দশেষত্বাৎ, উপায়ন – গ্রহণ] অর্থাৎ ত্যাগ না হইলে গ্রহণ হইতে পারে না, এবং ত্যাগ ও গ্রহণ পরস্পর সাপেক্ষ। ত্যাগের কথা হইলে স্বভাবতঃই গ্রহণের কথা মনে জাগে। সুতরাং যেস্থলে গ্রহণের উল্লেখ নাই, কেবল ত্যাগের উল্লেখ আছে, সেস্থলেও অন্য শ্রুত্যুক্ত গ্রহণ কথার যোগ করিয়া শ্রুতিবাক্যের পূরণ করিতে হইবে। কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের মত [কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ], একথা পূর্ব্ব মীমাংসাতেও উক্ত হইয়াছে [তদুক্তম্]। কৌষীতকীতে 'কুশা' নামক কাষ্ঠখণ্ড বিশেষের সংগ্রহের কথা আছে, কিন্তু 'কুশা' কোন্ কাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে, তাহা

বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, ডুমুর গাছের কাষ্ঠদ্বারা কুশা নির্ম্মিত হয়। এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ উক্তি পরবর্ত্তী বিশেষ উক্তিদ্বারা পূরণ করা হয়। এক শ্রুতিতে ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনা করিবার বিধান আছে, কিন্তু কোন্ ছন্দ তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। সেস্থলেও অন্য শ্রুত্যুক্ত 'দৈব' নামক ছন্দ অবলম্বন করা হয়। এক শ্রুতিতে 'ষোড়শী' নামক যজ্ঞপাত্রের স্তুতি করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্ সময় করিতে হইবে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'সূর্য্যোদয়ে ষোড়শীর স্তুতি করিবে'। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি পরবর্ত্তী শ্রুতিদ্বারা পূরণ করা হয়। আবার এক শ্রুতিতে যজ্ঞে গান করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু চারিজন পুরোহিতের মধ্যে কে কে গান করিবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। অন্য এক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'অধ্বর্য্যু গান করিবেন না'। ইহাতে স্থির হয়, অধ্বর্য্যু ছাড়া আর তিন জন গান করিবেন। এইরূপ এক শ্রুতিতে যে টুকু অপূরণ থাকে, অন্য শ্রুতি হইতে সেই টুকু পূরণ করিবার নিয়ম আচার্য্য জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসায় স্থাপন করিয়াছেন। সেইরূপ যেস্থলে কেবল ত্যাগের উল্লেখ আছে, সেস্থলে অন্যশ্রুত্যুক্ত গ্রহণের যোজনা করিয়া বাক্যপূরণ করিতে হইবে।

শিষ্য। শ্রুতির এক শাখায় বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী দেহত্যাগ করিয়া দেবযান পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, ক্রমে 'বিরজা' নামক নদী অতিক্রম করিয়া পুণ্যপাপ ত্যাগ করেন (কৌঃ ১.৪)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানীর পুণ্যপাপ ত্যাগ দেহত্যাগসময়েই হয়, না পরে পথমধ্যে হয়?

গুরু। সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হি অন্যে ॥২৭॥

দেহত্যাগকালেই [সাম্পরায়ে] হয়; কারণ দেহত্যাগ হইয়া গেলে পাপপুণ্য দ্বারা লাভ করিবার কিছুই থাকে না [তর্ত্তব্যাভাবাৎ]। অন্যশ্রুতিও [অন্যে] সেইরূপই [তথাহি] বলেন। সাধক যখন জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই জ্ঞান প্রভাবে তাঁহার যাবতীয় সঞ্চিত ও ভবিষ্যৎ কর্ম্ম (পুণ্যপাপ) বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বশে দেহ কিছুকাল বিধৃত থাকে। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞানের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। দেহত্যাগক্ষণ হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিক্ষণ পর্য্যন্ত (অথবা বিরজা নদী গমন পর্য্যন্ত) দেবযান পথ অতিক্রম করিতে যেটুকু সময়, সেই সময়ের জন্য পুণ্য বা পাপ থাকিবার কোন প্রয়োজনই নাই। পুণ্য বা পাপের ফলভোগ তখন নিশ্চয়ই হয় না; কারণ দেহাদিতে আত্মাভিমানী পুরুষেরই ভোগ হইতে পারে, কিন্তু দেবযান পথের যাত্রীর তাদৃশ অভিমান না থাকায় তাঁহার আর কি ভোগ হইবে? সুতরাং দেহত্যাগের পরে পুণ্য পাপের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষ সূর্য্যোলোকে অন্ধকারের মত, জ্ঞানালোকে সমুদায় পুণ্যপাপেরই বিলয় হইয়া যায়। সুতরাং দেহত্যাগের সময় জ্ঞানীর কোন পুণ্যপাপই থাকে না—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। তবে স্থলবিশেষে যে বিরজা নদী অতিক্রমের পর পুণ্য পাপ ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, 'যেহেতু জ্ঞানী বিরজা নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, সেইহেতু বুঝিতে হইবে যে, তিনি সমস্ত পুণ্যপাপও পরিত্যাগ করিয়াছেন'; অভিপ্রায় এই যে, বিরজা (যে নদীতে কোনরূপ রজঃ অর্থাৎ মলিনতা নাই) নদী উত্তরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানীর পাপ পুণ্য দেহত্যাগ-

কালেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অন্য শ্রুতিও বলেন যে, দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানীর পাপ পুণ্যেরও ত্যাগ হইয়া যায়।

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, পাপ পুণ্যের ক্ষয় হয় কিসে? যমনিয়মাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিলেই পাপপুণ্যের ক্ষয় হয়। অর্থাৎ পুণ্যপাপ ক্ষয়রূপ কার্য্যের [effect] কারণ [cause] হইল যমনিয়মসহকৃত জ্ঞান। কারণ থাকিলে কার্য্য হইবেই। কারণ আছে, অথচ কার্য্য হইতে বিলম্ব হয়, এরূপ কদাচ হয় না। এক্ষণে দেখ, যে সাধক যমনিয়মাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার পাপপুণ্য ক্ষয় তন্মুহূর্ত্তেই হয়। অবশ্য প্রারব্ধবশে কিছুকাল দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু সঞ্চিত ও ভবিষ্যৎ পুণ্য পাপ সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত। আর দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহ ত্যাগের পরে অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যের ক্ষয় হয় বলিলে কারণ সত্ত্বেও কার্য্য হয় না, এইরূপ অযৌক্তিক মত মানিতে হয়, এবং উক্ত উভয় প্রকারের শ্রুতিরও পরস্পর বিরোধ ঘটে। বিশেষ, যমনিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন দেহ থাকিতেই সম্ভব। সাধক তখনই ইচ্ছানুরূপ সাধন করিতে পারেন, দেহত্যাগের পরে নয়। সুতরাং সাধক দেহত্যাগের পূর্ব্বেই

ছন্দতঃ উভয়-অবিরোধাৎ ॥ ২৮ ॥

ইচ্ছানুরূপ [ছন্দতঃ] সাধন করিয়া পাপপুণ্য ক্ষয় করেন, এইরূপ বলিলেই কার্য্যকারণের এবং উভয় প্রকার শ্রুতিরও সঙ্গতি হয় [উভয়াবিরোধাৎ]।

শিষ্য। কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "মৃত্যুর পর জ্ঞানীর

সর্ব্ববিধ পাপপুণ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি দেবযান পথে গমন করেন।" কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্য বিনাশের কথাই আছে, দেবযান পথে গমনের কোন উল্লেখ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ দেবযান পথে গমন কি নির্ব্বিশেষে সকল জ্ঞানীরই হয়, না কাহারও কাহারও হয়? অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে শ্রুতির অনুসরণ করে, সে কি তদনুসারে, হয় দেবযান পথে, না হয় অন্য পথে, গমন করে?

উত্তর। না, সকলেই দেবযান পথে যায় না,

গতেঃ অর্থবত্ত্বম্ উভয়থা, অন্যথা হি বিরোধঃ ॥ ২৯ ॥

উভয় রকমেই [উভয়থা] গতি বা ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ কোন কোন জ্ঞানী দেবযান পথে গমন করেন, কেহ বা করেন না। এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলেই দেবযান পথে গতির [গতেঃ] সার্থকতা [অর্থবত্ত্বম্] রক্ষা হয়। না হইলে [অন্যথা] একটা বিরোধ [বিরোধঃ] উপস্থিত হয়। এক শ্রুতি বলেন, "জ্ঞানী সমস্ত পাপপুণ্য বিধূত করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) নিরঞ্জন ও পরমব্রহ্ম হন" (মুঃ ৩.১.৩)। যিনি নিরঞ্জন (সর্ব্ববিধ মালিন্যশূন্য, পরম শুদ্ধ, নিরুপাধিক) ও ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহার আবার গমন কি? তাঁহার গন্তব্য ব্রহ্ম, তাহা ত তিনি জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আর গমন করিবার প্রয়োজন কি, সম্ভাবনাই বা কোথায়? তিনি যে তখন সর্ব্বব্যাপী হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং সকলেই অবিশেষে দেবযান পথে গমন করে, একথা বলিলে উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে।

আর, কেহ দেবযান পথে গমন করেন, কেহ করেন না, ইহা

উপপন্নঃ তৎ-লক্ষণার্থ-উপলব্ধেঃ লোকবৎ ॥৩০॥

যুক্তিযুক্তও বটে [উপপন্নঃ]; যেহেতু, যে সমস্ত কারণে দেবযান পথে গতি হইতে পারে, সেই সমস্ত গতির কারণ [তল্লক্ষণার্থ-] সগুণ-বিদ্যা সম্পর্কেই উল্লিখিত দেখা যায় [উপলব্ধেঃ]। যে সব স্থলে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত আছে, সেই সব স্থলে ঐ উপাসনার যে ফলের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াই পাওয়া যায়। যেমন, "পর্য্যঙ্ক-বিদ্যায়" (পর্য্যঙ্ক = পালঙ্ক) উপাসক পর্য্যঙ্কে আরোহণ করেন, পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের সহিত কথোপকথন করেন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি বহুবিধ ফল শ্রুত হয়। এই সব স্থানান্তরে গমন করিয়াই লাভ করা যায়। সুতরাং যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই দেবযান পথে গতি হয়, এবং তাঁহাদের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতি সার্থক। আর নির্গুণোপাসক যখন জানেন যে, আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, তখন ত তিনি পূর্ণকাম হইয়া যান, এই শরীর থাকিতেই তাঁহার সমস্ত পাপপুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়, তিনি কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ের জন্য দেহধারণ করেন। ভোগ দ্বারা সেই প্রারব্ধ শেষ হইয়া গেলে তিনি কৃতকৃতার্থ হন, তাঁহার পাইবার আর কিছুই থাকে না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে গতি শ্রুতির কোন সার্থকতাই নাই। এইরূপ বিভাগ, অর্থাৎ কেহ দেবযানে গমন করেন, কেহ করেন না, এরূপ বিভাগ লৌকিক ঘটনার মত [লোকবৎ]। যেমন, দেশান্তর পাইতে হইলে গমন করিতে হয়, কিন্তু রোগমুক্তি পাইতে হইলে গমনের কোন প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যিনি সগুণোপাসনা দ্বারা কিছু পাইতে চান, তিনি দেবযানে গমন করেন, আর যিনি কেবল ভবরোগ মুক্তি কামনা করেন, তিনি এই দেহ সত্ত্বেই তাহা লাভ করেন,

তাঁহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না। [চতুর্থ অধ্যায়ে এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে]।

শিষ্য। কিন্তু কোন কোন সগুণ বিদ্যাতে দেবযান পথে গমনের উল্লেখ নাই। সেই সব বিদ্যা অবলম্বন করিলেও কি ওরূপ গতি হয়?

গুরু। যে-সব বিদ্যাতে গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সেই বিদ্যাতেই গতি নিয়মিত, অন্য বিদ্যাতে সেইরূপ গতি হয় না—এরূপ কোন নিয়ম নাই ;

অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্ অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

সমস্ত সগুণ বিদ্যারই [সর্ব্বাসাম্] ফল দেবযান পথে গতি, অর্থাৎ যে কোন সগুণ বিদ্যা অবলম্বন করিলেই দেবযান পথে গতি হয় ; যে বিদ্যা প্রসঙ্গে তাদৃশ ফল উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল সেই বিদ্যা অবলম্বন করিলেই দেবযানে গতি হয়, অন্য বিদ্যা অবলম্বন করিলে হয় না, এরূপ কোন নিয়ম নাই [অনিয়মঃ]। এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলেই কোনরূপ বিরোধ হয় না [অবিরোধঃ] এবং এই ব্যবস্থাই শ্রুতি (শব্দ) ও স্মৃতির (অনুমান) অনুমোদিত [শব্দানুমানাভ্যাম্]। শ্রুতি এক স্থলে "পঞ্চাগ্নিবিদ্যার" অনুশীলনপরায়ণ সাধকের দেবযান পথে গতির উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, অন্য বিদ্যার অনুশীলন করিলেও দেবযানে গতি হয়। স্মৃতিও তাহাই বলেন। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য্যে বুঝা যায় যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন সগুণ বিদ্যার অনুশীলন করেন, তিনিই দেবযান পথে গমন করেন।

শিষ্য। আচ্ছা, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমান

দেহপাতের পর পুনরায় দেহ ধারণ করেন কি? যদিও বুঝি যে, আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর কিছু কাম্য থাকে না, সুতরাং দেহধারণ করিবারও কোন আবশ্যক হয় না, তথাপি ইতিহাস ও পুরাণে দেখা যায় যে, অনেক জ্ঞানী ঋষি পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। যেমন, অপান্তরতমা নামক জনৈক ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বিষ্ণুর আদেশে দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি বশিষ্ঠ নিমি রাজার শাপে দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষি বরুণের যজ্ঞে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ সনৎকুমার, দক্ষ, নারদ প্রভৃতি অনেকানেক মুনি ঋষি পুনর্দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিদিত। যদি ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জন্ম হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যার আর বিশেষত্ব কি?

গুরু। না বৎস! ব্রহ্মজ্ঞের আর পুনর্জন্ম হয় না। তবে যে অপান্তরতমা প্রভৃতি ঋষির পুনর্জন্মের কথা শুনা যায়, তাহা বাস্তবিক সাধারণ জীবের জন্মের ন্যায় নহে। ঐ সমস্ত ঋষিরা এক একটা উদ্দেশ্য বা অধিকার (Mission, যেমন বেদ প্রচার) লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ঐ 'অধিকার' শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা জীবন্মুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন, অথবা কেবলমাত্র ঐ 'অধিকার' বা কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যই এক বা একাধিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের ঐ 'অধিকার' প্রারব্ধ কর্ম্মের ন্যায়। যেমন, কোন সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও প্রারব্ধ শেষ না হইলে জীবন্মুক্ত অবস্থায় দেহ ত্যাগ কাল পর্য্যন্ত সশরীরে অবস্থান করেন, সেইরূপ অপান্তরতমা প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাও নিজ নিজ প্রারব্ধতুল্য 'অধিকার' শেষ করিবার জন্য আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ জন্মগ্রহণে

তাঁহাদের কোন বন্ধন হইতে পারে না, কিংবা ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানেরও নিষ্ফলতা হয় না। সেইজন্যই সূত্রকার বলেন

যাবদধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্ ।। ৩২ ।।

বেদপ্রচারাদি বিশেষ বিশেষ অধিকারে (mission) নিযুক্ত ঋষিদের [আধিকারিকাণাম্], যতকাল পর্য্যন্ত সেই অধিকার শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত [যাবদধিকারম্] এক বা একাধিক দেহে অবস্থান [অবস্থিতিঃ] হয়। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও কেবলমাত্র আপন আপন 'অধিকার' সমাপ্তির জন্যই দেহ ধারণ করেন; 'অধিকার' সমাপ্ত হইলে 'কৈবল্য' প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (১১ সূঃ) এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, সেই গুণগুলি সমস্তই একত্র সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু অনেক শ্রুতিতে আবার ব্রহ্মসম্বন্ধে গুণের নিষেধ করাও হইয়াছে। যেমন, বৃহদারণ্যকে আছে, "হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন, এই অক্ষর (যিনি ক্ষরিত, বিকৃত হন না, সর্ব্বকালে একইরূপে অবস্থান করেন, সেই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম) স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন" (বৃঃ ৩.৮.৮)। আবার মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন, "তাহাই পরাবিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর জ্ঞাত হয়। সেই অক্ষরকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাঁহার কোন গোত্র নাই, বর্ণ নাই" (মুঃ ১.১৫)। এই সমস্ত অক্ষরবিদ্যাতে কোন স্থলে কয়েকটী বিশেষ গুণের নিষেধ করা হইয়াছে, কোনস্থলে আবার অপর কয়েকটী বিশেষ গুণের নিষেধ করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে শ্রুতিতে দুইটী একটী গুণের নিষেধ আছে, সেই শ্রুত্যুক্ত

অক্ষরবিদ্যাতে কি অন্য শ্রুত্যুক্ত অক্ষর বিদ্যা হইতে সেস্থলে উক্ত অপরাপর যে সমস্ত গুণের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাও সংগ্রহ করা হইবে, না যে স্থলে যে কয়টী গুণের নিষেধ আছে, কেবল সেই কয়টী নিষেধ অবলম্বনেই এক একটী শ্রুতিতে এক একটী অক্ষরবিদ্যা হইবে ?

গুরু। অক্ষরধিয়াং তু অবরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ ঔপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

সমস্ত অক্ষরবিদ্যারই [অক্ষরধিয়াম্] একস্থলে সংগ্রহ [অবরোধঃ] করিতে হইবে, অর্থাৎ অক্ষরবিদ্যা প্রসঙ্গে সমুদায় শ্রুতিতে যে যে নিষেধ আছে, সেই সমস্ত নিষেধই একত্র সংগৃহীত করিয়া একটী পূর্ণাঙ্গ অক্ষরবিদ্যা হইবে। যেহেতু, প্রত্যেক শ্রুতিতেই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিবার প্রণালী (নিষেধমুখে ব্রহ্মনির্দ্ধারণ) সমান এবং ব্রহ্মভাবও (অক্ষর ব্রহ্ম) সর্ব্বত্রই এক [সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্]। অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদন প্রণালী সর্ব্বত্রই এক ও একরূপ, সেইহেতু একস্থলের নিষেধ অন্যস্থলেও নীত হইবে। এইরূপ নীত হইবার দৃষ্টান্ত 'উপসদ' [ঔপসদবৎ]। 'উপসদ' নামে একটি আনুষঙ্গিক যাগ আছে। তাহাতে পুরোডাশ (একপ্রকার পিঠা) উৎসর্গ করিবার যে মন্ত্র, তাহা সামবেদেই আছে। কিন্তু যজুর্ব্বেদের পুরোহিত অধ্বর্য্যু ঐ সামবেদীয় মন্ত্র পাঠ করিয়াই পুরোডাশ উৎসর্গ করেন। এস্থলে যেমন একবেদের মন্ত্র অন্য বেদে গৃহীত হয়, সেইরূপ অক্ষরবিদ্যা বিষয়ক নিষেধবাক্যও বিভিন্ন শ্রুতিতে গৃহীত হইবে। এইরূপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার রীতি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসায় প্রতিপাদন করিয়াছেন [তদুক্তম্]।

শিষ্য। মুণ্ডকোপনিষদের একটী মন্ত্র এই—"একই বৃক্ষে (শরীরে) দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) পরস্পর সখ্যভাবে একসঙ্গে বাস করে। তাহাদের একটী (জীব) স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভক্ষণ করে, অন্যটী (পরমাত্মা) কিছু ভোগ না করিয়া কেবল প্রকাশমান থাকেন" (মুঃ ৩.১.১)। আবার কঠোপনিষদে আছে, "ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন, 'আলো ও ছায়ার ন্যায় দুইজন (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) স্বকর্ম্মের লোকে (দেহে) ঋত পান করেন, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন, এবং উহারা গুহাতে (বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে) প্রবিষ্ট আছেন" (কঃ ৩.১)। এই দুই শ্রুতিতে দুইরকমের বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ মুণ্ডকে একজনকেই ভোক্তা বলা হইয়াছে, আর কঠে দুইজনকেই ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

গুরু। না, একই বিদ্যা ঐ দুই শ্রুতিতে বিবৃত করা হইয়াছে,

ইয়ৎ-আমননাৎ ॥ ৩৪ ॥

কারণ, ঐ উভয়শ্রুতিতে যাঁহাকে জ্ঞেয়রূপে বুঝান হইয়াছে, তিনি একই, তবে তাঁহার দ্বিত্ব মাত্র উক্ত হইয়াছে [ইয়দামননাৎ], অর্থাৎ তিনি 'এমন এমন ভাবে অবস্থান করেন' এইটুকু দেখানই ঐ দুই শ্রুতির উদ্দেশ্য। অন্যকথায় জীবাত্মারূপেও তিনিই বর্ত্তমান, এই তথ্য প্রকাশ করাই ঐ উভয় শ্রুতির অভিপ্রায়। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করাই ঐ উভয় শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্ধৃত বাক্যের পূর্ব্বে ও পরে অদ্বিতীয় পরমাত্মার বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে, মধ্যে হঠাৎ দ্বিতীয় বস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে, এরূপ কল্পনা করা যায় না। কঠ শ্রুতিতে যে পরমাত্মাকেও ভোক্তা বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই তাঁহারও ভোগ হয়, ইহা প্রতিপাদনের জন্য নয়, তবে

জীবসাহচর্য্যে অর্থাৎ জীবরূপ উপাধির সম্পর্কে যেন তাঁহারও ভোগ হয় বলিয়া বোধ হয়, এইটুকু দেখাইবার জন্য। আর, জীবেরও যে পৃথক্ নির্দ্দেশ, তাহাও বস্তুতঃ ব্রহ্ম ছাড়া জীবনামক স্বতন্ত্র একটা পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে নহে, বরং জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ উভয় শ্রুতি একই বিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩.৪.১, ৩.৫.১) উষস্ত প্রশ্ন করিলেন, "যে আত্মা সর্ব্বান্তর, তাঁহার বিষয় আমাকে উপদেশ করুন"। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "যাঁহা প্রাণদ্বারা প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি) করেন, তিনিই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা" ইত্যাদি। তৎপরে কহোল আবার ঠিক একইরূপ প্রশ্ন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া সর্ব্বান্তর আত্মার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন, "যাঁহা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন"— ইত্যাদি। এস্থলে উষস্ত ও কহোল উভয়ের প্রশ্ন ঠিক একরূপ হইলেও উত্তর বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য দুই জনকে দুই প্রকারের আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, এবং তাহা হইলে ফলে ঐ স্থলে দুইটী বিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে বলিতে হয়।

গুরু। না বৎস, একই বিদ্যা উভয়কে ভাষার একটু তারতম্য করিয়া বুঝান হইয়াছে। উভয়েই এক সর্ব্বান্তর আত্মা সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন, কিন্তু আত্মদর্শী যাজ্ঞবল্ক্য দুই আত্মাসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা কখনও সঙ্গত হয় না। বিশেষ এক দেহে কখনও দুইটী 'সর্ব্বান্তর' (সর্ব্বাপেক্ষা আন্তর--innermost) আত্মা হইতে পারে না। একটীরই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরত্ব হইতে পারে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে,

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

একই আত্মার [স্বাত্মনঃ] সর্ব্বান্তরত্ব [অন্তরা] উভয়ের প্রশ্নের উত্তরেই দেখান হইয়াছে, সুতরাং বিদ্যাও উভয়স্থলেই এক। ইহার দৃষ্টান্ত ভূতসমূহ [ভূতগ্রামবৎ]। পঞ্চভূতে নির্ম্মিত এই শরীরে প্রত্যেকটী ভূতের অপর সকল অপেক্ষা অন্তরত্ব হইতে পারে না। তবে মৃত্তিকা অপেক্ষা জল অন্তর (সূক্ষ্ম), জল অপেক্ষা তেজ অন্তর—এইরূপ এক একটী ভূতের আপেক্ষিক অন্তরত্ব থাকিলেও 'সর্ব্বান্তর' (সূক্ষ্মতম) একটীই, সেইরূপ সর্ব্বান্তর আত্মাও দুইটী থাকিতে পারে না। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য উভয় স্থলেই একই সর্ব্বান্তর আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়।

শিষ্য। কিন্তু

অন্যথা ভেদ-অনুপপত্তিঃ ইতি চেৎ ?—

উক্ত দুই স্থলে বিদ্যার ভেদ স্বীকার না করিলে [অন্যথা] এইরূপ বার বার একই বিদ্যার উপদেশ করিবার সার্থকতা কি ? একই বিষয়ের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে, সেইহেতু বলিতেই হইবে যে, বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই বিদ্যার ভেদ স্বীকার না করিলে ঐরূপ পুনরুক্তি [ভেদ-] সঙ্গত হয় না [অনুপপত্তিঃ]—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু। না বৎস ! একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিলেই যে সর্ব্বত্র নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াই করিতে হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। "অমুক যজ্ঞ করিবে" এইরূপ বিধানবাক্য একবার বলিলেই যথেষ্ট, কারণ বিধির সার্থকতাই হইল নূতন কিছু করিতে বলা, তাহা একবার বলিলেই হয়। দ্বিতীয়বার বলিলে তাহার

নূতনত্ব থাকে না, সুতরাং সেরূপ কোন পুনরুক্তি হইলে বিধির ভেদই সিদ্ধ হয়। কিন্তু যে বাক্য শুধু বিধি নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা যতক্ষণ না বোদ্ধার হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নানা ভাবে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও বস্তুর পার্থক্য হয় না, একই বস্তু বিভিন্নভাবে বুঝান হয় মাত্র।

উপদেশান্তরবৎ ॥৩৬॥

যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে 'তত্ত্বমসি—তাঁহাই তুমি' এই একই বাক্য নয়বার উপদেশ করিয়াছেন। তথাপি সেস্থলে বিদ্যার ভেদ হইয়াছে, এমন কথা কেহ বলে না। জ্ঞাতব্য বস্তু এক হইলেও ঐ বিষয়ে শিষ্যের বুদ্ধির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন রকমের আশঙ্কা বা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; গুরু বিভিন্ন উপায়ে সেই সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া যে ভাবে শিষ্যের বুদ্ধিতে তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই ব্যবস্থা করেন, এবং সেইজন্য একই তত্ত্ব বার বার বিবৃত হইলেও কোন দোষ হয় না। আলোচ্য স্থলে উষস্ত ও কহোলের প্রশ্ন এক হইলেও তাহাদের বুঝিবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র, সেই জন্য উত্তরও একটু স্বতন্ত্রভাবেই করা হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যার ভেদ স্বীকার করা সঙ্গত নয়—একই সর্ব্বান্তর আত্মা উভয়কে দুইভাবে বুঝান হইয়াছে মাত্র।

শিষ্য। ঐতরেয় শাখীরা এইরূপে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে ধ্যান করিবেন—"আমিই ইনি, ইনিই আমি"। জাবালেরাও "হে ভগবতি দেবতে! আমিই তুমি, তুমিই আমি" এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ আমি ও তুমির পরস্পর বিনিময়াত্মক ভাবনা করিবেন, এইরূপ

উপদেশ আছে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, উপাসক কি সত্য-সত্যই আপনার সহিত উপাস্য দেবতার বিনিময়াত্মক ভাবনা করিবে (অর্থাৎ উপসকই উপাস্য এবং উপাস্যও উপাসক, এইরূপ উভয়ভাবে চিন্তা করিবে), না কেবল আপনাকেই উপাস্যরূপে ভাবনা করিবে?

গুরু। ব্যতিহারঃ বিশিংষন্তি হি, ইতরবৎ ॥৩৭॥

বিনিময়াত্মক ভাবনাই [ব্যতিহারঃ] করিতে হইবে, কারণ [হি] শ্রুতি বিশেষ করিয়া ব্যতিহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন [বিশিংষন্তি] 'উপাসকই উপাস্য'—মাত্র এইটুকু ভাবনা করিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতির ওরূপ বিশেষ উক্তির (আমিই তুমি, তুমিও আমি) কোন সার্থকতা থাকে না। 'সত্যকাম', 'সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাদি ঈশ্বরবোধক গুণসমূহ যেমন অন্যান্য শ্রুতিতে ধ্যানের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ [ইতরবৎ] ধ্যানের নিমিত্তই 'ব্যতিহার' উপদিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য। আচ্ছা, উপাসক যদি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করে, তবে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকেও যদি সামান্য জীবরূপে ভাবনা করা হয়, তবে ত ঈশ্বরকে নিকৃষ্ট ও ছোট করা হয়।

গুরু। না, বৎস! উক্ত শ্রুতিতে ঈশ্বর বড়, কি উপাসক বড়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন প্রয়াস নাই। উক্ত শ্রুতি কেবলমাত্র কি ভাবে ধ্যান করিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য ঐরূপ ব্যতিহারে উপাস্য ও উপাসকের অভিন্নতা দৃঢ়তর হয় বটে, কিন্তু তাহা আনুষঙ্গিক, মুখ্যভাবে শ্রুতি মাত্র ধ্যানের পদ্ধতিই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণ যে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, উপাসক

ঈশ্বরকে ঐ ভাবে ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন ; ইহাতে শ্রুতি ঈশ্বরকে পরমার্থতঃ সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করেন, এরূপ মনে করিও না। সুতরাং আলোচ্য স্থলে ব্যতিহারাত্মক ধ্যানই অবলম্বনীয়।

শিষ্য। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে "যিনি এইরূপে এই মহৎ, পূজনীয়, প্রথমজ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন" (বৃঃ ৫. ৪. ১) ইত্যাদি ক্রমে **সত্যবিদ্যা** নামক এক উপাসনা বিহিত হইয়াছে। পরে আবার ঐ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে যে, "সেই যে (পূর্ব্বোক্ত) সত্য, তাহাই এই আদিত্য, সেই সত্যই এই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, সেই সত্যই দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ" (বৃঃ ৫.৫.২) ইত্যাদি। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্ববাক্যে যে সত্যবিদ্যার বিধান করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী বাক্যেও কি সেই সত্যবিদ্যারই উপদেশ করা হইয়াছে, না পৃথক্ রকমের এক সত্যবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে ?

গুরু। সা এব, হি সত্যাদয়ঃ ॥৩৮॥

সেই পূর্ব্ব বাক্যোক্ত সত্যবিদ্যাই [সা এব] পরবর্ত্তী বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে ; যেহেতু [হি], পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি গুণই [সত্যাদয়ঃ] পরবর্ত্তী বাক্যে পুনরুল্লেখ করিয়া শ্রুতি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, উভয়বাক্যে বিদ্যা একই।

শিষ্য। কিন্তু উভয়স্থলে উপাসনার যে ফলের উল্লেখ আছে, তাহা ত একরূপ নয় ?

গুরু। তাহা না হইলেও, বিদ্যার বাস্তবিক কোন ভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। সত্য উপাসনার প্রধান বা মুখ্য ফল যাহা, তাহা

উভয় স্থলেই এক, যেটুকু ইতরবিশেষ দেখান হইয়াছে, তাহা উপাসনার অঙ্গবিশেষের ফল। এইরূপ আনুষঙ্গিক ফলের ভিন্নতায় বিদ্যার বস্তুতঃ ভেদ সাধিত হয় না।

শিষ্য। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, "হৃদয়াভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ আছে, তাহাতে সূক্ষ্ম যে অন্তরাকাশ, তাহাই আত্মা—তিনি নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প—" (ছাঃ ৮.১. ১-৫)। আবার বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, "সেই এই মহান্ জন্মাদিরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশ, তিনি সর্বনিয়ন্তা" (বৃঃ ৪.৪.২২)। এই দুইস্থলের বিদ্যা কি এক, না ভিন্ন ?

গুরু। উভয়স্থলে একই বিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং

কামাদি ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ ॥৩৯॥

একস্থলে (ছান্দোগ্যে) উক্ত সত্যকাম প্রভৃতি ধর্ম বা গুণ [কামাদি] অন্যত্র (বৃহদারণ্যকে) [ইতরত্র], এবং বৃহদারণ্যকোক্ত গুণও ছান্দোগ্যে [তত্র চ] সংযোজিত করিতে হইবে ; যেহেতু, উভয় শ্রুতিতেই স্থান প্রভৃতি একই [আয়তনাদিভ্যঃ]। উভয়স্থলেই হৃদয়-সম্পর্কে পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইয়াছে, উভয়ত্রই তাঁহাকে লোক-নিয়ন্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; এইরূপ উভয়স্থলে বহুসাদৃশ্য বিদ্যমান, তবে বিশেষ এই মাত্র যে, ছান্দোগ্যে 'ধ্যেয়'রূপে, আর বৃহদারণ্যকে 'জ্ঞেয়'রূপে একই পরমেশ্বর উপদিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যা একই, এবং সেইজন্য এক স্থানের গুণও অন্যত্র সংযোজিত করা উচিত।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈশ্বানর উপাসনা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, যে অন্ন প্রথমে আহারের জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হোমের জন্য, অর্থাৎ তাহা দ্বারা হোম করিতে হইবে। অবশ্য এই হোম অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করা নয়, পরন্তু ভোক্তা প্রথমে কিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণ করিয়া "প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মুখে দিবেন। এইরূপ অপানাদি অপর চারিটী প্রাণের উদ্দেশ্যে চারিটি গ্রাস মুখাভ্যন্তরে আহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ হোমের নাম বলা হইয়াছে 'প্রাণাগ্নিহোত্র'। বৈশ্বানর-উপাসক ভোজনকালে এই অগ্নিহোত্র করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, এই অগ্নিহোত্রের কোনকালে লোপ হইতে পারে কি না? আপাততঃ মনে হয় যে, সাধারণ অগ্নিহোত্র প্রত্যহ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইলেও, অন্ততঃ উপবাসদিনে ভোজনদ্রব্যের অভাবে এই অগ্নিহোত্র সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু

আদরাৎ অলোপঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রুতি এই অগ্নিহোত্রের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইয়াছেন বলিয়া [আদরাৎ] কদাপি ইহার লোপ করা সঙ্গত নয় [অলোপঃ]। সাধারণতঃ অতিথিভোজন সর্ব্বাগ্রে করান হয়, পরে গৃহস্থ নিজে ভোজন করেন। কিন্তু এই অগ্নিহোত্র-সম্পর্কে শ্রুতি বলেন যে, অতিথিভোজনের পূর্ব্বেই বৈশ্বানরোপাসক আহার করিবেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রুতি এই অগ্নিহোত্রকে কতটা সম্মান করেন। এ হেন অগ্নিহোত্রের কিছুতেই লোপ করা উচিত নয়, সুতরাং উপবাসদিনেও অন্ন না হইলেও ফলমূল বা একান্ত পক্ষে একটু জলদ্বারা এই অগ্নিহোত্র সম্পাদন করা বিধেয় বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না বৎস,

উপস্থিতে অতঃ তদ্বচনাৎ ॥ ৪১ ॥

ভোজ্যবস্তু উপস্থিত হইলে [উপস্থিতে] অর্থাৎ সম্মুখে স্থাপিত হইলে সেই ভোজ্যবস্তু হইতে [অতঃ] প্রথম গ্রাস গ্রহণ করিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র করিবে ; যেহেতু, শ্রুতি **উপস্থিত** অন্নের প্রথম গ্রাসকেই অগ্নিহোত্রের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন [তদ্বচনাৎ]। সুতরাং যেদিন কোন খাদ্য গ্রহণ করা না হয়, সেদিন হোমদ্রব্যের অভাবে হোমও হইতে পারে না। কাজেই উপবাস দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপও দোষাবহ নহে। বিশেষ এই অগ্নিহোত্র নিত্যসম্পাদনীয় অগ্নিহোত্র নয়, কেবল উহার সদৃশমাত্র। আর তুমি যে সমাদরের কথা বলিয়াছ, তাহা ভোজন প্রথমে করিতে হইবে, এইটুকু দেখাইবার জন্য।

শিষ্য। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পর্কে কতক উপাসনার ব্যবস্থা আছে। উহাদিগকে "কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা" বলা হয়। ঐ সব কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা কি অবশ্যকর্ত্তব্য, না ইচ্ছাধীন ?—অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে হইলে ঐ সম্পর্কে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা করিতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম আছে কি ? না, যজ্ঞকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে ঐ উপাসনা নাও করিতে পারেন ?

গুরু। তন্নির্ধারণ-অনিয়মঃ তদ্দৃষ্টেঃ পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪২ ॥

কর্ম্মের সম্পর্কে যে উপাসনার বিধান আছে, তাহার [তৎ] অবশ্যকর্ত্তব্যতা [নির্দ্ধারণ] সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই [অনিয়মঃ],

অর্থাৎ ঐরূপ উপাসনা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন মাত্র; যেহেতু, শ্রুতিতে ঐরূপ উপাসনা করা ও না-করা উভয় প্রকারের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় [তদ্দৃষ্টেঃ]। শ্রুতি বলেন, "যাহারা এইরূপ উপাসনা করে, এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করিয়া থাকে" (ছাঃ ১.১.১০)—অর্থাৎ উপাসনা না করিলেও কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং শ্রুতিই দেখাইতেছেন যে, ঐরূপ উপাসনা না করিলেও মূল কর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হয় না। শ্রুতির এরূপ বলিবার কারণ এই যে [হি], কেবল কর্ম্মের (অর্থাৎ উপাসনারহিত কর্ম্মের) ফল এবং উপাসনার ফল পৃথক্ [পৃথক্]। উপাসনার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল 'অপ্রতিবন্ধ'—অর্থাৎ উপাসনার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কোনরূপ প্রতিবন্ধ (কর্ম্মের সফলতার কোন ব্যাঘাত) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না [অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্]। সুতরাং উপাসনার ফল যখন ভিন্ন, তখন সেই উপাসনা কর্ম্মের অঙ্গ নয়, ফলে তাহার অবশ্যকর্ত্তব্যত্ত্ব ও নাই।

শিষ্য। দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে শ্রুতি প্রাণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আবার বহির্জগতে বিদ্যমান অগ্নি-আদির মধ্যে বায়ুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং বহুস্থলে এই প্রাণ ও বায়ুকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি প্রাণ ও বায়ু তত্ত্বহিসাবে একই হয়, তবে একমাত্র প্রাণের উপাসনা করিলেই বায়ুরও উপাসনা করা হয়। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, **আধ্যাত্মিক প্রাণের উপাসনা ও আধিদৈবিক বায়ুর উপাসনা অভিন্ন।**

গুরু। না, বৎস! যদিও তত্ত্বহিসাবে বায়ু ও প্রাণ একই, তথাপি

আধ্যাত্মিকভাবেই প্রাণের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, এবং আধিদৈবিকভাবেই বায়ুর উপাসনার বিধান হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বহিসাবে প্রাণ ও বায়ু এক হইলেও উপাস্যভাবে উভয়ে ভিন্ন, কাজেই উপাসনাও ভিন্নভাবেই করিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত—

প্রদানবৎ এব তদুক্তম্ ॥ ৪৩ ॥

যেমন একই অগ্নিহোত্র যাগ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দুই সময়েই করিতে হয়, সেইরূপ একতত্ত্বের উপাসনাও দুইভাবেই করিতে হইবে। অথবা যেমন, ইন্দ্র এক হইলেও 'অধিরাজ' ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ও 'স্বরাট' ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃ প্রদান করা হয়, সেইরূপ [প্রদানবৎ] এস্থলেও হইবে। তত্ত্ব এক হইলেও যে তাহার বিভিন্ন গুণ বা অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন রকমের আরাধনা হইতে পারে, তাহা [তৎ] পূর্ব্বমীমাংসায় (৩.৩.৪২) নির্দ্ধারিত হইয়াছে [উক্তম্]।

শিষ্য। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে কতকগুলি অগ্নির নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই। যেমন, বাক্‌চিৎ অগ্নি, প্রাণচিৎ অগ্নি, চক্ষুশ্চিৎ অগ্নি, কর্ম্মচিৎ অগ্নি। বাক্‌চিৎ অর্থাৎ বাক্যদ্বারা নিষ্পন্ন বা উৎপাদিত, এইরূপ অন্যান্য অগ্নিরও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, এই সকল অগ্নি কি কোন যজ্ঞ করিবার জন্য কল্পিত, না উপাসনার জন্য? অর্থাৎ ঐরূপ অগ্নির কল্পনা করিয়া কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিম্বা কেবল ধ্যানের জন্য ঐ সব অগ্নির কল্পনা করা হইয়াছে?

গুরু। যে প্রসঙ্গে ঐ সব অগ্নির উল্লেখ আছে, তদনুসারে

উহাদিগকে ক্রিয়ার অঙ্গ অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নি বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু বাস্তবিক উহারা ক্রিয়ার অঙ্গ নয়, পরন্তু ধ্যানের জন্যই কল্পিত অর্থাৎ ঐ-সকল অগ্নির কেবল মনে মনে ভাবনাই করিতে হয়, উহাদের সাহায্যে কোন যাগযজ্ঞ করিতে হয় না। যজ্ঞের অগ্নি হইতে উহারা স্বতন্ত্ররকমের কল্পিত অগ্নিমাত্র ,

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—

যেহেতু, ঐ সমস্ত অগ্নিকে যজ্ঞাগ্নি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবার বহুতর লিঙ্গ (স্বতন্ত্রতাবোধক চিহ্ন) আছে। অর্থাৎ এই সমস্ত অগ্নি যে স্বতন্ত্র রকমের অগ্নি, তাহা শ্রুতি উহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আর

তৎ হি বলীয়ঃ তদপি ॥৪৪॥

সেই সমস্ত 'লিঙ্গ' [তৎ] অর্থাৎ স্বতন্ত্রতাবোধক চিহ্ন প্রকরণ অপেক্ষা প্রবল [বলীয়ঃ] ; অর্থাৎ অর্থ-নির্ণয়ব্যাপারে প্রকরণ (context) অপেক্ষা 'লিঙ্গের' শক্তি অধিক। একথাও [তদপি] পূর্বমীমাংসায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রকরণ অনুসারে ঐ সমস্ত অগ্নিকে যজ্ঞ-সম্পর্কীয় বলিয়া বোধ হইলেও উহাদের স্বতন্ত্রতাবোধক বহু চিহ্ন থাকায় উহাদিগকে স্বতন্ত্ররকমের অগ্নিই বলিতে হইবে।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকরণে এই সমস্ত অগ্নির উল্লেখ আছে, তাহাতে ক্রিয়াময় যাগেরই আলোচনা আছে। বাকৃচিৎ প্রভৃতি অগ্নি—

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥৪৫॥

প্রথমোক্ত সাধারণ যজ্ঞাগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ [illegible] [পূর্ব-বিকল্পঃ], যেহেতু, প্রকরণটী ক্রিয়াময় যজ্ঞেরই আলোচনা করিয়াছে [প্রকরণাৎ], তাহাতে হঠাৎ মনঃকল্পিত অগ্নির [illegible]।

অতএব বলা উচিত যে, এই বাক্‌চিৎ প্রভৃতি অগ্নিও ক্রিয়ারই অঙ্গ [ক্রিয়া স্যাৎ]। ইহার দৃষ্টান্ত, মানসগ্রহ [মানসবৎ]।—শ্রুতিতে বারদিনব্যাপী একটী যাগের বর্ণনা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, দশম দিনে প্রজাপতির উদ্দেশে, পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের স্থাপন, ভক্ষণ ইত্যাদি করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল মনে মনেই চিন্তা করিতে হয়। এই সব ব্যাপার মানস হইলেও যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত এবং সেইজন্য উপাসনার মধ্যে গণ্য হয় না। সেইরূপ বাক্‌চিৎ প্রভৃতি বাস্তবিক অগ্নি না হইলেও যজ্ঞের সম্পর্কেই মনে মনে চিন্তনীয়, অতএব ক্রিয়ারই অঙ্গবিশেষ, স্বতন্ত্র উপাসনার বিষয় নয়।

আবার শ্রুতি স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাগ্নির ধর্ম্ম এই সমস্ত মানস অগ্নিতেও

অতিদেশাৎ চ ॥৪৬॥

প্রযুক্ত করিয়াছেন—এইজন্যও মনে হয়, ঐ সমস্ত অগ্নি ক্রিয়ারই (বাহ্যানুষ্ঠানের) অঙ্গ।

গুরু। না,

বিদ্যা এব তু নির্ধারণাৎ ॥৪৭॥

ঐ অগ্নিগুলি উপাসনা স্বরূপই [বিদ্যা এব], কারণ শ্রুতি এই কথাই নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন [নির্ধারণাৎ]। শ্রুতি বলেন, "পূর্ব্বোক্ত অগ্নি সকল (বাক্‌চিৎ প্রভৃতি) নিশ্চয়ই 'বিদ্যাচিত' অর্থাৎ চিন্তাপ্রসূত।" "এইসব অগ্নি জ্ঞানীর বিদ্যা বা ধ্যানের দ্বারাই স্থাপিত হয়।"

তারপর, ৪৪ সূত্রে যে সমস্ত লিঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা

দর্শনাৎ চ ॥৪৮॥

দেখিয়াও নির্দ্ধারণ করা যায় যে, এইসব অগ্নি উপাসনার জন্যই, যাগানুষ্ঠানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

হ্যাঁ, প্রকরণটী অবশ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয়ই বটে, কিন্তু তাহা হইলেও কেবল সেই প্রকরণবলে ঐ সব অগ্নির যজ্ঞাঙ্গতা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, প্রকরণ অপেক্ষা

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ চ ন বাধঃ ॥৪৯॥

'শ্রুতি', 'লিঙ্গ' ও 'বাক্যের' বলবত্তা অধিক বলিয়া [শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ] একমাত্র প্রকরণ ঐ সব অগ্নির ধ্যানার্থতার বাধা জন্মাইতে পারে না [ন বাধঃ]। 'শ্রুতি' হইল এমন শব্দ, যাহা অন্য কিছুর অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সাক্ষাৎভাবে অর্থবোধ করায়—যেমন, "এই সমস্ত অগ্নি কেবলই বিদ্যাচিত অর্থাৎ উপাসনাস্বরূপ, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এই বাক্যে শ্রুতি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে ও অতি স্পষ্ট করিয়া ঐ অগ্নিগুলিকে উপাসনা সম্পর্কিত বলিয়াছেন। তারপর 'লিঙ্গ'—যেমন, "সমুদায় প্রাণী সর্ব্বদা এই অগ্নিসমূহের স্থাপনা করিতেছে"। যজ্ঞসম্পর্কিত অগ্নি সর্ব্বপ্রাণী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা স্থাপিত হয় না; সুতরাং এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, ঐ অগ্নিগুলির সহিত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের কোন সম্পর্ক নাই। আর বাক্য—যেমন, "ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ মনে মনে উপাসক ঐ সব অগ্নি স্থাপনা করেন"। 'শ্রুতি' 'লিঙ্গ' ও 'বাক্য'—এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান, অর্থাৎ অর্থ-নির্ণয় করিতে প্রকরণ অপেক্ষা এই তিনটিই অধিক সহায়ক—ইহা পূর্ব্ব মীমাংসায় বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

তারপর, এইসব অগ্নি সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "মনে মনেই এই সমস্ত অগ্নির সংগ্রহ করা হয়, মনে মনেই উহাদের স্থাপনা করা হয়, মনে মনেই যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করা হয়, মনে মনেই স্তবস্তুতি করা হয়··· অধিক কি যজ্ঞসম্পাদনের যতকিছু ব্যাপার সমস্তই মনে মনে, বাহিরে নয়"। যজ্ঞসাধনের যাবতীয় ব্যাপারই যখন মানসিক, তখন এই সমস্ত

অগ্নিকে কিছুতেই বাহ্যানুষ্ঠানের সম্পর্কিত বলা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে,—

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৫০॥

যজ্ঞসম্পর্কিত অগ্নিস্থাপনাদি যাবতীয় ব্যাপার (অনুবন্ধ) মানসিক বলিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য প্রভৃতি কারণে [অনুবন্ধাদিভ্যঃ] আলোচ্য অগ্নিসমূহকে স্বতন্ত্র রকমের অগ্নিই বলিতে হইবে; কেবল উপাসনায়ই উহাদের প্রয়োজন, কোনরূপ বাহ্য যজ্ঞানুষ্ঠানে নয়। ক্রিয়ার প্রসঙ্গে উক্ত হইলেও যেমন 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা', 'দহরবিদ্যা', ইত্যাদিকে ক্রিয়া হইতে পৃথক্‌রূপেই স্বীকার করা হয়, সেইরূপ [প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ, প্রজ্ঞা=বিদ্যা, প্রজ্ঞান্তর=শাণ্ডিল্য প্রভৃতি অন্যান্যবিদ্যা] এই অগ্নি সকলকেও ক্রিয়া হইতে পৃথক্‌রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার এরূপও দেখা যায় [দৃষ্টশ্চ] যে, এক প্রকরণে উক্ত হইলেও একটী যাগ মূল যজ্ঞ হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র। যেমন, রাজসূয় যজ্ঞপ্রকরণে উক্ত হইলেও 'আবেষ্টি' নামক যাগটী রাজসূয়যজ্ঞের অঙ্গ নয়, কিন্তু একটী স্বতন্ত্র যাগ. এইসব বিষয় পূর্ব্বমীমাংসায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে [তদুক্তম্]।

৪৫ সূত্রে বলিয়াছিলে যে, পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপার মানসিক হইলেও ক্রিয়াময় যজ্ঞেরই অঙ্গ, সেইরূপ আলোচ্য স্থলেও মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নি মনে মনে সম্পন্ন হইলেও ক্রিয়ারই সহায়ক, স্বতন্ত্ররকমের অগ্নি নয়। কিন্তু

ন সামান্যাৎ অপি, উপলব্ধেঃ, মৃত্যুবৎ,
ন হি লোকাপত্তিঃ ॥৫১॥

এরূপ সাম্য থাকিলেও [সামান্যাদপি] মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিকে ক্রিয়ার

অঙ্গ বলা যায় না [ন] ; কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, বাক্য ইত্যাদি কারণে ইহাদের স্বতন্ত্রতাই বুঝা যায় [উপলব্ধেঃ]। দুইটী বস্তুর এক অংশে সাম্য থাকিলেই যে উহারা সর্ব্বাংশে সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। যেমন, শ্রুতির একস্থলে অগ্নি ও সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া 'মৃত্যু' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথাপি অগ্নি ও সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ সর্ব্বাংশে সমান নয়। এস্থলেও 'মানসিক' শব্দটী ঐ 'মৃত্যু' শব্দের ন্যায় [মৃত্যুবৎ]। ইহাতে মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। "এই লোকই অগ্নি, সূর্য্য ইহার সমিধ"—ইত্যাদি স্থলে যেমন একভাবে লোক (বিশ্ব) ও অগ্নির সাম্য দেখান হইলেও বস্তুতঃ লোক সত্য সত্যই অগ্নি হইয়া যায় না [ন চ লোকাপত্তিঃ], সেইরূপ মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির ক্রিয়াময় অগ্নির সহিত কতক সাম্য কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ উহারা ক্রিয়াঙ্গ নহে, উপাসকের ধ্যানের জন্যই উহাদের কল্পনা।

আরও দেখ, আলোচ্য শ্রুতির পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় যাগের ফল হইতে মনশ্চিতাদি অগ্নির সাহায্যে ভাবনাময় যে যাগ করিতে হয়, তাহার ফল পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্, ভূয়স্ত্বাৎতু অনুবন্ধঃ ॥৫২॥

পরবর্ত্তী বাক্য দ্বারাও [পরেণ চ] মনশ্চিতাদি শব্দের [শব্দস্য] তাদৃশভাব [তাদ্বিধ্যম্], অর্থাৎ তাহারা যে কেবল উপাসনার জন্যই উক্ত একথা, নির্ণীত হয়। তবে [তু] ক্রিয়াময় অগ্নির প্রকরণে যে ইহাদের সন্নিবেশ [অনুবন্ধঃ] করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, মানস যাগের যে সমস্ত ব্যাপার, তাহার অধিকাংশই

ক্রিয়াময় যাগের অনুরূপ [ভূয়স্থাৎ]। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল এই যে, এই অগ্নিগুলি কেবল উপাসনার জন্য, কোন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নহে।

[শিষ্য। গুরুদেব! আপনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নি উপাসক মনে মনেই নিষ্পন্ন করিবেন, শারীরিক ক্রিয়ার সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উপাসনা একরূপ মানসিক ব্যাপার, কোন বিষয়ের অনুচিন্তনের নামই উহার উপাসনা, এবং ঈদৃশ উপাসনা হস্তপদাদির সাহায্যে নিষ্পন্ন বাহ্য অনুষ্ঠান হইতে ভিন্ন, ইহাই আপনার বক্তব্য। কিন্তু যিনি উপাসনা করেন, তিনি কি বস্তুতঃ শরীর হইতে ভিন্ন? যদি তিনি বস্তুতঃ শরীরাতিরিক্ত হন, তবে আপনার ওরূপ উক্তি সঙ্গত হয় বটে। অবশ্য এ যাবৎ যত কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বুঝিয়াছি যে, আত্মার সহিত শরীরাদির সত্যিকারের কোন সম্পর্ক নাই। ফলতঃ এই তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিতেই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র পর্য্যবসিত। আপনিও বহু-প্রকারেই বুঝাইয়াছেন যে, আত্মা পরমার্থতঃ সর্ব্ববিধ উপাধিরহিত এবং চিরকালই একভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু যাহাকে উপাসনা করিতে বলা হয়, তাহাকে অবশ্য সোপাধিক বলিয়াই স্বীকার করা হয়। চৈতন্য (consciousness), স্মৃতি ইত্যাদি যাহার হয়, সেই উপাসনা করিতে পারে। কিন্তু এই চৈতন্যাদি কাহার? শরীরের, না শরীরাতিরিক্ত কাহারও? যদি শরীরেরই এই সমস্ত ধর্ম্ম হয়, তবে উপাসনা মানসিক, শারীরিক নয় এরূপ বিভাগ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ যাহা মানসিক, তাহাও মূলতঃ শরীরেরই ধর্ম্ম, আর তাহা

হইলে শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপাসকেরও নাশ হইয়া যাওয়ায় উপাসনার ফলভোগ করিবার আর কেহ থাকে না। যদি দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়, তবে বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনাও নিষ্ফল বলিতে হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের উপরই সমুদায় শাস্ত্র দণ্ডায়মান। এই মূল সত্য মানিয়া লইয়াই এ পর্য্যন্ত যত কিছু বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সূত্রকার ব্যাস এযাবৎ এই সত্যটী প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ সূত্র লিপি-বদ্ধ করেন নাই। আর এ যাবৎ আমরা বিশেষভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধেই নানা রকমের আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্ম এরূপ, না ওরূপ—ইহার তথ্য নির্দ্ধারণ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের উপর তেমন নির্ভর করে না। কিন্তু 'এমন এমন উপাসনা করিবে'—এই কথা বলিলেই যাহাকে উপাসনা করিতে বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যদিও এ যাবৎ নানা প্রকারে আত্মার দেহাতিরিক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি এই উপাসনার আলোচনা প্রসঙ্গে সূত্রকারের অভিমত জানিতে বিশেষ কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। বৎস! এসম্বন্ধে

একে আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৫৩॥

একদল লোক [একে] অর্থাৎ চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা বলেন, আত্মার [আত্মনঃ] দেহ ছাড়া পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, কারণ শরীর থাকিলেই [শরীরে] আত্মার অস্তিত্ব [ভাবাৎ] বুঝা যায়, না থাকিলে নয়। ইহারা বলেন, দেহই আত্মা, দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা পৃথক্ পদার্থ কিছু নাই। প্রাণ-ক্রিয়া, চৈতন্য (consciousness), স্মৃতি প্রভৃতি গুণ, যাহা শরীরাতিরিক্ত কোন

কিছুর বলিয়া বলা হয়, তাহা বাস্তবিক শরীরেরই ধর্ম। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ইত্যাদি ভূতের সংমিশ্রণে এই শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরের উপাদানভূত এই সমস্ত পদার্থে পৃথক্‌ভাবে চৈতন্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু এগুলি একত্র মিলিত হইলেই একটা চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয়; যেমন, চূণ কিম্বা খয়ের কোনটীই লাল না হইলেও দুইটী মিশাইলেই লালবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্যগুণ-যুক্ত দেহই আত্মা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সব শেষ হইয়া যায়; স্বর্গ, নরক, পরলোক, বন্ধ, মোক্ষ, এসব নিছক কল্পনা-মাত্র। ইঁহাদের যুক্তি এই প্রকার—একটী প্রদীপের অগ্নি ও তাহার আলো। অগ্নি যতক্ষণ থাকে, আলোও ঠিক ততক্ষণই থাকে; যে মুহূর্তে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, আলোও তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হয়। ঠিক এইরূপেই দেখা যায়, যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ প্রাণশক্তি, চৈতন্য, বা যাহা কিছু তথাকথিত আত্মার ধর্ম বলিয়া কথিত হয়, সবই থাকে, আর দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্তই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চৈতন্যাদি সমস্তই দেহের গুণ বা ধর্ম, এবং দেহাভ্যন্তরেই বিদ্যমান, বাহিরে ইহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই। ইহাই হইল দেহাত্মবাদীর মত।

আত্মা দেহের সহিত অভিন্ন, অর্থাৎ দেহই আত্মা, একথা

ব্যতিরেকঃ তদ্‌ভাবাভাবিত্বাৎ ন তু উপলব্ধিবৎ ॥৫৪॥

কিন্তু [তু] হইতেই পারে না [ন]। বরং দেহ হইতে আত্মার ভিন্নতাই [ব্যতিরেকঃ] যুক্তিসঙ্গত; কারণ, দেহ থাকিলেও [তদ্ভাবে] যাহাকে দেহাত্মবাদীরা দেহের ধর্ম বলেন, সেইসব প্রাণন-ক্রিয়া, অনুভব করিবার শক্তি প্রভৃতি থাকে না [অভাবিত্বাৎ]।

মৃতদেহে ইহার কিছুই থাকে না, অথচ দেহটা পড়িয়া থাকে। অনুভবশক্তি প্রভৃতি যদি দেহেরই ধর্ম্ম হইত, তবে দেহ থাকা সত্ত্বেও এই সকলের অভাব হয় কেন? ইহাতেই বুঝা যায়, এ সব দেহাতিরিক্ত অন্য কিছুর, দেহের নয়। সেই অতিরিক্ত কিছু, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রাণ-ক্রিয়া, বিষয়োপলব্ধি ইত্যাদি হয়, তাহাই প্রকৃত আত্মা। দেহাত্মবাদীরাও স্বীকার করেন যে, যে পদার্থ বিষয়ের উপলব্ধি করে, তাহা বিষয় হইতে পৃথক্, সেইরূপ উপলব্ধিস্বরূপ আত্মাও দেহাদিকে উপলব্ধি করে বলিয়া দেহাদি হইতে অবশ্যই পৃথক [উপলব্ধিবৎ]।

যতকাল দেহ থাকে, ততকাল রূপ প্রভৃতি দেহের ধর্ম্ম থাকে থাকুক, কিন্তু প্রাণ-ক্রিয়া, অনুভূতি ইত্যাদি দেহসত্ত্বেও মৃতাবস্থায় থাকে না। আবার ইহাও দেখা উচিত যে, দেহের ধর্ম রূপ প্রভৃতি অন্যেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে, কিন্তু অনুভূতি, স্মৃতি ইত্যাদি অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আত্মদৃষ্টান্তে অপরেরও ঐ সব আছে, এরূপ অনুমান করা যায় মাত্র। অনুভূতি প্রভৃতি যদি দেহের ধর্ম্মই হয়, তবে দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেরও অপর কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষোপলব্ধি না হইবে কেন? তারপর, জীবিতাবস্থায় অনুভূতি ইত্যাদি থাকে, ইহা নিশ্চিত হইলেও মৃতাবস্থায় এগুলি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, এরূপ নিশ্চয় ত করা যায় না। একটা সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, মৃতাবস্থায় এসব থাকে, কি-না; থাকিলে বুঝিতে পারিতাম একথা বলা যায় না, কারণ জীবিতাবস্থায়ও এ সব অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল উহাদের অস্তিত্ব অনুমান করা হয় মাত্র। নিদ্রিতাবস্থায় অনুভূতির কোন কার্য্য দেখা যায় না, তা বলিয়া তখন অনুভূতি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ ত কেহ বলে না। একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় উহার উদ্ভব হওয়া

ত অসম্ভব। সেইরূপ মৃতশরীরে অনুভূতি থাকেই না, এরূপ নিশ্চয় করা অসম্ভব। তারপর মৃত বা নিদ্রামগ্ন দেহে অনুভূতি থাকেই না—এরূপ স্বীকার করিলেও উহাকে দেহের ধর্ম্ম বলা যায় না, কারণ দেহ ত তখনও বর্ত্তমানই থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেহ থাকা সত্ত্বেও যখন অনুভূতির প্রকাশ সময়ে সময়ে হয় না, তখন নিশ্চয়ই উহা দেহের ধর্ম্ম নয়।

তারপর দেখ, যিনি অনুভব করেন, তিনি যাহা অনুভব করেন, তাহা হইতে অবশ্যই পৃথক্ হইবেন। সেই অনুভব-শক্তি দেহের ধর্ম্ম হইলে কখনও দেহ অনুভবে আসিত না। অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা কখনও অগ্নিকে দগ্ধ করে না। চৈতন্য যদি পৃথিব্যাদি ভূতের ধর্ম্ম বা সম্মিলিত শক্তিই হয়, তবে কখনও তাহা পৃথিব্যাদি ভূতকে উপলব্ধি করিতে পারিত না। কিন্তু চৈতন্য বাহ্য, আভ্যন্তর সমস্ত পদার্থই অনুভব করে। সুতরাং এই চৈতন্যশক্তি নিশ্চয়ই যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র।

আর, দেহ থাকিলে চৈতন্য থাকে, না থাকিলে থাকে না, অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম—এ কোন যুক্তিই নয়। অন্ধকার গৃহে প্রদীপ থাকিলে বস্তুর উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না, অতএব উপলব্ধি প্রদীপের ধর্ম্ম—এরূপ অদ্ভুত কথা ত কেহ বলে না। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বিষয়ের উপলব্ধি ব্যাপারে দেহ প্রদীপের ন্যায় একটা উপকরণ মাত্র—একথা বলাও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং এই সমস্ত যুক্তি, নিজ নিজ অনুভব ও শাস্ত্রবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। ফল কথা, সমুদায় শাস্ত্রই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে, সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বলা বাহুল্যমাত্র।]

যাহা হউক, এক্ষণে উপাসনার বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। সে সম্বন্ধে যদি তোমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে বল।

শিষ্য। 'উদ্গীথ' সামগানের একপ্রকার বিভাগ। কিন্তু 'উদ্গীথ' সকল বেদের সকল শাখায় একরূপ নয়, উচ্চারণাদির ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় উদ্গীথও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে এই উদ্গীথ অবলম্বনে উপাসনা করিবার ব্যবস্থাও কোন কোন শাখায় করা হইয়াছে। এই উদ্গীথের মত আরও অনেক প্রকার যজ্ঞাঙ্গের বিধান বেদে আছে। ঐ যজ্ঞাঙ্গগুলিও এক এক শাখায় এক এক রকম বলিয়া মনে হয়, এবং উদ্গীথের ন্যায় এইরূপ যজ্ঞাঙ্গ অবলম্বনে উপাসনার ব্যবস্থাও কোন কোন শাখায় করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গ সম্পর্কিত উপাসনা কি যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, কেবল সেই শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে, না অন্যান্য শাখোক্ত উদ্গীথাদি সম্পর্কেও ঐরূপ উপাসনা করিতে হইবে? প্রত্যেক শাখায় উক্ত উদ্গীথাদি যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন তৎসম্পর্কিত উপাসনাও কেবল যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, সেই শাখায়ই নিবদ্ধ থাকিবে, অন্য শাখোক্ত উদ্গীথাদির সহিত ঐ উপাসনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না—আমার ত এইরূপই মনে হয়।

গুরু। না, বৎস!

অঙ্গাববদ্ধাঃ তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ।।৫৫।।

কর্ম্মাঙ্গের সম্পর্কিত ঐ সমস্ত উপাসনা [অঙ্গাববদ্ধাঃ] কিন্তু [তু] যে যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, কেবল সেই সেই শাখায় [শাখাসু] নিবদ্ধ থাকিবে না [ন], পরন্তু প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখায়—যে স্থলেই ঐ কর্ম্মাঙ্গের উল্লেখ আছে, সেই স্থলেই [প্রতিবেদম্]

ঐরূপ উপাসনা করিতে হইবে; যেহেতু [হি] সামান্য উচ্চারণাদির বৈষম্য থাকিলেও উদ্গীথাদি কর্মাঙ্গ সমস্ত শাখাতেই এক, সুতরাং সেই উদ্গীথাদি অঙ্গের অবলম্বনে যে উপাসনার বিধান আছে, তাহা সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্য। অতএব এক শাখায় কথিত উদ্গীথাদিতে অন্য শাখায় বিহিত উপাসনার সংযোগ করিলে কোন বিরোধ হয় না।

মন্ত্রাদিবৎ বা অবিরোধঃ ॥৫৬॥

অথবা [বা] যেমন, কোন একটী যজ্ঞের প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদি এক শাখায় মাত্র উক্ত হইলেও অন্যান্য শাখায় বিহিত সেই যজ্ঞানুষ্ঠান কালে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাদিরই যোজনা করিতে হয়, সেইরূপ [মন্ত্রাদিবৎ] কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি সম্পর্কে বিহিত উপাসনাও প্রত্যেক শাখায়ই সম্পাদন করিতে হয়, তাহাতে কোন অসঙ্গতি হয় না [অবিরোধঃ]।

শিষ্য। গুরুদেব! ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫.১১) বৈশ্বানর উপাসনা সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। ঐ স্থলে দেখিতে পাই, পরমাত্মাকে 'বৈশ্বানর' রূপে উপাসনা করিবার বিধান করা হইয়াছে। এই উপাসনায় স্বর্গ, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী ইত্যাদিকে ঐ বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে ধ্যান করা হয়। ত্রিভুবন তাঁহার শরীর, স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, জল তাঁহার মূত্রাশয়, পৃথিবী তাঁহার পাদ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর আত্মার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে, না ত্রিভুবন-শরীর সমগ্র বৈশ্বানরের উপাসনা করিতে হইবে? এই উপাসনা-পদ্ধতির প্রথম ভাগ আলোচনা করিলে

মনে হয়, অংশের উপাসনাই শ্রুতির অভিপ্রেত। ঐ শ্রুতিতে
পাই, প্রাচীনশাল, ঔপমন্যব প্রভৃতি ছয়জন ঋষি বৈশ্বানর উপাসনার
যথার্থ রীতি জানিবার জন্য কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট গমন
করিয়াছিলেন। অশ্বপতি প্রত্যেককে নিজ নিজ বৈশ্বানরোপাসনা
পদ্ধতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিলেন, "আমি দ্যুলোককে
বৈশ্বানর জ্ঞানে উপাসনা করি," কেহ বলিলেন, "আমি সূর্য্যকে
বৈশ্বানর জ্ঞানে উপাসনা করি"—ইত্যাদি। অশ্বপতি বলি-
"আচ্ছা বেশ, কিন্তু এ সমস্ত বৈশ্বানর আত্মার এক একটি অঙ্গ
পরে কোন্ অঙ্গের উপাসনা করিলে কি ফল হয়, তাহা বলিয়া
একজনকে বলিলেন, "তুমি যেরূপ উপাসনা কর, তাহার ফল
যাহা হউক, আমার কাছে আসিয়া ভালই করিয়াছ, না আসিলে
বিশেষ অমঙ্গল হইত"। এই বলিয়া পরে তিনি সমগ্র বৈশ্বানরোপাসনা
করিলেন। এই আখ্যায়িকা দৃষ্টে মনে হয় যে, বৈশ্বানর উপাসনা
আংশিকভাবেও করা যায়, এবং সমগ্রভাবেও করা যায়, উভয়
প্রকার উপাসনারই পৃথক্ পৃথক্ ফল বর্ণিত হইয়াছে

গুরু। না বৎস! ঐ স্থলে

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বম্ তথা হি দর্শয়তি ॥৫৭॥

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট পূর্ণ বৈশ্বানরেরই [ভূম্নঃ] প্রাধান্য [illegible]
লক্ষিত হয়, অর্থাৎ ঐ বৈশ্বানর উপাসনার বিবরণে [illegible]
বৈশ্বানরের অংশবিশেষের উপাসনা অপেক্ষা সমগ্র [illegible]
প্রধান ও শ্রেষ্ঠরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। একটি প্রধান [illegible]
সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই চারিটী অঙ্গযাগের অনুষ্ঠান করা [illegible]
সমস্ত অঙ্গযাগের সহিত প্রধান যাগটী অনুষ্ঠিত হইয়া [illegible]

পূর্ণযাগ হয়, সেইরূপ [ক্রতুবৎ] বৈশ্বানর উপাসনাও সমুদায় আংশিক উপাসনার সমষ্টিতে সমগ্রভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি এই সমগ্রের উপাসনারই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন [তথাহি দর্শয়তি]।

দেখ, অশ্বপতি অঙ্গবিশেষ উপাসনার পৃথক্ ফল দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, ঐ আংশিক উপাসনা ঠিক নয়, উহাতে অমঙ্গল হয়। সুতরাং সমগ্রেরই উপাসনা করা উচিত, তাহাতে আংশিক উপাসনার ফল ত হয়ই, উপরন্তু পূর্ণ উপাসনার একটা বিশেষ ফলও হয়। অশ্বপতির বাক্যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি আংশিক উপাসনা অনুমোদন করেন না। সমগ্রের উপাসনাই তাঁহার অনুমোদিত, এবং শ্রুতিও ইহা দেখাইবার জন্যই ঐ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন।

শিষ্য। আচ্ছা, বৈশ্বানর আত্মার এক একটা অঙ্গ অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল থাকা সত্ত্বেও সমগ্র উপাসনাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এই রীতি অনুসারে শ্রুতিতে যে নানা রকমের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের উপাস্য একমাত্র ঈশ্বর, এইজন্য সমুদায় উপাসনা মিলাইয়া একটা পরিপূর্ণ উপাসনাই কি শ্রুতির অভিপ্রেত? অর্থাৎ শ্রুতিতে শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, সত্যবিদ্যা ইত্যাদি যত কিছু উপাসনা বর্ণিত আছে, সেই সকলগুলি মিলাইয়া একটা পরিপূর্ণ ঈশ্বরোপাসনা করাই কি শ্রুতির অভিপ্রেত?

গুরু। না বৎস। উপাস্য বস্তুতঃ এক হইলেও ঐ সমস্ত উপাসনা মিলিয়া একটী সমগ্র উপাসনা হয় না, কিন্তু উহারা

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৫৮ ॥

পৃথক্ পৃথক্ [নানা] উপাসনাই বটে, কারণ, শ্রুতি এক একটী

উপাসনা এক এক জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিধান করিয়াছেন, প্রত্যেক উপাসনা পদ্ধতিতেই উপাস্যের পৃথক্ পৃথক্ গুণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এক এক উপাসনার এক এক রকম অবান্তর ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এই সমস্ত শব্দ, গুণ ও ফলের ভিন্নতায় [শব্দাদি-ভেদাৎ] উপাসনারও ভিন্নতা সাধিত হয়। একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বত্র উপাস্য, একথা ঠিক্ বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সমানরূপে উপাস্য নহেন। একই পরমেশ্বরকে নানাভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে—এই তত্ত্বই শ্রুতি নানা উপাসনা প্রণালী বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যত রকম উপাসনা প্রণালী বর্ণিত আছে, তাহা একত্রিত করিয়া একটীমাত্র উপাসনা পদ্ধতি স্থির করা শ্রুতির অভিপ্রায় নয়, তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। সকলের পক্ষেই একরকমের উপাসনা অতি হাস্যকর ব্যাপার। সামান্য সর্দ্দি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজযক্ষ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত রোগেই একটী ঔষধের ব্যবস্থা, কিম্বা পাঠশালার সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত একই পাঠ্য নির্দ্ধারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিতে নানা রকম উপাসনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি এক এক করিয়া সব প্রণালীতেই উপাসনা করিতে হইবে ?

গুরু। না, বৎস ! শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বহুবিধ উপাসনা প্রণালী বর্ণিত হইলেও এই সমস্ত উপাসনার

বিকল্পঃ অবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ ॥৫৯॥

ফল যখন একই, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবেই হউক, কিম্বা পরম্পরাক্রমেই হউক, সমস্ত উপাসনার ফলই যখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন [অবিশিষ্ট-

ফলত্বাৎ] একের অধিক প্রণালী অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; পরন্তু যাহার যেটী ইচ্ছা, সে সেইটীই অবলম্বন করিতে পারে [বিকল্পঃ]। বিশেষতঃ, এটা ছাড়িয়া ওটা, ওটা ছাড়িয়া আর একটা, কিম্বা এক সঙ্গে দুই তিনটা প্রণালী অবলম্বনে উপাসনা করিলে চিত্তের চাঞ্চল্যই উপস্থিত হয়। চিত্তস্থির না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। অতএব ইচ্ছানুসারে যে কোন একটী উপাসনার প্রণালী অবলম্বন করিয়া যতদিন না উপাস্যের সাক্ষাৎকার হয়, ততদিন তাহাতেই নিবিষ্ট থাকা উচিত।

যাহা হউক, এ যাবৎ যে সমস্ত উপাসনার বিষয় আলোচনা করা গেল, তাহা কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যেই বিহিত। আর এক জাতীয় উপাসনা আছে, যাহাদিগকে বলা হয় **কাম্য উপাসনা**। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত অন্য কোন ফলের কামনা করিয়া যে সমস্ত উপাসনা করা হয়, তাহাদিগকেই কাম্য উপাসনা বলে ; যেমন, "যিনি বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎসরূপে উপাসনা করেন, তিনি পুত্রশোক পান না" (ছাঃ ৩.১৫.২)। এই সমস্ত কাম্য উপাসনার একটীতেই রত থাকিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

কাম্যাঃ তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্, ন বা, পূর্ব্বহেতু-অভাবাৎ ॥৬০॥

পরন্তু [তু] এই সমস্ত কাম্য উপাসনা [কাম্যাঃ] উপাসকের ইচ্ছানুসারে [যথাকামম্] অনেকগুলি এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে পারে [সমুচ্চীয়েরন্], কিম্বা [বা] নাও হইতে পারে [ন], অর্থাৎ উপাসক যদি পাঁচ রকমের ফলের কামনা করেন, তবে পাঁচ রকমেরই উপাসনা করিবেন, আর না হয় একটী ফলের কামনা করিলে একটী

উপাসনাই করিবেন, যেমন তাঁহার ইচ্ছা। কারণ, এই সমস্ত উপাসনার উদ্দেশ্য পৃথক্ পৃথক্ (বিশিষ্ট) ফল লাভ করা, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-রূপ অবিশিষ্ট ফল এই সব কাম্য উপাসনার উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং সেই হেতুর অভাবে [পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ] এই সমস্ত কাম্য উপাসনা ইচ্ছানুসারে এক সঙ্গে দুইতিনটিও করা যায়, নাও করা যায়। যার যেমন ফলের কামনা, সে সেইরূপ করিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! শ্রুতিতে দেখিতে পাই, এক একটী যজ্ঞের বহুবিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন বেদে উক্ত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞটী করিতে হইলে সর্ব্ববেদোক্ত তাবৎ অঙ্গের সহিতই অনুষ্ঠান করিতে হয়। আবার ঐ সমস্ত অঙ্গ অবলম্বনে নানারকম উপাসনারও উল্লেখ আছে। অবশ্য এই সমস্ত উপাসনাও কাম্য। তথাপি অঙ্গের আশ্রয়েই উহাদের বিধান, স্বতন্ত্রভাবে ঐ সমস্ত উপাসনা করা যায় না। অঙ্গগুলি সকলই যখন একযোগে করিতে হয়, তখন ঐ উপাসনাও সকল গুলিই এক সঙ্গে করা উচিত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং

অঙ্গেষু যথাশ্রয়-ভাবঃ ॥৬১॥

অঙ্গের আশ্রিত উপাসনা সম্বন্ধে [অঙ্গেষু] সবগুলিই একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে, কিম্বা ইচ্ছানুসারে এক বা একাধিক (কিম্বা একটীও না) অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ প্রশ্নের উত্তর ত এইরূপই মনে হয় যে,—ঐ সমস্ত উপাসনার আশ্রয় (অঙ্গ) যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ সবগুলিই এক সঙ্গে) উহারাও সেই ভাবেই অনুষ্ঠিত হইবে [যথাশ্রয়-ভাবঃ]

আবার, শ্রুতি অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে যে ভাবে বিধান

দিয়াছেন, ঐ সমস্ত উপাসনার বিধানও সেই ভাবেই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং

শিষ্টেঃ চ ॥ ৬২ ॥

শ্রুতির এই এক রকমের অনুশাসন দেখিয়াও [শিষ্টেঃ চ] স্থির হয় যে, অঙ্গের মতই উপাসনাও এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারপর, "উদ্গীথ যদি উদ্গাতার (সামবেদের পুরোহিত) স্বরের দোষে দুষ্ট বা ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে হোতার (যজুর্ব্বেদের পুরোহিত) স্তোত্রে তাহার আবার সমাহার অর্থাৎ সংশোধন হইতে পারে" (ছাঃ ১.৫.৫)—এই বাক্যে দেখা যায় যে, উপাসনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন বেদে বিহিত হইলেও উহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং একটী অন্যটীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই

সমাহারাৎ ॥৬৩॥

সমাহার দৃষ্টেও বুঝা যায় যে, সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে কোন বাধা নাই।

আবার, ওঁকার সর্ব্ববিধ উপাসনারই আশ্রয়, তিন বেদেই ওঁকার 'সাধারণ গুণ' অর্থাৎ সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনায়ই ওঁকারের স্থান আছে, ওঁকার না হইলে কোন বেদের কোন উপাসনাই হয় না।

গুণ-সাধারণ্যশ্রুতেঃ চ ॥৬৪॥

শ্রুতির এই সর্ব্বসাধারণ গুণ (সর্ব্ববেদের সর্ব্ববিধ উপাসনার আশ্রয় স্বরূপ ওঁকার) দেখিয়াও নির্ণয় করা যায় যে, সেই ওঁকারের আশ্রিত সমস্ত উপাসনাই একযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

গুরু। না বৎস, ঐ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সমস্ত গুলিই এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম

ন বা, তৎ-সহভাব-অশ্রুতেঃ ॥৬৫॥

নাই [ন বা]; যেহেতু, সেই সমস্ত [তৎ] উপাসনার এক সঙ্গে অনুষ্ঠান [সহভাব] হইবে, এমন কোন শ্রুতিবাক্য নাই [অশ্রুতেঃ]।

যজ্ঞের অঙ্গ সমূহ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ শ্রুতিবাক্য থাকিলেও তাহাদের আশ্রিত উপাসনাগুলিও একযোগে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমন কোন শ্রুতিবাক্য নাই। যজ্ঞের অঙ্গ এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসনা, এতদুভয়ের অনেক পার্থক্য। অঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত না হইলে যজ্ঞই অপূর্ণ থাকে। উপাসনা কিন্তু বিশেষ ফলের অভিলাষ থাকিলেই, কিম্বা প্রধান যাগের সফলতায় নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই কর্ত্তব্য (ব্রঃ সূঃ ৩.৩.৪২ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অঙ্গগুলি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য একান্ত আবশ্যক, এবং সেইজন্য তাহাদের সবগুলিই এক সঙ্গে করা উচিত। কিন্তু উপাসনা না করিলেও যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে বাধা নাই। সুতরাং যজ্ঞের বা যজ্ঞাঙ্গের বিধি দ্বারা উপাসনার অনুষ্ঠান নিয়মিত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত উপাসনা করা-না-করা যজ্ঞকর্ত্তার ইচ্ছাধীন, সুতরাং ঐ গুলি সমস্তই করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না।

আর,

দর্শনাৎ চ ॥৬৬॥

শ্রুতিতেও দেখা যায়, "ব্রহ্মা (ঋত্বিক্‌বিশেষ) যদি এইরূপ জ্ঞানবান্ হন, তবে তিনি অন্য সকল ঋত্বিককে রক্ষা করিতে পারেন" (ছাঃ ৪.১৭.১০)। এই বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সমস্ত উপাসনার জ্ঞান যে প্রত্যেক ঋত্বিকেরই থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। ফলে ঐ সমস্ত উপাসনা কর্ত্তার ইচ্ছামতই অনুষ্ঠেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রই আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে কোন উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ কর—ইহাই সমুদায় উপনিষদের সার উপদেশ। এই আত্মজ্ঞান লাভের কি ফল, সে সম্বন্ধে আচার্যদিগের অভিমত শুনিতে আমার বিশেষ কৌতূহল হইতেছে। কৃপা করিয়া বিবৃত করুন।

গুরু। বৎস! জীব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটীর এক বা একাধিক উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই চারটী ছাড়া মানুষের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নাই। ইহাদিগকে **পুরুষার্থ** বলে কারণ পুরুষ এই সকলের প্রার্থী। ইহাদের মধ্যে আবার মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়, কারণ সমস্ত প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষার এইখানেই নিবৃত্তি। এইটী লাভ করিলে পুরুষের আর অন্য কোন বস্তু লাভ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাই চরম লাভ। এই পরম পুরুষার্থ স্বরূপতঃ কি পদার্থ, কি উপায়েই বা উহা লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ক্রমে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ ॥১॥

আচার্য্য বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] শ্রুতি প্রমাণ বলে [শব্দাৎ] সিদ্ধান্ত করেন যে [ইতি], উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞান হইতেই [অতঃ] পরম-পুরুষার্থ-সিদ্ধি [পুরুষার্থঃ] হয়। শ্রুতি বলেন, "আত্মজ্ঞ

ব্যক্তি সমুদায় শোক অতিক্রম করেন" (ছাঃ ৭. ১.৩); "যিনি পরমাত্মাকে জানেন, তিনি পরমাত্মাই হন" (মুঃ ৩. ২. ৯); "ব্রহ্মজ্ঞ পরমার্থ প্রাপ্ত হন" (তৈঃ ২.১.১) ইত্যাদি। এইরূপ বহু শ্রুতির স্পষ্ট উক্তি হইতে ভগবান বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন যে, একমাত্র আত্মজ্ঞান প্রভাবেই পুরুষের চরম সিদ্ধি লাভ হয়; আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য অন্য কোন প্রকার সাধনেরই প্রয়োজন হয় না। আত্মজ্ঞান স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া পরমার্থ প্রাপ্ত করায়। বস্তুতঃ আত্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ, ইহারই নাম মোক্ষ, ইহাই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের ফল— উহাতেই সর্ববিধ কামনার (বন্ধের) নিবৃত্তি, পরম কল্যাণ, চরম শান্তি। (ক্রমশঃ এই তথ্য আরও পরিস্ফুট হইবে)।

পক্ষান্তরে আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, সমগ্রবেদ 'কর্ম্ম' (যাগ যজ্ঞ) ছাড়া আর কিছুই উপদেশ করেন না। 'অমুক অমুক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে' ইহাই বেদের সার উপদেশ। সেই সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইলে নানাবিধ সামগ্রী (ধান্য, যব, কুশ ইত্যাদি) এবং অনেকানেক মন্ত্র, ক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদিও আবশ্যক হয়। আবার যিনি ঐ কর্ম্ম করিবেন, তিনি যে কেবল বর্ত্তমান দেহেই আবদ্ধ নন, দেহ ছাড়াও যে তাঁহার অস্তিত্ব আছে, এরূপ জ্ঞান তাঁহার থাকা প্রয়োজন। কারণ, বৈদিক কর্ম্মের ফল ইহ জীবনে না হইয়া প্রায়ই পরলোকে হয়; সুতরাং মরণের পর ফল ভোগ করিবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তার অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে কাহারও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব যিনি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার দেহের অতিরিক্ত আত্মা আছেন, এরূপ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। উপনিষৎ যে আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন,

তাহা এই উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ কর্মকর্তা বর্তমান দেহেই আবদ্ধ নন, দেহাতিরিক্ত ভাবেও তিনি আছেন ও থাকিবেন, অতএব তিনি পরলোকেও যাগ-যজ্ঞের ফল ভোগ করিতে পারিবেন, এই সত্যটি বলিয়া দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করানই উপনিষদের উদ্দেশ্য। অন্য কথায়, উপনিষৎও পরোক্ষভাবে কর্ম্মেরই উপদেশ করেন। উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই, উহা কেবল কর্ম্মসম্পাদনের জন্য অত্যাবশ্যক একটি সহায় মাত্র। আত্মজ্ঞান কর্ম্মেরই 'শেষ', পূরক (supplement), আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মের পূর্ণতা হয় মাত্র। যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইলে শস্যের (ধান্য, যব ইত্যাদি) প্রয়োজন ; প্রথমে মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ শস্যে জলের ছিটা দিয়া উহাকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। এই জল প্রোক্ষণ দ্বারা শস্যের 'সংস্কার' করা হয়। সেইরূপ ধান্যাদির মত যজ্ঞে কর্ত্তারও প্রয়োজন। উপনিষৎ উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ত্তার সংস্কার হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান কর্ম্মেরই

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ যথা অন্যেষু ইতি জৈমিনিঃ ॥২॥

অঙ্গ বলিয়া [শেষত্বাৎ] উহার যে সমস্ত ফল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা যজ্ঞকর্ত্তার স্তুতিমাত্র [পুরুষার্থবাদঃ], বাস্তবিক আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই ; যজ্ঞের যে ফল, আত্মজ্ঞানও সেই যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করে বলিয়া সেই ফলেরই আংশিক উৎপাদক মাত্র। যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (ধান্যাদির) 'সংস্কার' করিলে এক একটা ফল হয়, এরূপ উক্তি শ্রুতিতে থাকিলেও বস্তুতঃ যেমন ঐ সব ফল হয় না, উহা যেমন কেবল ঐ সমস্ত দ্রব্যের 'সংস্কার' যাহাতে লোকে করে, তাহার জন্য প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র, সেইরূপ

[যথা অন্যেষু] আত্মজ্ঞানেরও যে সমস্ত ফলশ্রুতি আছে, তাহাও প্রলোভন মাত্র—ইহা [ইতি] আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন।

শিষ্য। আচ্ছা, যজ্ঞ কর্ত্তা মৃত্যুর পরেও থাকিবেন, কেবল মাত্র এইটুকু জানিলেই তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতিতে আত্মাকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিষ্পাপ ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি আত্মাকে এইরূপে জানেন, তাঁহার পক্ষে যজ্ঞকর্ম্ম কেন, কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ আত্মজ্ঞান কর্ম্মের সহায় না হইয়া বরং প্রতিবন্ধকই হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষ, শ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া যায়।

গুরু। হ্যাঁ, তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই। তবে জৈমিনি বলেন যে, শ্রুতিতে আত্মার ঐরূপে বর্ণনা কেবল তাহার প্রশংসার্থ চাটুবাক্য মাত্র। বাস্তবিক আত্মা চিরকালই কর্ত্তা, ভোক্তা (সংসারী, empirical) এবং উপনিষৎও আত্মার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু বস্তুতঃ বলেন না।

তারপর, (জৈমিনির মতে) আত্মজ্ঞান যে কর্ম্ম করিবার জন্যই প্রয়োজন, তাহা আত্মজ্ঞানী পুরুষদের

আচারদর্শনাৎ ॥৩॥

আচরণ দেখিয়াও নির্দ্ধারিত হয়। জনক ছিলেন আত্মজ্ঞ রাজর্ষি, তিনি যজ্ঞ করিতেন। উদ্দালক ছিলেন আত্মজ্ঞ গৃহস্থ মহর্ষি, তিনি নিজ পুত্রকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। এ সমস্ত শ্রুতিরই কথা। সুতরাং আত্মজ্ঞানীরাও যখন যজ্ঞাদি কর্ম্ম, এমন কি গৃহস্থের কর্ত্তব্যও, সম্পাদন করিতেন, তখন নিশ্চয় করা যায় যে, আত্মজ্ঞান

স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল প্রদান করে না। কেবল জ্ঞানেই যদি পুরুষার্থ সিদ্ধি হইত, তবে জনক প্রভৃতি কখনও বহু আয়াস সাধ্য যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

জ্ঞান যে কর্মের অঙ্গ,

তৎ-শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

তাহা [তৎ] শ্রুতি হইতেও জানা যায়। যেমন, 'ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান ও উপাসনার সহিত যে কর্ম করা হয়, তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয়" (ছাঃ ১.১.১০)। "জ্ঞান ও কর্ম উভয়ে মিলিত হইয়া পরলোক প্রস্থিত জীবের ফলারম্ভ করে" (বৃঃ ৪.৪.২) ইত্যাদি। জ্ঞান ও কর্মের এই

সমন্বারম্ভণাৎ॥ ৫ ॥

এক সঙ্গে মৃত জীবের সহগমন করিয়া ফল প্রদানের কথা হইতেও বুঝা যায় যে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ে মিলিত হইয়াই ফল প্রসব করে। কেবল জ্ঞান কিছুই করে না।

তারপর, বৈদিক যজ্ঞাদিও যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, এমন

তদ্বতঃ বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

বেদজ্ঞের [তদ্বতঃ] জন্যই বিধান করা হইয়াছে বলিয়া [বিধানাৎ] প্রমাণিত হয় যে, বেদের অর্থ বোধ—অতএব আত্ম-জ্ঞানও—কর্ম অনুষ্ঠানের জন্যই প্রয়োজন, উহার স্বতন্ত্র কোন ফল নাই।

অথবা, আজীবন কর্ম করিতেই হইবে—শ্রুতি এরূপ

নিয়মাৎ চ ॥ ৭ ॥

নিয়ম করিয়াছেন বলিয়াও জ্ঞানকে কর্ম্মের অঙ্গ ছাড়া আর বলা যায় না। শ্রুতি বলেন, "কর্ম্ম পরায়ণ হইয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা করিবে" (ঈঃ ২)—ইত্যাদি।

এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য জৈমিনি সিদ্ধান্ত করেন যে জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই, উহা কর্ম্মেরই অঙ্গ মাত্র।

কিন্তু শ্রুতি যে কেবল সংসারী (empirical), কর্ত্তা ও ভোক্তা আত্মারই উপদেশ করিয়াছেন, তাহা নহে, তাহা ছাড়া অ-সংসারী, অ-কর্ত্তা ও অ-ভোক্তা আত্মারও বহুল উপদেশ শ্রুতি করিয়াছেন সুতরাং এই

অধিক-উপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্য এবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

বিশেষ উপদেশের বলে [অধিকোপদেশাৎ] আচার্য্য বাদরায়ণের [বাদরায়ণস্য] মতই সমীচীন [এবম্], যেহেতু এই বিশেষ উপদেশই শ্রুতির প্রধান বক্তব্য বলিয়া দেখা যায় [তদ্দর্শনাৎ]।

বেদান্তে যদি কেবল দেহের নাশেও অস্তিত্বশীল, কর্ত্তা ও কর্ম্ম-ফলের ভোগকারী সংসারী আত্মারই উপদেশ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য আত্মজ্ঞানের যে সমস্ত ফল বর্ণিত আছে, তাহা প্রশংসার্থ প্রলোভন বাক্য মাত্র বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু বেদান্তে আত্মার যে প্রকার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে শরীরধারী জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহাই জীবের সত্যিকারের রূপ ; কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কোন কিছুই তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই তথ্য প্রতিপাদন করাই

যে সমগ্র বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ শ্রুতিজ্ঞ ব্যক্তিই নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। এরূপ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন আত্মাকে জানিতেই শ্রুতি সহস্রবার উপদেশ করিয়াছেন। ঈদৃশ উপদেশকে চাটু-বাক্য মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ধৃষ্টতার চূড়ান্ত এবং তাহাতে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র উপনিষৎ-শাস্ত্রই উড়াইয়া দেওয়া হয়। আর, উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞান যাহার হয়, তিনি নিষ্পাপ, নির্লিপ্ত, উদাসীন, তাহার পক্ষে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। শ্রুতিতে সংসারী আত্মার সম্বন্ধে বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যই উহার অবতারণা। বাস্তবিক সর্ব্বত্রই শ্রুতির উদ্দেশ্য জীবের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা। শ্রুতির উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, পরমাত্ম-স্বরূপই জীবের যথার্থ স্বরূপ, জীবত্ব উপাধিকৃত; সেই স্বরূপ কর্ম্মের অঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, উহা কর্ম্মের একান্তই বিরোধী। যাহা হউক, এসম্বন্ধে বিশেষ বলা বাহুল্য মাত্র; জৈমিনির মত গ্রহণ করিলে সমুদায় উপনিষৎ শাস্ত্রই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারপর, জৈমিনি যে আত্মজ্ঞানীরও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে,

তুল্যং তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

আত্মজ্ঞের আচরণ দর্শন [দর্শনম্] উভয় পক্ষেই সমান [তুল্যম্]। শাস্ত্র, আত্মজ্ঞের কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, "আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি আর কোন্ কামনায় শরীর ধারণ করিবেন?" এইরূপ বহু

শ্রুতি আত্মজ্ঞের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম, এমন কি শরীর ধারণ পর্য্যন্ত, নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জনকাদি আত্মজ্ঞ পুরুষেরাও যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাতেও আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা কোন ফলের কামনা করিয়া নিশ্চয়ই ঐ সব কর্ম্মানুষ্ঠান করেন নাই, নিষ্কামভাবে, লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের কর্ম্মের প্রবৃত্তি; নতুবা তাহাদের আমিত্বের অভিমান লোপ হওয়ায় জৈমিনি যেরূপ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, সেরূপ কর্ম্ম করা তাহাদের পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক ও অসম্ভব।

আবার, "জ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়"—এই শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যে জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

সর্ব্ববিদ্যা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারেনা। ঐ বাক্য উদ্‌গীথ উপাসনার প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য বিদ্যার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব সর্ব্বত্রই জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ, এরূপ সাধারণ নিয়ম করা দুঃসাহস মাত্র।

তারপর, কর্ম্মবাদী 'জ্ঞান ও কর্ম্ম একসঙ্গে ফল প্রসব করে' ইত্যাকার যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও

বিভাগঃ শতবৎ॥ ১১ ॥

একশত মুদ্রা দুই জনকে ভাগ করিয়া দেওয়ার মত [শতবৎ] বিভাগক্রমে গ্রহণ করা উচিত [বিভাগঃ]। "দুই জনকে একশত

মুদ্রা দাও" বলিলে যেমন ভাগ করিয়া পঞ্চাশ মুদ্রা এক জনকে এবং পঞ্চাশ মুদ্রা অন্য জনকে দেওয়া হয়, সেইরূপ "জ্ঞান ও কর্ম্ম পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের অনুগমন করিয়া ফল প্রসব করে" এই বাক্যেরও বিভাগক্রমে অর্থ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ বাক্যের 'জ্ঞান এক জনের অনুসরণ করে, কর্ম্ম অন্য জনকে অনুসরণ করে', এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন ; কারণ জ্ঞানের ফল ও কর্ম্মের ফল অত্যন্ত বিভিন্ন। যে স্থল হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই স্থলেই কর্ম্মফল প্রার্থী ও মোক্ষার্থীর পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলবৈষম্য স্পষ্টভাবেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তারপর, 'কর্ম্ম অনুষ্ঠানের তিনিই অধিকারী, যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন' এইরূপ শাস্ত্র বাক্য হইতে জ্ঞান কর্ম্মেরই সহায়ক মাত্র, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না ; কারণ ঐ শাস্ত্র বাক্য তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে,

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

যাহার কেবল বেদের অধ্যয়নই হইয়াছে। যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া কি ভাবে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা জানিয়া লইয়াছেন, তিনিই কর্ম্মে অধিকারী, উপনিষদে যে আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহ জানিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। সেই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নয়, বরং কর্ম্মের ক্ষয়সাধনে।

তারপর, আজীবন কর্ম্ম করিতেই হইবে, এই যে নিয়ম, তাহা জ্ঞানীর জন্য

ন, অবিশেষাৎ ॥১৩॥

নয় [ন] ; যেহেতু, জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্ব্বিশেষেই ঐ বাক্যটি উক্ত

হইয়াছে [অবিশেষাৎ]। সুতরাং ঐ একটা সাধারণ কথা হইতে জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম স্বীকার করা যায় যায় না। (শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগে নির্ণয় করা যায় যে, জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগই স্বাভাবিক)।

"কর্ম্ম করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে"—এই বাক্য অবশ্য জ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এস্থলে শ্রুতি যে জ্ঞানীকে কর্ম্ম করিতেই উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানী লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধন হইবে না, কারণ বন্ধনের মূল অজ্ঞান তাঁহার বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐ বাক্যে জ্ঞানের

স্তুতয়ে অনুমতিঃ বা ॥১৪॥

মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য [স্তুতয়ে] কর্ম্ম করিবার অনুমতি [অনুমতি] দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ জ্ঞানীকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ জ্ঞানীর নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া না থাকিয়া লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার কর্ম্ম করাই উচিত—ইহাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য।

জনক প্রভৃতি যেমন জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্ম্ম করিয়াছেন, সেইরূপ

কামকারেণ চ একে ॥১৫॥

অনেক জ্ঞানী [একে] আবার [চ] সমুদায় কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া [কামকারেণ] আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিতেন, এরূপ শ্রুতিও আছে।

বিশেষ, জ্ঞানের ফল যেমুহূর্ত্তে জ্ঞান হয়, সেই মুহূর্ত্তেই লব্ধ হয়, কর্ম্মফলের মত তাহা কালান্তরে হয় না, সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ একথা বলা যায় না। আর জ্ঞানের ফলশ্রুতি যে মিথ্যা প্রলোভন মাত্র, এরূপ বলাও ধৃষ্টতা মাত্র, প্রত্যক্ষ অনুভূত বস্তুকে মিথ্যা বলা বাতুলতা ভিন্ন আর কি ?

তারপর, কর্ম্মে অধিকার লাভ করিতে হইলে 'আমি কর্ম্ম করিতেছি,' 'এই কর্ম্মের এই ফল হইবে'—ইত্যাকার যাবতীয় অভিসন্ধিই জ্ঞানোদয়ে মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়, এবং ফলতঃ জ্ঞান তাদৃশ অভিসন্ধির

উপমর্দ্দং চ ॥১৬॥

লয়ই সম্পাদন করে ; সুতরাং জ্ঞানীর আর কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্যই থাকে না।

তারপর,

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ—

আবার [চ] 'সন্ন্যাস' নামক চতুর্থ আশ্রমে [ঊর্দ্ধরেতঃসু] জ্ঞান হয়—এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। এক্ষণে দেখ, এই আশ্রমে কোনরূপ কর্ম্মেরই বিধান নাই, ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বিহিত সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগ করিয়া একমাত্র জ্ঞানালোচনাই সন্ন্যাসাশ্রমের একমাত্র কর্ম্ম ; সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ হইবে কি প্রকারে ?

শিষ্য। কিন্তু ঊর্দ্ধরেতঃ বা সন্ন্যাস নামক কোন আশ্রম যে আছে, তাহার প্রমাণ কি ?

গুরু। কেন,

শব্দে হি ॥১৭॥

শ্রুতিতেই ঐ আশ্রমের উল্লেখ আছে। "যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপশ্চর্য্যা করেন" (ছাঃ ২.২৩.১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের উল্লেখ রহিয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, শ্রুতিতে সন্ন্যাসাশ্রমের কোন **বিধান** * নাই। উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাস আশ্রমের

পরামর্শং জৈমিনিঃ অচোদনা চ, অপবদতি হি ॥১৮॥

কেবলমাত্র 'উল্লেখ' [পরামর্শম্] করা হইয়াছে, কিন্তু [চ] কোন বিধান করা হয় নাই [অচোদনা], পক্ষান্তরে শ্রুতি ঐ আশ্রমের বরং নিন্দাই করিয়াছেন [অপবদতি হি], জৈমিনি এইরূপ বলেন [জৈমিনিঃ]। ১৭ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে এমন বুঝা যায় না যে, ঐ শ্রুতি 'সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবে' এরূপ 'বিধি' দিয়াছেন। ওস্থলে 'কেহ কেহ ওরূপ করিয়া থাকেন' এইমাত্র বলা হইয়াছে। তবে শ্রুতি অবশ্য বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহা চিরস্থায়ী হয় না, কেবল ব্রহ্মে অবস্থান করিলেই চিরস্থির ফল লাভ হয়। কিন্তু এই উক্তিতেও সন্ন্যাসের কোন 'বিধি' অনুমান করা যায় না, শ্রুতি কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রশংসার জন্যই ওরূপ বলিয়াছেন। ঐ বাক্যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমেরও কোন 'বিধি' নাই, উল্লেখমাত্র আছে, সেইরূপ সন্ন্যাসও শ্রুতি বিধান করেন নাই, উহার উল্লেখমাত্র

---

* **"অমুক করিবে"**—এইরূপ আদেশ বাক্যের নাম **'বিধি'**। 'এটা এমন' বা 'এমন এমন করা হয়'—এইরূপ স্বরূপকথনের নাম 'পরামর্শ' বা 'অনুবাদ'। 'বিধি' অবশ্য-পালনীয়, অনুবাদ ঐ আদেশের পোষক মাত্র।

করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ন্যাস আশ্রমের 'বিধি' আছে বটে, এবং মহাপুরুষেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এ কথাও সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতিতে 'এই আশ্রম অবলম্বনীয়' এমন কোন 'বিধিবাক্য' নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতি বলেন, "বেদাধ্যাপক গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া বংশবিস্তার অব্যাহত রাখিবে, কখনও বংশবিচ্ছেদ করিবে না" (তৈঃ ১.১১.১)। "পুত্রহীনের স্বর্গাদিলোক হয় না, অপুত্রক লোক পশুতুল্য"—ইত্যাদি বাক্যে সন্ন্যাসীর নিন্দাই করা হইয়াছে। সুতরাং জৈমিনির মতে সন্ন্যাস অবলম্বন করা অনুচিত, গৃহস্থাদি আশ্রমে থাকিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। সন্ন্যাস অবলম্বন কি সত্য সত্যই অকর্ত্তব্য ?

গুরু। বৎস !

অনুষ্ঠেয়ম্ বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥

আচার্য্য বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] বলেন, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রমও অবলম্বনীয় [অনুষ্ঠেয়ম্], কারণ উদাহৃত শ্রুতি ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমেরই সমানভাবে উল্লেখ করিয়াছেন [সাম্যশ্রুতেঃ]। উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রহ্মচর্য্যাদি যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সন্ন্যাসও সেই ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সামান্য উল্লেখমাত্র দ্বারাও নির্ণয় করা যায় যে, সন্ন্যাসাশ্রমও ব্রহ্মচর্য্যাদির ন্যায় শ্রুতির অনুমোদিত ; এস্থলে উহার স্পষ্টতঃ বিধান না থাকিলেও অন্যত্র নিশ্চয়ই আছে—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, না হইলে সন্ন্যাসের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমও বিহিত হয় নাই, একথাও স্বীকার করিতে হয়।

একটী শ্রুতি আছে, "তাহার নীচে সমিধ স্থাপন করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে উপরি ধারণ করিতেছে"। এই বাক্যের বিচার

প্রসঙ্গে জৈমিনিই তাঁহার পূর্ব্ব মীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'উপরি ধারণ করিতেছে'—এই অংশে স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও ঐ অংশকে বিধি বাক্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। জৈমিনি একটি সাধারণ নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন এই যে, শ্রুতিতে যদি এমন কোন কর্ম্মের উল্লেখ মাত্র থাকে, যাহা অন্যত্র 'বিহিত' হয় নাই, তবে সেই উল্লেখ মাত্রকেই বিধিরূপে স্বীকার করিতে হইবে—যদিও ঐ উল্লেখে বিধি বোধক কোন শব্দ না থাকুক। 'উপরি ধারণ ব্যাপার' অন্য কোন স্থলে বিহিত হয় নাই, কেবল ঐ বাক্যেই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং 'অ-পূর্ব্ব' বলিয়া ইহাও একটী বিধি বাক্য, অর্থাৎ 'উপরি ধারণ করিতেছে' ইহার অর্থ 'উপরি ধারণ করিবে'। এই নিয়ম অনুসারে আমাদের আলোচ্য শ্রুতিকেও এই

বিধিঃ বা ধারণবৎ ॥২০॥

'ধারণের' মত [ধারণবৎ] সন্ন্যাসাশ্রমেরও বিধি [বিধির্ব্বা] স্বীকার করা যাইতে পারে। অন্য কোন স্থলে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি দেখা না গেলেও যখন এই স্থলেই প্রথম উহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন জৈমিনির সিদ্ধান্ত অনুসারে উহাকেই বিধি বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত।

তারপর, যদি স্বীকার করাও যায় যে, ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রশংসার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন আশ্রমের বিধির জন্য নয়, তাহা হইলেও 'ব্রহ্মনিষ্ঠা করা উচিত'—এরূপ একটি বিধি ঐ বাক্য হইতেই গ্রহণ করা যায়। কারণ জৈমিনিই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যাহার প্রশংসা করা হয়, তাহার বিধানও করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

তারপর বিচার করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ব্রহ্মসংস্থা কোন্ আশ্রমের জন্য বিহিত। 'ব্রহ্মসংস্থা' শব্দের অর্থ হইল—অন্য কিছু না করিয়া, অন্য কিছু না ভাবিয়া একমাত্র ব্রহ্মধ্যানেই নিমগ্ন থাকা। এরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে অসম্ভব। গৃহস্থাদি নিজ নিজ আশ্রম বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হয়। কিন্তু পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসীর জন্য কোন কর্ত্তব্যেরই বিধান নাই। কেবল তাহার পক্ষেই ব্রহ্মসংস্থা যথাযথ পরিপালিত হইতে পারে। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম যে শ্রুতিবিহিত নয়, এ কথা বলা যায় না। বস্তুতঃ শ্রুতি সাক্ষাৎ ভাবেই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করিয়াছেন; যথা:— "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে। গার্হস্থ্যের পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, অনন্তর প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবে; অথবা যদি ব্রহ্মচর্য্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে, তবে সেই আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে, অথবা গার্হস্থ্য হইতে, কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে (অর্থাৎ যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই) প্রব্রজ্যা করিবে" (জাঃ ৪)। সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে। সুতরাং উহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

অতএব দেখা গেল, জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ নয়, উহাই স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে পরম পুরুষার্থ প্রদান করে।

শিষ্য। গুরুদেব! এক জাতীয় শ্রুতিবাক্য আছে, যাহা উদ্গীথাদি যজ্ঞাঙ্গের প্রশংসার্থ, কিম্বা ঐ ভাবে উপাসনা করিবার বিধানার্থ, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যেমন, একস্থলে উদ্গীথকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস (সার পদার্থ] রূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে "এই উদ্গীথ পরমত্মার প্রতীক (symbol) বলিয়া পরম এবং পরমাত্মার ন্যায়

উপাস্য" (ছাঃ ১.৬.১)—ইত্যাদি। এই প্রকার বাক্য উদ্গীথ প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গের

স্তুতিমাত্রম্ উপাদানাৎ ইতি চেৎ ?—

অবলম্বনে উক্ত হইয়াছে বলিয়া [উপাদানাৎ] কেবল মাত্র প্রশংসার্থই [স্তুতিমাত্রম্]—এরূপ বলা যায় কি [ইতিচেৎ] ?—

গুরু। **ন, অপূর্ব্বত্বাৎ ॥২১॥**

না, ওরূপ বলা সঙ্গত নয়, [ন]; কারণ ঐরূপ কথা পূর্ব্বে কোথাও বলা হয় নাই [অপূর্ব্বত্বাৎ]। পূর্ব্বে যদি বিধিজ্ঞাপক কোন কথা থাকে, তবেই পরবর্ত্তী বাক্যকে উহার পোষক বা স্তাবক বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু আলোচ্য স্থলে সেরূপ কোন বিধি ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, সুতরাং এই সকল বাক্য 'অপূর্ব্ব' বলিয়া উপাসনার বিধানই উহাদের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে।

তারপর, "উদগীথ উপাসনা করিবে" (ছাঃ ১.১.১.) ইত্যাদি

ভাব-শব্দাৎ চ ॥২২॥

স্পষ্ট বিধিবোধক শব্দ আছে বলিয়াও উদ্গীথাদি শ্রুতি উপাসনারই বিধায়ক, উদ্গীথাদির প্রশংসার্থ নহে, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞ কয়েক দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে পুরোহিতেরা স্তোত্র গান ও আখ্যায়িকা পাঠ করেন। যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা পুত্র ও মন্ত্রী প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া উহা শ্রবণ করেন। যজ্ঞের এই ব্যাপারটিকে "পারিপ্লব" বলে। বেদান্তেও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কালে স্থলে স্থলে উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। যেমন,

"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী" (বৃঃ ৪.৫.১), "পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রচুর দান করিতেন, বহু লোককে ভোজন করাইতেন" (ছাঃ ৪.১.১) ইত্যাদি। বেদান্তের এই সমস্ত আখ্যায়িকা কি পারিপ্লবের জন্য, না আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে সরস ও সুখবোধ্য হয়, সেই জন্য? যদি পারিপ্লবের জন্যই হয়, তবে, 'পারিপ্লব' যেমন কর্ম্মের (যজ্ঞের) অঙ্গ, ঐ আখ্যায়িকা গুলিকে সেইরূপ কর্ম্মাঙ্গই বলিতে হয়, ফলে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদান্তশাস্ত্র প্রধানভাবে কর্ম্মই প্রতিপাদন করে। আর যজ্ঞের আখ্যায়িকাও আখ্যায়িকা, বেদান্তের আখ্যায়িকাও আখ্যায়িকা; সুতরাং এই সব উপাখ্যান

পারিপ্লবার্থাঃ ইতি চেৎ?

পারিপ্লবের জন্যই—এরূপ বলিতে পারি কি?

উঃ। ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥২৩॥

না, এই উপাখ্যানগুলিকে পারিপ্লব রূপে গ্রহণ করা যায় না [ন]; যেহেতু পারিপ্লবে কোন্ কোন্ উপাখ্যান উপযোগী, তাহা শ্রুতি বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন [বিশেষিতত্বাৎ]। উপাখ্যান হইলেই যে তাহা পারিপ্লবের জন্য, এমন কোন সাধারণ নিয়ম নাই। বরং বিশেষ বিশেষ উপাখ্যানই পারিপ্লবের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদান্তোক্ত উপাখ্যানগুলি পারিপ্লবের জন্য নির্দ্দিষ্ট নয়।

সুতরাং এই সমস্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে জ্ঞানোপদেশ আছে, তাহার সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ, কোন কর্ম্মের সহিত নহে।

তথা চ একবাক্যতা-উপবন্ধাৎ ॥২৪॥

তার পর [তথাচ] এই সব আখ্যায়িকা এবং তদবলম্বনে উপদিষ্ট জ্ঞান—এই উভয় মিলিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব বুঝানই শ্রুতির উদ্দেশ্য বলিয়া [একবাক্যতোপবন্ধাৎ] এই আখ্যায়িকা গুলিকে কর্ম্মাঙ্গরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল জ্ঞান বিষয়ে শ্রোতার একটা রুচি উৎপাদন এবং তত্ত্বটি সহজে হৃদ্‌গম্য করান।

শিষ্য। গুরুদেব ! আপনার উপদেশে বুঝিলাম, আত্মজ্ঞান হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। যদি তাহাই হয়, তবে আর গার্হস্থ্য বিহিত ক্রিয়াকলাপ করিবার কি প্রয়োজন ?

গুরু। হ্যাঁ বৎস ! যেহেতু আত্মজ্ঞানেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়,

অতএব চ অগ্নি-ইন্ধন-আদি-অনপেক্ষা ॥২৫॥

সেই হেতু [অতএব চ] অগ্নিরক্ষা * প্রভৃতি আশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করিলেও চলে [অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা]। জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিলেও জ্ঞানের ফল মোক্ষ লাভের কোন বাধা হয় না।

শিষ্য। তবে গার্হস্থ্যাদি আশ্রম বিহিত কর্ম্ম কি একেবারেই নিরর্থক ?

গুরু। না,

---

* প্রাচীনকালে গৃহস্থকে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া প্রত্যহ হোম করিতে হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ ॥২৬॥

ঐ সমস্ত কর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে [সর্ব্বাপেক্ষা চ], যেহেতু, শ্রুতি বলেন, "যজ্ঞাদি দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" (বৃঃ ৪.৪. ১২) [যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ]। জ্ঞানলাভ হইলে কর্ম্মের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও জ্ঞানের প্রকাশে অবশ্যই উহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। অশ্ব রথ বহনেই নিযুক্ত হয়, দুগ্ধ প্রদানে হয় না, সেইরূপ [অশ্ববৎ] কর্ম্মও জ্ঞানের উৎপত্তিতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মোক্ষ প্রদানে সাক্ষাৎভাবে উহার কোনই উপযোগিতা নাই। কাষ্ঠ, অগ্নি, প্রভৃতির সাহায্যে অন্ন প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কাষ্ঠাদিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, অন্ন দ্বারাই তৃপ্তি হয়। সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্য করে বটে, কিন্তু জ্ঞানেই মোক্ষরূপ পরমাতৃপ্তি লাভ হয়। জীবনের উদ্দেশ্য হইবে জ্ঞান লাভ করা, কারণ তাহাতেই পরমা শান্তি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন কর্ম্ম প্রয়োজনীয় বোধ হইবে, তাহাই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হইলেও অগ্নিরক্ষা করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না, কারণ তখন কর্ম্মদ্বারা লাভ করিবার আর কিছুই থাকে না। জ্ঞানার্থীর পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপকারিতা এইমাত্র যে, উহাদ্বারা ক্রমশঃ তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধ চিত্তেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। দেখ, একটা নিয়মের ভিতর না থাকিলে কেহই মনকে সংযত করিতে পারে না। আশ্রম বিহিত কর্ম্ম সেই নিয়ম। উহাতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম ইত্যাদি শিক্ষা হয়। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মও নিরর্থক নয়, উহা জ্ঞানের **বহিরঙ্গ** সাধন, আর শম, দম, উপরতি প্রভৃতি জ্ঞানের **অন্তরঙ্গ** সাধন।

শিষ্য। আচ্ছা, আপনি যে বলিলেন, যজ্ঞাদি জ্ঞানোৎপত্তির সহায়

বলিয়া তাহাও অনুষ্ঠান করা উচিত ; কিন্তু "জ্ঞানলাভের জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে"—শ্রুতিতে এরূপ কোন বিধিবাক্য ত পাওয়া যায় না। "যজ্ঞাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন"—এ বাক্যটি বাস্তবিক বিধিবাক্য নয়, জ্ঞানের প্রশংসার্থই উহা প্রযুক্ত অর্থাৎ 'জ্ঞান এমন পদার্থ যে যজ্ঞাদির দ্বারাও লোকে উহা লাভ করিতে চেষ্টা করে'—ইহাই ঐ বাক্যটির তাৎপর্য্য।

গুরু। না, বৎস! ঐ বাক্যটি শুধু প্রশংসার্থ নয়। যদিও সাক্ষাৎ ভাবে বিধি বুঝাইতে পারে, এমন শব্দ ঐ বাক্যে নাই,

শমদমাদি-উপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু, তদ্বিধেঃ
তদঙ্গতয়া তেষাম্ অবশ্য-অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।।২৭।।

তাহা হইলেও [তথাপি তু] 'জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবে' [শম-দমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ] এইরূপ বিধি যখন শ্রুতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যখন ঐ বিধিরই [তদ্বিধেঃ] পোষক [তদঙ্গতয়া]—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় ফলে উহা শমদমাদিরই সহায়, শমদমাদি সিদ্ধির নামই চিত্তশুদ্ধি—, এবং জ্ঞানের জন্য যখন শমদমাদি অবশ্যই অনুষ্ঠেয় [তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ], তখন জ্ঞানের জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও শ্রুতির অনুমোদিত, ইহা বেশ বুঝা যায়। শ্রুতি জ্ঞানলাভের জন্য বিশেষ ভাবে শমদমাদি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। শমদমাদি সাধনের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি লাভ করা। যজ্ঞাদির দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হয়, সুতরাং যজ্ঞাদি বস্তুতঃ শমদমাদি সাধনেরই সহায় বলিয়া উহাও শ্রুতি-সম্মত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর, 'যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিবে', এরূপ স্পষ্ট বিধিবাক্য না থাকিলেও "ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিতে যত্ন করেন,"

এই বাক্যে যজ্ঞের সহিত জ্ঞানের একটা সম্বন্ধ শ্রুতি দেখাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এরূপ সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বে শ্রুতিতে কখনও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং "অপূর্ব্ব" বলিয়া এখানে বিধিও স্বীকার করা যায়।

অতএব দেখা গেল, জ্ঞানলাভের জন্য শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন, এবং জ্ঞানোৎপত্তির জন্য যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য—যদিও জ্ঞানের ফল মোক্ষে যজ্ঞাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপযোগিতাই নাই এবং জ্ঞানলাভের পর কোনরূপ কর্ম্মেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

শিষ্য। প্রাণবিদ্যার প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন যে, প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছুই নাই (ছাঃ ৫. ২. ১)। জ্ঞানার্থী সর্ব্বদা শমদমাদি সাধন করিবেন, এই যেমন শ্রুতির বিধি, সেইরূপ প্রাণোপাসকও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেন. ইহাও কি শ্রুতির বিধি ?

গুরু। না বৎস ! শ্রুতি সর্ব্ববিধ বস্তুই নির্ব্বিচারে ভক্ষণ করিবার বিধি দেন নাই।

সর্ব্ব-অন্ন-অনুমতিঃ চ প্রাণাত্যয়ে, তদ্দর্শনাৎ ॥২৮॥

তবে প্রাণ যায় যায়, এমন অবস্থা হইলে [প্রাণাত্যয়ে]সর্ব্ববিধ খাদ্যই শ্রুতি অনুমোদন করেন [সর্ব্বান্নানুমতিঃ]; যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষির উপাখ্যানে সেইরূপই দেখা যায় [তদ্দর্শনাৎ]।

চাক্রায়ণ ঋষি প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় এক মাহুতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে জল দিলে ঋষি তাহা পান করিলেন না, এবং বলিলেন, "এই অন্ন না হইলে আমার প্রাণবিয়োগ হইত, সেইজন্য

তোমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলাম, কিন্তু জল অন্যত্র সুলভ, সুতরাং তোমার প্রদত্ত জল আমি গ্রহণ করিব না" (ছাঃ ১.১০.৪)। এই দৃষ্টান্তে শ্রুতির অভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, কেবল প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেই যে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, নতুবা অবৈধ আহার গ্রহণ করিতে শ্রুতি কুত্রাপি বিধি দেন না। প্রাণোপাসকের নিকট যে কোন বস্তুই অন্ন, একথার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ঐ রূপই ভাবনা করেন, তিনি সর্ব্বত্রই প্রাণের খেলা দেখিতে অভ্যাস করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, তৃণগুল্ম যাবতীয় পদার্থই এক প্রাণশক্তির স্পন্দনমাত্র, এক মহাপ্রাণ সমুদ্রের আবর্ত্ত-তরঙ্গ-বুদ্‌বুদ্‌মাত্র, তিনি যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহা ঐ মহাপ্রাণ সাগরেই নিক্ষেপ করেন। তাঁহার বুদ্ধিতে ভক্ষণের অর্থ প্রাণে আহুতি, প্রাণ সমুদ্রের বুদ্‌বুদাদির প্রাণেই বিলয়—সুতরাং প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছুই নাই, একথার অর্থ এই নয় যে, তিনি গাছ পাথর বিষ্ঠামূত্র সবই ভক্ষণ করেন।

বস্তুতঃ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলে সর্ব্বদা ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বিশেষভাবে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের কোনরূপ

অবাধাৎ চ ॥২৯॥

আনর্থক্য উপস্থিত হয় না। বিশেষ আহার শুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়—এই পরম্পরারও কোন ব্যাঘাত হয় না।

তারপর আবার, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই আপৎকালে যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, এ ব্যবস্থা

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৩০॥

স্মৃতি শাস্ত্রেও দেওয়া হইয়াছে—

শব্দঃ চ অতঃ অকামকারে ॥৩১॥

এইজন্যই আবার [অতঃ চঃ] স্বেচ্ছাহার নিবারণ উদ্দেশ্যে [অকামকারে] শ্রুতির বাক্যও দেখা যায় [শব্দঃ]। যেমন, "ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, কেবল প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই যে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা ছাড়া সব সময়েই বিচার করা সাধকের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। এমন কি, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত বিধি নিষেধের অতীত হইয়াছেন, তাঁহাকেও অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্য এই নিয়ম পালন করা উচিত। তারপর দেখিতে গেলে তাদৃশ সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে কোনরূপ অনাচার করা সম্ভবই নয়; কারণ, তিনি উহাতে একান্তই অনভ্যস্ত। (অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া কেহ কখনও পরমার্থ লাভ করিতে পারে না)। জ্ঞান লাভের পর তাহার নূতন কোন কর্ম্ম হয় না, প্রারব্ধবশে পূর্ব্বাভ্যাস মত কর্ম্ম করিয়া যান মাত্র। জীবন্মুক্ত পুরুষ যদিও বলবৎ প্রাক্তন বশে কোনরূপ অনাচার করিয়াও ফেলেন, তবে তাহা অন্যের অনুসরণীয় নহে, কিম্বা সেই জন্য অনাচার পালনের বিধিও শাস্ত্র সম্মত, এরূপ বলা যায় না। অতএব, প্রাণোপাসকও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবেন।

—

শিষ্য। ২৬ সূত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের জন্য বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায়। তাহা হইলে যে ব্যক্তি

জ্ঞান লাভের ইচ্ছুক নহে, অথচ আশ্রমী, সে জ্ঞানের সহায় আশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কি না ?

গুরু। বিহিতত্বাৎ চ আশ্রম-কর্ম্ম অপি ॥ ৩২ ॥

যেহেতু গার্হস্থ্যাদি-আশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বীর (সে জ্ঞানার্থী হউক, বা না হউক) জন্য বিহিত হইয়াছে [বিহিতত্বাৎ], সেইহেতু আশ্রম কর্ম্মও [আশ্রম-কর্ম্মাপি] তাহার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। শাস্ত্র যখন আশ্রমীর জন্য ঐ সমস্ত কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, তখন তাহার উহা অবশ্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। কিন্তু ২৬ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, এই সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়, সুতরাং যে জ্ঞান চাহেনা, তাহার এই সব কর্ম্ম করা নিরর্থক।

গুরু। না, নিরর্থক হইবে কেন ? শাস্ত্র যখন ঐ সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই উহার একটা ফল আছে। কোনরূপ ফল কামনা না থাকিলেও আশ্রমীর জন্য বিহিত কর্ম্ম সকল করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। কর্ম্ম না করিয়া মানুষ থাকিতেই পারে না, সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলভাবে কর্ম্ম না করিয়া একটা নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে কর্ম্ম করাই যে সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, তাহা বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। অতএব কোনরূপ ফলকামনা না থাকিলেও আশ্রমীর বিহিত কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠান করা উচিত (২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

আর [চ] জ্ঞানের সহকারিরূপে ত [সহকারিত্বেন] ঐ সকল কর্ম্ম করিতেই হয়—ইহা ২৬ সূত্রেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শিষ্য। আচ্ছা, জ্ঞানের সহকারিরূপে যে যে কর্ম্ম করা বিধেয়, এবং শুধু আশ্রমীর যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই উভয় কি ভিন্ন জাতীয়, না যে সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়রূপে বিহিত, সেই সমস্ত কর্ম্মই কেবল-আশ্রমীর জন্যও নির্দ্দিষ্ট?

গুরু। জ্ঞানের সহকারিরূপেই হউক, কিম্বা কেবল আশ্রম ধর্ম্মরূপেই হউক,

সর্ব্বথাপি তে এব উভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বপ্রকারেই [সর্ব্বথাপি] সেই এক জাতীয় কর্ম্মই [ত এব] বিহিত; যেহেতু, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রই এই সিদ্ধান্তের অনুকূল [উভয়লিঙ্গাৎ]। শ্রুতি জ্ঞানের সহায়রূপে যে সমস্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই যজ্ঞাদি সাধারণ, কেবল জ্ঞানের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের নির্দ্দেশ শাস্ত্র করেন নাই। স্মৃতিও সাধারণ কর্ম্মকেই জ্ঞানের সহায় বলিয়াছেন।

আর, কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্ম কেন, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনও জ্ঞানোৎপত্তির সহায়, ইহাও শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতি

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

দেখাইয়াছেন [দর্শয়তি] যে ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি কোন কিছুতে অভিভূত হইয়া পড়েন না [অনভিভবম্]। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম কর্ম্মও সাধককে জ্ঞানলাভের সহায়তা করে।

শিষ্য। আশ্রম কর্ম্ম জ্ঞান লাভের উপায়, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু

যিনি কোনও আশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন নাই (যেমন এক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াছেন, অথচ সুযোগের অভাবে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে পারিতেছেন না. অথবা যেমন এক জন পত্নী বিয়োগের পরে আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন না—এই প্রকার ব্যক্তিকে **বিধুর** বলে), অথবা নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া আশ্রম বিহিত কর্ম্ম করিতে অক্ষম—এমন লোকেরও কি জ্ঞানে অধিকার আছে ?

গুরু। কেন থাকিবে না ? কোনও এক আশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া

অন্তরা চ অপিতু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্তরালে অর্থাৎ দুই আশ্রমের মধ্যে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহারাও [অন্তরা চাপিতু] জ্ঞানে অধিকারী, কারণ শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাসাদিতে এরূপ লোকও যে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাহা দেখা যায় [তদ্দৃষ্টেঃ]।

কোনও আশ্রমে না থাকিলে সেই আশ্রমবিহিত কর্ম্মে অধিকার থাকে না সত্য, তথাপি বর্ণ-ধর্ম্ম (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্ত্তব্য), সন্ধ্যা-বন্দনাদি, দান, ধ্যান ইত্যাদিতে সকলেরই অধিকার আছে। দরিদ্র হইলেও পূজা, উপবাস, জপ ইত্যাদি সকলেই করিতে পারে। সুতরাং ঈদৃশ লোক কেন জ্ঞানের অধিকারী হইবেন না ? রৈক, বাচক্নবী প্রভৃতি বিধুর এবং দরিদ্র হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন—ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন।

আর, সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি কোনরূপ আশ্রমকর্ম্ম না করিয়াও জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন, একথা

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

আর, জপ, তপ, উপবাস, দেবার্চ্চনা ইত্যাদি কর্ম্ম জ্ঞানের বিশেষ অনুকূল, যে-কোন ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারে।

বিশেষ-অনুগ্রহঃ চ ॥ ৩৮ ॥

এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মদ্বারাও "বিধুর' কিম্বা দরিদ্রের প্রতি জ্ঞানের অনুগ্রহ হইতে পারে। স্মৃতি বলেন, "ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। তিনি অন্য কোন কর্ম্ম করুন, বা না করুন, তিনি সর্ব্বত্র আত্মদর্শী ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত হন।"

অতঃ তু ইতরৎ জ্যায়ঃ, লিঙ্গাৎ চ ॥ ৩৯ ॥

তবে [তু] কোন আশ্রমে না-থাকা অপেক্ষা [অতঃ] কোন-না-কোন আশ্রমনিষ্ঠ হইয়া থাকা [ইতরৎ] ভাল [জ্যায়ঃ], কারণ শ্রুতি, স্মৃতি উভয়ই এরূপ ভাব প্রকাশ করেন [লিঙ্গাৎ চ]।

আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিলে সেই আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম দ্বারা জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাহাতে জ্ঞানের বিশেষ সহায়তা হয়; সুতরাং আশ্রমে অবস্থান করা যে ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

---

৭১ প্রশ্ন। আচ্ছা, যিনি একবার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি মনে করেন যে, তাঁহার গার্হস্থ্যাদি ভাল রকম অনুষ্ঠিত হয় নাই, অথবা যদি তাঁহার গৃহস্থ ধর্ম্মাদি আচরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, তবে কি তিনি আবার নীচের আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে পারেন?

গুরু ।　তদ্ভূতস্য তু ন অতদ্ভাবঃ, জৈমিনেঃ অপি,
নিয়ম-অতদ্রূপ-অভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

একবার সেরূপ হইলে অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিলে [তদ্ভূতস্য] কিন্তু [তু] তাহা ত্যাগ করিয়া নীচের আশ্রমে নামিয়া আসা [অতদ্ভাবঃ] যায় না [ন] ; যেহেতু—শাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রমে আরোহণেরই নিয়ম করিয়াছেন [নিয়ম-], কিন্তু নামিয়া আসার কোন নিয়ম করেন নাই [-অতদ্রূপ-] এবং কোন সন্ন্যাসী সেরূপ করিয়াছেন বলিয়াও শুনা যায় না [-অভাবেভ্যঃ] ; আচার্য্য জৈমিনিরও এই মত [জৈমিনেরপি]। শাস্ত্র নিয়ম করিয়াছেন, "শিষ্য গুরুগৃহে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কর্ম্মদ্বারা আপনাকে কষ্টসহ করিয়া অরণ্যে গমন করিবেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন—ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা। তাহা হইতে আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে প্রত্যার্ত্তন করিবেন না—ইহাই শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম" (ছাঃ ২.২৩. ১)। এই হইল নিয়ম শাস্ত্র। আবার, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদিক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে আরোহণের যেমন শাস্ত্রীয় বিধি আছে, সেরূপ সন্ন্যাস হইতে অবরোহণের (নামিয়া আসার) কোন শাস্ত্রবাক্য নাই। তারপর, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কোন ঋষি কোন কালে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া নীচের আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এরূপ কুত্রাপি উল্লেখও নাই। সুতরাং সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে নামিয়া আসা শাস্ত্রসঙ্গত নয়।

তারপর, 'আমি গার্হস্থ্যাশ্রম ভালরূপ অনুষ্ঠান করিব'—এরূপ প্রবৃত্তিও প্রশংসনীয় নয়। যিনি যে আশ্রমে আছেন, তাহাই যথাশক্তি অনুসরণ করা তাঁহার ধর্ম্ম, এবং তাহাতেই তাঁহার কল্যাণ। শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্পূর্ণ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ"

(গী. ৩. ৩৫)। দেখ, নিষ্ঠাই সিদ্ধির মূল। নিষ্ঠাপূর্ব্বক যে-কোন সংকল্প কর না কেন, তাহাতেই তোমার মঙ্গল। আজ এটা, কাল ওটা—এরূপ অব্যবস্থিত চিত্তের কোন কিছুই লাভ হয় না। আমি এইটাই ভালরূপে করিতে পারি, এতএব এইটাই আমার করা উচিত, ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ প্রবৃত্তির লাগরের স্থান নাই। কিসে তোমার সত্যিকারের মঙ্গল হইবে, তাহা তুমি জান না, জানিলে তুমি মুক্ত। (ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্)। এমতাবস্থায় শাস্ত্র ও গুরু তোমার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তোমাকে তাহাই সাধ্যানুসারে পালন করিতে হইবে—ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তারপর যিনি আসক্তির বশে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে চান, তিনি ত সেই মুহূর্ত্তেই পতিত হন। তাঁহার সেই কার্য্য শাস্ত্র কিরূপে অনুমোদন করিবে? সুতরাং সন্ন্যাস আশ্রম হইতে অবরোহণ অসঙ্গত—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

———

শিষ্য। দুই রকমের ব্রহ্মচারী আছেন। কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত গুরুসমীপে বাস করিয়া অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন এবং বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন। ইঁহাদিগকে বলা হয় "উপকুর্ব্বাণ" ব্রহ্মচারী। আবার কেহ কেহ যাবজ্জীবন গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া অধ্যয়নাদিতে রত থাকেন; ইঁহাদিগকে বলা হয় **নৈষ্ঠিক**। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি অনবধানতা বশতঃ ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন, তবে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার শুদ্ধ হইতে পারেন কি?

গুরু। না, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি একবার ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শিষ্য। কেন, পূর্ব্বমীমাংসায় অধিকারনির্ণয়প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের এক প্রায়শ্চিত্তের ত উল্লেখ আছে ?

গুরু। হ্যাঁ, আছে সত্য, কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিকের জন্য নয়, উপকুর্ব্বাণের জন্য। যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইলে গর্দ্দভ বধ করিয়া তাহা দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। সেই জন্য অগ্নিসংগ্রহ এবং অগ্নিস্থাপনও করিতে হয়, আর তজ্জন্য স্ত্রীগ্রহণও আবশ্যক। সুতরাং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে যদি অগ্নিস্থাপন ও স্ত্রীগ্রহণ করিতেই হইল, তবে ত তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রতেরই অবসান হয়। অতএব

ন চ আধিকারিকম্ অপি, পতন-অনুমানাৎ, তৎ-অযোগাৎ ॥৪১॥

'অধিকার লক্ষণে' উক্ত প্রায়শ্চিত্তও [আধিকারিকমপি] নৈষ্ঠিকের জন্য নয় [ন]; কারণ, স্মৃতি বলেন, নৈষ্ঠিকের পতন অপ্রতিবিধেয়, অর্থাৎ একবার পতন হইলে আর উদ্ধারের উপায় নাই [পতনানুমানাৎ] আর ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গের যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহাও নৈষ্ঠিকের পক্ষে সম্ভব নয় [তদযোগাৎ]। শাস্ত্র বলেন, "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া আবার তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিনা, যদ্বারা সেই আত্মঘাতী শুদ্ধ হইতে পারে"। শিরশ্ছেদের যেমন চিকিৎসা নাই, নৈষ্ঠিক ব্রত ভঙ্গেরও তেমন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

উপপূর্ব্বম্ অপি তু একে ভাবম্, অশনবৎ,তদুক্তম্ ॥৪২॥

তবে [অপিতু] কেহ কেহ [একে] বলেন, নৈষ্ঠিক ব্রত ভঙ্গেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে [ভাবম্], কারণ (তাঁহারা বলেন) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর

গুরুপত্নী প্রভৃতি ব্যতীত অন্যস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্যের লোপ হইলে 'উপপাতক' হয় [উপপূর্ব্বম্], মহাপাতক হয় না। উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তারপর, ব্রহ্মচারী ভ্রমক্রমে মদ্যমাংসাদি নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে যেমন তাহার উপপাতক হয়, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ [অশনবৎ] গুরুদারাদি ভিন্ন অন্যস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য স্খলিত হইলে, নৈষ্ঠিকের 'উপপাতক' হয় বলিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। ইহা জৈমিনিও পূর্ব্বমীমাংসায় বলিয়াছেন, [তদুক্তম্]। শাস্ত্র যে "প্রায়শ্চিত্ত দেখিনা", এরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মচারী যেন প্রাণপণ চেষ্টায় স্বীয় ব্রত রক্ষা করিতে যত্ন করেন। প্রায়শ্চিত্ত যে একেবারেই নাই, ইহা এই শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য নয়। বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুর (সন্ন্যাসী) সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা।

বহিঃ তু উভয়থাপি স্মৃতেঃ আচারাৎ চ ॥৪৩॥

তবে [তু] নৈষ্ঠিকাদির ব্রহ্মচর্য্য স্খলন মহাপাতকই হউক, আর উপপাতকই হউক উভয়থাই [উভয়থাপি] তাহারা সাধুসমাজের বহির্ভূত [বহিঃ]; কারণ, স্মৃতি শাস্ত্র এবং সজ্জনের ব্যবহারে এইরূপ ব্যবস্থাই দেখা যায় [স্মৃতেঃ আচারাৎ চ]। কোন সাধু ব্যক্তি এইরূপ ভ্রষ্টাচারীর সহিত একযোগে কোন যজ্ঞাদিও করেন না, কিম্বা তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও ইচ্ছা করেন না।

শিষ্য। গুরুদেব! যজ্ঞের আনুষঙ্গিক যে সমস্ত উপাসনা, তাহা কি যজমানই করিবেন, না ঋত্বিক্ (পুরোহিত) করিবেন?

গুরু। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ ইতি আত্রেয়ঃ॥৪৪॥

আচার্য্য আত্রেয় [আত্রেয়ঃ] বলন যে [ইতি], ঐরূপ উপাসনা যজ্ঞের অধিকারী যজমানেরই [স্বামিনঃ] কর্ত্তব্য, কারণ যজমানই

সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফলভাগী বলিয়া উপাসনার যে ফল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই ফলও তাহারই প্রাপ্য, সুতরাং উপাসনাও তাহারই করা উচিত। কিন্তু

আর্ত্বিজ্যম্ ইতি ঔডুলোমিঃ, তস্মৈ হি পরিক্রিয়তে ॥৪৫॥

ঔডুলোমি নামক আচার্য্য [ঔডুলোমিঃ] বলেন যে [ইতি], ঐ উপাসনা ঋত্বিক্ অর্থাৎ যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতেরই [আর্ত্বিজ্যম্] কর্ত্তব্য, কারণ [হি] উপাসনার ফললাভের জন্যও [তস্মৈ] ঋত্বিক্ দক্ষিণাদি দ্বারা ক্রীত হন [পরিক্রীয়তে]। ঋত্বিক্‌গণ দক্ষিণাদির বিনিময়ে যজমানের কার্য্য করিয়া দিবেন, এই সর্ত্তে নিযুক্ত হন, সুতরাং সম্পূর্ণ যজ্ঞ (উপাসনার সহিত) তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গের ফলও যেমন যজমানের, উপাসনার ফলও তেমন তাঁহারই (তিনি স্বয়ং উপাসনা না করিলেও)।

শ্রুতেঃ চ ॥৪৬॥

শ্রুতিও ঔডুলোমির মত সমর্থন করেন (ছাঃ ১. ৭. ৮-৯)।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থলে আছে, "ব্রাহ্মণ 'পাণ্ডিত্য' লাভ করিয়া 'বালক'ভাবে অবস্থান করিবেন। 'বাল্য' ও 'পাণ্ডিত্য' স্থিরতররূপে অধিগত হইলে পরে 'মুনি'। 'মৌন' (=মুনির কার্য্য—মনন, নিদিধ্যাসন অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" নিরন্তর এইরূপ ধ্যান) এবং অ-মৌন (অর্থাৎ বাল্য ও পাণ্ডিত্য) লাভ করিয়া তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণপদবাচ্য (ব্রাহ্মণ=যিনি ব্রহ্মকে জানেন) হন" (বৃঃ ৩. ৫. ১)। 'পাণ্ডিত্য' শব্দে এস্থলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য জনিত "আমিই ব্রহ্ম"

ইত্যাকার বৃত্তি ; এবং 'বাল্য' শব্দে বালকের সরলতা বুঝাইতেছে। এই শ্রুতি বাক্যে 'মুনি' হইবার, অর্থাৎ সতত মনন করিবার, বিধি দেওয়া হইয়াছে কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। পাণ্ডিত্য যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহকারি কারণ, মননও সেইরূপ জ্ঞানেরই (বিশেষভাবে অনুভূতির) সহকারী।

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতঃ বিধি-আদিবৎ ॥৪৭॥

এই সহকারিটীরও বিধি শ্রুতিবাক্যে করা হইয়াছে [সহকার্য্যন্তর-বিধিঃ]। তবে যিনি সাধারণভাবে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, অথচ ভেদ জ্ঞান প্রবল থাকায় প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতেছে না, তাহার [তদ্বতঃ] পক্ষেই [পক্ষেণ] এই মনন তৃতীয় বিধি [তৃতীয়ম্] (পাণ্ডিত্য প্রথম বিধি, বাল্য দ্বিতীয় বিধি)। পূর্ব্বমীমাংসায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, অগ্নিস্থাপন প্রভৃতির বিধি দর্শপূর্ণমাসাদি মুখ্য যাগবিধির অঙ্গীভূত, সেইরূপ [বিধ্যাদিবৎ] এস্থলেও মৌন অবলম্বন করিবার বিধিটী "ব্রহ্মকে জানিবে" এই মুখ্যবিধির অঙ্গীভূত। দর্শপূর্ণমাস নামক যাগ করিতে হইলে অগ্নি স্থাপন করিতেই হয়, সুতরাং অগ্নিস্থাপনের বিধি স্পষ্টতঃ না থাকিলেও ঐ মুখ্য যাগের বিধিতেই উহা অন্তর্নিবিষ্ট (implied) আছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে 'মুনি হইবে' এইরূপ স্পষ্ট বিধি বাক্য না থাকিলেও ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনন একান্ত আবশ্যক বলিয়া উহারও বিধি ব্রহ্মজ্ঞানের বিধির দ্বারাই করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর মৌন উদ্ধৃত বাক্যে 'অপূর্ব্ব' বলিয়া বিহিতই হইয়াছে বলিতে হইবে।

তবে এই মৌন গৃহস্থাদি আশ্রমে সম্ভব হয় না, কারণ অবিচ্ছিন্ন-

ভাবে 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ অনুচিন্তনের নামই মৌন, গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্যবাহুল্যের মধ্যে সতত ধ্যান সম্ভব হয় না। যাহার প্রবল ভেদ-জ্ঞান রহিয়াছে, জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাকে মৌন অবলম্বন করিতেই হয়। সুতরাং 'মৌন' বিশেষ ভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের জন্যই বিহিত, এবং মৌন শব্দে সন্ন্যাসকেও লক্ষ্য করা হয়। [ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, সন্ন্যাসাশ্রম শ্রুতিসিদ্ধ, ১৯—২০ সূত্র দ্রষ্টব্য]।

শিষ্য। [আচ্ছা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের কোন উল্লেখ করেন নাই, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। ছান্দোগ্য যে

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণা উপসংহারঃ ॥৪৮॥

গৃহস্থাশ্রমের দ্বারাই [গৃহিণা] প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন [উপসংহারঃ] তাহার কারণ, গৃহস্থাশ্রমে সকল আশ্রমের ভাবই কিছু না কিছু আছে [কৃৎস্নভাবাৎ]। বহু আয়াস সাধ্য যাগযজ্ঞাদি ত গৃহীর কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেই, অধিকন্তু অন্যান্য আশ্রমের অধ্যয়ন, অহিংসা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধ্যানধারণা ইত্যাদিও তাহার কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যের এই বিশেষত্ব প্রদর্শনের জন্যই ছান্দোগ্য গৃহীর কর্ত্তব্য বিবৃত করিয়াই প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন।]

যাহা হউক,

মৌনবৎ ইতরেষামপি উপদেশাৎ ॥৪৯॥

মৌন যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমন [মৌনবৎ] ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ইত্যাদিরও [ইতরেষামপি] উপদেশ আছে বলিয়া [উপদেশাৎ] তাহাও শাস্ত্রানুমোদিত।

শিষ্য। আচ্ছা, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে জ্ঞানীকে বালকভাবে অবস্থান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি বালকের মত যথেচ্ছাচার, উদ্দেশ্যহীন লীলা, বিষ্ঠামূত্র লেপন ইত্যাদি, না বালকের সরলতা, অভিমানশূন্যতা, ইন্দ্রিয়বিকাররাহিত্য ইত্যাদি ?

গুরু। বাল্য শব্দে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থই বুঝিতে হইবে। 'জ্ঞানী বাল্যে অবস্থান করিবেন', ইহার অর্থ এই যে, তিনি নিজের মহিমা

অনাবিষ্কুর্ব্বন্ অন্বয়াৎ ॥৫০॥

উদ্ঘোষণ না করিয়া [অনাবিষ্কুর্ব্বন্] বালকের ন্যায় নিরভিমান ও সরল হইবেন। বাল্যশব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে [অন্বয়াৎ] (৩১ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। গুরুদেব! "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ"—এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ কি উপায়ে জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহার সাধন প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত সাধন অবলম্বন করিলে এই জন্মেই কি জ্ঞান উৎপন্ন হয় ?

গুরু। দেখ বৎস! এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। কেহ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ করিব, এরূপ তীব্র সঙ্কল্প করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কেহ বা হচ্ছে, হবে, এই ভাবে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হয়। যাহার সাধনের তীব্রতা যত অধিক, সে তত শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ করে। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, কেহ বহুকাল কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত থাকিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন না, আবার কেহ বা সামান্য চেষ্টাতেই সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার কারণ কি ? তীব্র সাধন সত্ত্বেও যিনি জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার জ্ঞানোৎ-

পত্তির একটা প্রতিবন্ধক রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই প্রতিবন্ধক আর কিছুই নহে—হয়ত জন্মান্তরের কোন এক প্রবল কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মাইতেছে। কর্ম্মের ফল কখন কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সাধনের শক্তি অপেক্ষা যদি ফলোন্মুখ কর্ম্মের শক্তি অধিক হয়, তবে যতক্ষণ না সেই কর্ম্মফল নিঃশেষ হয়, ততক্ষণ সাধককে অপেক্ষা করিতেই হয়। সুতরাং সাধনার ফল জ্ঞান

ঐহিকমপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥৫১॥

ইহজন্মেও [ঐহিকমপি] হইতে পারে, যদি না কোন প্রতিবন্ধক আরব্ধ হয় [অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে]। শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন [তদ্দর্শনাৎ]। প্রতিবন্ধক ক্ষয় না হইলে আত্মজ্ঞান হয় না—ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি আত্মার দুর্ব্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"বহুলোক গুরুশাস্ত্রাদি হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ যিনি দেন, তিনিও আশ্চর্য্য। যিনি ইঁহাকে লাভ করেন, তিনিও আশ্চর্য্য। যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনিও আশ্চর্য্য। আর যিনি ইঁহার বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তিনিও আশ্চর্য্য। অর্থাৎ এ সকলই দুর্লভ" (কেঃ ২. ৭)।

পক্ষান্তরে আবার, বামদেব গর্ভে থাকিতে থাকিতেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার রহস্য এই যে, তাঁহার জন্মান্তরের সাধনার কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক ছিল, গর্ভবাসকালে সেই প্রতিবন্ধক অপসারিত হওয়ায় তিনি তখনই জ্ঞানলাভ করিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন "কেহ কেহ জন্মে জন্মে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ

করিয়া পরমাগতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়" (গীঃ ৬. ৪৫)। সুতরাং কোনরূপ প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই জ্ঞান হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে সাধককে জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়।

সাধনের ফল জ্ঞান। সাধনের তীব্রতা অনুসারে জ্ঞানেরও তারতম্য হয়, এই যেমন নিয়ম, কিন্তু জ্ঞানের

এবং মুক্তি-ফল-অনিয়মঃ তদবস্থা-
অবধৃতেঃ তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৫২॥

ফল মুক্তি [মুক্তিফল] সম্বন্ধে সেরূপ কোন [এবম্] নিয়ম নাই [অনিয়মঃ]; কারণ, সেই মুক্তির অবস্থা সর্ব্বদা একরূপ বলিয়াই নির্দ্ধারিত [তদবস্থাবধৃতেঃ]। মুক্তি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। মুক্ত হওয়া ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। ব্রহ্ম সর্ব্বদাই একরূপ, তাঁহাতে আর কোন প্রকার ইতরবিশেষ বা তারতম্য নাই। সুতরাং জ্ঞানের ফল যে মুক্তি, তাহা সকলেরই একরূপ। একথা অবশ্য নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেই বলা হইল। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলের কিন্তু তারতম্য হয়। শ্রুতি বলেন, "তাঁহাকে যিনি যেভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাই হন।" [সূত্রের শেষ শব্দটী অধ্যায় সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য দুইবার বলা হইয়াছে]।

— —

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার প্রসাদে বুঝিলাম, আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই জীবের পরম শান্তি। এই আত্মা বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিবার উপায় **শ্রবণ, মনন** ও **নিদিধ্যাসন**। শ্রবণ—গুরুমুখে ও শাস্ত্র হইতে শুনিয়া নেওয়া যে, আত্মা কি পদার্থ। মনন—অনুকূল যুক্তি ও বিচার দ্বারা সেই তত্ত্বের সমর্থন। নিদিধ্যাসন—পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের ধ্যান। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এক কথায় আত্মবিষয়ক ধারণা—কি একবার করিলেই তাহার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে, না বারবার করিতে হইবে? কতকগুলি যাগ আছে, যাহা একবার করিলেই কালে তাহার ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়। আত্মসম্বন্ধী শ্রবণাদিও কি সেইরূপ একবার করিলেই হয়?

গুরু। বৎস! যাগাদির ফল প্রত্যক্ষ নয়। যাগ সমাপ্ত হইলে একটা 'অদৃষ্ট' উৎপন্ন হয়, উহাই কালে ফল প্রদান করে। কিন্তু শ্রবণাদির ফল প্রত্যক্ষ। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করাই উহাদের উদ্দেশ্য। যদি একবার শ্রবণাদি করিলেই আত্মা প্রত্যক্ষ হন, তবে আর পুনরায় উহা করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। মোটের উপর উদ্দেশ্য হইল, আত্মাকে সাক্ষাৎকার করা। যতক্ষণ না আত্মার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ

আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ ॥ ১ ॥

আত্মবিষয়ক শ্রবণাদি পুনঃ পুনঃ করিতেই হইবে [আবৃত্তিঃ], কারণ, শাস্ত্র বারবার [অসকৃৎ] আত্মার উপদেশ করিয়াছেন [উপদেশাৎ]। শাস্ত্র বহুপ্রকারে বহুবার আত্মার উপদেশ করিয়াছেন এবং আত্মদর্শনের বহুবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সাধক যতক্ষণ আত্মদর্শন না করিবেন, ততক্ষণ শ্রবণাদি হইতে বিরত হইবেন না। শাস্ত্র নানাভাবে আত্মার উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, স্বর্গাদি ফল যেমন 'অদৃষ্ট'-জনিত, মোক্ষ বা আত্মজ্ঞান সেরূপ নয়, পরন্তু তাহা 'দৃষ্ট' অর্থাৎ ফল প্রাপ্তি হইলেই শ্রবণাদি সাধনের বিরতি, তৎপূর্ব্বে নয়।

তারপর, শাস্ত্রে যে নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে, তাহার অর্থ এই নয় যে, একবার মাত্র মনে করা। ধ্যেয় বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহের নামই বাস্তবিক নিদিধ্যাসন, তাহারই নাম প্রকৃত উপাসনা। যদি একবার মনে করিলেই আত্মদর্শন হইত, তবে শাস্ত্র এত আগ্রহের সহিত নিদিধ্যাসন বা উপাসনা করিতে বলিবেন কেন? সুতরাং যতক্ষণ না আত্মদর্শন হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি অবশ্যই করিতে হইবে।

তারপর, উদ্গীথ উপাসনা প্রসঙ্গেও শ্রুতি পুনঃ পুনঃ উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই

লিঙ্গাৎ চ ॥ ২ ॥

সঙ্কেত হইতেও বুঝা যায় যে, সর্ব্ববিধ উপাসনাই যতক্ষণ অভীষ্ট বস্তু লাভ না হয়, ততক্ষণ করিতে হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! বুঝিলাম যে, আত্মসাক্ষাৎকারই শ্রবণাদির

লক্ষ্য, এবং যতক্ষণ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আত্মতত্ত্ব গুরু ও বেদান্তবাক্য হইতে শুনিয়া বিচারপূর্ব্বক একবার বুঝিয়া লইলে কেন যে আবার পুনঃ পুনঃ তাহাই চিন্তা করিতে হইবে—একথা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একগাছি দড়িতে সর্প-ভ্রম হইয়াছে; একজন বিশ্বাসী লোক বলিলেন, "না হে, ওটা সাপ নয়, দড়ি"; নিজেও বিচার করিয়া দেখিলাম, ওটা সাপ হইতেই পারে না। ইহার পরেও 'সাপটা দড়িই' 'সাপটা দড়িই' এরূপ বারংবার চিন্তা করিবার কি প্রয়োজন আছে? একবার শ্রবণ ও বিচার করিয়াও যদি আমার দড়ির জ্ঞান না হয়, তবে সহস্রবার করিলেও যে হইবে, এমন কি ভরসা আছে? সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধে একবার শ্রবণে ও মননে যদি আত্মার জ্ঞান না হয়, তবে বহুবারেও যে হইবে, তাহারই বা ভরসা কি? হ্যাঁ, তবে এমনও হইতে পারে যে, বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণে ও যুক্তি প্রয়োগে কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রথমতঃ একটা 'সাধারণ' জ্ঞান হয়, তারপর পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাহার 'বিশেষ' জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মার ত কোন 'বিশেষ' নাই, তাহা সর্ব্বদাই একরূপ, সামান্য-বিশেষ-বর্জ্জিত। সেই আত্মা সম্বন্ধে একবার বাক্য বা যুক্তি প্রয়োগ করিলে যদি তাহার জ্ঞান না হয়, তবে বহুবার করিলেই বা লাভ কি? যদি জ্ঞান হইবার হয় ত একবারেই হইবে, না হইলে হাজারবারেও হইবে না। সুতরাং শ্রবণ মনন একাধিকবার করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি না।

গুরু। বৎস! প্রয়োজনীয়তা যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। এমন লোক অবশ্য আছেন, যিনি একবার উপদেশেই আত্মতত্ত্ব সম্যক্ অনুভব করিতে সক্ষম। কিন্তু সেইজন্য সকলেই যে তাহা পারিবে,

তাহার স্থিরতা কি? সাধারণতঃ দেখা যায়, কেহ এক কথাতেই বোঝে, কেহবা দশবারে বোঝে, আবার কেহবা শতবার বলিলেও বোঝে না। যাহার বুদ্ধি নির্ম্মল, সে একেবারেই 'তত্ত্বমসি—তুমিই সেই', এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারে এবং আপনার ব্রহ্মত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। তাহার পক্ষে উহার পুনঃ শ্রবণাদি অবশ্যই নিরর্থক। কিন্তু যিনি একবার শ্রবণাদি দ্বারা আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না, তাঁহার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দেখ, ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা তাঁহাকে "তত্ত্বমসি" এইরূপ উপদেশ করিলেও শ্বেতকেতু পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ, আমি ঠিক বুঝিলাম না, আবার বলুন।" পিতাও বহুবার শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগে পুত্রের সংশয় দূর করিয়া ঐ তত্ত্বের উপদেশ করিলেন, এবং অবশেষে শ্বেতকেতু আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। অনেকস্থলেই দেখা যায়, একবার চেষ্টা করিয়া যাহা বুঝা যায় না, বারবার চেষ্টা করিলে তাহা বোধগম্য হয়। এ'ত অহরহঃ হইতেছে। একবারেই বুঝিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে? এই প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়ে আর বিবাদ কি? দড়িতে সাপের ভ্রম একবারে নিবৃত্ত না হইলে যে কোনকালেই হইবে না, এমন কি কথা আছে? অজ্ঞান অবস্থায় যাহাকে তুমি 'আমি আমি' মনে করিতেছ, গুরুমুখে ও শাস্ত্র হইতে শুনিলে যে, তাহা তোমার সত্যিকারের 'আমি' নয়, পরন্তু দেহাদির অতিরিক্ত ব্রহ্ম পদার্থই তোমার প্রকৃত 'আমি'। তারপর বিচার করিয়া দেখিলে, 'হ্যাঁ, গুরু ও শাস্ত্র বাক্যই ঠিক'। কিন্তু তথাপি সে সত্য তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছে না। এরূপ ত প্রায় সকলেরই হয়। কেন হয়? ব্রহ্ম বস্তুতঃ অংশ বা বিশেষ রহিত বটে। কিন্তু অজ্ঞান প্রভাবে সেই

একরস ব্রহ্মেই বহুরকমের 'বিশেষ' বা অংশ কল্পনা করিয়া জীব এমন কতকগুলি সংস্কারের বশবর্ত্তী হয় যে সহজে সেই সংস্কার-মুক্ত হওয়া যায় না। মন কিছুতেই মানিতে চায় না যে, আমি দেহাদির অতিরিক্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সাধন করিতে করিতে ক্রমে এই জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার রাশি অপনীত হয়, তখন আপনা হইতেই ব্রহ্মস্বরূপের স্ফুরণ হয়। এই পুঞ্জীভূত সংস্কার ও সংশয় অপনোদনের জন্যই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন একান্ত আবশ্যক। শ্রুতি ও যুক্তির সহায়ে আত্মা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হইলেও তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য পুনঃ পুনঃ ধ্যান করা একান্ত প্রয়োজন। পানার নীচে নির্ম্মল জল আছে। হাত দিয়া পানা সরাইয়া দিলে জল দেখা যায় বটে, কিন্তু হাত তুলিয়া লইলে আবার জল পানায় ঢাকিয়া যায়। যাহাতে পানা আর আবরণ করিতে না পারে, সেই জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। পানারূপ অনন্ত সংস্কার চতুর্দ্দিক হইতে নির্ম্মল রসস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপায় ও বিচার বুদ্ধিবলে একবার উহার দর্শন পাইলেও উহাতেই স্থিতি লাভ করিয়া রসস্বরূপে পর্য্যবসিত হইতে হইলে সতত সাধন একান্তই প্রয়োজন।

শিষ্য। আচ্ছা, পরমাত্মার ধ্যান কি ভাবে করিতে হইবে? 'তিনিই আমি'—এইভাবে ধ্যান করিব? কিম্বা 'তিনি আমা হইতে ভিন্ন, আমার প্রভু বা অন্য কিছু'—এই ভাবে ধ্যান করিব?

গুরু। পরমেশ্বরই ধ্যানকারীর

আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৩॥

আত্মা [আত্মা], এইভাবে [ইতি] ধ্যান করাই শ্রুতি স্বীকার

করেন [উপগচ্ছন্তি] এবং [চ] শ্রুতি পরমেশ্বরকে উপাসকের আত্মা বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন [গ্রাহয়ন্তি]। সুতরাং পরমেশ্বরকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই ধ্যান করিবে। শ্রুতি বলেন, "হে দেব ! তুমিই আমি, আমিই তুমি"। "আমি ব্রহ্ম," "এই ব্রহ্মই তোমার আত্মা, ইনিই সর্ব্বান্তর" (বৃঃ ৩. ৪. ১) এই প্রকার বেদান্ত বাক্য হইতে নিশ্চয় হয় যে, পরমেশ্বরকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই ধ্যান করা বিধেয়। শ্রুতি আবার ভেদভাবনার নিন্দাও করিয়াছেন—"যিনি ভেদজ্ঞানে উপাসনা করেন, অর্থাৎ আমি একজন, আর আমার উপাস্য অপর জন, এই ভাবে উপাসনা করেন,তিনি প্রকৃত তথ্য জানেন না" (বৃঃ ৪. ৫. ৭)।

শিষ্য। কিন্তু পরমেশ্বর হইলেন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আর জীব হইল অশুদ্ধ, অজ্ঞ, বদ্ধ। এই উভয়ের পরস্পরের ঐক্য হইবে কিরূপে ?

গুরু। বৎস! এত আলোচনার পরেও তুমি একি বলিতেছ ? জীবের যত কিছু মালিন্য, সমস্তই যে অজ্ঞানের ফল, বস্তুতঃ সে যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহাই ত এযাবৎ বুঝাইলাম ! [বৎস ! এখন বুঝিলে ত কেন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা প্রয়োজন ?] যাহা হউক, এই সমস্ত মিথ্যা মালিন্য দ্বারা পরমেশ্বর হইতে জীবের ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না। আমি অশুদ্ধ, অজ্ঞ, বদ্ধ এরূপ ধ্যান করিয়া কি ফল ? বরং আমি শুদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ, চিরমুক্ত—এইভাবে ধ্যান করিলেই জীবের অজ্ঞান দূর হইয়া তাহাকে শাশ্বত সুখের অধিকারী করিতে পারে। সুতরাং সাধক আপনাকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্নভাবেই ধ্যান করিবেন।

শিষ্য। আচ্ছা, পরমেশ্বর আর জীব যদি একই হয়, তবে ত প্রকারান্তরে বলা হইল যে, পরমেশ্বরই জীব হইয়াছেন, জীব ছাড়া পরমেশ্বর বলিয়া কিছু নাই।

গুরু। তাহা কেন হইবে ? বরং জীবত্ববুদ্ধিই অজ্ঞানপ্রসূত।

সেই জীবত্ববুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যাহাতে ঈশ্বরত্ববুদ্ধি দৃঢ় হয়, সেই জন্যই সাধনা এবং শাস্ত্রও সেই উদ্দেশ্যেই জীবেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাস্তবিক জীব বলিয়া কেহই নাই, পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য সত্য আছেন। তথাপি যে জীবত্বের বোধ, তাহা ভ্রমমাত্র। সেই ভ্রম দূর হইলে একমাত্র পরমেশ্বরেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, উপাস্য ও উপাসক এক হইলে কে কাহার উপাসনা করে?

গুরু। বৎস! তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই না অভেদ? কিন্তু যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, ততক্ষণ ত ভেদ আছেই, আর ততক্ষণই সাধনা বা উপাসনা। শ্রুতি বলেন, "সমস্তই যখন সাধকের আত্মভূত হয়, তখন কে কি দেখিবে?" (বৃঃ ৪. ৩. ২২)। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান হইলে উপাসনার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তখন "বেদও অ-বেদ" (বৃঃ ৪. ৩. ২২)—অর্থাৎ শাস্ত্রও তখন নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। আচ্ছা, যদি জীব ও ঈশ্বর একই হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞান হইবে কাহার?

গুরু। যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই তোমার, অর্থাৎ যে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব অনুভব করে না, তাহারই।

শিষ্য। কিন্তু আমি ত বাস্তবিক ঈশ্বরই, এবং আমার আত্মজ্ঞানের পরমার্থতঃ কোনকালেই অভাব নাই, উহা চিরকালই অব্যাহত আছে?

গুরু। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, তুমি ঈশ্বরই এবং তুমি নিত্যবুদ্ধ, তবে আর কাহার তত্ত্বজ্ঞান হইবে? যাহার জ্ঞান নাই, তাহারই জ্ঞান হইতে পারে। যাহার আছে, তাহার আর কি হইবে? যিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তাহার পক্ষে গুরুই বল, শাস্ত্রই বল, ধ্যান ধারণা যাহাই কেন বলনা, সবই নিষ্ফল, নিষ্প্রয়োজন। হাঁ, তুমি

বাস্তবিক ঈশ্বরই, তবে ইহা তোমার জানা নাই বলিয়াই, তুমি উপাসক, ঈশ্বর উপাস্য; তুমি জ্ঞাতা, ঈশ্বর জ্ঞেয়।

সুতরাং ঈশ্বরই আমি বা আত্মা, এই ভাবেই ধ্যান করিবে।

শিষ্য। আচ্ছা, "মন ব্রহ্ম—এইরূপে উপাসনা করিবে" (ছাঃ ৩. ১৮. ১)। "আকাশ ব্রহ্ম—এইভাবে উপাসনা করিবে"(ছাঃ ৩. ১৯. ১)—এই যে মন, আকাশ ইত্যাদি অবলম্বনে উপাসনার বিধান আছে, ইহার নাম **প্রতীক উপাসনা** মন প্রভৃতি 'প্রতীকে' (Symbol) ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপাদন করাই এই সমস্ত উপাসনার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত প্রতীককেও কি আত্মা হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করিতে হইবে, অর্থাৎ আমিই মন, আমিই আকাশ, আমিই সূর্য্য—এইরূপই কি ধ্যান করিতে হইবে?

গুরু। ন প্রতীকে, ন হি সঃ॥ ৪॥

না, প্রতীকে [প্রতীকে] আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেনা [ন], কারণ উপাসক [সঃ] প্রতীক নয় [ন]। ব্রহ্ম এবং উপাসক যেমন এক, প্রতীক ও উপাসক সেইরূপ এক নয়। দেখ, ব্রহ্মোপাসনায় সাধক আপনাকেই স্ব-স্বরূপে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলিয়া ভাবনা করেন। কিন্তু প্রতীকোপাসনায় সাধক কতকগুলি গুণের সাদৃশ্য ধরিয়া লইয়া মন প্রভৃতিকেই ব্রহ্মভাবে ভাবনা করেন; ইহাতে তাঁহার ব্রহ্ম ধারণার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে সে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে। এই প্রতীক উপাসনায় সাধক প্রতীকগুলিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া মানিয়া লইয়াই সাধনে অগ্রসর হয়, সুতরাং আমিই মন, আমিই আদিত্য, প্রতীকে এইরূপ আত্ম-বুদ্ধি করিবার অবসরই সে স্থলে নাই।

শিষ্য। কিন্তু প্রতীক যখন ব্রহ্মেরই 'বিকার বিশেষ' অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহাও বস্তুতঃ ব্রহ্মই (ব্রঃ সূঃ ২.১.১৪ দ্রষ্টব্য); আত্মা ত ব্রহ্মই। সুতরাং এইভাবে প্রতীকে আত্ম-দৃষ্টি করিতে বাধা কি?

গুরু। হঁ্যা, প্রতীক ব্রহ্মের 'বিকার' বটে, তাহাকে যদি ব্রহ্ম-রূপেই গ্রহণ কর, তবে আর সে প্রতীক রহিল না। যতক্ষণ আদিত্য প্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বিকাররূপে গ্রহণ করিবে, ততক্ষণই তাহা প্রতীক হইবার যোগ্য; তাহার বিকার ভাব ত্যাগ করিয়া তাহার স্বরূপ যে ব্রহ্মভাব, তাহাই যদি গ্রহণ কর, তবে আর সে প্রতীক থাকেনা। স্বরূপের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উপাসক ও প্রতীক একই বটে; কিন্তু যখন স্বরূপের ভাবনা না করিয়া প্রতীক অবলম্বন করা হইতেছে, তখন সেই প্রতীককে উপাসক হইতে ভিন্ন বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইতেছে। দেখ, হার ও অনন্ত সুবর্ণ হিসাবে এক হইলেও এক একটী অলঙ্কার হিসাবে ভিন্ন ভিন্নই বটে। হারকে হারই বলিব, অনন্তকে অনন্তই বলিব, অথচ উভয়ই এক, এমন ত হইতে পারে না; অর্থাৎ যে কারণে একটীকে বলি হার, অপরটীকে বলি অনন্ত, সেই কারণ বিদ্যমান থাকিলে উভয়কে এক বলা যায় না। সেইরূপ, যখন প্রতীক অবলম্বনেই উপাসনা হইতেছে, তখন আর তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করা যায় না।

শিষ্য। "আদিত্য ব্রহ্ম", "প্রাণ ব্রহ্ম" ইত্যাদি প্রতীক উপাসনায় কি আদিত্যাদিকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, না ব্রহ্মকেই আদিত্যাদি মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে? অর্থাৎ আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, কি ব্রহ্মতেই আদিত্যাদিদৃষ্টি করিতে হইবে?

গুরু। ব্রহ্মদৃষ্টিঃ উৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদৃষ্টি [ব্রহ্মদৃষ্টিঃ] করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মই আদিত্যাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট [উৎকর্ষাৎ]। নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট-রূপে ধ্যান করিলেই সাধকের উন্নতি হইতে পারে, উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট ভাবিলে নয়। শুক্তিতে (ঝিনুক) যখন রৌপ্য ভ্রম হয়, তখন এমন ভাবেই বিচার করা প্রয়োজন, যাহাতে রৌপ্যবুদ্ধি নষ্ট হইয়া শুক্তিবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ প্রতীকোপাসনায়ও ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতীককেই ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে হয়, ব্রহ্মকে প্রতীকভাবে নয়। যেমম শালগ্রামকে বিষ্ণুভাবে আরাধনা করা হয়, বিষ্ণুকে শালগ্রাম শিলাভাবে নয়, এও সেইরূপ।

শিষ্য। যজ্ঞ সম্পর্কে কতকগুলি উপাসনা বিহিত আছে। যেমন "এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তিনি (অর্থাৎ সূর্য্য) 'উদ্গীথ,' এই ভাবে উপাসনা করিবে।" এই রকম উপাসনায় কে কাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্ম জগতের কারণ, নিত্য, শুদ্ধ, সুতরাং তিনি আদিত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আদিত্যও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নশ্বর পদার্থ বিশেষ, উদ্গীথও তাহাই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে আর ইতর-বিশেষ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উদ্গীথাদিকে কি আদিত্যাদি বোধে উপাসনা করিতে হয়, না আদিত্যাদিতে উদ্গীথবুদ্ধি করিতে হয়?

গুরু। আদিত্যাদিমতয়ঃ চ অঙ্গে উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

যজ্ঞের অঙ্গ সম্পর্কে যে সমস্ত উপাসনা, তাহাতে [অঙ্গে] আদিত্যাদি বুদ্ধিই [আদিত্যাদিমতয়ঃ] করিতে হয়। কারণ, তাহা

হইলেই শাস্ত্র বাক্য সঙ্গত হয় [উপপত্তেঃ]। শ্রুতি বলেন, এই রকম উপাসনায় কর্ম্মের (যজ্ঞের) একটা বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় এবং তাহা দ্বারা কর্ম্মের ফলের নিশ্চয়তা জন্মে। "উপাসনার সহিত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অধিকতর বীর্য্যশালী হয়।" এক্ষণে দেখ, কর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্য কিরূপে উৎপন্ন হয়। কর্ম্মের অঙ্গ (যেমন উদ্গীথ) যদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই কর্ম্মে বৈশিষ্ট্য জন্মে। কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিকে আদিত্যাদিভাবে ভাবনা করিয়া উপাসনা করিলেই তাহা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আদিত্যাদিকে উদ্গীথাদিভাবে উপাসনা করিলে কর্ম্মের কি উপকার? সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিকেই আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাসনা করিতে হইবে। আর, ঐ সমস্ত উপাসনার ফল আদিত্যাদি লোক প্রাপ্তি, সুতরাং সেই হিসাবে আদিত্যাদি উদ্গীথাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও বটে।

শিষ্য। আচ্ছা, উপাসনা কি আসনে উপবিষ্ট হইয়া করিতে হইবে, না দাঁড়াইয়া, শুইয়া যে কোন ভাবে করিলেই চলিবে?

গুরু।　　আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

উপবিষ্ট হইয়াই [আসীনঃ] উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কারণ সেই ভাবেই উপাসনা করা সম্ভব হয় [সম্ভবাৎ]।

শিষ্য। কেন, উপাসনা ত মানসিক ব্যাপার, তাহাতে শারীরিক নিয়মের কি প্রয়োজন?

গুরু। প্রয়োজন আছে। উপাসনা কি?—যাঁহার উপাসনা করিবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহারই চিন্তা করার নাম উপাসনা। উপাসনার সময় উপাস্য ব্যতীত অন্য কিছুরই চিন্তা করিবে না, তবেই প্রকৃত উপাসনা হইবে। তাদৃশ উপাসনা দাঁড়াইয়া হয় না,

কারণ তাহাতে মনটা দেহটাকে ধারণ করিয়া রাখিতে কতকটা ব্যাপৃত থাকে, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই শ্রান্তি বোধ হয়। শয়ন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেও লোকে সহজে ঘুমাইয়া পড়ে। দেখ, শরীরের সহিত মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সামান্য একটা পিপীলিকায় দংশন করিলেও মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। মনের মত চঞ্চল জগতে দ্বিতীয় পদার্থ নাই। সেই মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে উপাসনা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, কাজে কিছুই হয় না। শারীরিক সুখ দুঃখ লইয়াই মন ব্যস্ত। সুতরাং যে ভাবে অবস্থান করিলে মনের একাগ্রতার সাহায্য হয়, সেই ভাবেই উপাসনা করা উচিত। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা অভ্যাস করিলে সহজেই মন একাগ্র হইয়া আইসে এবং পূর্ব্বোক্ত বাধা বিঘ্নও অপসারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। যোগ ব্যতীত প্রকৃত উপাসনা অসম্ভব। সুতরাং যথানির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উপবেশন করিয়াই উপাসনা করিবে।

ধ্যানাৎ চ ॥৮॥

আর [চ], উপাসনা অর্থ ধ্যান, অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল, দৃষ্টি স্থির, একটা মাত্র বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখিলে লোকে বলে, ধ্যান করিতেছে; যেমন, বিরহিণী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া স্বামী ধ্যানে মগ্ন হইয়া উপবিষ্ট আছে ইত্যাদি। এইরূপ ধ্যান উপবিষ্ট ব্যক্তিরই সহজ সাধ্য। শ্রুতিও

অচঞ্চলত্বং চ অপেক্ষ্য ॥৯॥

নিশ্চলভাবে অবস্থানকে [অচঞ্চলত্বম্] লক্ষ্য করিয়াই [অপেক্ষ্য]

ধ্যানশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। "পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে"। ইহাতেও বুঝা যায়, উপবিষ্ট হইয়াই ধ্যান করা উচিত।

স্মরন্তি চ ॥১০॥

আর, স্মৃতি-শাস্ত্রেও উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ আসনের উপদেশ আছে। সুতরাং উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে। [তবে সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে আসনাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টার বা আয়াসস্বীকারের প্রয়োজন হয় না, উহা আপনা হইতেই আয়ত্ব হইয়া স্বভাবে পরিণত হয় এবং সাধনায় অগ্রসর হইলে যে কোন অবস্থাতেই উপাসনা করা সম্ভব হয়।]

শিষ্য। উপাসনায় দিক্ (কোন্ দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে), স্থান ও সময়ের কোন নিয়ম আছে কি ?

গুরু। উপাসনা বা ধ্যান করিতে হইলে অমুকদিকে মুখ করিয়াই করিতে হইবে, অমুক স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিতে হইবে, অমুক সময়েই ধ্যান করিতে হইবে, অন্যদিকে, অন্যস্থানে, অন্য সময়ে ধ্যান করা যাইবে না, এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই।

যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ ॥১১॥

কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় [অবিশেষাৎ] যে দিকে, যেস্থানে ও যে সময়ে [যত্র] বসিলে চিত্তের একাগ্রতা [একাগ্রতা] হয়, সেই দিকে, সেইস্থানে ও সেই সময়েই [তত্র] উপাসনা বা ধ্যান করিবে। মোটের উপর দেখিতে হইবে, চিত্তের একাগ্রতা কি ভাবে হয়। সেই ভাবেই ধ্যানে বসিবে। হ্যাঁ, তবে যোগশাস্ত্রে বিশেষ

বিশেষ স্থান কালের নির্দ্দেশ আছে সত্য, কিন্তু ঐ স্থান কাল ছাড়া অন্যত্র যে ধ্যান হইবেই না, এমন কোন কথাই নাই। তবে ঐ সমস্ত একাগ্রতার পক্ষে অনুকূল বলিয়াই কৃপালু শাস্ত্রকার উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা হয়, তাহাই করিবে।

শিষ্য। এই অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে উপাসনা অবলম্বিত হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যেমন চাউল বাহির করিবার জন্যই ধানে 'পাঢ়' দেওয়া হয়, চাউল বাহির হইলে আর পাঢ় দিতে হয় না। কিন্তু এমন উপাসনাও আছে, যাহা সাক্ষাৎভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে করা হয় না, কিন্তু কোন একটা বিশেষ উন্নতি কামনায়ই করা হয়। স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে একপ্রকার যজ্ঞ করা হয়; উহা একবার করিলেই মরণান্তে স্বর্গলাভ হয়। এইরূপ বিশেষ ফলের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহারও কি একবার বা দুই-চারিবার করিলেই ফল পাওয়া যায়, না আমরণ তাহা করিতে হয়?

গুরু। এই সব উপাসনা

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥১২॥

মরণকাল পর্য্যন্ত [আপ্রায়ণাৎ] করিতে হয়, কারণ [হি] মরণ কালেও [তত্রাপি] উপাসনার কর্ত্তব্যতা শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই দেখা যায় [দৃষ্টম্]।

যজ্ঞের ফলে আর উপাসনার ফলে একটু পার্থক্য আছে। যজ্ঞ করা হইয়া গেলে তাহা হইতে 'অদৃষ্ট' নামক একটা শক্তি উৎপন্ন হয়

এবং তাহা কালান্তরে (হয়ত মৃত্যুর পর) ফল প্রদান করে—ইহা শাস্ত্রালোচনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু, উপাসনা দ্বারা সেরূপ কোন অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদানের জন্য সময়ের অপেক্ষায় থাকে না। উপাসনা বা জ্ঞান প্রভাবে যে ফল মৃত্যুর পরে উৎপন্ন হইবে, তাহা মৃত্যুকালেই ফলরূপে অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করে। মৃত্যুকালের ভাবনা দ্বারাই মৃত্যুর পরে যাহা হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হয় ; অন্য কথায় মৃত্যুকালীন চিন্তাই মৃত্যুর পরে আকার ধারণ করে। মৃত্যুকালে যে চিন্তা প্রবল হয়, মৃত্যুর পরে তদনুরূপ ফলই হয়। শ্রুতি বলেন, "মৃত্যু সময়ে মনুষ্য ভাবনাময় হয়, অর্থাৎ জীবনে সে যে বিষয়ের বিশেষ অনুশীলন করিয়াছে, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া একটা ভাবনাময় আকার প্রাপ্ত হয় এবং দেহ ত্যাগ করিয়া এই ভাবনাময় আকারের অনুরূপ আকার বা দেহ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে মন যে আকারে অবস্থান করে, সেই আকারেই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। মনসংযুক্ত সেই প্রাণ দেহ ছাড়িয়া জীবকে সঙ্কল্পের অনুরূপ লোকে লইয়া যায় অর্থাৎ যে স্থলে সেই সঙ্কল্পের সিদ্ধি হইতে পারে, সেই স্থলেই উপনীত করে"। স্মৃতি বলেন, "হে অর্জ্জুন! জীব মৃত্যুকালে যে বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবে ভাবিত হওয়ায় সে তাহাই হয়" (গী. ৮. ৬)। কেহ হয়ত মনে করিতে পারে যে, জীবন ব্যাপিয়া কুকর্ম্ম করিয়া যাই, মৃত্যুকালে একটা সুচিন্তা করিলেই ত ভাল জন্ম পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল। মৃত্যুকালে এমনই অবস্থা হয় যে, তখন আর নিজের উপর কোন প্রভুত্ব থাকে না, যাহা জীবন ভরিয়া ভাবা যায়, তাহাই প্রবল ভাবে আসিয়া পড়ে। রোগের বিকার উপস্থিত হইলে কিম্বা মাতাল হইলে লোকের আর তখন মনের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে

না ; তখন যে সমস্ত অসম্বদ্ধ বাক্য তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উহাই তাহার সর্ব্ব প্রধান মানসিক ভাব। মৃত্যুকালেও এইরূপ অবস্থাই হয়। অতএব মৃত্যু কালের জন্য প্রস্তুত হইতেই জীবন ব্যাপী সুচিন্তা করা প্রয়োজন। মরণ কালের চিন্তাই যখন ভাবিফলের নিয়ন্তা, তখন উপাসনাও অবশ্য মরণকাল পর্য্যন্তই করিতে হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলেন, আত্মজ্ঞান হইলে জীবের সমস্ত দুঃখের অবসান হয় এবং সে চিরশান্তির অধিকারী হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটী প্রশ্ন আছে। জন্ম জন্মান্তরে জীব যে কত দুষ্কর্ম করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই পুঞ্জীকৃত পাপের ফল সমস্তই কিছু আর এক জীবনে ভোগ হইয়া যায় না। অথচ যদি কাহারও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তবে নাকি তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। কিন্তু পূর্ব্বকৃত পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইলে আর তাহার দুঃখের অবসান হইল কোথায়? আবার তত্ত্বজ্ঞানের পরেও তাহার শরীর দ্বারা যে কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এমন নয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বেকার সঞ্চিত পাপরাশি ও পরে সম্ভাব্যমান পাপরাশির ফল যদি তাহাকে ভোগ করিতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানে আর তাহার কি লাভ হইল?

গুরু। না, বৎস, সেই সমস্ত পাপের ফল আর তাহাকে ভোগ করিতে হয় না।

তৎ-অধিগমে উত্তর-পূর্ব্ব-অঘয়োঃ অশ্লেষ-
বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥১৩॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে [তদধিগমে পূর্ব্ব পাপের]

বিনাশ [পূর্ব্ব-অঘ-বিনাশ) এবং পরে হইতে পারে এমন যে সব পাপ [উত্তর-অঘ] তাহার অশ্লেষ (অর্থাৎ জ্ঞানীতে সে পাপের সংস্পর্শের অভাব) হয় ; কারণ, শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তদ্ব্যপদেশাৎ]। শ্রুতি বলেন, "জল যেমন পদ্ম পত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পাপকর্ম্ম সকলও জ্ঞানীতে সংশ্লিষ্ট হয় না" (ছাঃ ৪.১৪.৩)। "তূলা যেমন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়" (ছাঃ ৫. ২৪. ৩)। "সেই পরাবর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষ (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" (মুঃ ২.২.৮)। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে. ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানীর আর পাপফল ভোগ করিতে হয় না।

শিষ্য। কিন্তু ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম ক্ষয় হয় না, এও ত শাস্ত্রের বচন। বিশেষ, কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ হয় না, একথা বলিলে সমুদায় শাস্ত্রই যে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং সংসারের এত যে বৈষম্য, তাহারও একটা সঙ্গত কারণ নির্দ্ধারিত হয় না। ফলে লোকে সৎকর্ম্মের ও অসৎকর্ম্মের কোন পার্থক্যই মানিতে চাহিবে না, এবং জগতে পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতাই বিরাজ করিবে।

গুরু। বৎস, অধৈর্য্য হইও না। তুমি যাহা বলিলে, সত্য। কর্ম্মের যে একটা ফলদায়িনী শক্তি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? নিশ্চয়ই কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ হয় এবং তাহা হওয়াই উচিত—শাস্ত্র, যুক্তি, সবই এই কথার অনুমোদন করে। কিন্তু পক্ষান্তরে আবার ভাবিয়া দেখ যে, ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় আর কিছুতেই হইবে না—এরূপ যদি একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মই থাকে, তবে কোটি কল্পেও জীবের মুক্তি অসম্ভব। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত-

কর্ম্মরাশি যদি ভোগ করিয়াই শেষ করিতে হয়, তবে ত কোটিজন্মেও তাহা সমাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি, এ সমস্ত ত কথার কথামাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ভোগ করিয়া কর্ম্মের শেষ করা যায় না; কারণ ভোগকালেও আবার কতশত নূতন কর্ম্ম সঞ্চিতই হইতে থাকে। সুতরাং এই কর্ম্মের নাগপাশ হইতে চিরতরে মুক্ত হইবার জন্যই ঋষি রহস্য আবিষ্কার করিলেন ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আমি পাপ করি—এই জ্ঞান যতদিন আছে, ততদিন সে পাপের ফল ভোগ করিতেই হয়। যিনি মনে করেন 'পাপ করি', তিনিই ভোগ করেন, ভোগ ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর নাই- এইখানেই কর্ম্মের ফলপ্রদায়িনী অব্যাহতশক্তি। কিন্তু যিনি জানিয়াছেন, 'আমি কর্ত্তা নই, আমি কোন কালে কোন কর্ম্ম করি নাই, করি না বা করিবও না, কর্ম্মের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ কোন কালেই নাই, শুধু এক সময়ে মনে করিয়াছিলাম মাত্র যে, আমি কর্ম্মকর্ত্তা, কিন্তু সে ত ভ্রম,' তাঁহার কর্ম্ম ত সেই মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া গিয়াছে, পাপপুণ্য তাঁহার আর কি করিবে? তাই বলিতেছি আত্মজ্ঞান হইলে কোন পাপই জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আত্মজ্ঞান লাভ করিলে জ্ঞানীর যেমন পাপের সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ হইয়া যায়,

ইতরস্য অপি এবম্ অশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

সেইরূপ [এবম্] পুণ্যেরও [ইতরস্যাপি] কোন সংস্পর্শ থাকে না [অশ্লেষঃ], এবং দেহপাত হইলেই [পাতে] তাঁহার বিদেহমুক্তি অবশ্যম্ভাবী [তু]। পাপের ন্যায় পুণ্যও ভোগদায়ক, তাহাও জীবের বন্ধন। সুতরাং পুণ্য ও পাপ উভয়ের ক্ষয় হইলেই প্রকৃত মুক্তি।

শ্রুতিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "জ্ঞানী পাপপুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হন"। "জ্ঞানীর সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়"। আত্মাকে যখন অকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহা কি সুকৃত, কি দুষ্কৃত, সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানলাভ হইলে পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং নূতন পাপপুণ্যও আর জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। তারপর দেহপাত হইলেই সে মুক্ত হইয়া যায়।

শিষ্য। গুরুদেব! দেহপাত হইলে জ্ঞানীর মোক্ষ হয়, একথার তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেন, যে মুহূর্ত্তে তাঁহার জ্ঞান-লাভ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই ত তাহার মোক্ষ হইল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে কেন?

গুরু। হ্যাঁ, বৎস। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই। মুক্তির কোন ইতর বিশেষ নাই। তবে ব্যবহার হিসাবে উহার দুইটী 'প্রকার' স্বীকার করা হয়। এক **জীবন্মুক্তি**, অর্থাৎ শরীর পূর্ব্বের মতই আছে এবং তাহাতে শরীরোচিত কার্য্যাদিও হইতেছে, অথচ যিনি শরীরী তিনি আপনাকে শরীরের অতিরিক্ত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলিয়া জানিয়াছেন! অপর—**বিদেহমুক্তি**, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের অবস্থাই, কেবল শরীরটী না থাকা। সুতরাং মুক্তি দেহসত্ত্বেও যাহা, দেহত্যাগ হইলেও তাহা। তবে দেহের ভাষায় বলিতে গেলে একটীকে বলা হয় জীবন্মুক্তি, অপরটীকে বলা হয় বিদেহমুক্তি—এ কেবল শব্দগত একটু বিশেষ।

শিষ্য। আচ্ছা, জ্ঞানলাভ হইলে যদি সমুদায় পাপপুণ্য বিনষ্ট হইয়াই যায়, তবে দেহ থাকে কিরূপে? কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্যই না দেহ?

গুরু। কর্ম্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। জন্মজন্মা-

ন্তরে অনেক কর্ম্ম করা হইয়াছে। কিন্তু সকল কর্ম্মের ফলভোগ এক জন্মেই হয় না। এক এক জাতীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য এক এক প্রকারের দেহ উৎপন্ন হয়; কারণ কর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎই তাহার ফল হইবে, এমন সর্ব্বত্র হয় না। কর্ম্মের ফল দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এমন কর্ম্ম আছে, যাহার ফল হয়ত এই পৃথিবীতে ভোগ হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং সেই ফলভোগের জন্য স্বর্গাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ বিচিত্র কর্ম্মফলভোগের জন্য বিচিত্র জন্ম হয়। এমন কর্ম্মও সঞ্চিত থাকিতে পারে, যাহার ফল মনুষ্য দেহে ভোগ করা সম্ভব হয় না, তাহার জন্য হয়ত পশ্বাদি জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মের ফল দেশ কালাদির উপর নির্ভর করে—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে কতকগুলির ফলভোগের জন্যই বর্ত্তমান শরীর। এই শরীরেও আবার কতকগুলি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং কর্ম্মের তিন ভাগ, প্রথম—সঞ্চিত, দ্বিতীয়—প্রারব্ধ, যাহা ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তৃতীয়—ক্রিয়মাণ, যাহা বর্ত্তমান শরীরে নূতন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। জ্ঞান হইলে যে সমস্ত পাপপুণ্যের ক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে, তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

কিন্তু [তু] পূর্ব্বকৃত [পূর্ব্বে] যে সমস্ত পাপপুণ্য এখনও ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই [অনারব্ধকার্য্য এব] বলা হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি বর্ত্তমান দেহপাত পর্য্যন্ত জ্ঞানীকে অপেক্ষা করিতে হয়, এরূপ একটা সীমার নির্দ্দেশ করিয়াছেন [তদবধেঃ]। এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভ হইলেও প্রারব্ধ-কর্ম্মের

নাশ হয় না, ভোগ হইয়া গেলেই তাহার শেষ হয়। (তবে জানিও, এই ভোগে জ্ঞানীর বাস্তবিক কোন সুখ দুঃখই হয় না, হইতে পারে না, কারণ তখন দেহের প্রতি তাঁহার আত্মাভিমান নাই—দেহের উপর দিয়াই প্রারব্ধের ভোগ হইয়া যায়। বস্তুতঃ ভোগ দেহেরই, সে স্থূল দেহই হউক, সূক্ষ্ম দেহই হউক, কি কারণ দেহই হউক, এবং এই দেহের ভোগের জন্যই প্রারব্ধ কর্ম্মের আরম্ভ; সুতরাং ভোগ শেষ হইলেই দেহেরও নাশ, জ্ঞানীরও বিদেহমুক্তি। বাস্তবিক প্রারব্ধ ভোগকালেও জ্ঞানী মুক্ত ও সুখ দুঃখের অতীত—যেহেতু তখন তিনি জ্ঞানতঃ ত্রিবিধ-দেহের অতীত। সুতরাং ব্যাধি, যন্ত্রনায় চিৎকার, এ সব যে জ্ঞানীর দেহে হইতে পারে না, এমন নহে, তবে এসমস্ত দেহের ধর্ম্ম অন্য লোকের দুঃখের কারণ হইলেও জ্ঞানী স্বস্বরূপে নির্ব্বিকারই থাকেন।)

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞান প্রারব্ধকেও বিনষ্ট করে না কেন, আর একটু বিশদ করিয়া বলুন।

গুরু। শুন, যিনি আপনাকে পরিপূর্ণ স্বভাব, নির্ব্বিকার, ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কি সঞ্চিত, কি প্রারব্ধ সকল কর্ম্মই বিরুদ্ধ, তথাপি সঞ্চিত কর্ম্মরাশি এখনও কার্য্যশীল না হওয়ায় তন্মুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কার্য্যশীল বলিয়া কিছু কাল তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সাধারণতঃও দেখা যায় যে, একটা ক্রিয়াশীল পদার্থের যে কারণে তাহাতে ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই কারণটি সহসা রুদ্ধ করিয়া দিলেও কিছুক্ষণ তাহাতে ক্রিয়া হইতে থাকে। যেমন কুম্ভকারের চাকা, একটা দণ্ডের সাহায্যে ঐ চাকা ঘুরান হয়। সহসা দণ্ডটি তুলিয়া লইলেও কিছুক্ষণ চাকাটি ঘুরিতে থাকে।

শক্তির স্বভাবই এই যে, উহা একবার ক্রিয়াশীল হইলে শেষ পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করিয়া তবে ক্ষান্ত হয়—যদি না প্রবলতর শক্তি তাহার গতি রুদ্ধ করে। চাকার উপর এমন ভাবে ধাক্কা দেওয়া যায়, যাহাতে চাকাটি দশবার ঘুরিবে, কি বিশবার ঘুরিবে, কি পঞ্চাশ বার ঘুরিবে। এই যে ঘুরিবার সামর্থ্য, এ যেন চাকাটির সঞ্চিত শক্তি। কিন্তু যে ধাক্কাতে চাকাটি বিশবার ঘুরিতে পারে, মনে কর, সেই ধাক্কাটি দেওয়া হইয়াছে। এখন চাকাটি দশবার মাত্র ঘুরিবার পর স্থির হইল. চাকার ঘুরিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি চাকাটি আরও দশবার ঘুরিয়া তবে স্থির হইবে। তবে উহার ঘুরিবার যখন প্রয়োজন নাই, ইহা স্থির হইয়াছে, তখন পঞ্চাশবার, হাজারবার ঘুরিবার শক্তি থাকিলেও উহা আর কখনও কার্য্যকরী হইবে না। সেইরূপ সঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে যে কয়টি ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমান দেহ জন্মাইয়াছে, সেই কয়টি নিঃশেষ হইবেই—যদিও মাঝখানে স্থির হইল যে, ভোগ নিষ্প্রয়োজন (কেন না আত্মা পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাতে কোন অভাব নাই—অভাব থাকিলেই কর্ম্ম ও ভোগ)। আরও দেখ, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্থির জানিয়াছেন যে, কর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল মাত্র এই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্ম বিলীন হইয়া গেল, প্রারব্ধ নিজ শক্তিতে কার্য্যশীল হইতে থাকিলেও তিনি তাহা নিরোধের কোন চেষ্টাই করিবেন না, কারণ নিরোধ করিয়াও তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না—তাঁহার যে প্রয়োজন বলিয়া একটা জিনিষই নাই। কর্ম্ম আপন শক্তিতে যাহা খুসী করুক, তাহাতে জ্ঞানীর কিছুই আসে যায় না। সুতরাং দেখা গেল, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও বহু কালের

মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার কিছু কাল অনুবর্ত্তন করে এবং সেই জন্যই জ্ঞানীও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তারপর, জ্ঞান হইলেও যে শরীর কিছু কাল থাকে, ইহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব করেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতেও কত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উল্লেখ আছে, এবং তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও শরীর ধারণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। আপনি ১৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে সমুদায় পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। সৎকর্ম্মের ফলেই পুণ্য সঞ্চিত হয়। সেই সৎকর্ম্ম দুই প্রকার। এক অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, ইহা নিত্যই অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সমস্ত নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে বিশেষ কোন ফল হয় না, তবে না করিলে পাপ হয়, শাস্ত্রের এই আদেশ। শাস্ত্র করিতে বলিয়াছেন বলিয়াই নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আর এক প্রকারের সৎকর্ম্ম আছে, যাহা কোন একটা ফল কামনা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদিগকে কাম্য-কর্ম্ম বলে। সাধক যখন জানিতে পারিলেন যে, জ্ঞান লাভ হইলে তাহার সমুদায় পুণ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন কাম্যকর্ম্মে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। আর কাম্যকর্ম্ম না করিলেও শাস্ত্রের মর্য্যাদা হানি হয় না; কারণ শাস্ত্রই বলেন, কাম্যকর্ম্ম কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু সাধক এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া নিত্য কর্ম্মও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তিনি কেবল সেইরূপ ধ্যান ধারণাতেই নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু তাহা হইলে ত শাস্ত্র বাক্য পালন

করা হয় না এবং অনুষ্ঠান রহিত হইয়া কেবল জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইলে জ্ঞান লাভও যে সুদূর পরাহত, ইহা ত শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত (ঈশোপনিষৎ)।

গুরু। বৎস! তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমুদায় পুণ্য নষ্ট হয় সত্য। কিন্তু নিত্য অগ্নিহোত্রাদির একটু বিশেষত্ব আছে। এই সমস্ত নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন বিশেষ পুণ্যের সঞ্চার হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও এগুলি অনাবশ্যক নয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত পুণ্যেরও ক্ষয় হইবে, সুতরাং অনাবশ্যক বোধে জ্ঞানার্থী সাধক কাম্য-কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়। সাধক চান মোক্ষ, এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু সহস্র বিচার করিলেও চিত্ত শুদ্ধ না হইলে আত্মতত্ত্ব কিছুতেই উপলব্ধ হয় না। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার রাশি চিত্ত দর্পণে এমন দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে যে, এই সমস্ত সংস্কার দূরীভূত হইয়া চিত্ত দর্পণ পরিমার্জ্জিত না হইলে যথার্থ ধ্যান বা প্রকৃত বিচার কিছুতেই সম্ভব হয় না। ধ্যান করিতে বসিলে সহস্র সংস্কার মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দেয়। এরূপ মলিন চিত্তে আত্মতত্ত্ব কিরূপে প্রতিফলিত হইবে? অবশ্য বিচার করিতে করিতে কামনা বাসনা অনেকটা অপগত হইয়া যায় বটে; কিন্তু নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বিচার করিলে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি তাহার প্রতি আসক্তি কিছুতেই কমিতে চায় না। চিত্তে ঐ বাসনা এতই বদ্ধমূল থাকে যে, বিচারে উহা পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থির হইলেও কিছুতেই যেন উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না। এই সমস্ত বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার

একমাত্র উপায় নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান। মানুষ যখন কর্ম না করি থাকিতেই পারে না, কোন-না-কোন কর্ম্ম তাহাকে করিতেই হ তখন এই সমস্ত নিত্যকর্ম্মের কোন বিশেষ ফল না থাকায় নিরাকা ভাবে অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে চি ক্রমশঃই শুদ্ধ হইয়া আসে। সাধকমাত্রেই নিজ নিজ জীবনে ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হ আর বিশুদ্ধচিত্তেই আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। সুতর দেখা গেল, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং পরম্পরাক্রমে

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎ-কার্য্যায় এব, তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ।

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম [অগ্নিহোত্রাদি] জ্ঞানের ফল যে মো তাহারই জন্য [তৎকার্য্যায়ৈব] বিহিত; কারণ শ্রুতিতে সেইরূ দেখা যায় [তদ্দর্শনাৎ]। শ্রুতি বলেন, "ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ, যজ্ঞ, দ ইত্যাদি সৎকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন," (বৃঃ ৪। ২২)। সুতরাং জ্ঞানার্থী কখনও নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অবশ্য জ্ঞান লাভ হইলে যখন তিনি আপনাকে অকর্ত্তা বল জানেন, তখন তাঁহার কোনরূপ কর্ম্মই থাকে না, কিন্তু যতদিন আপন কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকে, ততদিন অগ্নিহোত্রাদি অবশ্যই অনুষ্ঠান কর উচিত।

শিষ্য। জ্ঞানীর মৃত্যুকালে "পুত্রগণ তাঁহার ধন-সম্পত্তি মিত্রগণ তাঁহার পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার পাপ প্রাপ্ত হয়"—শ্রুতির শাখাবিশেষে এই যে বাক্য আছে, ইহা কোন্ পুণ্যকে লক্ষ্য করি বলা হইয়াছে ?

গুরু। অতঃ অন্যাপি হি একেষাম্ উভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ভিন্ন যে সমস্ত সৎকর্ম্ম [অতোঽন্যাপি], তাহাই লক্ষ্য করিয়া কোন কোন শাখার [একেষাম্] ঐ উক্তি। এ বিষয়ে জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই [উভয়োঃ] এক মত। অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য কাম্য কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভের কোন সহায়তা হয় না। নিত্যকর্ম্মের কোনরূপ ফল কামনা না থাকায় অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্মের ফল কে ভোগ করে, এরূপ প্রশ্নই উঠে না। কাম্য কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি অব্যাহত বলিয়া উহার একটা ব্যবস্থা শ্রুতি এইভাবে করিতেছেন যে, জ্ঞানীর বন্ধুগণ তাঁহার পুণ্য ফলের ভাগী হয় এবং শত্রুগণ পাপ-ফলের ভাগী হয়। এরূপ হওয়া অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিকও নয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ চিত্তে সহজেই আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দুই রকমের—এক উপাসনা সহিত, অপর উপাসনা রহিত। অগ্নিহোত্র যাগের বিবিধ অঙ্গ সম্পর্কে উপাসনার বিধান আছে, আবার উপাসনা না করিয়াও অগ্নিহোত্র করা যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানার্থী কি জ্ঞানের সহকারী বলিয়া কেবল উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদিই করিবেন, কি উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রাদিও করিবেন ?

গুরু। উভয় প্রকারের অগ্নিহোত্রাদিই তাঁহার করা উচিত।

যদেব বিদ্যয়া ইতি হি ॥ ১৮ ॥

যেহেতু [হি] শ্রুতি বলেন যে [ইতি] "যাহা বিদ্যা বা উপাসনার সহিত [যদেব বিদ্যয়া] অনুষ্ঠিতহয়, তাহা অধিক বীর্য্যশালী

হয়" (ছাঃ ১. ১. ১০)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপাসনার সহিত অগ্নিহোত্রাদি করিলে শীঘ্র শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়, আর কেবল অগ্নিহোত্রাদি করিলে একটু দেরীতে হয়। উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রাদি করিলে কোনই ফল হয় না, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। বরং শ্রুতি সাধারণভাবে সমস্ত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং উভয়বিধ অগ্নিহোত্রাদিই সাধক অনুষ্ঠান করিবেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় স্থির হইল যে, জ্ঞানীর সর্ব্ববিধ সঞ্চিত পাপ-পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়। এক্ষণে যে সমস্ত কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে (প্রারব্ধ) তাহার কি হয়, সূত্রকার তাহাই বলিতেছেন—

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পাদ্যতে ॥ ১৯ ॥

যে সমস্ত পাপ ও পুণ্য আরব্ধ হইয়াছে, তাহা [ইতরে] ভোগের দ্বারা [ভোগেন] ক্ষয় করিয়া [ক্ষপয়িত্বা] জ্ঞানী ব্রহ্মসম্পন্ন হন [সম্পাদ্যতে], অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এস্থলে কেবল সূত্রটীর ব্যাখা করা গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব। জীব মৃত্যুকালে কিভাবে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। শুন। মৃত্যুকালে প্রথমতঃ

বাক্ মনসি দর্শনাৎ শব্দাৎ চ ॥১॥

বাক্‌ব্যাপার, অর্থাৎ বাক্ নামক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (বাক্য, কথা বলা) [বাক্] মনে [মনসি] লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ সেইরূপই দেখা যায় [দর্শনাৎ] এবং [চ] এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণও আছে [শব্দাৎ]। মৃত্যুকালে দেখা যায় যে, প্রথমে বাক্‌রোধ হয়, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে, সেইজন্য মুমূর্ষু ব্যক্তি আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। শ্রুতি বলেন, "মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্ মনে লয়প্রাপ্ত হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় বিলীন হয়" (ছাঃ ৬. ৮. ৬)।

শিষ্য। আচ্ছা, এস্থলে বাক্ বলিতে কি বাগিন্দ্রিয় বুঝাইতেছে, না বাক্যমাত্র, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার মাত্র?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বাক্যই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত। দেখ, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু কেবল তাহাতেই বিলীন হইতে পারে। অর্থাৎ উপাদান কারণেই কার্য্যের লয়

হয়। মন বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান নয়, কাজেই মনে বাকের লয় হওয়ার অর্থ—বাক্যের লয় হওয়া, বাগিন্দ্রিয়ের লয় হওয়া নহে। বৃত্তির (ব্যাপারের) আবির্ভাব ও লয় উপাদান ছাড়া অন্যত্রও হইতে পারে। যেমন অগ্নি কাষ্ঠে আবিভূর্ত হয়, আবার জলে লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাক্-বৃত্তি বাক্যই মনে লয় হয়। শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব সর্ব্বাণি অনু ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণেই [অতএব] অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও [সর্ব্বাণি] পর পর [অনু] মনে প্রবেশ করে। অর্থাৎ বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আপন আপন বৃত্তি (—ব্যাপার—কথন, শ্রবণ, দর্শন, গন্ধগ্রহণ, আস্বাদন, স্পর্শ) হারাইয়া মনে প্রবেশ করে।

তন্মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ ॥৩॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতির শেষ অংশ হইতে [উত্তরাৎ] জানা যায় যে, সেই মন [তন্মনঃ] আবার প্রাণে [প্রাণে] প্রবেশ করে। এস্থলেও মনের বৃত্তিই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসহ প্রাণে প্রবেশ করে—এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত। মনের স্বরূপ প্রাণে লয় হয় না। কারণ, প্রাণ মনের উপাদান নহে।

সঃ অধ্যক্ষে তৎ-উপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥

'জীবের নিকট গমন', 'তাহার অনুসরণ' ও 'তাহাতে অবস্থান'— এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে [তদুপগমাদিভ্যঃ] জানা যায় যে, সেই প্রাণ [সঃ] দেহেন্দ্রিয়াদির প্রভু জীবে [অধ্যক্ষে] প্রবেশ করে। শ্রুতি বলেন, "মৃত্যুকালে প্রাণসকল জীবের নিকট গমন

করে"। "জীব দেহত্যাগ করিবার সময় প্রাণও তাহার অনুসরণ করে" (বৃঃ ৪.৪.২)। "মুখ্য প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তাহার অনুগামী হয়" (বৃঃ ৪. ৪. ২)। "মৃত্যুকালে জীব ভাবী দেহের অনুরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হয়।" এই সমস্ত শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সকলেই নিজ নিজ বৃত্তিরহিত হইয়া জীবাত্মাতে যাইয়া মিলিত হয়।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, প্রাণ জীবাত্মায় প্রবেশ করে; কিন্তু অন্য শ্রুতি ত বলিয়াছেন যে, প্রাণ তেজে (প্রাণঃ তেজসি) মিলিত হয়। ইহার সামঞ্জস্য কি ?

গুরু। বৎস! আমি যে সমস্ত শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাণ জীবাত্মায় প্রবেশ করে। কিন্তু "প্রাণঃ তেজসি"—

ভূতেষু অতঃ শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

এই শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য করিলে [অতঃ শ্রুতেঃ] বলিতে হইবে যে, প্রাণসংযুক্ত জীব তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে [ভূতেষু] অবস্থান করে। "প্রাণঃ তেজসি," এই শ্রুতির অর্থ কেবল প্রাণ তেজে অবস্থান করে, এইরূপ করিলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু প্রথমে প্রাণ জীবে প্রবেশ করে, পরে সেই প্রাণসংযুক্ত জীব তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মে অবস্থান করে, এরূপ অর্থ কবিলে উভয় শ্রুতিরই একটা সামঞ্জস্য হয়। যে ব্যক্তি কাশী হইতে গয়ায় ও গয়া হইতে বৈদ্যনাথ যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, সে কাশী হইতে বৈদ্যনাথ যাইতেছে, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, 'প্রাণঃ তেজসি' এই শ্রুতি ও ৪ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতির সামঞ্জস্য হইতে বুঝিলাম যে, প্রাণসংযুক্ত জীব তেজে অবস্থান করে। কিন্তু আপনি শুধু তেজ না বলিয়া তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশে অবস্থান করে, এরূপ বলিলেন কেন ?

গুরু। দেখ, জীব যখন এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণে উদ্যত হয়, তখন

ন একস্মিন্ দর্শয়তঃ হি ॥ ৬ ॥

কেবলমাত্র একটি ভূতসূক্ষ্মে অর্থাৎ তেজে [একস্মিন্] অবস্থান করে না [ন], পরন্তু সমুদায় ভূতেরই সূক্ষ্মাংশে অবস্থান করে। কারণ [হি] শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন [দর্শয়তঃ]। শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই বলেন যে, জীব নূতন শরীর ধারণ কালে পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশেই অবস্থান করে, অর্থাৎ, সেই সমস্ত সূক্ষ্মাংশ আশ্রয় করিয়াই থাকে। "প্রাণঃ তেজসি" এই বাক্যে যে কেবল তেজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ—ঐ সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টিতে তেজের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক (ব্রঃ সূঃ ৩. ১. ২ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। গুরুদেব ! এই যে দেহত্যাগ প্রণালী, ইহা কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই একরূপ ?

গুরু। বৎস ! জ্ঞানীরও দুইটী শ্রেণী আছে। এক—সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, অপর—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। কেহ কেহ ব্রহ্মকে সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি অশেষ গুণের আধাররূপে উপলব্ধি করিয়া দেহত্যাগ করেন। কেহ বা ব্রহ্মকে স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন—এইভাবে সর্ব্বগুণের অতীতরূপে উপলব্ধি করেন। সগুণ উপাসক

আপনাকে পৃথক বলিয়াই জানেন। আর নির্গুণ উপাসক আপনাকেই ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন। ইহারা উভয়েই জ্ঞানী বলিয়া কথিত হন। তবে নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানীর বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানীর দেহ ত্যাগের বিষয় বলিতেছি।

কি সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী মৃত্যুকালে উভয়েরই বাক্ মনে, মন প্রাণে প্রাণ জীবাত্মায় প্রবেশ করে। তার পর অজ্ঞানী ভবিষ্যৎ দেহের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় দেহান্তর গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু জ্ঞানী দেহান্তর গ্রহণের পথে অগ্রসর হন না, তিনি সুষুম্না-নাড়ী-রূপ দ্বার দিয়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দেবযান পথে ব্রহ্মলোকের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। (এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পরে দিব)। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর এই দুইটী পথ।

সমানা চ আসৃতি-উপক্রমাৎ

এই পথ গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত [আসৃত্যুপক্রমাৎ] উভয়ের দেহত্যাগ প্রণালী একই প্রকার [সমানা]। অর্থাৎ জ্ঞানীরও অজ্ঞানীর ন্যায় বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ ভূতসূক্ষ্মাশ্রিত জীবে সম্মিলিত হইয়া থাকে। তারপর অজ্ঞানী শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া দেহ হইতে নির্গত হয় এবং দেহান্তর গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়; আর জ্ঞানী সুষুম্না-নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধগামী হইয়া দেবযান পথ অবলম্বন করে এবং ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়।

শিষ্য। কিন্তু জ্ঞানী "সুষুম্না-নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধগামী হইয়া 'অমৃতত্ব' লাভ করেন"—এই শ্রুতিবাক্যে ত জ্ঞানী 'অমর' হইয়া যান, এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানীর আর পুনর্জন্ম হয় না।

আর, 'অমৃতত্ব' অর্থ নিজের চিরসিদ্ধ নির্ব্বিকার অবস্থা—তাহা ত একস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া লাভ করিতে হয় না। সুতরাং জ্ঞানী কি জন্য সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিবেন, কি জন্যই বা পথারোহণ করিবেন ?

গুরু। দেখ, যিনি ব্রহ্মকে অশেষ গুণের আধার পুরুষবিশেষ বলিয়া অবগত হইয়াছেন এবং আপনাকে তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করেন নাই, নিশ্চয়ই তাঁহার কামনা বাসনার নিঃশেষ হয় নাই, অন্ততঃ সেই পুরুষবিশেষের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আছে। যেহেতু তিনি

অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য ॥৭॥

সমস্ত কামনা বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া [অনুপোষ্য] দেহত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না, সেইজন্য তাঁহার যে 'অমৃতত্ব' [অমৃতত্বঞ্চ] তাহা আপেক্ষিক। অবশ্য অজ্ঞানীর ন্যায় তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না সত্য, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সেখানকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং যতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছেন, ততকাল ব্রহ্মলোকেই অবস্থান করিয়া অন্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। তিনি যে বর্ত্তমান দেহত্যাগ-মুহূর্ত্তেই প্রকৃত অমরত্ব লাভ করেন, তাহা নহে। সুতরাং তাঁহার অমরত্ব আপেক্ষিক, অর্থাৎ অজ্ঞানীর মত তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, এইমাত্র। শ্রুতিও বলেন, 'তিনি উর্দ্ধগামী হন ও (পরে) অমরত্ব লাভ করেন'। আর এই গমন-ক্রিয়া কোন একটী আশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ভূতসূক্ষ্ম আশ্রয় করিয়া পথারোহণ করেন—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আপনি যে শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 'তেজ পরম দেবতায় বিলীন হয়'। পরবর্ত্তী বিচারে বুঝিলাম যে, জীব সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সহিত তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতের আশ্রয় করে (এই অবস্থাটাকে জীবের **লিঙ্গদেহ** বলা হয়) এবং পরম দেবতায় লীন হয়। আচ্ছা, এই যে পরম দেবতায় লীন হওয়া, একি তাঁহার সহিত একেবারে এক হইয়া যাওয়া? অর্থাৎ জীব কি তখন আপন ব্যক্তিত্ব (Individuality) হারাইয়া পরব্রহ্মই হইয়া যায়? না, বীজরূপে তাঁহার ব্যক্তিত্ব অব্যাহত থাকে?

গুরু। না, মরণে জীবের লিঙ্গদেহ পরমাত্মার সহিত একেবারে এক হইয়া যায় না, কিন্তু

তৎ আ-অপাতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ॥৮॥

তাহা অর্থাৎ সেই লিঙ্গদেহ [তৎ] যতদিন না যথার্থ জ্ঞান প্রভাবে মোক্ষলাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত [আপীতেঃ] অবস্থান করে, একেবারে পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় না; কারণ সম্যক্ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার চলিতে থাকে, শ্রুতির ইহাই নির্দ্দেশ [সংসারব্যপদেশাৎ]। যথার্থ আত্মজ্ঞান না হইলে যখন সংসার নিবৃত্ত হয় না, তখন মরণেও নিশ্চয় লিঙ্গদেহ বর্ত্তমান থাকে। যদি মরণেই জীব পরমাত্মার সহিত একবারে অভিন্ন হইয়া যাইত, তবে সাধন-ভজনের আর কি প্রয়োজন ছিল? তাহা হইলে যে সমস্ত শাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়! আর সংসার-বন্ধন অজ্ঞানের ফল, জ্ঞান ব্যতীত কিসে তাহার অবসান হইবে? সুতরাং গভীর নিদ্রায় যেমন জীব পরমাত্মার সহিত একেবারে

অভিন্ন হইয়া যায় না, পরন্তু বীজরূপে তাঁহাতে অবস্থান করে, সেইরূপ মরণেও আত্যন্তিক বিলয় হয় না।

শিষ্য। মৃত্যুকালে জীব যখন লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন আমরা তাহা দেখিতে পাই না কেন? আর অন্য কোন সাকার পদার্থই বা তাহার গমনের পথ রুদ্ধ করে না কেন?

গুরু। এই পর্য্যন্ত বিচার করিয়া জানা গেল যে, জীব মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়াই আপন পথে অগ্রসর হয়।

সূক্ষ্মং প্রমাণতঃ চ তথা উপলব্ধেঃ ॥৯॥

এইরূপ [তথা] জানাতে [উপলব্ধেঃ] স্থির হয় যে, ঐ লিঙ্গশরীর অতীব সূক্ষ্ম [সূক্ষ্মম্]। সূক্ষ্মতা আবার দুই ভাবে হইতে পারে—পরিমাণগত ও স্বরূপগত। পরিমাণ গত যেমন, এক সের জল অপেক্ষা আধসের জল সূক্ষ্ম, তাহা হইতে এক পোয়া সূক্ষ্ম, তাহা হইতে এক বিন্দু আরও সূক্ষ্ম, বিন্দু হইতে কণিকা আরও সূক্ষ্ম—এইভাবে পরিমাণ হিসাবে সূক্ষ্মতা বুঝা যাইতে পারে। আর স্বরূপগত, যেমন,—এক সের গঙ্গার ঘোলা জল অপেক্ষা কলের জল (পরিমাণে এক পুকুরও হউক না কেন) সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা পরিস্রুত জল আরও সূক্ষ্ম—এই ভাবে জলের জলত্ব হিসাবেও সূক্ষ্মতা বুঝা যায়। লিঙ্গ শরীরের যে সূক্ষ্মতা, তাহা পরিমাণ হিসাবেও [প্রমাণতঃ] বটে, আবার [চ] স্বরূপ হিসাবেও বটে। পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আর স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম বা অতি স্বচ্ছ বলিয়া কোন মূর্ত্ত পদার্থ তাহার গতিরোধও করিতে পারে না।

ন উপমর্দ্দেন অতঃ ॥ ১০ ॥

এইজন্যই [অতঃ] অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থূল শরীরের নাশে [উপমর্দ্দেন] ইহার নাশও হয় না [ন]।

তারপর, সজীব শরীর স্পর্শ করিলে যে একটা তাপ অনুভূত হয়,

অস্য এব চ উপপত্তেঃ এষ উষ্মা ॥ ১১ ॥

সেই তাপ [এষ উষ্মা] এই লিঙ্গ শরীরেরই [অস্য এব], কারণ তাহাই যুক্তিযুক্ত [উপপত্তেঃ]। দেখ, মৃতাবস্থায় স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাপ থাকে না। আমরা বলিয়াও থাকি যে, শরীর একেবারে হিম হইয়া গিয়াছে, অতএব প্রাণ আর নাই। শ্রুতিও বলেন, "জীবিতাবস্থায় উষ্ণ, মৃতাবস্থায় শীতল।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, শরীরের উষ্ণতা সূক্ষ্ম শরীরেরই।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, অজ্ঞানী ও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর কি অবস্থা হয়, তাহা এক্ষণে বলুন।

গুরু। বৎস! যিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বগুণের অতীতরূপে অবগত হইয়াছেন এবং আপনাকে সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ত পূর্ণকাম হইয়াছেন। তাঁহার ত কামনা বাসনার লেশ মাত্রও নাই। সুতরাং তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হওয়া এবং স্থানান্তরে যাওয়া উভয়ই নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গতও হয় না, এবং তিনি স্থানান্তরেও যান না। প্রাণ তাঁহার দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি প্রথমে অজ্ঞানী ও সগুণ

ব্রহ্মোপাসকের দেহত্যাগের বর্ণনা করিয়া পরে বলিতেছেন, "এক্ষণে নিষ্কামীর কথা বলা যাইতেছে। যিনি সর্ব্ববিধ কামনা-রহিত হইয়াছেন, যাঁহার সমস্ত কামনারই সিদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার আত্মাতেই সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার প্রাণ উদ্গত হয় না, তিনি ব্রহ্মই হন এবং ব্রহ্মেই লীন হইয়া যান" (বৃঃ ৪.৪.৬)। সুতরাং দেখা গেল যে, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উদ্গত হয় না।

শিষ্য। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনিও দেহ হইতে উদ্গত হন।

গুরু। কেন, শ্রুতি যে তাঁহার উদ্গমনের

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ?—

নিষেধ করিয়াছেন, ইহা ত এই মাত্র দেখাইলাম ?

শিষ্য।　　　　ন, শারীরাৎ ॥ ২ ॥

না, ঐ শ্রুতি শরীর হইতে প্রাণের বহির্গমন নিষেধ করেন না [ন], কিন্তু শরীরের মালিক যে জীবাত্মা, তাহা হইতেই [শারীরাৎ] প্রাণ উদ্গত হয় না, এই অর্থ প্রকাশ করেন। দেখুন, এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "**তাহার** প্রাণ উদ্গত হয় না।" অবশ্য তাহার বলিতে জীবাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু তাহার শরীর হইতে, কিংবা তাহা হইতেই, ইহা নিশ্চয় হয় না। তবে অন্য এক শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, "তাহা অর্থাৎ জীবাত্মা হইতেই প্রাণ উদ্গত হয় না।" প্রথম শ্রুতির অর্থ একটু সন্দেহযুক্ত, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ খুব পরিষ্কার। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রুতির সাহায্যে প্রথম শ্রুতির এই অর্থই নির্দ্ধারিত হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উদ্গত হয় না, কিন্তু শরীর হইতে উদ্গত হয়।

গুরু। দেখ, তুমি যে দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ খুব স্পষ্ট বলিলে, কিন্তু

স্পষ্টঃ হি একেষাম্ ॥ ১৩ ॥

কোন কোন শ্রুতির [একেষাম্] অর্থ (তাহা অপেক্ষাও) স্পষ্ট [স্পষ্টঃ], এবং সেই সমস্ত শ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, নির্গুণ জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উদ্গত হইয়া বাহিরে যায় না (বৃঃ ৩.২.১১)। তোমার উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থও তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই শ্রুতি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, দেহ হইতে প্রাণ উদ্গত হয় না। সুতরাং এই অতি স্পষ্ট শ্রুতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্রুতির তাৎপর্য্যও যে উদ্গমনের নিষেধ, তাহা নিশ্চয় করা যায়। বিশেষ দেখ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাবাপন্ন, তাহার কর্ম্মরাশি সমূলে বিনষ্ট; সুতরাং তাহার দেহ হইতে বহির্গত হওয়া কিংবা কোথাও গমন করা উভয়ই নিষ্প্রয়োজন।

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥

মহাভারতাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের দেহ হইতে উদ্গমন বা পরলোক গমন হয় না। (পরলোক গতি সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে বলিব)।

শিষ্য। আচ্ছা, পরব্রহ্মজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও ভূতসূক্ষ্ম দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় না বুঝিলাম। কিন্তু সেগুলি কি হয়?

গুরু। **তানি পরে, তথাহি আহ ॥ ১৫ ॥**

সেগুলি [তানি] পরব্রহ্মেই [পরে] বিলীন হইয়া যায়, যেহেতু [হি] শ্রুতি সেইরূপই [তথা] বলেন [আহ]। শ্রুতি বলেন, "এইরূপে

যিনি আত্মদর্শন করেন, তাঁহার ষোল কলা (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়+মন+দেহবীজ পঞ্চ ভূতসূক্ষ্ম=১৬) পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগমন করে" (প্রঃ ৬.৫)।

শিষ্য। কিন্তু অন্য শ্রুতি ত বলেন যে, এই সমস্ত কলা (অংশ, উপাদান, ingredients) নিজ নিজ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় ?

গুরু। হ্যাঁ, ঐরূপ শ্রুতি আছে সত্য, কিন্তু উহা ব্যবহারদৃষ্টিতে। জ্ঞানীর পরমার্থদৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই সমস্ত কলার লয় হয়। এই যে লয় হওয়া, ইহা কিরূপ ?—এক টুকরা লবণ জলে লয় হইয়া যাওয়ার মত ষোড়শ কলা ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়, এরূপ মনে করিও না। সাধারণ দৃষ্টিতে সেইরূপই মনে হইতে পারে। কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে এই লয় কিরূপ, যেমন একগাছি দড়িতে যখন সর্পের ভ্রম অপগত হয়, তখন যেমন সেই মিথ্যা সর্প দড়িতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে তাঁহার ষোড়শ কলা, এমন কি যাবতীয় দৃশ্য বস্তুই, ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মজ্ঞের এই যে কলা লয়, ইহা কি একেবারেই ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া, না তখনও শক্তিরূপে, বীজরূপে—ব্রহ্মেতে অপ্রকাশিতরূপে—অবস্থান করা ?

গুরু। কলাসমূহ তখন শক্তিরূপেও অবস্থান করে না, পরন্তু ব্রহ্মের সহিত

অবিভাগঃ বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

একেবারে অভিন্নই হইয়া যায় [অবিভাগঃ]; যেহেতু, শ্রুতি তাহাই বলেন [বচনাৎ]। শ্রুতি বলেন, "তখন আর তাহাদের নিজস্ব নামরূপ বলিয়া কিছু থাকে না, তাহারাও ব্রহ্ম—এইরূপই বলা

হয়” (প্রঃ ৬.৫)। অজ্ঞান হইতেই এই সব কলার কল্পনা, সেই অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় তাহাদের কোনরূপ অস্তিত্বই সম্ভব হয় না।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ হয় না, এবং অজ্ঞানী ও সগুণব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আপন আপন বাসনানুযায়ী নির্দিষ্ট পথে গমন করে। আচ্ছা, এই যে দেহ হইতে নিক্রমণ, ইহা কি শরীরের যে কোন স্থান দিয়াই হয়?

গুরু। শ্রুতি বলেন, “জীব মৃত্যুকালে হয় চক্ষু, না হয় ব্রহ্মরন্ধ্র, না হয় অন্য কোন স্থান দিয়া বাহির হইয়া যায়” (বৃঃ ৪.৪.৩), অর্থাৎ জীব যে কোন দেহছিদ্র দ্বারাই নির্গত হইতে পারে। তবে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর একটু বিশেষ আছে। তিনি যে-কোন দেহদ্বার দিয়া বহির্গত হন না। মৃত্যুকালে জীব সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ আত্মসাৎ করিয়া হৃদয়ে আগমন করে। হৃদয় হইতে বহু নাড়ী নানা দিকে প্রসৃত আছে। হৃদয়ে আগমন করিবার পর, জীব ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার একটা সুস্পষ্ট স্ফুরণ হয়, এবং তাহাতে জীবের, যার যেরূপ ভাব, তদনুরূপ একটা ভাবনাময় সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ মনুষ্য হইবার যোগ্য কর্ম্ম প্রবল হইলে তখন সে তীব্রভাবে ভাবিতে থাকে যে, সে মনুষ্য; ব্যাঘ্রাদি হইবার যোগ্য কর্ম প্রবল থাকিলে ভাবিতে থাকে যে সে ব্যাঘ্রাদি। এইরূপ তীব্র ভাবনাদ্বারা নাড়ীমুখ আলোকিত হয় এবং সেই নাড়ীপথে সে নির্গত হয়। এই নাড়ীমুখ আলোকিত হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই এক অবস্থা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হৃদয় হইতে বহু নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একশত একটি প্রধান

এবং উহার মধ্যে একটি নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে, উহার নাম **সুষুম্না নাড়ী**; অপরগুলি চক্ষু, মুখ, নাসিকা ইত্যাদি স্থানে গিয়া শেষ হইয়াছে। অজ্ঞানীরা এই সমস্ত নাড়ীপথে চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুকালে

তৎ-ওকঃ-অগ্রজ্বলনং তৎ-প্রকাশিত-দ্বারঃ
বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ তৎ-শেষ-গতি-অনুস্মৃতিযোগাৎ চ
হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

উপাসকের অর্থাৎ সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়রূপ আবাসস্থানের নাড়ীমুখ প্রজ্জ্বলিত হয় [তদোকোঽগ্রজ্জ্বলনম্, তৎ = তাঁহার, **ওকঃ** = আবাস-স্থান হৃদয়, অগ্র = নাড়ীমুখ, জ্বলন = ভাবী ফলের স্ফূরণ], পরে তাঁহার জ্ঞান প্রভাবে [বিদ্যাসামর্থ্যাৎ] সুষুম্না নাড়ীদ্বার প্রকাশিত হইয়া তিনি [তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ] সেই নাড়ীপথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যান; কারণ, জ্ঞানের অঙ্গীভূত সুষুম্না নাড়ীদ্বারাই তাঁহার গতি [তচ্ছেষগতি] হওয়া স্বাভাবিক, কেন-না, জীবনে তিনি পুনঃ পুনঃ তাহারই (সুষুম্নার) অনুশীলন করিয়াছেন [অনুস্মৃতি-যোগাৎ], এবং সেইজন্যই হৃদয়স্থ ব্রহ্মের (যাঁহাকে তিনি উপাসনা করিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছেন) অনুগ্রহ লাভ করিয়া [হার্দ্দানুগৃহীতঃ] এক শতের অধিক যে নাড়ীটি অর্থাৎ সুষুম্না, তদ্দ্বারা [শতাধিকয়া] দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

হৃদয় হইতে প্রসৃত সুষুম্না নাড়ীর অনুশীলন করা উপাসনার একটি অঙ্গ। উপাসক আমরণ তাহার অনুশীলন করাতে মৃত্যুকালে সেই পরিচিত পন্থাই অনুসরণ করেন। এবং তাঁহার জ্ঞানের

প্রভাবে সেই পথটী তিনি দেদীপ্যমান দেখিতে পান। হৃদয়প্রদেশে ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা সাধক ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারই কৃপায় সুষুম্নানাড়ী পথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

তারপর ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮.৬.১) বলা হইয়াছে যে, এই সুষুম্নানাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির একটা যোগ আছে, এবং উপাসক সুষুম্নানাড়ী-পথে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া সেই

রশ্মি-অনুসারী ॥ ১৮ ॥

সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধগামী হন।

শিষ্য। কিন্তু রাত্রিতে সূর্য্যের কিরণ থাকে না। কোন উপাসক যদি

নিশি ন ইতি চেৎ ?—

রাত্রিতে [নিশি] দেহত্যাগ করেন, তবে ত তাঁহার রশ্মি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না [ন]—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

গুরু। ন, সম্বন্ধস্য যাবৎ-দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি চ ॥১৯॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন] ; কারণ, নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্পর্ক যতকাল শরীর আছে, ততকালই থাকে [সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ-ভাবিত্বাৎ], শ্রুতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিয়াছেন [দর্শয়তি চ]। দেখ, রাত্রে যে সূর্য্যকিরণ একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, এমন বলিতে পার না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যকিরণ লক্ষ্য হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও তখন সূর্য্যকিরণ অবশ্য থাকে। গ্রীষ্মকালের রাত্রে যে গরম বোধ হয়, সে কি সূর্য্যের তাপে নয় ? রাত্রেও সূর্য্যকিরণ থাকে, তবে খুব সামান্য ও সূক্ষ্ম বলিয়া আমরা

লক্ষ্য করিতে পারি না। শ্রুতি বলেন, "সবিতৃদেব রাত্রেও কিরণ বিতরণ করেন।" স্থতরাং রাত্রে মরিলেও রশ্মি অনুসরণের বাধা হয় না। আর রাত্রে মরিলেই যদি জ্ঞানী উর্দ্ধগামী হইতে না পারেন, তবে ত জ্ঞানই বৃথা হইয়া পড়ে। কে কখন মরিবে, তাহার স্থিরতা কি ?

অতশ্চ অয়নে অপি দক্ষিণে ।। ২০ ।।

আর, যেহেতু মরণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই এবং জ্ঞানের ফলও অবশ্যম্ভাবী, সেই হেতু [অতশ্চ] দক্ষিণায়নে [অয়নেঽপি দক্ষিণে] মরিলেও উপাসকের উপাসনার ফল প্রাপ্তিতে কোন বাধা হয় না।

শিষ্য। কিন্তু ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত হইলেন, তখন দক্ষিণায়ন বলিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন না, উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হয়, দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে অধোগতি হয়।

গুরু। না, বৎস! তাহা হয় না। অবশ্য উত্তরায়ণে মরা প্রশস্ত বটে, কিন্তু জ্ঞানীর কি উত্তরায়ণ, কি দক্ষিণায়ন উভয়ই সমান। তবে ভীষ্মের উদ্দেশ্য ছিল আচার পালন ও পিতৃদত্ত বর ইচ্ছামরণ প্রদর্শন করা।

আর, দেবযান পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রুতি যে উত্তরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য "আতিবাহিকা—৪.৩.৪" সূত্রে বলিব।

শিষ্য। কিন্তু গীতায় যে যে সময়ে মৃত্যু হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতিই পুনর্জ্জন্ম না হইবার কালরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন পুনর্জ্জন্মের প্রাপক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য কি ?

শুক্ল। দেখ, গীতাতে ঐ যে দিন, শুক্লপক্ষ ইত্যাদির উল্লেখ আছে, উহা আপাততঃ কালবাচক শব্দ বলিয়াই বোধ হয়, এবং "যে কালে মরিলে আর জন্ম হয় না, তাহা বলিতেছি"—এই বলিয়াই ভগবান্ ঐ সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলি কালবাচক শব্দ নয়, পরন্তু উহাদের অভিমানী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সমস্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সমস্ত দেবতা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। সগুণ উপাসক যখনই দেহত্যাগ করেন, তখনই উহাদের সহায়তা লাভ করিয়া আপন পথে অগ্রসর হন। (ব্রঃ সূঃ ৪.৩.৪ দ্রষ্টব্য)।

তবে যদি ঐ শব্দগুলিকে একান্তই কালবাচক মনে কর, তাহা হইলে বলিতে হয় যে,

যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে, স্মার্ত্তে চ এতে ॥ ২১ ॥

ঐ সমস্ত কাল যোগিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই [যোগিনঃ প্রতি] গীতায় উক্ত হইয়াছে [স্মর্য্যতে], আর [চ] এই সমস্ত যোগিরা [এতে] স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতেই [স্মার্ত্তে] সাধনা করেন। স্মৃতি শাস্ত্রে 'অমুক কালে অমুক কার্য্য করিতে হইবে'—এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবস্থা আছে। যাহারা স্মৃতির অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে কালাকালের বিচার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যিনি শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সাধন করেন, তাঁহার কালাকালের বিচার নাই [ব্রঃ সূঃ ৪. ১.১১ দ্রষ্টব্য]।

গীতা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম। যাঁহারা ভগবৎপ্রীতির জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করেন, গীতায় তাঁহাদিগকে কর্ম্মযোগী বলা হইয়াছে; আর যাহারা ইন্দ্রিয়াদিই সমুদায় কর্ম্ম করিতেছে, 'আমি কিছুই

করি না'—এইরূপ ধারণা করিয়া আপনাকে অ-কর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাংখ্যযোগী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্মার্ত্ত যোগীরা কালাকালের বিচার বিশেষভাবে মানেন বলিয়া উহার প্রতি তাঁহাদের একটা দৃঢ় অভিনিবেশ জন্মে। তাহারই প্রভাবে মৃত্যুর পরে তাঁহাদের গতি নিয়মিত হয়। কিন্তু যাঁহারা শ্রৌত প্রণালীতে সাধনা করেন, তাঁহাদের কালাকালের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না থাকায়, কি দিবা, কি রাত্রি, কি উত্তরায়ণ, কি দক্ষিণায়ন যখনই কেন তাঁহাদের মৃত্যু হউক না, তাঁহাদের উর্দ্ধগতি হইতে কোন বাধা হয় না, এবং পুনর্জ্জন্মও তাঁহাদের অসম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, সগুণ উপাসক ও উপাসনারহিত অজ্ঞানী কর্ম্মী উভয়েই শরীর হইতে বহির্গত হন। তারপর সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানী এক পথে (দেবযান পথে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু বিভিন্ন শ্রুতিতে দেবযান পথের যেরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, দেবযান পথ একটী নয়, অনেক; এবং এক এক জন এক এক পথে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। কোন শ্রুতি বলেন, "তিনি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধগামী হন" (ছাঃ ৮.৬.৫)। কোন শ্রুতি বলেন, "তাঁহারা প্রথমে অর্চ্চি (তেজ) সম্পন্ন হইয়া পরে দিবসে গমন করেন" (কৌঃ ১.৩)। এইরূপ বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন পথের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সমস্ত কি বাস্তবিকই ভিন্ন ভিন্ন পথ, না একই পথের বিভিন্ন বিভাগ (sections)?

গুরু। না, শ্রুতিতে সগুণ উপাসকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু

অর্চ্চিঃ-আদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

অর্চ্চিঃ (তেজ) হইতে আরম্ভ করিয়া [অর্চ্চিরাদিনা] ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একটীমাত্র পথই সমুদায় উপাসকের জন্য নির্দ্দিষ্ট, যেহেতু সেই পথটাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ [তৎপ্রথিতেঃ]। দেখ, যিনি যে ভাবেই উপাসনা করুন, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। আর,

ব্রহ্মলোক গমনের পথে যে সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ আছে, বিভিন্ন শ্রুতিতে সেই সমস্ত প্রদেশেরই দুটী একটীর উল্লেখ করিয়া উপাসকের গতি বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রুতিতে যে সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ আছে, তাহার সবগুলিই একটীমাত্র দেবযান পথের এক একটী অংশ। ঐ সমস্ত বিভিন্ন অংশ একত্রিত হইয়া দেবযান পথটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন শ্রুতি বা সমস্তগুলি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন শ্রুতি বা দুটী একটী। সেইজন্য মনে করিতে পার না যে, বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন পথের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (যেমন, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বর্ণনায় কেহ ঐ রাস্তার পাঁচটী গ্রামের উল্লেখ করিলেন, অন্য একজন অপর পাঁচটী গ্রামের)। মোটের উপর সমস্ত শ্রাত অনুসন্ধান করিলে উপাসকদের জন্য একটীমাত্র প্রসিদ্ধ পথেরই সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেবযান ও পিতৃযান ব্যতীত আর যে একটী তৃতীয় পথ আছে, তাহা অতীব কষ্টদায়ক এবং দুষ্কর্ম্মকারীরাই সেই পথে গমন করে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সগুণ উপাসকদের জন্য দেবযান ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই। সেই পথের প্রথম বিভাগ অর্চ্চিঃ বা তেজ।

শিষ্য। গুরুদেব! কৃপা করিয়া এই দেবযান পথের কোন্ বিভাগের পর কোন্ বিভাগ, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। শুন। প্রথমতঃ অর্চ্চি, তেজ বা অগ্নি। কৌষীতকী শ্রুতি বলেন, "উপাসক দেবযান পথে অগ্নিলোকে গমন করেন, এবং তিনি বায়ুলোকে, বরুণ লোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতি লোকে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করেন" (কৌঃ ১.৬)। এই শ্রুতিতে মাত্র কয়েকটী বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহাদের অন্তরালে অন্য কোন বিভাগ আছে, কি নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে না! কিন্তু

অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে যে, "তাঁহারা অর্চ্চিতে গমন করেন, অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যলোকে গমন করেন" (ছাঃ ৫.১০.১২)। সুতরাং দেখা গেল, অর্চ্চির পরে এবং বায়ুর পূর্ব্বে আরও কতকগুলি বিভাগ আছে। আর কৌষীতকী শ্রুতিতে উল্লিখিত

বায়ুম্ অব্দাৎ অবিশেষ বিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

বায়ুলোক [বায়ুম্] সংবৎসরের পরে [অব্দাৎ] এবং আদিত্য লোকের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হইবে ; কারণ, এক শ্রুতিতে সাধারণভাবে বায়ুলোকে গমনের উল্লেখ আছে, এবং অন্য শ্রুতিতে আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুলোক, এইরূপ বিশেষ উল্লেখ আছে [অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্]। সুতরাং এই সমস্ত শ্রুতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে দেবযান পথটী এইরূপ :—অর্চ্চিঃ—দিবস—শুক্লপক্ষ—উত্তরায়ণের ছয় মাস—সংবৎসর—বায়ু—আদিত্য। আবার বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই যে, সংবৎসরের উল্লেখ নাই, কিন্তু 'মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর আদিত্য' এইরূপ বর্ণনা আছে। সুতরাং এই শ্রুতির সহিত ঐক্য করিয়া পথটী দাঁড়াইল এই :—অর্চ্চিঃ—দিবস—শুক্লপক্ষ—উত্তরায়ণের ছয় মাস—সংবৎসর—দেবলোক—বায়ুলোক—আদিত্য। ছান্দোগ্যে আবার বর্ণনা আছে, "আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ" (ছাঃ ৪.১৫.৫)। এক্ষণে কৌষীতকীর যে বরুণ লোক,

তড়িতঃ অধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

সেই বরুণলোক [বরুণঃ] বিদ্যুতের উপরে [তড়িতোঽধি]

নির্দ্দিষ্ট করা উচিত, কারণ বিদ্যুতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ [সম্বন্ধাৎ]। বরুণ জলের দেবতা, বিদ্যুৎ আবার জলপূর্ণ মেঘে দৃষ্ট হয়, এবং বিদ্যুৎস্ফুরণের পরে জলবর্ষণ হয়। এইরূপ সাধারণ সম্বন্ধ দেখিয়া স্থির হয় যে, বিদ্যুতের পরে বরুণ। সুতরাং দেবযান পথটী হইল এইরূপ :—

অর্চ্চিঃ—দিবস—শুক্লপক্ষ—উত্তরায়ণ—সংবৎসর—দেবলোক—বায়ুলোক—আদিত্য—চন্দ্র—বিদ্যুৎ—বরুণ—ইন্দ্র—প্রজাপতি—ব্রহ্মলোক।

শিষ্য। গুরুদেব এই যে দেবযান পথের অর্চ্চিঃ প্রভৃতি, এগুলি বাস্তবিক কি ? উহারা কি ঐ পথের এক একটী চিহ্ন ?—যেমন, এক ব্যক্তি কোন এক গ্রামে যাইবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, অমুক গ্রামে যাইব কোন্ পথে' ? সে উত্তর করিল, 'এখান হইতে বরাবর উত্তরদিকে কতকদূর গেলে দেখিবেন একটী পাহাড়, তারপর কিছু দূরে দেখিবেন একটী প্রকাণ্ড বটগাছ, তারপর ছোট একটী নদী, তারপরেই সেই গ্রাম'। এস্থলে পাহাড়, গাছ ও নদী পথের এক একটি চিহ্ন। অর্চ্চিরাদিও কি সেইরূপ চিহ্ন ? কিংবা ঐগুলি দেবযান পথের এক একটী ভোগভূমি, অর্থাৎ ঐ সব স্থানে কি পথিক কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করেন ?

গুরু। বৎস ! অর্চ্চি প্রভৃতি চিহ্নও নয়, কিংবা ভোগভূমিও নয়, উহারা ব্রহ্মলোক যাত্রীর

আতিবাহিকাঃ তৎ-লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

বাহক বা পরিচালক (guide) দেবতা বিশেষ [আতিবাহিকাঃ];

কারণ, শ্রুতিতে ইহাদিগকে এইভাবে গ্রহণ করিবারই সঙ্কেত পাওয়া যায় [তল্লিঙ্গাৎ]। শ্রুতি দেবযান পথের বর্ণনার শেষভাগে বলিয়াছেন, "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে **অমানব পুরুষ** যাত্রীদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়" (ছাঃ ৪.১৫.৫)। এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যুৎপ্রভৃতি পথিকের বাহক মাত্র, এবং এই সঙ্কেত অনুসারে অর্চ্চিঃ প্রভৃতিকেও বাহকরূপে ধরা যায়। ইহাদিগকে বাহকরূপে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গতও বটে। দেখ, যাহারা দেবযান পথে গমন করেন, দেহত্যাগের পরে তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হইয়া মনে লয়প্রাপ্ত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং তাঁহারা নিজেরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারেন না। তারপর আবার অর্চ্চিঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ ইত্যাদিও অচেতন, ইহারাও স্বয়ং বহন করিতে অসমর্থ। অতএব কোন চেতনের সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মলোকে যাত্রীর গমনই সম্ভব হয় না;

উভয়-ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

যাত্রী এবং অর্চ্চিরাদি উভয়েই মোহগ্রস্ত বলিয়া, অর্থাৎ যাত্রী মূর্চ্ছিতের ন্যায় এবং অর্চ্চিরাদি অচেতন বলিয়া [উভয়-ব্যামোহাৎ] চেতনের সাহায্য না হইলে ঊর্দ্ধগতি হইতে পারে না। সুতরাং বাহক অবশ্যই একজন আছে, ইহা যখন সিদ্ধ হইল [তৎসিদ্ধেঃ], তখন পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেত অনুসারে অর্চ্চিরাদিকেও বাহক বলিলে কোনই দোষ হয় না। আর, অর্চ্চিঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ—এইসব অস্থির, সকল সময় থাকে না। যিনি দক্ষিণায়নের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে দেহত্যাগ করিলেন, তিনি ত এই সকল আশ্রয় করিতে পারেন না, কাজেই ইহাদিগকে

পথের চিহ্ন বলা যায় না। কিন্তু ইহাদিগকে যদি অভিমানী দেবতারূপে গ্রহণ করা যায়, তবে ইহারা কি দিবা কি রাত্রি, কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন, কি শুক্লপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ, সকল সময়ই বিদ্যমান থাকেন বলিয়া ইহাদের সাহায্যে সাধকের উর্দ্ধগতি যে কোন সময়েই হইতে পারে। অর্চ্চিরাদিকে ভোগভূমিও বলা যায় না, কারণ পথিকের ইন্দ্রিয়গুলি তখন নিষ্ক্রিয়, ভোগ করিবে কে? সুতরাং অর্চ্চিরাদিকে দেবতা বিশেষ রূপে স্বীকার করাই সঙ্গত।

শিষ্য। গুরুদেব! অর্চ্চিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত যে কয়টী বিভাগ আছে, তাহাদিগকে না হয় আতিবাহিক দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু বিদ্যুতের পরে বরুণ, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই তিনটীকে আতিবাহিক দেবতা বলিবার কোন সঙ্কেত ত শ্রুতিতে নাই। বরং শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বিদ্যুতের পরে একটীমাত্র অমানব পুরুষই ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লইয়া যায়।

গুরু। হ্যাঁ, তাহাই বটে,

বৈদ্যুতেন এব ততঃ তৎশ্রুতেঃ ॥৬॥

বিদ্যুতের পরে [ততঃ] বিদ্যুতে সমাগত অমানব পুরুষ কর্ত্তৃকই [বৈদ্যুতেনৈব] উপাসক ব্রহ্মলোকে নীত হন, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলিয়াছেন [তচ্ছ্রুতেঃ]।

শিষ্য। তবে বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি ইঁহারা কি করেন?

গুরু। ইঁহারা উপাসকের গমনে কোন বাধা জন্মান না এবং কোন-না-কোন রূপে তাঁহার সাহায্য করেন, প্রধানভাবে পূর্ব্বোক্ত অমানব পুরুষই তাঁহাকে বহন করেন।

শিষ্য। গুরুদেব! এই যে দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি

হয়, সে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার একটী প্রশ্ন আছে। ব্রহ্মকে দুইভাবে দেখা যাইতে পারে। একভাবে তিনি গুণাতীত, নিষ্ক্রিয়, চিরশুদ্ধ, সর্ব্ববিধভেদরহিত, অখণ্ড-চিন্মাত্রস্বরূপ—এইভাবেই তিনি মুখ্য পর-ব্রহ্ম, এবং এই পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিও নাই, বন্ধও নাই, মুক্তিও নাই, একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন। আবার সৃষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্রহ্ম সগুণ, জগতের স্রষ্টা। গুণের সহযোগে যখন ব্রহ্মকে দেখা হয়, তখন তাঁহাকে জন্মবান বা **কার্য্যব্রহ্ম** বলা হয়। তাঁহারই অপর নাম হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, স্রষ্টা ইত্যাদি। তখন তাঁহাকে বলা হয় সত্যকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ইত্যাদি।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দেবযান পথের পথিক যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, সেই ব্রহ্ম কি মুখ্য পর ব্রহ্ম, না কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ?

সূত্র। কার্য্যং বাদরিঃ অস্য গতি-উপপত্তেঃ ॥৭॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন, এই ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্ম [কার্য্যম্] অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম, যেহেতু ইহাতেই [অস্য] গতি হওয়া যুক্তিসঙ্গত [গত্যুপপত্তেঃ]; পরব্রহ্মে নহে। গমন বা প্রাপ্তি দুইটী বস্তুসাপেক্ষ— এক, যিনি পান অপর, যাহা পাওয়া হয়। সুতরাং যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিদ্যমান এবং তিনি সর্ব্বদা প্রাপ্তই আছেন, তাঁহার আর প্রাপ্তি কি হইবে ? সুতরাং যখনই কোন এক বিশেষ স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, সেই ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ,— সর্ব্বগত নহেন।

তারপর এই ব্রহ্মকে যে ভাবে

বিশেষিতত্বাৎ চ ॥ ৮ ॥

বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় যে, ইনি কার্য্য-ব্রহ্মই। এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে; কার্য্যব্রহ্মেই তাহার বিবিধ অবস্থা অনুসারে বহুবচন প্রযুক্ত হইতে পারে। পর ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, তাঁহাকে কোনরূপেই বহু বলা যায় না (ব্রঃ সূঃ ৩.২.১১ দ্রষ্টব্য)। "ব্রহ্মলোক"—এই লোকশব্দও মুখ্যভাবে বিশেষ একটী ভোগের স্থান অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত বিশিষ্ট কারণে ঐ ব্রহ্মকে কার্য্যব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শিষ্য। তবে কার্য্য-ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা হয় কেন?

গুরু। **সামীপ্যাৎ তু তৎ-ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥**

কার্য্যব্রহ্ম পরব্রহ্মের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া [সামীপ্যাৎ] তাঁহার ব্রহ্মনাম দেওয়া হইয়াছে [তদ্ব্যপদেশঃ]। যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে গঙ্গাবাসী বলা হয়, সেইরূপ। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পরব্রহ্মই যখন মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিস্বরূপ ইত্যাদি বিশুদ্ধ উপাধিসহযোগে উপাসিত হন, তখন তাঁহাকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। উপাসক যদি কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, তবে তিনি আর জন্মগ্রহণ করিবার জন্য সংসারে ফিরিয়া আসেন না, এ কথা সঙ্গত হয় কি প্রকারে? একমাত্র পরব্রহ্ম ছাড়া সবই ত ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তনশীল।

গুরু। উপাসক কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেও ফিরিয়া আসেন না, একথা সঙ্গতই বটে। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা যতদিন ব্রহ্মা অবস্থান করেন, অর্থাৎ যতদিন না সেই ব্রহ্মলোকের প্রলয় হয়, ততদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং

কার্য্য-অত্যয়ে তৎ-অধ্যক্ষেণ সহ অতঃ পরম্ অভিধানাৎ ॥১০॥

সেই কার্য্য ব্রহ্মলোকের প্রলয় হইলে [কার্য্যাত্যয়ে] সেই ব্রহ্মলোকের অধীশ্বর ব্রহ্মার সহিত [তদধ্যক্ষেণ সহ] এই ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান [অতঃ পরম্] ; যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বলেন [অভিধানাৎ]। ইহারই নাম **ক্রমমুক্তি**। একবার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইলে আর সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতির উক্তিই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ ; তারপর শরীর ধারণ যোগ্য বাসনার নিবৃত্তি হওয়ায় তাঁহাদের পুনর্জন্ম না হওয়াই স্বাভাবিক।

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ।

স্মৃতিও এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন।

তবে

পরং জৈমিনিঃ মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন, উপাসকের গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্মই [পরম্] ; কারণ, ব্রহ্ম বলিতে মুখ্য বা প্রধানভাবে পর ব্রহ্মকেই বুঝায় [মুখ্যত্বাৎ]। পরব্রহ্ম মুখ্য, আর অপর বা কার্য্য ব্রহ্ম গৌণ। শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থের মধ্যে সন্দেহ হইলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন।

দর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রুতিতেও দেখা যায় যে, দেবযান পথে গমন করিয়া 'অমরত্ব' লাভ হয়। সেই অমরত্ব একমাত্র পরব্রহ্মেই সম্ভব, কেন-না, কার্য্য

ব্রহ্ম অপেক্ষাকৃত বহুকাল স্থায়ী হইলেও পরিণামে তাঁহারও বিনাশ হয়, সুতরাং কার্য্যব্রহ্মে অমরত্ব অসম্ভব।

তারপর, শ্রুতি পরব্রহ্মের উপদেশ-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, উপাসক মরণকালে 'আমি প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম'। এইরূপ একটা সঙ্কল্প করেন। এই যে

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্তি-অভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সঙ্কল্প [প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ], তাহা কার্য্য-ব্রহ্ম বিষয়ে [কার্য্যে] সঙ্গত হয় না [ন]; কারণ, যে-স্থলে ঐ প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে কার্য্য ব্রহ্মের কোন আলোচনা নাই, পরন্তু পরব্রহ্মের আলোচনাই ঐ স্থলে করা হইয়াছে।

এই সমস্ত কারণে আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্মই, কার্য্যব্রহ্ম নহেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আচার্য্য বাদরির মতই সমীচীন। জৈমিনি ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থের উপর নির্ভর করিয়াই নিজ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মে যে কিরূপে গতি সঙ্গত হইতে পারে, তিনি তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। মুখ্যার্থকে বরং গৌণার্থে স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু গতির অযৌক্তিকতা কিছুতেই পরিহার করা যায় না। "তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর, সর্ব্বাত্মক।" "তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য।" "তিনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে সদা বিরাজমান"—ইত্যাদি ক্রমে যে পরব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার আবার প্রাপ্তি কি? তিনি ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রাপ্তই আছেন। যাওয়া বা পাওয়া ভেদ-

সাপেক্ষ। অন্ততঃ একজন যাইবেন বা পাইবেন, অপর একজন প্রাপ্য হইবেন, এরূপ না হইলে গতি বা প্রাপ্তির কোন অর্থই হয় না। হ্যাঁ, তবে হইতে পারে, যেমন মনে কর, কলমটা আমার কাণেই রহিয়াছে, অথচ আমি কলম খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছি। তখন কেহ হয় ত বলিল, 'ওকি মহাশয়! কলম যে আপনার কাণেই রহিয়াছে।' তখন আমি প্রাপ্ত কলমটাই পাইলাম বটে, কিন্তু এই পাওয়া আর ব্রহ্ম লোক পাওয়া এক জাতীয় নহে। ভাবিয়া দেখ, কলম পাওয়ায় একটা ভ্রমের অপনোদন হয় মাত্র, সুতরাং এ পাওয়াটা একটা কথার কথা মাত্র। পরব্রহ্মপ্রাপ্তিও সেইরূপই। তিনি সর্বদা প্রাপ্ত হইয়াই আছেন, কেবল অজ্ঞান প্রভাবে বুঝিতেছি না মাত্র, অজ্ঞান দূর হইলে তিনি আপনিই প্রকাশিত হন। সুতরাং পরব্রহ্ম প্রাপ্তি একটা নূতন বস্তু পাওয়া নয়। কিন্তু ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তির যেরূপ বর্ণনা পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই পাওয়াটা কোন ভ্রমের নিবৃত্তি নয়, সত্য সত্যই কিছু পাওয়া। এরূপ পাওয়া পরব্রহ্মে সম্ভবই হয় না। কারণ তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদই কল্পনা করা যায় না, অথচ ভেদ না থাকিলে মুখ্যভাবে পাওয়াও সম্ভব হয় না। কি অংশ হিসাবে, কি অবস্থা হিসাবে, কি কাল হিসাবে কোন ভাবেই পরব্রহ্মে ভেদ স্বীকার করা যায় না (ব্র: সূ: ৩.২.১১ দ্রষ্টব্য)। তিনি অখণ্ড, পরিপূর্ণ স্বভাব, আত্মা, সুতরাং তাঁহাতে গতি বা তাঁহার প্রাপ্তি—এ কথার কোন অর্থই হয় না।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতি ত সেই পরব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের শক্তির সমাবেশ আছে, না হইলে একমাত্র পরব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি

ও লয়ের কারণ হইতে পারেন না। অতএব তাহাতে কোন প্রকারেরই বিশেষ বা ভেদ নাই, এরূপ বলা ত সঙ্গত হয় না।

গুরু। বৎস! শ্রুতি উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন সত্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ঐ বিবরণ দেওয়ায় শ্রুতির কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? শ্রুতি কি সৃষ্ট্যাদির বিবরণ দেওয়ার জন্যই ঐ সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে? একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সৃষ্ট্যাদির বর্ণনা করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সৃষ্টি প্রভৃতির যেটি আদি কারণ, সেইটি বুঝাইবার জন্যই উহাদের অবতারণা। শ্রুতি আবার মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কারণ বস্তুই বাস্তবিক সত্য, কার্য্য মিথ্যা। অর্থাৎ বিচারে শ্রুতির এই অভিপ্রায়ই বুঝা যায় যে, একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পদার্থই সত্য, অপর সমুদায়ই মিথ্যা।

শ্রুতিতে দুই রকমের বাক্য আছে। এক, সৃষ্টি প্রভৃতির বর্ণনা বিষয়ক; অপর, সৃষ্ট্যাদি বিশেষের নিষেধ বিষয়ক। এই দুই জাতীয় বাক্যের মধ্যে সৃষ্ট্যাদির বর্ণনা বিষয়ক বাক্যগুলি নির্ব্বিশেষ, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত হইয়াছে, উহাদের স্বতন্ত্র কোন সার্থকতা নাই। দেখ, সৃষ্ট্যাদি জানিলেও জ্ঞানপিপাসুর তৃপ্তি হয় না; কিন্তু যে সমস্ত শ্রুতি সর্ব্ববিধ ভেদের অসত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া একমাত্র অদ্বয় নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন, সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ অবগত হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিলে, অর্থাৎ 'আমিই পূর্ণ ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যায়, একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে, জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ

প্রতিপাদক শ্রুতিই প্রধান এবং সবিশেষ বর্ণনাত্মক শ্রুতি তাহারই পোষক ও অপ্রধান, গৌণ। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একমাত্র সৎই জগতের মূল, তাহাই জানা উচিত। "যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, যাহাতে অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লীন হইতেছে, তাহাই জানিতে চেষ্টা কর, তাহা ব্রহ্ম।" এই প্রকার শ্রুতির উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বিষয়ক শ্রুতির কোন স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই, কেবল অদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই উহাদের প্রয়োজনীয়তা। এই জাতীয় শ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে, পরব্রহ্মে সত্যসত্যই বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ আছে।

সুতরাং পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাহাতে কোন প্রকারেই মুখ্য গতি বা প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ গতি হইতে হইলেই জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে। জীব ব্রহ্মের অংশ, এই হিসাবেও যদি পরস্পরের ভেদ স্বীকার কর, তথাপি গতির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। কারণ, অংশ সর্ব্বদাই সমগ্রকে প্রাপ্ত হইয়াই অবস্থান করে। জীবনামক ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে বলিলে ব্রহ্মকে সসীমও বলিতে হয়। তারপর ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা দুঃসাহস মাত্র। এরূপ কল্পনা শ্রুতি যুক্তি উভয়বিরুদ্ধ। সাবয়ব পদার্থ মাত্রই ধ্বংসশীল। আবার, জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ (ঘট যেমন মৃত্তিকার বিকার, সেইরূপ)—এই হিসাবে উভয়ের ভেদ স্বীকার করিলেও জীবের নিকট ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট কোনকালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। তারপর, ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জীব হন—একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। জীব ব্রহ্ম হইতে একেবারে ভিন্ন একটা কিছু, এরূপ কল্পনা করিলেও প্রশ্ন হইতে পারে

যে, জীবের পরিমাণ কতটুকু ? সে কি অণুপরিমাণ, না মধ্যমপরিমাণ, না মহৎপরিমাণ ? জীব যে অণু বা মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। মহতের (সর্ব্বব্যাপীর) কোন গতিই সম্ভব হয় না। সুতরাং পরব্রহ্মে মুখ্যভাবে গতি অসম্ভব। তবে জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে, অজ্ঞানবশতঃ এই সত্যটী বুঝা যায় না। অজ্ঞান দূর হইলে জীবের আপনার স্বরূপ ব্রহ্মভাব আপনিই প্রকট হয়, এবং ইহারই নাম **পরব্রহ্মপ্রাপ্তি**, ইহা ছাড়া প্রাপ্তির আর কোন সঙ্গত অর্থই কল্পনা করা যায় না। কাজেই দেখা গেল, একমাত্র ব্রহ্মাত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞানেই পরামুক্তি বা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি। আত্মাতিরিক্তরূপে ব্রহ্মকে জানিলে, তাহা পরামুক্তি নয়। সুতরাং সগুণোপাসক কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, পরব্রহ্ম নয়, কারণ তিনি আপন উপাস্যকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। গুরুদেব ! জীব চিরকাল ব্রহ্মই আছে, কিন্তু অজ্ঞান-প্রভাবে সেই ব্রহ্মাত্মভাব আবৃত রহিয়াছে মাত্র, এবং অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশ হইলেই মোক্ষ। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীতও ত মোক্ষ হইতে পারে ?

গুরু। কিরূপে ?

শিষ্য। জীবের কর্ম্মফলেই ত দেহ উৎপন্ন হয়। আর দেহধারণই বন্ধন। এক্ষণে কেহ যদি এরূপ সঙ্কল্প করেন যে, যাহাতে পাপ উৎপন্ন হইতে না পারে সেইজন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পাদন করিব, যাহাতে স্বর্গ নরক না হইতে পারে, সেইজন্য কাম্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব এবং ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ করিব, তাহা হইলে এই দেহ-নাশের পর আর দেহ হইবার কারণ না থাকায় দেহান্তরই হইবে না।

দেহান্তরের কারণ শুভাশুভ কর্ম বা পাপপুণ্য তাহা ত তাহার নাই-ই। সুতরাং মুক্তি আত্মজ্ঞান ব্যতীতও হইতে পারে।

গুরু। বৎস! এরূপভাবে মুক্তি হওয়া অসম্ভব। কোন শাস্ত্রই বলেন না যে, ঐ ভাবে মুক্তি হয়। একমাত্র জ্ঞানেই মুক্তি, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। দেহপ্রাপ্তি কর্ম্মের ফলেই হয়, একথা সত্য। কিন্তু তুমি যে প্রণালীর উল্লেখ করিলে, সেই প্রণালীতে সমুদায় কর্ম্মের ক্ষয় হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে কত যে জন্ম অতীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত জন্মের কৃত কত কর্ম্মের ফল যে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ একজন্মেই সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব। এমন সব কর্ম্ম হয়ত সঞ্চিত আছে যাহা একদেহে ভোগ হইতে পারে না। পূর্ব্বদেহের পতনকালে যে কর্ম্মসমষ্টি প্রবল হইয়া ফলোন্মুখ হইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে বর্ত্তমান জন্ম হইয়াছে। আরও যে কত কর্ম্ম কর্ম্মের ভাণ্ডারে নীরবে ফলপ্রদানের জন্য স্থান, কাল, ও নিমিত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা কে বলিবে? এই দেহে সেই সমস্ত কর্ম্মের শেষ হইবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং আর দেহধারণ করিতে হইবে না, এমন ভাবে জীবন যাপন করিব, ইহা দুরাশা মাত্র। একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই কর্ম্মের আমূল বিনাশ অসম্ভব। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সঞ্চিত পাপের ক্ষয় করে, ইহা মানিলেও সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয় হইতে পারে না, কারণ, পুণ্যের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী কর্ম্ম হইলে, না হয় একটি অন্যটির বিনাশ করিতে পারে, একথা স্বীকার করা যায়। কিন্তু দুইটি পুণ্যকর্ম্ম পরস্পরের বিনাশের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সঞ্চিত পুণ্যকর্ম্মের ক্ষয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা হয় না, ফলে পুনর্জন্মের কারণ বর্ত্তমানই থাকিয়া যায়।

তারপর, তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হইলে কোন জীব যে সম্পূর্ণরূপে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পারে, এমন ত মনে হয় না। অতি সাবধানী লোকেরও অজ্ঞাতসারে যে কতশত সদসৎ কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে না, তাহা কে বলিবে? ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করাই মুক্তি। সেই অবস্থা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়। বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপই হইল যে, সে কর্ত্তাও নয়, ভোক্তা ও নয়, অর্থাৎ সে কোন কর্ম্ম করেও না, কর্ম্মফলও ভোগ করে না। এই সত্যটী অজ্ঞানে আবৃত থাকে। অজ্ঞান অপসৃত হইলে জীব বুঝিতে পারে যে, সে বাস্তবিক অ-কর্ত্তা ও অ-ভোক্তা, সুতরাং সমুদায় কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে যে, সে কোন কালে কোন কর্ম্ম করে নাই, করিতেছে না, করিবেও না। তাহা ছাড়া আত্মা যদি সত্য সত্যই কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, তবে কোন কালে তাহার কর্ম্ম ও ভোগ হইতে অব্যাহতি নাই। যাহার যেটী স্বভাব, সেটী ছাড়িয়া সে অবস্থান করিতেই পারে না। অগ্নি কখনও আপনার-স্বভাব উষ্ণতা ত্যাগ করে কি? স্বভাব ত্যাগ করিলে বস্তুর অস্তিত্বই লোপ পায়।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলি যে, আত্মা স্বরূপতঃ কর্ত্তা ও ভোক্তাই বটে, (অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম করিবার ও ভোগ করিবার শক্তি চিরকালই আছে), তবে কোন কর্ম্ম না করিয়া এবং কোন কিছু ভোগ না করিয়া যদি অবস্থান করে, তাহা হইলেই ত তাহার মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে?

গুরু। বৎস! শক্তি থাকিলে সাময়িক তাহার ক্রিয়ার প্রকাশ স্থগিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উপযুক্ত স্থান, কাল ও নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সে শক্তি যে ক্রিয়াশীল হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং অবসর পাইলে ক্রিয়াশীল হওয়াই শক্তির

স্বভাব। সুতরাং কর্ম্ম না করিলেই মুক্তি হইবে, এ অতি ভ্রান্ত ধারণা। বন্ধন যদি সত্য হয়, তবে মুক্তি বলিয়া কিছু হইতেই পারে না। বন্ধন মিথ্যা হইলেই মুক্তি কথার সার্থকতা থাকে। আমি ব্রহ্ম নই, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার অপগম ছাড়া মুক্তির কোন অর্থ নাই।

শিষ্য। জীব যদি পরব্রহ্মই হয়, তবে ত ব্যবহারিক জগতই নাই বলিতে হয়, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহা কিছু করি, সকলই করি না বলিতে হয়। অথচ সবই করিতেছি। এমন অবস্থায় করি না বলি কিরূপে? ব্যবহার সবই হইতেছে দেখিতেছি, অথচ হয় না বলি কিরূপে?

গুরু। বৎস! অদ্বৈততত্ত্বের এইখানটাই লোকে সব চেয়ে ভুল বোঝে। ব্যবহারিক অবস্থা আর সর্ব্বব্যবহারের অতীত পারমার্থিক অবস্থা—এই দুইটি অবস্থা এক করিয়াই লোকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হয়। তুমি জল পান করিতেছ, তোমার পিপাসার শান্তি হইতেছে, অথচ জল পান করিতেছ না, পিপাসার শান্তি হইতেছে না, এরূপ কথা বাতুল ভিন্ন কে বলিতে পারে? তুমি যতক্ষণ নিম্নতলে বসিয়া আছ, ততক্ষণ যদি বল আমি নিম্নতলে নাই, তবে তোমার উক্তি প্রলাপ ছাড়া আর কি বলিব? যতক্ষণ তুমি মনে কর যে, তুমিই করিতেছ, তুমিই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ, ততক্ষণ 'তুমিই ব্রহ্ম', একথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। যখন তুমি বুঝিবে যে 'তুমিই ব্রহ্ম', তখনই তোমার বলিবার অধিকার হইবে যে, জগৎ নাই। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি তুমি বল যে জগৎ নাই, তবে তুমি মিথ্যাই বলিবে। যতক্ষণ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ব্যবহারিক জগৎ নাই বলিতে পার না, ততক্ষণ উহাই তোমার নিকট একমাত্র সত্য। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ, ততক্ষণ স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা বলিবার তোমার অধিকার নাই,

ততক্ষণ জাগ্রত অবস্থার পদার্থসমূহ তোমার নিকট যতটা সত্য, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও ততটাই সত্য। তবে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে জাগরিত হইয়া বলিতে পার যে, স্বপ্নে যাহা কিছু দেখিয়াছ, সবই মিথ্যা। সেইরূপ অজ্ঞানের অবস্থায় এই দৃশ্য জগৎ নিশ্চয়ই সত্য। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলেই কেবল এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়, তৎপূর্ব্বে নয়।

যাহা হউক, এখন বুঝিলে যে, পরব্রহ্মে মুখ্য গতি কিছুতেই সম্ভব হয় না। অপর বা সগুণ ব্রহ্মেই গতি হইতে পারে। শ্রুতিতেও সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গেই গতির বর্ণনা আছে। সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে যে স্থলে ব্রহ্মের উপাসনার বিধান আছে, সেই স্থলেই তাদৃশ উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোকে গতি হয়—শ্রুতি এইরূপই বলেন। নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ যে স্থলে আছে, সেস্থলে কোনরূপ গতি হয় না—ইহাই শ্রুতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি, মোক্ষলাভ ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য কি তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিষ্য। ব্রহ্ম কি তাহা হইলে দুইটী?

গুরু। হ্যাঁ, দুইটীই বটে। **পরব্রহ্ম** আর **অপরব্রহ্ম**। শ্রুতির যে স্থলে দেখিবে, ব্রহ্মকে সমস্ত নামরূপের অতীত, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ইত্যাদি সর্ব্বগুণের অতীত রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই স্থলেই বুঝিবে পরব্রহ্মের কথাই বলা হইতেছে। আর যে স্থলে দেখিবে মনোময়, প্রাণশরীর জ্যোতিঃ-স্বরূপ ইত্যাদি গুণ সহযোগে ব্রহ্মের বর্ণনা, সেই স্থলে বুঝিবে অপর-ব্রহ্মেরই বর্ণনা হইতেছে।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি দুই-ই হন, তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতির গতি কি?

গুরু। হ্যাঁ, পরমার্থতঃ ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই বটে। তবে তাঁহারই

বোধের সৌকর্য্যার্থ, তাঁহারই সহজ উপাসনার জন্য শ্রুতি বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট রূপে তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। নির্গুণ, অদ্বৈতৈকরস ব্রহ্ম পদার্থের ধারণা আমাদের বুদ্ধির অতীত, সে বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণই হউক না কেন। বুদ্ধির সাহায্যে নির্গুণের ধারণা হইতেই পারে না। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা অসীমের ধারণা হয় না। কাজেই ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্ম যে কি, তাহা ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। তবে সেই উদ্দেশ্যেই মানববুদ্ধির উপযোগী করিয়া ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়াও শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। সগুণের ধারণা করিতে করিতে অবশেষে নির্গুণে পৌছান যায়। না হইলে পরমার্থ হিসাবে ব্রহ্ম দুইটী নয়। উপাধির সম্পর্কেই ব্রহ্ম সগুণ, না হইলে তিনি বস্তুতঃ নির্গুণ। উপাধি মিথ্যা বলিয়া সগুণ ব্রহ্মও মিথ্যা, নির্গুণই সত্য। সুতরাং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতির কোনই হানি হয় না। তবে মনে রাখিও, যতক্ষণে নির্গুণে পৌছান না যায়, ততক্ষণ সগুণও সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়।

অতএব স্থির হইল যে, আচার্য্য বাদরির মতই সমীচীন।

শিষ্য। গুরুদেব! অমানব অপুরুষেরা উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। কিন্তু উপাসকও ত বিভিন্ন শ্রেণীর আছে। কেহ হয়ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ বা নাম, মূর্ত্তি ইত্যাদি এক একটী প্রতীক অবলম্বন করিয়া তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করেন। সকল শ্রেণীর উপাসকই কি ব্রহ্মলোকে নীত হন, না কোন বিশেষ নিয়ম আছে?

গুরু। না বৎস, সকল শ্রেণীর উপাসকই ব্রহ্মলোকে নীত হন না।

অপ্রতীক-আলম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণঃ—

আচার্য্য বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] বলেন যে [ইতি], যাহারা

প্রতীক অবলম্বনে উপাসনা করেন না, কেবল সেই উপাসকদিগকেই [অপ্রতীকালম্বনান্] অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান [নয়তি]।

শিষ্য। "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্"—(ব্রঃ সূঃ ৩.৩.৩১)—এই সূত্রে ত বলা হইয়াছে যে, অবিশেষে সকল উপাসকই ব্রহ্মলোকে যায়, এখন আবার একটা বিশেষ নিয়মের (restriction) কথা বলিতেছেন কেন ?

গুরু। "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্—" এই সূত্রের 'সর্ব্ব' শব্দের অর্থ যদি এই কর যে 'প্রতীক উপাসক ব্যতীত অন্য সকল,' তবে

উভয়থা-অদোষাৎ, তৎক্রতুঃ চ ॥১৫॥

উভয় বাক্যের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকিবে না [উভয়থাদোষাৎ]; আর [চ], এইরূপ বলা যুক্তিযুক্তও বটে, কারণ তৎক্রতুঃ-নামক শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, যে যাহা ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে তাহাই পায় [তৎক্রতুঃ]। সুতরাং যাহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা সগুণ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয় ; আর যাহারা প্রতীকের উপাসনা করে, তাহারা প্রতীকই প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ব্রহ্মলোকে যাওয়া সম্ভব হয় না। ছান্দোগ্যে এই বিষয়ের সুন্দর আলোচনা আছে। সে স্থলে বলা হইয়াছে,—যে বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে সে বাক্যের যতটা প্রসার, ততটুকুর মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করে। যে নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে নামের গতি যতখানি ততখানির মধ্যেই কামচারী হয় ইত্যাদি। যে টাকাকেই জীবনের ব্রহ্ম (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ) বলিয়া তাহারই উপাসনায় রত, সে

টাকাই লাভ করে, এ ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার। এইভাবে ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রতীকের তারতম্য অনুসারে ফলের যে তারতম্য হয়,

বিশেষং চ দর্শয়তি ॥১৬॥

সেই বিশেষত্বটুকুই [বিশেষং চ] দেখাইয়াছেন [দর্শয়তি]।

সুতরাং ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, অন্যে নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য। "এই সম্প্রসাদ (সম্যক্ প্রসন্ন, অর্থাৎ উপাধির অপগমে সর্ব্ববিধ মালিন্য বা অশান্তি রহিত) এই শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে উত্থান করিয়া (অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, অথবা দেহত্যাগ করিয়া) পরমজ্যোতিঃ **সম্পন্ন** হন এবং **স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন** হন"—এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-জ্ঞানীর মুক্তি কিরূপ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রুতির তাৎপর্য্য পরিষ্কার রূপে বুঝিতেছি না। 'স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন" হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি? অভিনিষ্পন্ন হওয়ার সাধারণ অর্থ উৎপন্ন হওয়া। তাহা দুই ভাবে হইতে পারে; এক পূর্ব্বে যাহা ছিল না, তাহা হওয়া—যেমন একজন মানুষ মরিয়া দেবতা হইল, সে পূর্ব্বে মানুষ ছিল, এখন নূতন কিছু হইল। অথবা অন্যপ্রকারেও অভিনিষ্পত্তি হইতে পারে—যেমন, একজন স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া সাময়িকভাবে অসুস্থ হইল, আবার রোগের উপশমে স্বাস্থ্যবান্ হইল, অর্থাৎ সে যেমন ছিল, তেমনই হইল—এই অর্থেও অভিনিষ্পত্তি শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পরব্রহ্ম জ্ঞানীর মুক্তি কি একটা নূতন কিছু হওয়া, না সে বরাবর যাহা সত্য সত্য আছে, তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র হওয়া?

গুরু। বৎস! জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে,

তবে তাহার সেই পরব্রহ্ম ভাবটী অজ্ঞানের প্রভাবে তিরোহিত থাকে মাত্র। যখন সে জানিতে পারে যে, সে পরমাত্মাই, তখনই তাহার মুক্তি, এবং সেই মুক্তি আর কিছুই নহে, কেবল

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥১॥

পরমাত্মভাবটীর আবির্ভাব বা বিকাশ মাত্র [সম্পদ্যাবির্ভাবঃ], অর্থাৎ জ্ঞানী বরাবর যাহা আছে, তাহাই বুঝিতে পারে মাত্র, সে নূতন কিছু হয় না। যে ভাবটী অজ্ঞানে আবৃত ছিল, অজ্ঞান অপগমে সেই ভাবটীই আবির্ভূত হয় মাত্র। শ্রুতির 'স্ব' এই শব্দটী হইতেই [স্বেন শব্দাৎ] ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রুতি বলিলেন, 'স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন'—ইহার অর্থ নিজের যেটী স্বরূপ সেইটীরই বিকাশ হওয়া, নূতন কিছু হওয়া নহে। নূতন কিছু হইলে আর স্ব-শব্দ ব্যবহার করিবার সার্থকতা থাকে না। এই স্ব-শব্দ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তির অবস্থায় জ্ঞানী যাহা হন, তাহা তাঁহার নিজের চিরন্তন স্বরূপ বা আত্মা, নূতন কিছু নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, মুক্তিতে যদি নূতন কিছু না হয়, তবে বদ্ধাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি?

গুরু। প্রভেদ এইমাত্র যে, যিনি পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন তিনিই এখন

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥২॥

মুক্ত হইলেন [মুক্তঃ], ইহা শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিলে [প্রতিজ্ঞানাৎ] বুঝা যায়।

দেখ, জীবের বন্ধন আর কিছুই নয়, কেবল জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় দেহাদিকেই 'আমি' বলিয়া মনে করা। দেহাদির

সহিত আপনাকে একেবারে একীভূত, জড়িত বলিয়া মনে করার নামই বন্ধন। এবং তাহাতেই যত দুঃখ। সেই অভিমানটী ত্যাগ হওয়ার নামই মুক্তি। সুতরাং মুক্তিতে নূতন আর কি হইবে? আত্মার যাহা চিরস্থির, অবিকৃতরূপ, তাহাই বন্ধাবস্থায় অজ্ঞানে আবৃত থাকে, মুক্তাবস্থায় প্রকাশিত হয়। মুক্তি যদি নূতন একটা কিছু উৎপন্ন পদার্থ হয়, তবে অবশ্যই কোন-না-কোন দিন তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী—উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই ধ্বংসশীল। সেরূপ মুক্তি ভোগকামী ব্যতীত কেহই আকাঙ্ক্ষা করে না, সে ত মুক্তি নয়, একটা বিশেষ ঐশ্বর্য্যের ভোগ মাত্র, ফলে ওটা স্বর্ণশৃঙ্খল তুল্য বন্ধেরই নামান্তর। মুক্তির মূল্যবত্তা এইখানেই যে, উহা চিরকালই স্থায়ী, সুতরাং বন্ধাবস্থার ও মোক্ষাবস্থার প্রভেদ এইমাত্র যে, বন্ধাবস্থায় অজ্ঞান থাকে, মুক্তাবস্থায় তাহা থাকে না।

'স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন',—এই যে মুক্ত আত্মার স্বরূপ বর্ণনা, তাহা শ্রুতি (ছাঃ ৮) আরম্ভ করিয়াছেন এই ভাবে:—প্রথমে শ্রুতি, মুক্ত আত্মা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন। তারপর "এই আত্মা কিরূপ, তাহাই আবার বুঝাইতেছি"—এই বলিয়া একে একে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে সেই একই আত্মার বর্ণনা করিয়া পরে বলিলেন, "শরীরাভিমান রহিত আত্মাকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করে না," এবং অবশেষে "দেহাদি অভিমানশূন্য আত্মা পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন,"—এই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিলেন। এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে এবং মুক্তাবস্থায়ও একইরূপে অবস্থান করেন, তবে জাগ্রদাদি অবস্থায় দেহাদির অভিমান থাকে, মুক্তাবস্থায় তাহা থাকে না—বন্ধের সহিত মুক্তির এইমাত্র পার্থক্য।

শিষ্য। আচ্ছা, স্ব-স্বরূপে অভিনিস্পন্ন হইলে মুক্তি হয়, বুঝিলাম। কিন্তু শ্রুতি ত বলিয়াছেন যে, তখন আত্মা জ্যোতিঃসম্পন্ন হন। জ্যোতিঃ বলিতে ত পঞ্চভূতের অন্তর্গত তেজ নামক ভূতকেই বুঝায়। যিনি সেই তেজরূপতা প্রাপ্ত হন, তাঁহার মুক্তি হইল, একথা বলা যায় কিরূপে? সমুদায় ভৌতিক পদার্থই ত ধ্বংসশীল।

গুরু। হ্যাঁ, তিনি তখন জ্যোতিঃ-সম্পন্নই হন বটে, কিন্তু তাহাতে মুক্তির কোন হানি হয় না। কারণ ঐ শ্রুতিতে জ্যোতিঃশব্দে কোন ভূতকে বুঝাইতেছে না, পরন্তু জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

আত্মা [আত্মা], কারণ প্রস্তাবটী আত্মা সম্বন্ধেই করা হইয়াছে [প্রকরণাৎ]। শ্রুতি "যে আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অমর—" (ছাঃ ৮.৭.১) ইত্যাদিরূপে পরমাত্মার বর্ণনা-প্রসঙ্গেই জ্যোতিঃ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং ঐ জ্যোতিঃ শব্দে পরমাত্মারই নির্দ্দেশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তেজভূতের কোন প্রসঙ্গই ওস্থলে নাই। আর জ্যোতিঃশব্দে যে পরমাত্মাকেও বুঝায়, তাহা 'জ্যোতি-র্দর্শনাৎ' (১.৩.৪০), এই সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হওয়া অর্থ জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করা।

শিষ্য। গুরুদেব! নিজের স্বরূপপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত আত্মা কি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ তাঁহার কি কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (Individuality) থাকে, না পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান?

গুরু। মুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥

এক হইয়াই [অবিভাগেন] অবস্থান করেন, কারণ, শ্রুতিতে

সেইরূপই দেখা যায় [দৃষ্টত্বাৎ]। পরমাত্মাই উপাধির সম্পর্কে অন্য একজন অর্থাৎ জীবরূপে প্রতিভাত হন, মুক্তাবস্থায় সেই উপাধির বিগমে যেই পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই হন। "আমি ব্রহ্ম" (বৃঃ ১.৪.১০), "সেই ব্রহ্ম তুমিই" (ছাঃ ৬.৮.৭), "যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর আত্মাও শুদ্ধব্রহ্মে মিশিয়া এক হইয়া যায়" (কঃ ৪.১৫), "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে মুক্তাত্মা ও পরমাত্মার কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না।

শিষ্য। গুরুদেব! মুক্ত আত্মা যদি পরমাত্মার সহিত একই হইয়া গেলেন, যদি তাঁহার কোন পৃথক্ অস্তিত্বই না থাকিল, তবে ত তাঁহার আত্মনাশই হইল! এরূপ মুক্তি কে কামনা করিবে ?

গুরু। বৎস! পরিপূর্ণতাকে যদি তুমি আত্মনাশ বল, তবে আর কি বলিব ? খণ্ডতার একটা আপাতঃ সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু সমস্ত খণ্ডতার পরিসমাপ্তি যেখানে, সেখানে যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাহা লাভ করিলে আর কিছুই লব্ধব্য থাকিবে না, সেই জিনিষটী যে প্রত্যেকের কাম্য হওয়া উচিত, ইহা কে অস্বীকার করিবে ? তাহাতেই পরম সুখ, চরম শান্তি। সেই পরিপূর্ণতার বিন্দুমাত্র অভাব হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে না; সুখের পূর্ণতা হইতে পারে না। তুমি যতই ঐশ্বর্য্য, যতই বিভূতি লাভ কর না কেন, পূর্ণ না হইতে পারিলে কিছুতেই তোমার শান্তি হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। "যৎ বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"—যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ, যাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক কিছুই নাই, তাহাই যথার্থ সুখ, তাহার বিন্দুমাত্র অল্পতায়ও সুখের লাঘব অবশ্যম্ভাবী।

পরমাত্মাই সেই ভূমা, পরিপূর্ণতা, সুখের চরম; তাহা হইতে এতটুকু পার্থক্য থাকিলেও পরিপূর্ণ আনন্দের, পরমা তৃপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। "যখনই পরমাত্মা হইতে এতটুকু পার্থক্য অনুভূত হয়, তখনই ভয়—অশান্তি"। সুতরাং সেই পরিপূর্ণতা অর্থাৎ পরমাত্মা হওয়াই কি কাম্য নহে? পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিকে তুমি বলিতেছ আত্মনাশ; আমি বলি, ইহাই আত্মার সত্যিকারের অস্তিত্ব, ইহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা পার্থক্যের অনুভূতিই প্রকৃত আত্মনাশ। যে ব্যাঘ্রশিশু জন্মাবধি মেষপালের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনাকেও একটা মেষরূপে ভাবিতে এবং মেষের মতই ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, বাস্তবিক তাহারই কি আত্মনাশ হয় নাই? সে যখন বুঝিতে পারে যে, সে বস্তুতঃ মেষ নহে পরন্তু ব্যাঘ্র, তখনই কি তাহার সত্যিকারের আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না? আপনার সত্যিকারের রূপ ভুলিয়া যাওয়াই ত আত্মনাশ। আর আপনার সত্যিকারের রূপ জানিতে পারাই ত প্রকৃত আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সুতরাং মুক্তাত্মার পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাওয়াকে যদি তুমি আত্মনাশ বল, তবে আমি কামনা করি, সেরূপ আত্মনাশ প্রত্যেকের হউক, প্রত্যেকের মেষের আত্মার বিনাশ হইয়া ব্যাঘ্রের আত্মা সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। এরূপ আত্ম-বিনাশে ভয় পাইতেছ কেন? অবশ্য ব্যাঘ্রশাবকের বোধ হয় প্রথম প্রথম খুবই ভয় হইয়াছিল—এই মনে করিয়া যে, "তাই ত, আমি বাঘ! না, না, তাহা হইলেই যে আমার মেষত্বের লোপ হইয়া যাইবে, কচি কচি ঘাস ত খাইতে পাইব না!" কিন্তু সে যখন দৃঢ়রূপে বুঝিল যে, সে সত্যই ব্যাঘ্র, মেষ নয়, তখন যে তাহার আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেইরূপ এখন তোমার মনে হইতে পারে বটে যে,

"তাইত, আমি আমার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিব, মুক্তির আস্বাদ তাহা হইলে উপভোগ করিবে কে?" কিন্তু যখন বুঝিতে পারিবে যে, তুমি সত্য সত্য পরমাত্মাই, তখন দেখিবে, এই ব্যক্তিত্বের (Individuality) জ্ঞানই বস্তুতঃ তোমার দুঃখের কারণ, পরমাত্মভাবই চরম সুখ।

শিষ্য। গুরুদেব! বুঝিলাম যে, মুক্ত আত্মা পরমাত্মাই হইয়া যান। কিন্তু পরমাত্মাকে ত দুই রকমে বুঝা যায়। এক রকম হইল— তিনি শুদ্ধচৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ, আর এক রকম—তিনি নিষ্পাপ, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি। মুক্তাত্মা পরমাত্মার এই দুইটী রূপের কোন্‌টী প্রাপ্ত হন?

গুরু। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিঃ উপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৫॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন যে, মুক্ত আত্মা পরমাত্মসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় রূপটীতে [ব্রাহ্মেণ] অবস্থান করেন, অর্থাৎ তিনি নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি অশেষ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন; শ্রুতির বিষয় নির্দ্দেশাদি হইতে [উপন্যাসাদিভ্যঃ] একথা জানা যায়। শ্রুতি পরমাত্মা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য এই বলিয়া বিষয়ের অবতারণা করিলেন যে, "যে আত্মা নিষ্পাপ, সত্যকাম ইত্যাদি, তাঁহারই নির্দ্দেশ করিতেছি, তাঁহাকেই জানা উচিত" (ছাঃ ৮.৭.১)। তারপর তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি রূপে সর্ব্বগুণাধার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, মুক্ত আত্মা নানারূপ ক্রীড়া করেন, সুখভোগ করেন ইত্যাদি, অর্থাৎ তাঁহার বহুবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন (ছাঃ ৮.১২.৩; ৭.২৫.২)। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা

যাইতেছে যে, মুক্ত আত্মা কেবল অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন না, পরন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

কিন্তু

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ ইতি ঔডুলোমিঃ ।।৬।।

আচার্য্য ঔডুলোমি [ঔডুলোমিঃ] বলেন যে [ইতি], যেহেতু পরমাত্মা কেবল শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সেইহেতু [তদাত্মকত্বাৎ] মুক্ত আত্মা কেবল মাত্র শুদ্ধ চৈতন্যরূপেই [তন্মাত্রেণ] চৈতন্যে [চিতি] অভিনিষ্পন্ন হন। আচার্য্য জৈমিনির মতে পরমাত্মার যেমন চৈতন্য **শক্তি** আছে, তেমন সত্যকামত্ব, সর্ব্বসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি **ধর্ম্মও** আছে। কিন্তু আচার্য্য ঔডুলোমির মতে পরমাত্মার কোনরূপ ধর্ম্মই নাই, চৈতন্যও তাঁহার ধর্ম্ম বা শক্তি নহে, কিন্তু তিনি শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র। "আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র" (বৃঃ ৪.৫.১৩)—এই জাতীয় শ্রুতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিষ্য। তবে পরমাত্মা নিষ্পাপ, অজর, অমর ইত্যাদিরূপে যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। ঔডুলোমি বলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, আত্মাতে পাপ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নাই। ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা পরমাত্মাতে কোন প্রকার ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

শিষ্য। কিন্তু তাঁহাকে ত সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদিরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে ?

গুরু। ঔডুলোমি বলেন, হ্যাঁ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম উপাধি-সম্পর্কেই আত্মাতে আরোপিত করা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধি ছাড়িয়া দিলে আত্মাতে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের একান্তই অভাব প্রমাণিত হয়।

পরমাত্মার যে উপাধি-সম্পর্কেও বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, তাহা "ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্" (ব্রঃ সূঃ ৩. ২. ১১) এই সূত্রে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্ত আত্মার ক্রীড়া, উপভোগ ইত্যাদিও দুঃখের অভাবমাত্র অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। এবং মুক্তাত্মার প্রশংসার জন্যই শ্রুতি ঐ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, বস্তুতঃ কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে। ইহা হইল আচার্য্য ঔডুলোমির মত।

সুতরাং দেখা গেল, জৈমিনি বলিতেছেন, পরমাত্মা বহুধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব মুক্তাত্মাও বহুধর্ম্মবিশিষ্ট। আবার ঔডুলোমি বলিতেছেন, পরমাত্মার কোনই ধর্ম্ম নাই, তিনি কেবল চৈতন্য, অতএব মুক্তাত্মাও শুদ্ধ চৈতন্যই। উভয়ের এই বিরোধের মীমাংসা আচার্য্য বাদরায়ণ অতি সুন্দররূপে করিয়াছেন।

এবমপি উপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাৎ অবিরোধম্ বাদরায়ণঃ ॥৭॥

তিনি বলেন [বাদরায়ণঃ], সত্য বটে পরমাত্মাতে পারমার্থিক হিসাবে কোনই ধর্ম্ম নাই এবং তিনি শুদ্ধ চৈতন্য মাত্রই, তাহা হইলেও [এবমপি] জৈমিনি প্রদর্শিত শ্রুতির নির্দ্দেশ অনুসারে [উপন্যাসাৎ] স্বীকার করিতেই হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মের অস্তিত্বও কোন-না-কোন প্রকারে ব্রহ্মে সম্ভব হইতে পারে, এবং সেইজন্য [পূর্ব্বভাবাৎ] বলিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম ব্যবহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মে আছে। অর্থাৎ পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্মে কোন ধর্ম্ম নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতে আছে, ফলে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ [অবিরোধম্] দেখা যায় না। মুক্ত আত্মা নিজের দৃষ্টিতে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যবান্। শুদ্ধ চৈতন্য পদার্থটী যে কি, তাহা স্বয়ং

শুদ্ধ চৈতন্য না হইলে বুঝা যায় না। কাজেই সাধারণ দৃষ্টিতে মুক্তাত্মাকেও কতকগুলি ধর্ম্মবিশিষ্ট রূপে ধারণা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ঔড়ুলোমি মুক্তাত্মার নিজ দৃষ্টি অবলম্বনে বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল চৈতন্যঘন, আর জৈমিনি সাধারণ দৃষ্টি অনুসারে বলিয়াছেন যে, তিনি বিবিধ গুণশালী। সুতরাং বস্তুগত্যা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! যিনি আপনাকে গুণাতীত ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মুক্তি কিরূপ বুঝিলাম। এক্ষণে যিনি ব্রহ্মকে অশেষ গুণের আধাররূপে অনুভব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন আছে, কৃপা করিয়া মীমাংসা করুন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদ্‌পদ্মে ব্রহ্মের উপসনার একটি প্রণালী কথিত হইয়াছে। উহাকে হার্দ্দবিদ্যা বা দহরবিদ্যা বলে। এই উপাসনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "এই উপাসক যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তবে সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ আবির্ভূত হন" (ছাঃ ৮.২.১)। কিন্তু কেবলমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই কোন কিছু লব্ধ হইতে দেখা যায় না। সঙ্কল্পের পরে সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুরূপ কার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়, কেবল সঙ্কল্পে কিছুই হয় না। কিন্তু শ্রুতি যেন বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র সঙ্কল্পেই পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়।

গুরু। হ্যাঁ,

সঙ্কল্পাৎ এব তু তৎ-শ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

কেবলমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই [সঙ্কল্পাদেব] পিতৃলোকাদির প্রাপ্তি হয়, কারণ শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তচ্ছ্রুতেঃ]। অবশ্য সাধারণ

মনুষ্যকে সঙ্কল্পের পরে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য চেষ্টাও করিতে হয়; কিন্তু দহর উপাসনায় সিদ্ধ পুরুষের সেরূপ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার প্রার্থিত বস্তু লব্ধ হয়। সাধারণ মানুষের চেষ্টা যত্ন দ্বারা সিদ্ধির যতটা সহায়তা হয়, তাহাও উপাসকের সঙ্কল্পদ্বারাই সাধিত হয়। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। শ্রুতিও সেই জন্যই কেবল সঙ্কল্পের কথাই বলিয়াছেন। আর, যেহেতু তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি বা কাম্য বস্তু লাভ হয়,

অতএব চ অনন্য-অধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

সেইহেতু [অতএব] তাঁহার অপর কোন অধিপতি বা নিয়ন্তা নাই [অনন্যাধিপতিঃ], একথাও স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ সে স্বয়ংপ্রভু, তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা জন্মাইবার কেহ নাই। একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন (ছাঃ ৮.১.৬)।

শিষ্য। দহরাদি বিদ্যাপ্রভাবে মুক্ত পুরুষের সঙ্কল্পমাত্রেই অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়—ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার মন থাকে। কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে, কি-না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তাঁহার কি শরীর ও ইন্দ্রিয়ও থাকে।

গুরু। অভাবং বাদরিঃ আহ হি এবম্ ॥ ১০ ॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন, শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না [অভাবম্]; কারণ [হি], শ্রুতি না থাকার কথাই [এবম্] বলেন [আহ]। শ্রুতি বলেন, "তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা যথাভিপ্রেত বস্তু লাভ করিয়া সুখানুভব করেন" (ছাঃ ৮.১২.৫)। সকলেই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সাহায্যে অভীষ্ট লাভ করিয়া সুখী

হয়, কিন্তু শ্রুতি বলেন যে, ব্রহ্মলোকস্থ মুক্ত পুরুষ মনের দ্বারা ভোগ করেন। শ্রুতির এই উক্তি দ্বারা নিশ্চয় করা যায় যে, তাদৃশ মুক্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না।

আবার,

ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্প-আমননাৎ ॥ ১১ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন, শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে [ভাবম্]; যেহেতু, শ্রুতি মুক্তপুরুষের ইচ্ছানুসারে এক বা বহু রূপ গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন [বিকল্পামননাৎ]। মুক্তপুরুষ যখন ইচ্ছানুসারে কখনও একরূপ কখনও বহুরূপ গ্রহণ করেন, তখন অবশ্যই তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে, না হইলে এরূপ রূপ গ্রহণই সম্ভব হয় না।

কিন্তু

দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধম্ বাদরায়ণঃ অতঃ ॥ ১২ ॥

আচার্য্য বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] বলেন যে, বাদরি ও জৈমিনি প্রদর্শিত উভয় প্রকার শ্রুতি আছে বলিয়া [অতঃ] মুক্ত পুরুষের শরীরেন্দ্রিয় থাকা ও না-থাকা উভয়ই [উভয়বিধম্] সম্ভব। যেমন বার দিন ব্যাপী একটি যাগকে এক শ্রুতি অনুসারে বলা হয় 'সত্র' এবং আর এক শ্রুতি অনুসারে বলা হয় 'অহীন', সেইরূপ [দ্বাদশাহবৎ] ব্রহ্মলোকস্থ মুক্তপুরুষও কখনও সশরীর, কখনও অশরীর। তাহার সঙ্কল্প অমোঘ ও বিচিত্র। যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখন এক বা একাধিক শরীর ধারণ করেন, এবং যখন সেরূপ ইচ্ছা করেন না, তখন অশরীর হইয়াই অবস্থান করেন।

শিষ্য। যখন অশরীর হন, তখন কিরূপে তাঁহার কামনা সিদ্ধি হয়?

গুরু। এক দিকে মৃত্যু, অপরদিকে পুনরায় জন্ম ইহার মধ্যে অর্থাৎ অন্তরালে যে অবস্থা, তাহার নাম **সন্ধ্যস্থান**; অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি—ইহাদের অন্তরালবর্ত্তী অবস্থা অর্থাৎ স্বপ্নকেও 'সন্ধ্যস্থান' বলা হয়। এই সন্ধ্য অবস্থায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় না থাকিলেও জীব কেবলমাত্র ভাবনা দ্বারা ভোগ করে। ব্রহ্মলোকস্থ মুক্ত পুরুষেরও

তন্বভাবে সন্ধ্যবৎ উপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শরীরের অভাবে [তন্বভাবে] সন্ধ্য অবস্থার ন্যায় [সন্ধ্যবৎ] কামনা সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে [উপপদ্যতে]।

আবার,

ভাবে জাগ্রৎ-বৎ ॥ ১৪ ॥

শরীর গ্রহণ করিলে [ভাবে] জাগ্রৎকালে যেরূপ ভোগ হয়, সেইরূপ [জাগ্রদ্বৎ] মুক্তপুরুষেরও ভোগ হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! মুক্তপুরুষ যখন বহু শরীর ধরণ করেন, তখন ঐ সমস্ত শরীরে একই সময়ে তাহার ভোগ হয় কিরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য আত্ম-স্বরূপে তিনি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর ব্যতীত ত ভোগ হয় না; অথচ সেই সূক্ষ্ম শরীর একটী মাত্র শরীরেই থাকিতে পারে, এবং কেবল মাত্র সেই শরীরেই মুক্ত পুরুষের ভোগ হইতে পারে, অন্যান্য শরীরে সূক্ষ্মশরীর না থাকায় ভোগ হইবে কিরূপে?

গুরু। বৎস! শ্রুতি বলেন, তিনি একই সময়ে বহু হইতে পারেন। এই বহু হওয়ার অর্থ সূক্ষ্মশরীরেরই বহু হওয়া; তিনি আত্ম-স্বরূপে আর বহু হইতে পারেন না, কারণ আত্মা এক। অতএব তিনি বহু হন, একথার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সূক্ষ্মশরীরই বিভিন্ন

শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেইজন্য তিনি একই সময়ে ঐ সমস্ত শরীরেই ভোগ উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারই অন্তঃকরণ বহু রূপ ধারণ করিয়া বহু শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তিনি সেই সেই অন্তঃকরণ উপহিত হইয়া ঐ সমস্ত শরীরের ভোগ উপলব্ধি করেন। ঐ সমস্ত শরীর কাষ্ঠযন্ত্রের মত নির্জ্জীব, কিংবা অন্য জীবকর্ত্তৃক অধিকৃত, যদি এরূপ বলা হয়, তবে "তিনি এককালে বহু শরীর ধারণ করেন" শ্রুতির এই বাক্যের কোন সার্থকতা থাকে না। সুতরাং

প্রদীপবৎ আবেশঃ তথাহি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

যেহেতু শ্রুতি বহু শরীর ধারণের কথা বলিয়াছেন, সেইহেতু [তথাহি দর্শয়তি] স্বীকার করিতেই হইবে যে, মুক্তপুরুষের এমন শক্তি হয়, যাহার প্রভাবে তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের মনের অনুরূপ অনেক সমনস্ক শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আবিষ্ট হইতে পারেন [আবেশঃ]। যেমন, একটী প্রদীপ বিভিন্ন প্রদীপের বর্ত্তির (সলতে) সহিত সংলগ্ন হইয়া আত্মানুরূপ বহু প্রদীপ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, এরূপ বলা যায়, সেইরূপ [প্রদীপবৎ] মুক্ত আত্মাও বহু শরীরে আবিষ্ট হইয়া ভোগ করেন। যোগীরাও ঠিক এইভাবে বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।

শিষ্য। গুরুদেব! মুক্তপুরুষের এই সমস্ত ভোগের বিষয় শুনিয়া আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। শ্রুতি বলেন, মুক্তি হইলে কোনরূপ ভেদজ্ঞানই থাকে না। যেমন, "তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" (বৃঃ ৪.৫.১৫)। "তখন দ্বিতীয় আর কিছু থাকে না।" (বৃঃ ৪.৩.১০)। "জলে জল মিশিয়া যাওয়ার মত মুক্তপুরুষ অদ্বয় পরমাত্মায় মিশিয়া যান" (বৃঃ ৪.৩.৩২) ইত্যাদি। কিন্তু ভোগ হইতে

হইলে যিনি ভোগ করিবেন, ভোগ্যবস্তু অবশ্যই তাঁহা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ ভোগ ভেদ না থাকিলে হয় না। সুতরাং মুক্তপুরুষের ভোগ হয় বলিলে এই সমস্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়।

গুরু। না, বৎস! বিরোধ কিছুই হয় না। ভাবিয়া দেখ, ঐ যে বিশেষ জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান না থাকার কথা বলা হইয়াছে, তাহা কোন্ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া। যে সম্পর্কে ঐ ভেদ জ্ঞানের অভাবের উক্তি আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখ। শ্রুতি অনেক স্থলে সুষুপ্তি অর্থে **স্বাপ্যয়** (স্বতে অর্থাৎ আত্মাতে, অপ্যয় অর্থাৎ লয় বা অবস্থিতি) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য স্থগিত হওয়ায় আত্মা আপনাতেই অবস্থান করেন। আবার, অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থানকে শ্রুতি **সম্পত্তি** নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'কোনরূপ ভেদ বা বিশেষ জ্ঞান থাকে না' এই যে উক্তি, ইহা

স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ অন্যতর-অপেক্ষম্,
আবিষ্কৃতম্ হি ॥ ১৬ ॥

"হয় স্বাপ্যয়, না হয় সম্পত্তি' এই দুইটীর [স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ] একটীকে লক্ষ্য করিয়াই [অন্যতরাপেক্ষম্] করা হইয়াছে। কোনস্থলে সুষুপ্তিসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তখন কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান (ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি) থাকে না; আবার কোন স্থলে অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ কৈবল্যসম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞানের অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত 'স্বাপ্যয়' ও 'সম্পত্তি' যে যে স্থলে আলোচিত হইয়াছে, সেই সেই স্থল অনুসন্ধান করিলেই পরিস্ফুট হয় [আবিষ্কৃতম্]।

নির্গুণ উপাসনার দ্বারায় যাঁহারা অদ্বয়ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহারা **কেবল** হন অর্থাৎ তাঁহারা অখণ্ড চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান করেন, কৈবল্য প্রাপ্ত হন; তাঁহাদের কোনপ্রকার ভেদজ্ঞানই থাকে না, এমন কি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনেরও বিলয় হয়। সুতরাং ঈদৃশ কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের কোনপ্রকার ভোগই হয় না। পূর্ব্বে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের কথা বলিয়াছি, তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ফল। সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভেদজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, সুতরাং তাঁহার ভোগ হইতে কোন বাধা নাই। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া সকামপুরুষ যেমন স্বর্গসুখ অনুভব করে; সগুণব্রহ্মোপাসনা করিয়াও সাধক ব্রহ্মলোকে নানাবিধ সুখভোগ করেন। তবে বিশেষ এই যে, স্বর্গাদি উপভোগের পর আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু সগুণ উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় আর জন্ম হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের কি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের কি অসীম ও স্বাধীন ক্ষমতা লাভ হয়? তাঁহারা কি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন? না, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়াই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য কি ঈশ্বরাধীন, ঈশরনিয়ন্ত্রিত?

গুরু। বৎস! যাঁহারা সগুণ উপাসনার দ্বারা ঈশ্বর তুল্য হন, তাঁহাদের 'স্বরাজ' আপেক্ষিক (Relative), আত্যন্তিক (Absolute) নহে। তাঁহারা ঈশ্বরাধীনে থাকিয়াই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

জগৎ-ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাৎ চ ॥১৭॥

জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যাপার ছাড়া [জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্] অন্যান্য অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহাদের লাভ হয়। যেহেতু, জগতের

উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্যাপারে একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার [প্রকরণাৎ] এবং [চ] মুক্তপুরুষের সেই সব ব্যাপারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই [অসন্নিহিতত্বাৎ]। শ্রুতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই জানা যায়।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে যাহা কিছু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহা সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের কার্য্য, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও সেরূপ ক্ষমতা আছে বলিয়া শ্রুতি কুত্রাপি নির্দ্দেশ করেন নাই। যাঁহার চিরন্তন শক্তি আছে, কেবল তিনিই অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহ পরিচালিত করিতে পারেন। মুক্তপুরুষের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, সমস্তই সাদি, উৎপন্ন, ক্রিয়াবিশেষদ্বারা লব্ধ (acquired), সুতরাং তাঁহার পক্ষে সৃষ্ট্যাদি করা অসম্ভব। তারপর বিভিন্ন মুক্তপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন মন। একজন হয় ত ইচ্ছা করিলেন, 'সৃষ্টি করিব,' ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর একজন হয় ত ইচ্ছা করিলেন, 'প্রলয় করিব'। ভাবিয়া দেখ, এরূপ বিরোধের কোনরূপ প্রতীকার হইতে পারে না। সুতরাং সগুণ উপাসনায় সিদ্ধপুরুষের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (unrestrained) নহে, কিন্তু ঈশ্বরাধীন।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতি, 'তাদৃশ উপাসক স্বারাজ্য' (পূর্ণস্বাধীনতা, absolute freedom), প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি বাক্যে

প্রত্যক্ষ-উপদেশাৎ ইতি চেৎ ?—

প্রত্যক্ষভাবেই নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যলাভের উল্লেখ থাকায় [প্রত্যক্ষোপদেশাৎ] সগুণ উপাসনায় মুক্তপুরুষের পূর্ণ স্বাধীন ঐশ্বর্য্যই লাভ হয়, এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

গুরু। না, বৎস! শ্রুতি ঐ স্বারাজ্যপ্রাপ্তির উল্লেখ করিলেও তাহাদ্বারা সগুণ উপাসকের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি

ন, আধিকারিক-মণ্ডলস্থ-উক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধ হয় না [ন], যেহেতু স্বারাজ্য প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া পরে আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঐ উপাসক যিনি সূর্য্যাদির তাপদানাদি কার্য্যের অধিকার প্রদান করেন এবং যিনি সূর্য্যাদিমণ্ডলে অবস্থান করেন, সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন [আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ]। শ্রুতির এই পরবর্ত্তী বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উপাসকের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, সমস্তই ঈশ্বরপ্রসাদে লব্ধ। যদি তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইত, তবে আর শ্রুতি তাঁহার ঈদৃশ ঈশ্বর-প্রাপ্তির কথা বলিতেন না। সুতরাং দেখা গেল যে, উপাসকের 'স্বরাজ' ভোগসম্বন্ধেই, সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে নহে।

শিষ্য আচ্ছা, উপাসক ত নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। সুতরাং তাঁহারও কেন নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে না? যে যেরূপ উপাসনা করে, সে ত সেইরূপই হয়?

গুরু। হাঁ, তাহা ঠিক বটে। যিনি যেরূপ উপাসনা করেন, তিনি সেইরূপই হন। সগুণ উপাসক সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের উপাসনা করিলেও তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়াত্মক হইলেও যিনি তাঁহাকে কেবল সগুণরূপে উপাসনা করেন, তিনি তাঁহার নির্গুণরূপ প্রাপ্ত হন না; সেইরূপ সগুণ পরমেশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য থাকিলেও উপাসক সেই অসীম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন না, কারণ তিনি পরমেশ্বরকে অসীম ঐশ্বর্য্য শালীরূপে উপাসনা করেন না, করিতে পারেনও না (অসীমের ধারণা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব), তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ভাবেই ভাবনা করেন,

ফলে বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য্যই প্রাপ্ত হন, তাঁহার পূর্ণত্ব উপাসক লাভ করেন না।

শিষ্য। তাহা হইলে পরমেশ্বরের কি বিকারাতীত (বিকার = পরমেশ্বর-শক্তির যাবতীয় বিকাশ, যাহা উপাসকের ধারণায় আসে) একটী রূপও আছে ?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে।

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিম্ আহ ॥১৯॥

বিকারের অতীত একটী রূপও [বিকারাবর্ত্তি চ] পরমেশ্বরের আছে, যেহেতু [তথাহি] শ্রুতি দুইরূপে অবস্থানের কথাই বলিয়াছেন [স্থিতিম্ আহ]। যেমন, "এই ভূতবর্গ তাঁহার একচতুর্থাংশ, অবশিষ্ট তিন অংশ বিকারাতীত" (ছাঃ ৩. ১২. ৬) ইত্যাদি।

দর্শয়তঃ চ এবং প্রত্যক্ষ-অনুমানে ॥২০॥

আর [চ] শ্রুতি এবং স্মৃতি [প্রত্যক্ষানুমানে] উভয়েই ব্রহ্মের বিকারাতীত রূপও যে আছে তাহা [এবং] দেখাইয়াছেন [দর্শয়তঃ]। আর, সগুণ উপাসকের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ নহে, তাহা

ভোগমাত্র-সাম্য-লিঙ্গাৎ চ ॥২১॥

শ্রুতির ইঙ্গিত হইতেও [লিঙ্গাৎ চ] জানা যায়, এবং সেই ইঙ্গিত হইতেছে এই যে, সগুণ উপাসকের একমাত্র ভোগবিষয়েই ঈশ্বরের সহিত সাম্য আছে [ভোগমাত্র-সাম্য], অন্য বিষয়ে নহে। শ্রুতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সগুণ উপাসক ভোগেই ঈশ্বরের সমান, ক্ষমতায় নহে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, যাঁহারা সগুণ

উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের বহুবিধ ঐশ্বর্য্যলাভ ও ভোগ হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত ভোগও নিশ্চয় অনন্ত অসীম নয়। সুতরাং ভোগক্ষয় হইলে তাঁহারাও কি সুকৃতকারীর চন্দ্রলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের মত পুনরায় এই জগতে ফিরিয়া আসেন ?

গুরু। না, বৎস! তাঁহাদের

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ (অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ) ॥২২॥

আর আবৃত্তি অর্থাৎ এই জগতে ফিরিয়া আসা বা পুনঃ জন্মগ্রহণ করা হয় না [অনাবৃত্তিঃ], যেহেতু শ্রুতি তাহাই বলেন [শব্দাৎ]। শ্রুতি বলেন, যাঁহারা একবার ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না (ব্রঃ সূঃ ৪. ৩. ১৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। শাস্ত্রসমাপ্তি বুঝাইবার জন্য সূত্রটী দুইবার বলা হইয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

বিশেষ সূচী

সূত্র সূচী

অ = অধ্যায়, পা = পাদ, সূ = সূত্র, পৃ = পৃষ্ঠা

অ

আ

ই

গ

প